নির্বাচিতা

নির্বাচিত ছোট গল্পের সংকলন

প্রেমেন্দ্র মিত্র

এম. সি. সরকার অ্যান্ড সন্‌স প্রাইভেট লিমিটেড
১৪, বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলিকাতা ৭৩

সূচীপত্র

শুধু কেরানী

তখন পাখীদের নীড় বাঁধবার সময়। চঞ্চল পাখীগুলো খড়ের কুটি, ছেঁড়া পালক, শুকনো ডাল মুখে করে উৎকণ্ঠিত হয়ে ফিরছে।

তাদের বিয়ে হ'ল।—দুটি নেহাৎ সাদাসিদে ছেলেমেয়ের।

ছেলেটি মার্চেণ্ট অফিসের কেরানী—বছরের পর বছর ধরে বড় বড় বাঁধানো খাতায় গোটা গোটা স্পষ্ট অক্ষরে আমদানি-রপ্তানির হিসাব লেখে। মেয়েটি শুধু একটি শ্যামবর্ণ সাধারণ গৃহস্থঘরের মেয়ে—সলজ্জ সহিষ্ণুত মমতাময়ী।

আফ্রিকা জুড়ে কালো কাফ্রী জাতের উদ্বোধন—হুঙ্কারে সাদা বরফের দেশের আকাশ কেমন করে শিউরে উঠছে, সে খবর তারা রাখে না। হলুদবরণ বিপুল মৃতপ্রতিম জাতি একটা কোথায় কবরের চাদর ছুঁড়ে ফেলে খাড়া হয়ে দাঁড়িয়েছে তাজা রক্তের প্রমাণ দিতে, সে খোঁজ রাখবার তাদের দরকার হয় না।

তারা বাঙলার নগণ্য একটি কেরানী আর কেরানীর কিশোরী বধূ।

আসন্ন যৌবনা মেয়েটি স্বজনহীন স্বামীর ঘরে এসে গৃহিনী হ'ল।

প্রেমের কবিতা তারা লেখে না, পড়বার ফুরসৎ বা সুবিধাও বড় নেই। দুজনে দুজনকে সম্বোধন করতে নব নব কল্পনা-লোকের সম্ভাষণ চয়ন করে না। শুধু এ ওকে বলে—'ওগো'।

সকাল বেলা স্বামীকে খাইয়ে-দাইয়ে হাতে পানের ডিবেটি দিয়ে দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে মেয়েটি একটি দরজার আড়াল থেকে ঈষৎ মুখ বার করে সলজ্জ একটু করুণ হাসি হাসে: —ছেলেটিও ফিরে চেয়ে হাসে। কোনো দিন বা মেয়েটি বলে মৃদু মধুর স্বরে, 'ওগো তাড়াতাড়ি এসো, কালকের মতো দেরী কোরো না।' ছেলেটি হয়ত অনুযোগের স্বরে বলে, 'বাঃ! কাল ত মোটে আধঘণ্টা দেরি হয়েছিল; বললুম ত রাস্তায় ট্রামের তার খারাপ হয়ে গিয়েছিল ব'লেই...একটু দেরি হ'লেই বুঝি অমনি অস্থির হয়ে উঠতে হয়?' মেয়েটি লজ্জিত হয়ে বলে, 'হ্যাঁ, আমি বুঝি অস্থির হই!'

সন্ধ্যায় দরজায় একটি টোকা পড়তে না পড়তেই দুটি উৎসুক হাতে দরজাটি খুলে যায়; সারাদিনের পরিশ্রম-শ্রান্ত ছেলেটি ধীরে ধীরে গিয়ে পরিচ্ছন্ন বিছানায় একটু ব'সে আপত্তি করে বলে, 'না গো, তোমায় জুতোর ফিতে খুলে দিতে হবে না।' মেয়েটি প্রতিবাদ করে বলে, 'তা দিলেই বা তাতে দোষ কি?' ছেলেটি একটু রাগ দেখিয়ে বলে, 'ওটা কি আমি নিজে পারিনে?' মেয়েটি খুলতে খুলতে বলে, 'তা হোক—তুমি চুপ করো দেখি।'

ছুটির দিন তাদের আসে। সেদিন একটু ভালো খাবার দাবারের আয়োজন হয়, কোনদিন দুটি একটি বন্ধু আসে নিমন্ত্রিত হয়ে। মেয়েটি সলজ্জ-সঙ্কোচে আপাদমস্তক অবগুণ্ঠিত হয়ে পরিবেষণ করে। সে-দিন বিছানায় আলস্যে হেলান দিয়ে গল্প করবার দুপুর। জ্ঞানাভিমানহীন কেরানী আর কেরানী-প্রিয়ার সাধারণ আনন্দ-আলাপ। জটিল তর্কের দুরূহ সমস্যার গোলকধাঁধায় তারা ঘুরে ঘুরে হয়রান হয় না, সহজেই সেসব মীমাংসা করে ফেলে। মেয়েটি

হয়ত জিজ্ঞাসা করে, আচ্ছা, 'মশা মারলে পাপ হয় ত?' ছেলেটি হয়ত বলে, 'নিশ্চয়ই? আর মেরো না।' মেয়েটি বলে, 'বেশ! কিন্তু রোজ যে মাছগুলো মেরে খাও, পাঁঠার মাংস খাও, তার বেলা?' ছেলেটি একটু বিব্রত হয়ে বলে, 'বাঃ! ও যে আমাদের আহার। যা আমাদের আহারের তা খেলে কি পাপ হয়? তা হ'লে ভগবান আমাদের আহার দেবেন কেন?' মেয়েটি বলে, 'ও—।' মেয়েটি হয়ত বলে, 'ওদের বাড়ির বৌরা কাল বেড়াতে এসেছিল, ওরা বলছিল কোন্ গণৎকার নাকি গুনে বলেছে আর দশদিন বাদে পৃথিবীটা চুরমার হয়ে যাবে একটা ধূমকেতুর সঙ্গে ধাক্কা লেগে,—সত্যি?' ছেলেটি হেসে বলে, 'মেয়েদের যেমন সব আজগুবি কথা! চুরমার হয়ে গেলেই হ'ল কিনা!' মেয়েটি গম্ভীর হয়ে বলে, 'আমিও বিশ্বাস করিনি। আর একবারও ত অমনি গুজব উঠেছিল, তখন আমাদের বিয়ে হয়নি।' এমনিতর তাদের ছুটির আনন্দগুঞ্জন।

একদিন ছেলেটি ট্রামের পয়সা বাঁচিয়ে হেঁটে এল। সেই পয়সায় রাস্তার মোড়ে একটি গোড়ের মালা কিনলে। ঘরে এসে হঠাৎ মেয়েটির খোঁপায় জড়িয়ে দিয়ে বললে, 'বলো দেখি কেমন গন্ধ?' মেয়েটি বিস্মিত আনন্দে মালাটি দেখতে দেখতে একটু ক্ষুন্নস্বরে বললে, 'কেন আবার তুমি বাজে পয়সা খরচ করতে গেলে বলোত?' ছেলেটি বললে, 'বাজে পয়সা খরচ বুঝি! ট্রামের পয়সা আজ বাঁচিয়ে তাইতে কিনেছি।' এবার মেয়েটি সত্যি রেগে বললে, 'এই ছাই ফুলের মালা কেনবার জন্যে তুমি এই পথটা হেঁটে এলে? যাও, চাইনে আমি তোমার ফুলের মালা!' ছেলেটি ক্ষুব্ধস্বরে বললে, 'বাঃ—অমনি রাগ হয়ে গেল, সব কথা আগে শুনলে না কিছু না, অমনি রাগ! আজ অফিসে বড্ড মাথাটা ধরেছিল, ভাবলুম মাঠের ভিতর দিয়ে হাওয়ায় হেঁটে গেলে ছেড়ে যাবে। তার উপর সকাল সকাল ছুটি হ'ল ; একি এতই অন্যায় হয়ে গেছে? বেশ যা হোক্।' মেয়েটি একটু কাতর হয়ে বললে, 'আমি রাগ করলুম কোথায়? তুমি মিছিমিছি ফুলের মালা কেনবার জন্যে হেঁটে এসেছ ভেবে—।' ছেলেটি বললে, 'দাও, ফুলের মালাটা ফেলে দাও তাহ'লে।' —এবার মেয়েটি পরম আনন্দে ফুলের মালাটি খোঁপায় জড়াতে জড়াতে বললে, 'হুঁ ফেলে দিচ্ছি এই যে! বাবা! একটা ভালো কথা যদি তোমায় বলবার জো আছে।'

একদিন একটু বেশি জ্বর হ'ল মেয়েটির। তার পরদিন আরো বাড়ল। তার পরদিনও ক'মল না। অফিস যাবার সময় উৎকণ্ঠিত হয়ে ছেলেটি বললে, 'এখানে এমন করে কি ক'রে চলবে। দেখবার একটা লোক নেই—এই বেলা তোমার বাপের বাড়ি যাবার বন্দোবস্ত করি। মেয়েটি বললে, 'না না, ও কালকেই সেরে যাবে...তুমি অফিস যাও, ভাবতে হবে না।' ছেলেটি উদ্বিগ্ন হৃদয়ে কাজে গেল উপায় ভাবতে ভাবতে। তার পরদিনও জ্বর বাড়ল দেখে বললে, 'না, আমার আর সাহস হচ্ছে না। আমি সমস্ত দিন অফিসে থাকি, জ্বর বাড়লে কে তোমায় দেখে! তোমায় রেখে আসি চলো ওখানে।' মেয়েটি করুণ-চোখে তার দিকে চেয়ে রইল, তারপর মুখ ফিরিয়ে বললে, 'আমার সেখানে ভালো লাগে না।'

জ্বরের মধ্যে রাঁধারাঁধি নিয়ে দুজনের রাগারাগি হয়। মেয়েটি বলে,

'আমি খুব পারব—তোমার না খেয়ে অফিসে যাওয়া হবে না।' ছেলেটি বলে, 'তুমি পারলেও আমি রাঁধতে দেব না। আমি না-হয় হোটেলে খাব।' মেয়েটি বলে, 'হ্যাঁ ভদ্রলোকে বুঝি হোটেলে খেতে পারে!' ছেলেটি বলে, 'দরকার হ'লে সব পারে।' মেয়েটি তবু বলে, 'তোমার এখনো ত দরকার হয়নি।'

তারপর জোর করে মেয়েটি রাঁধতে যায়। ছেলেটি এবার খুব রাগ করে, ভীষণ এক দিব্যি দিয়ে বলে, 'যে আজ রাঁধবে সে আমার মরা মুখ দেখবে।' মেয়েটি দিব্যি শুনে স্তম্ভিত হয়ে বিছানায় শুয়ে কাঁদতে থাকে। ছেলেটি অনুতপ্ত হয়ে মাথায় হাত বুলিয়ে শান্ত করবার চেষ্টায় বলতে থাকে, 'তুমি অবুঝের মত জেদ করলে, তাই না আমি দিব্যি দিলুম; লক্ষ্মীটি, রাগ কোরো না। আচ্ছা ভেবে দেখ দেখি আগুণ-তাতে রেঁধে যদি তোমার জ্বর বেশি বাড়ে তখন ত আমারই কষ্ট বাড়বে। এখন ত একদিন রান্না পাচ্ছিনে, তখন ত কতদিন পাব না...সে ত আমারই কষ্ট...তুমি ভালো হয়ে যত খুশি রেঁধো না, আমি কি বারণ করছি?' মেয়েটি বলে, 'বেশ ত, খুব হয়েছে, দিব্যি দিয়েছ—আমি ত আর রাঁধতে যাচ্ছিনে!' ছেলেটি আরো অনুতপ্ত হয়ে বোঝাতে থাকে।

সেবারে জ্বর আপনা থেকেই ধীরে ধীরে সেরে গেল।

তাদের রাগারাগির পালাও এমনি করে সমাপ্ত হ'ল।

নতুন নীড়ে তখন অচেনা অতিথির সমাগম হয়েছে। একটি খোকা।

কিন্তু মেয়েটির আর বাপের বাড়ি থেকে আসা হয়ে উঠছে না। অসুখ আর সারতে চায় না, বাপ-মাও অসুখ-সুদ্ধ মেয়েকে ছেড়ে দিতে রাজি হয় না। ডাক্তার ধাত্রী বলে 'সূতিকা।'

ছেলেটি বন্ধুদের কাছে উৎকণ্ঠিত হয়ে জিজ্ঞাসা করে বেড়ায়, 'হ্যাঁ ভাই, সূতিকা হ'লে কি বাঁচে না?'

মেয়েটি দিন দিন আরো কাহিল হয়ে যেতে লাগল—বিছানা থেকে আর ওঠবার ক্ষমতা রইল না ক্রমে।

ছেলেটি রোজ অফিসে দেরি হবার জন্যে বকুনি খায়। হিসাব ভুলের জন্যে তাড়া খায়।

কিন্তু তারা সৃষ্টির বিরুদ্ধে এই অকারণ উৎপীড়নের জন্যে বিদ্রোহী হয়ে উঠতে জানে না। নির্দোষের উপর এই অন্যায় অবিচারে, বিধাতার পক্ষপাতিত্বে ক্ষিপ্ত হয়ে অভিশাপ দেয় না সংসারকে। মানুষের কাছে তারা মাথা নিচু ক'রে চলে, বিধাতার কাছেও।

মেয়েটি কোনদিন স্বামীকে একলা কাছে পেয়ে, করুণ কাতর চোখে তার মুখের দিকে চেয়ে বলে, 'হ্যাঁ গা, আমি বাঁচব না?'

ছেলেটি জোর করে বুক-ফাটা হাসি হেসে বলে, 'কি যে পাগলের মতো বলো তার ঠিক নেই। বাঁচবে না কেন, কি হয়েছে তোমার?'

মেয়েটি চোখ নামিয়ে মৃদুস্বরে বলে, 'আমি মরতে চাইনে কিছুতেই।'

ছেলেটি আবার হেসে বলে, 'ওসব আজগুবি কথা কোথায় পাও বলো ত?'

একটা হাসি আছে—কান্নার চেয়ে নিদারুণ, কান্নার চেয়ে হৃৎপিণ্ড

নেংড়ান।

রোগ কিন্তু ক্রমশঃ বেড়েই চলল। মেয়েটি আর স্বামীর কাছে জিজ্ঞাসা করে না, 'হ্যাঁ গা, আমি বাঁচব না?' বরঞ্চ তার সামনে প্রফুল্ল মুখ দেখিয়ে হাসতে চেষ্টা ক'রে বলে, 'তুমি ভাবছ কেন, আমি ত শীগগীরই সেরে উঠছি।' তারপর ঘরকন্না পাতবার নব নব কল্পনার গল্প করে, কেমন করে ছেলে মানুষ করবে, তার নাম কি রাখবে, এইসব। ছেলেটিও তার শিয়রে ব'সে করুণ হেসে তার শীর্ণ হাতটি নিজের হাতে নিয়ে স্তব্ধ হয়ে শোনে। মেয়েটি বলে, 'তুমি ভেবে ভেবে মন খারাপ কোরো না, আমি ঠিক সেরে উঠব।' ছেলেটি বলে, 'কই, আমি ভাবিনে ত! সেরে উঠবে না ত কি, নিশ্চয়ই উঠবে।' কিন্তু তারা বুঝতে পারে, এ ছলনা দুজনের কারুরই বুঝতে বাকি নেই। তবু তারা পরস্পরকে সান্ত্বনা দিতে এই করুণ ছলনার নিষ্ঠুর মর্মান্তিক অভিনয় করে। তারপর লুকিয়ে কাঁদে।

তবু ছেলেটির নিত্যনিয়মিত অফিস যেতে হয়। বড় বড় বাঁধানো খাতা-গুলোর নির্ভুল গোটা-গোটা অক্ষরগুলো নির্বিকারভাবে চেয়ে থাকে। তেমনি হিসাবের পর হিসাব নকল করতে হয়।

তাড়াতাড়ি ঘরে ফেরবার জন্যে প্রাণ আকুল হয়ে উঠলেও ছেলেটি হেঁটে আসে—ট্রামের পয়সা বাঁচিয়ে ফুলের মালা কেনবার জন্যে নয়—অসুখের খরচ যোগাতে।

কোনো সময় হয়ত একবারটি মনে হয় যদি সে এমন গরীব না হ'ত, আরো ভালো করে ডাক্তার দেখিয়ে আর একটু চেষ্টা করে দেখত।

শুধু সেদিন জ্ঞান হারাবার আগে মেয়েটি একটি বারের জন্যে এতদিন-কার মিথ্যা করুণ ছলনা ভেঙে দিয়ে কেঁদে ফেলে বললে, 'আমি মরতে চাইনি,—ভগবানের কাছে রাতদিন কেঁদে জীবন ভিক্ষা চেয়েছি, কিন্তু—'

সব ফুরিয়ে গেল।

তখন কাল-বোশেখীর উন্মত্ত মসীবরণ আকাশে নীড়ভাঙার মহোৎসব লেগেছে।

পোনাঘাট পেরিয়ে

রোগা লম্বা শালতিগুলি আসে—খড়, ধান, চালের বোঝাই নিয়ে নড়ালের পোলের তলা দিয়ে, দক্ষিণ থেকে। নোনা দেশের মিশকালো চাষী, বাঁশের লম্বা লাগি বায় ; দরমার ছাউনির তলায় উনুনে ভাত ফোটে।

উত্তর থেকে আসে হাঁড়ি, টালি, বালি, ইট, গুড়ের বোঝাই নিয়ে মহাজনী নৌকা।

নদী মরে এসেছে। এককালে গাধাবোটেও আপত্তি ছিল না, আজকাল জোয়ারের সময় বড় জোর বিশমাল্লা পর্যন্ত চলে। ভাঁটায় শুধু শালতি।

এখানে নদীটির অত্যন্ত দৈন্য দশা। শীতকালে ভাঁটার সময় হাঁটু পর্যন্ত জল ওঠে কিনা সন্দেহ।

হালদার কোম্পানীর চালান-সরকার বিদেশী লোক, নতুন কাজে বাহাল হয়েছে। সেদিন সে কাকে বলেছিল, 'খালের জল যা ঘোলা, নাইতি পারবা না।'

'খাল! খাল! তোমার নানা কাটিয়েছিল'—বুড়ো সরকার-মশাই দাঁত-খিঁচিয়ে উঠলেন—'এই খালের এক ফোঁটা জল পেলে তোমার চোদ্দপুরুষ উদ্ধার হয়ে যায়! খাল! ডোবা!'

'আমার খুশি আমি একশবার খাল বলব। আপনার কি।'

'আমার কচু! তুমি নর্দমা বলো না, মা গঙ্গার মুখে থুথু দাও না!'

এমন তাদের রোজই হয় ছোটো-খাটো জিনিস নিয়ে। তার কারণও আছে। বুড়ো সরকারের বকাটে ঘর জামাইটা গোলায় গোলায় পাশা চেলে গাঁজা-ভাঙ্গ টেনে দিন কাটায়।

সরকার-মশাই বলেন, 'তার ত একটা হিল্লে হয়ে গেছল ওই বেটা না উড়ে এসে জুড়ে বসলে।'

কথাটা ষোল আনা সত্য নয়। জামাইকে বলে কয়ে তিনি কাজে একরকম লাগিয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু একদিন মুখার্জি কোম্পানীর সরকার এসে হট্টগোল বাধিয়ে দিলে—'সকাল থেকে মাল নেই ; তিনশ মিস্ত্রী বেকার বসে আছে, দু'ফেরা সুরকি মুটের মাথায় পাঠিয়ে দিয়েছেন! বলিহারি আপনাদের আক্কেল! কে এখন গুনোগার দেবে শুনি?'

সত্যিই গুরুতর ব্যাপার!

'গাড়োয়ানরাও অনেকক্ষণ মাল নিয়ে বেরিয়ে গেছে, এতক্ষণ ফিরে আসবার কথা!' খোদ কর্তা গদি থেকে বিপুল দেহভার তুলে উদ্বেগে হাঁসফাঁস করতে লাগলেন।

মুখার্জি-কোম্পানী বড় খদ্দের!

শেতল মোড়ল হাঁফাতে হাঁফাতে এসে বললে, 'আজ্ঞে, আমিও শুধু দু'ফেরা সুরকি চেয়েছিলাম!'

'তারপর?'

'পঁচিশ গাড়ি সুরকি নিয়ে আমি কি আমার গোরে চাপা দেব?'

বুড়ো সরকারের বকাটে জামাই তখন নির্বিকার মুখে চালান লিখে চলেছে।

খোদ কর্তা হাঁকলেন, 'কে, চালান সই করেছে কে?'

'আজ্ঞে আমি!—'

ব্যাপার বিশেষ কিছুই নয়—একই রাস্তার নম্বরগুলো একটু ওলট-পালট হয়ে গেছে। অমন ভুল ত হতেই পারে।

বুড়ো সরকার-মশাই-এর চোখ ফেটে জল বেরোয় আর কি।

তাঁর জামাই কিন্তু অত্যন্ত বিনীত ভাবে জিজ্ঞাসা করলে, 'কাল থেকে তাহ'লে আর আসতে হবে না?'

'না।'

'আর পরশু?'

'না, না।'

'আজ্ঞে, কোনদিন যদি দরকার বোধ করেন ডাক দিলেই আমি আসব. জানেন ত ওই গুলিখোরের ঘাট।'

দু'জোড়া রোষরক্ত চোখের সামনে দিয়ে আর কেউ অমন অবিচলিত ভাবে বেরিয়ে আসতে পারত না বোধ হয়। কিন্তু বলাই-এর কাঠামোই আলাদা।

আর চাকরির বালাই নেই। নির্ভাবনায় বলাই ঘুরে বেড়ায়। সরকার মশাই বলেছেন, 'মুখ দেখতে চাই না।' মুখ দেখবার চেষ্টা করলেও তিনি সফল হতেন বলে মনে হয় না—সে সুযোগ মেলা ভার।

শাশুড়ি ঝনাৎ করে ভাতের থালাটা নামিয়ে দিয়ে মুখ হাঁড়ি করে ঘরে গিয়ে ঢোকেন। বলাই নির্বিকার মুখে থালাটা নিঃশেষ করে উঠে যেতে যেতে বলে, 'ডালটা যা হয়েছে অমৃত।'

বুড়ো সরকারের ষোড়শী কন্যা ভ্রূকুটি করে মনে মনে বলে. 'মরণ আর কি!'

শাশুড়ি গলা ছেড়েই বলে, 'চোদ্দ পো অধর্ম না করলে এমন জামাই হয়। ওর ভীমরতি ধরেছিল, নইলে রাজ্যে আর পাত্তর ছিল না!'

বলাই একটু মুচকে হাসে ; তাচ্ছিল্যভরে দেওয়া পানটা বৌ-এর হাত থেকে নিয়ে বলে, 'একটু চুন।' তারপর একটু থেমে বলে. 'সঙ্গে না হয় একটু কালিও দিও।'

চপলা ভুরু কুঁচকে মুখ ঘুরিয়ে চলে যায়।

এ-বছর বাজার বড় মন্দা, নদীতে দাঁড়ের ঘা পড়ে না। দক্ষিণ থেকে দুটি একটি শালতি কখনো বা আসে. লগি বেয়ে,—উত্তরের কুদ্‌ঘাটায় কেরানী নাক ডাকিয়ে ঘুমোয়—

'হ্যাঁ বাবা, পেটো, বেশ করে বেড়োন্‌ দাও, নইলে অত আয়েশ সইবে কেন? ফুলে মরে যাবে যে! গতরে ঘুণ ধরে যাবে! কাজ যেমন নেই, রোজ সময় করে একটু একটু বেড়োন দিচ্ছ ত?'

মেহরারু বলদটাকে রেহাই দিয়ে বললে, 'নেহি বাবু, এ বলদটো ভারী বদমাশ আছে, ইহার লিয়ে হামার বিলকুল লোকসান হয়ে গেলো। আর সব

বলদ হামার নাল বাঁধতে লাগে দু-আনা, আর ই-শালার খালি গিরাই লাগে এক টাকা। অর পর নয়া রুশ্‌শি—উভি দশ আনার কমতি নেই!'

অনেকগুলো গরুর-গাড়ি ল্যাজ তুলে অতিকায় ফড়িঙের মতো পড়ে ছিল। তারি একটায় বেশ আয়েস করে বসে বলাই বললে, 'তেমনি একটি বছরের মতো যে খালাস বাবা! দুষ্টু গরুর সুখ ত ওই। ক্ষুর কখনো পাতলা হবে না, ও আট দিন অন্তর নাল বাঁধাবার হ্যাঙ্গামা নেই।'

ওসমান কাছেই বসে জীয়ুতের ভঁইসের নাল বাঁধছিল। লোহার নালে একটা গজাল ঠুকে বললে, 'ঠিক বলেছেন বাবু! আমি এই বিশ বছর নাল বাঁধছি, একটা দুশমন গরুর পাতলা ক্ষুর দেখলাম না।'

'কিন্তু এত নাল বাঁধাবাঁধিই বা কিসের রে বাপু! বসে বসে গাড়ি চালাতে ত বোধ হয় ভুলেই গেলি। বলদগুলো কি আজকাল দাঁড়িয়ে নাল খোয়াচ্ছে, না সুরকি-পটির নসীব ফিরল?'

জীয়ুৎ দুটি বিড়ি বার করে একটা বলাই এর দিকে এগিয়ে ধরল, 'কাঁহা নসীব বাবু, কোনো গোলেমে' বিক্রি উক্রি কুছু নাহি বা, আজ ছ রোজ হমার এক্‌গো খেপ মিলল ন।'

নাল বাঁধা শেষ হয়ে গেছল। ওসমান মোষের পা থেকে দড়িটা খুলে নিতে নিতে বললে, 'সত্যি এবছর বাজার এত ঢিলে কেন বলুন ত বলাই-বাবু?'

মুখ থেকে এক রাশ ধোঁয়া ছেড়ে বলাই বললে, 'শহরে কি আর টাকা আছে রে বাপু, যে লোকে বাড়ি করবে?'

খানিক থেমে সকলের মুখের দিকে একবার চেয়ে নিয়ে বলাই আবার বললে, 'এক টাকার নোট বেরিয়েছে দেখেছিস?'

'হাঁ, দেখেছে।'—মেহরারু আরো কিছু বলতে যাচ্ছিল, বলাই তাকে বাধা দিলে, 'খালি কাগজ! ঐ কাগজ দিয়ে ভুলিয়ে সব টাকা বিলেতে চালান করে দিচ্ছে, তা জানিস?'

এ খবরটা তারা কেউ জানত না বটে স্বীকার করলে।

'টাকা এদেশে থাকলে ত লোকে বাড়ি করবে। সব টাকাই যে বিলেতে!'

তিনজনেই মাথা নেড়ে জানালে—ঠিক কথা বটে—বলাইবাবু ধরেছেন ঠিক—'আচ্ছা, বিলেতে টাকা পাঠাচ্ছে কেন?'

'কেন? আবার যে যুদ্ধ বাধবে রে!'

'ফিন্‌ লড়াই!'

বলাই গরুর গাড়িটায় চিৎ হয়ে শুয়ে পড়ে বললে, 'তবে আর বলছি কি? সুরকি-পটিতে লোক চলতে পারত না, দু'মাস অন্তর রোলার ইঞ্জিন আসত রাস্তা মেরামত করতে। আর এখন?'

'আমি আর খাদেম এ রাস্তার নাল বেঁধে কুলিয়ে উঠতে পারতাম না, বাবু—' ওসমান কথাটা শেষ করতে পারল না।

মেহরারু নদীর দিকে মুখ করে বসে ছিল, উল্লসিত হয়ে হাঁকলে, 'উ নাও আছে না কি আছে বোলাই বাবু? দেখেন ফিরে!'

বিস্ময়ের কথাই ত! পোনাঘাটের বাঁকের মাথায় ইটের ভরা দেখা দিয়েছে। একটি নয়, দুটি নয়, পাঁচ-পাঁচটি ইঁটের ভরা পোনাঘাটের বাঁকের মাথায়

পর পর দেখা দিল। বলাই হাঁকলে, 'কোন ঘাটে বাঁধবে মাঝির পো?'
হালীর মাচা থেকে উত্তর এল, 'হালদারদের গো হালদারদের!'
তা হালদারদের ছাড়া আর কাদেরই বা হওয়া সম্ভব!
রাস্তায় যেতে যেতে একটি লোক থেমে পড়ে জিজ্ঞাসা করলে, 'কি বললে? হালদারদের না?'
সকলে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে একটু হাসল মাত্র। উত্তর দিলে না। লোকটা বিরক্ত হয়ে বলাই-এর দিকে বিষদৃষ্টি হেসে চলে গেল—একটু খুঁড়িয়ে যেন!
'খোঁড়া-বাবুর চোখ টাটাচ্ছে।' ওসমান হাসতে লাগল।
খোঁড়া-বাবুর সঙ্গে হালদার-কোম্পানীর সতা-সতীন সম্পর্ক। কার সঙ্গেই বা নয়?
সুরকি-পটিতে সাড়া পড়ে গেছে।
গরুর গাড়িটার উপর বলাই চিৎ হয়ে শুয়ে ছিল। একে একে দুজন সরে পড়েছে। প্রথমে গেল জীয়ুৎ—তার দামাদ আসবে, তাকে সওদা করতে যেতে হবে।
জীয়ুৎ যেতে না যেতে মুখ বেঁকিয়ে মেহরারু জানালে, 'জামাই এসেছে না আরো কিছু—ও শুধু খেপ মাঙতে যাওয়া তা আর কে না বুঝতে পারে : অত ছোট মেহরারু হতে পারে না। আপন খুশিতে খেপ কেউ দেয়, বহুৎ আচ্ছা। নইলে খেপ পাবার জন্যে উমেদারী করতে হবে? আবার ভরা ঘাটে না লাগতে লাগতে,—ছোঃ—!'
মেহরারুকেও কিন্তু তাড়াতাড়ি উঠতে হয়। নড়ালের পোল পেরিয়ে একবার নতুন চাক্কাটার কি হ'ল খোঁজ করতে যেতে হবে।
আজ সবারই দরকার নড়ালের পোলের দিকে!
খানিক চুপ করে থেকে চোখ বুজেই বলাই বললে, 'ওসমান আছিস?'
'হাঁ বাবু।'
'চুপি চুপি দু'পুঁটলি নিয়ে আয় দেখি।'
ওসমান আপত্তি করে বললে, 'না না বাবু, আজ বড় বেলা হয়ে গেছে, ঘরে যান, সরকার-মশাই আবার রাগ করবেন।'
মুদিত চোখেই হাত নেড়ে বলাই বললে, 'বাজে কথা ফেলে তুই যা দেখি, দুটি পুঁটলি আর আধ সের রাবড়ি, বুঝেছিস? আমি ওই গুলিখোরের ঘাটে আছি।'
খানিক ওসমানকে নীরব দেখে বলাই বললে, 'ঘাটে পাঁচ-পাঁচটা ভরা লেগেছে, আবার ভাবনা? যা যা খপ করে আয়।'
'আজ্ঞে না বাবু, ভৌজি আপনার জন্যে বসে থাকবে—।'
বলাই একটু হেসে বললে, 'রাবড়িটা একটু লুকিয়ে আনিস।'
অগত্যা ওসমান গেল।
বেলা বেশ বেড়ে গেছে। জীয়ুতের মোষটা নিজে নিজেই গিয়ে নদীতে নামল। কিন্তু বলাই-এর ভ্রূক্ষেপ নেই। গরুর গাড়িটার ওপর তেমনি ভাবেই এই প্রচণ্ড রোদে এলো গায়ে সে পড়ে রইল।
কিন্তু বেশীক্ষণ পড়ে থাকা গেল না।

পায়ে সুড়সুড়ি লাগতেই চমকে ঘুম ভেঙে গেল।—'ফের এসেছিস ছুটকি! আজ তোর বাবাকে বলে দেবই। দেখ্ তাহ'লে!'

কিন্তু ছুটকি সে কথা শুনতে পায় কেমন করে। সে ত তখন তার নতুন রঙীন ডোরদার শাড়ী বাঁচিয়ে গোবর কুড়োতে অত্যন্ত ব্যস্ত।

খোঁড়া-বাবু আবার ফিরছিল। দাঁড়িয়ে পড়ল। দাঁতে দাঁত চেপে কি একটা উদ্যত কথাকে সে দমন করলে তাও বোঝা গেল। বলাই কিন্তু তার ভ্রূকুটি-কুটিল অগ্নিদৃষ্টির প্রত্যুত্তরে হেসে বললে, 'বড়ি পিয়াস লাগল এ ছুটকি, তনি মেহেরবানি করি কি ন।'

খোঁড়া-বাবু এতখানিই বা সহ্য কেমন ক'রে করে।

ছুটকি আবার ঘাড় বেঁকিয়ে মুখ ফিরিয়ে মুখে কাপড় দিয়ে দুষ্টু হাসিটুকু লুকোবার ভান করে।

রাত অনেক হয়ে গেছে।

বলাই পা টিপে-টিপে ঘরে গিয়ে ঢোকে। চপলা বই পড়ায় ব্যস্ত, ফিরেও তাকায় না। বলাই চুপ করে দাঁড়িয়ে খানিক আড়চোখে দেখে, তারপর খপ করে পাশে বসে পড়ে, বইটা হাত থেকে কেড়ে নেয়। ঝটকা দিয়ে বইটা আবার ছিনিয়ে নিয়ে চপলা রুক্ষস্বরে বলে, 'ও আবার কি ন্যাকাপনা! সরে বোসো। ওসব গাঁজা-গুলির গন্ধ আমার সয় না!'

বলাই ভুরু দুটো তুলে একটু মুচকে হাসে। বলে, 'মাইরি আজ মুখ শুঁকে দেখো, খাসা কচি আমের গন্ধ না পাও ত আমায় দূর করে দিও। তোমার জন্যেই শেষটা গাঁজা ছেড়ে চরস ধরতে হ'ল।'

চপলা উত্তর দেয় না। বাতিটা নিবিয়ে দিয়ে বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়ে। তারপর আপন মনেই বলে, 'মুখ নাড়তে লজ্জা করে না? মানের ত একে সীমে নেই—গাড়োয়ান ইয়ার, ঠিকাদার ইয়ার, গরুর নাল বাঁধে যে মোছলমান সেও ইয়ার। তাও না হয় হ'ল। শেষটা বামুনের ছেলে হয়ে কৈবর্তের ঘাড়-ধাক্কা খাওয়া! কোন মুখে সে আবার লোকসমাজে বেরোয়—দাঁত বের করে কথা কয়! দু'কান কাটা বেহায়া! দড়ি কলসী জোটে না!'

কথাটা মিথ্যে নয়।

ক'দিন ধরেই খোঁড়া-বাবু প্রতিশোধ নেবার তক্কে ছিল। সুযোগও মিলতে দেরি হ'ল না। কবে থেকে খোঁড়া-বাবু গুলিখোরের ঘাট আবার জমা নিয়েছে তা কে জানে। দুপুরে বলাই রোজকার মতোই শিষ্য-সাকরেদসমেত মৌতাতের আড্ডাটি জমিয়েছে, এমন সময় দরওয়ান সমেত খোঁড়া-বাবু এসে হাজির। তারপর বেপরোয়া ঘাড়ধাক্কা। মৌতাত তখন বেশ জমে উঠেছে। শান্ত সুবোধ ছেলের মতো সবাই বেরিয়ে এল।

ওসমান ছিল না। এসে শুনে বললে, 'এইবার হাতে হাঁটতে হবে, ঠেঙের বায়না দিতে বলে আসি খোঁড়া-বাবুকে।'

বলাই হেসে বললে, 'তা' হলে এতদিন ধরে ছাই নেশা করেছিস। রক্ত যদি গরমই হ'ল তবে আর মানুষের বার হলি কোথায়?'

ব্যাপার ওইখানেই থেমে আছে।

চপলা কথাগুলো বলে পাশ ফিরে শোয়। তারপর খানিক সব চুপচাপ। পুবের জানলা দিয়ে যে সামান্য গ্যাসের আলোটুকু আসে তাতে কেউ কাউকে

দেখতে পায় না।

পেলে বোধহয় ভালো হ'ত।

বলাই বিছানার ধারে এসে বলে, 'মাইরি, রাত্রে সব দোকান বন্ধ হয়ে গেছে, এখন দড়িও পাব না কলশীও না। রাতটুকুর মত একটু সরে শুতে দাও।'

চপলা বিছান থেকে নেমে মেজেতে আঁচল পেতে শোয়। বলাই বিনা বাক্যব্যয়ে বিছানায় উঠে শোয়, খানিক এপাশ-ওপাশ করে, তারপর বলে, 'উঃ বেজায় গরম, ঘাটে যেতে হ'ল।'

বলাই বেরিয়ে যায়। চপলা বোধহয় ঘুমিয়ে পড়েছে। তার কাছ থেকে কোনো সাড়াশব্দ পাওয়া যায় না।

ক'দিন ধরে খোঁড়া-বাবুর খিলে-ডিঙিটা পাওয়া যাচ্ছে না। তাজ্জব ব্যাপার!

কেউ বলে, 'কুদ্‌ঘাটার গজের মধ্যে আট্‌কে আছে দেখে এলাম।'

কেউ বলে, 'উঁহু, সে ত দেখলাম—'

সরকার-মশাই-এর জামাইএর ন্যাকি ক'দিন ধরে পাত্তা নেই।

ঘটির কানায় লেগে শাঁখা গাছাটা গেল ভেঙে।

মা বললে, 'যাবে না? অত খর-খর হ'লে যাবে না! ভাঙল ত এই বেস্পতিবারটায়?'

চপলা আর একটা শাঁখা সজোরে আছড়ে ভেঙে বললে, 'ভাঙুক্‌,— ভাঙুক সব ভাঙুক! সব যাক।'

মা গালে হাত দিয়ে চোখ কপালে তুলে বললে, 'ও মা, কি হবে গো! কি অলুক্ষনে পোড়াকপালী মেয়ে গো! এইস্ত্রী মানুষ শাঁখা দু'টো ঠুকে ঠুকে ভাঙলে গা এই বেস্পতিবারে!'

চপলা দুমদুম করে ঘরে গিয়ে ঢুকে খিল দিয়ে বললে, 'ভেঙেছিই ত, কপাল ত পুড়েইছে! আমার হাড়ও জুড়িয়েছে, তোমরাও নিশ্চিন্ত হয়েছ। এক মাস ধরে একটা মানুষের কি আর অমনি খবর মেলে না। আছে কোন আঘাটায় আট্‌কে এতক্ষণ দেখগে যাও। আর দেখবারই বা কার দায় পড়েছে! তোমাদের কাছে শ্যাল কুকুর বইত নয়!'

খবর মিলল।

কোমরে দড়ি দিয়ে পাহারাওয়ালা ধরে নিয়ে এল। খিলে-ডিঙি সমেত বলাই নড়ালের পোলের তলাতেই এসে হাজির! বলিহারি সাহস!—

বুড়ো সরকার-মশাই গিয়ে বললেন, 'আমি বামুন হয়ে তোমার হাতে পৈতে জড়িয়ে মিনতি করছি বাবা, এবারটা মাপ করো।'

খোঁড়া-বাবু অত নরম মাটি নয়। অত সহজে সেখানে দাগ বসে না। বললে, 'বিস্তর সয়েছি মশাই! আপনার জামাই, আর ভদ্রলোকের ছেলে বলে বিস্তর সয়েছি। এ সুরকি-পটির কলঙ্ক!'

'তা ত স্বীকার যাচ্ছি বাবা, তবে তোমরা যদি মাপ না করো তাহ'লে করবে কে? তোমরা হ'লে এ পটির মাথা।'

খোঁড়া-বাবু বলাইএর দিকে ভ্রূকুটি করে চেয়ে বললে, 'কিন্তু মাথাও মাঝে মাঝে গরম হয়। বাছাধন পীরের সঙ্গে মামদোবাজি করতে গেছলেন যে!'

বলাই তখন পাহারাওয়ালাকে জিজ্ঞাসা করছে, 'সাহেব, তোমাদের মুলুকে লুকিয়ে-চুরিয়ে নেশাটা আশটা চলবে ত? নইলে বাবা, বেহ্মহত্যার পাতক হবে!'

কথাটা জোরেই বলা হয়েছিল। সবাই শুনতে পেল।

খোঁড়া-বাবু সরকার-মশাইএর হাতটায় একটা টান দিয়ে বললে, 'শুনলেন ত—গাঁজলা এখনও মরেনি। না মশাই, আমি কিছু পারব না।'

কিন্তু শেষ পর্যন্ত দেখা গেল যে খোঁড়া-বাবু পারল। খোঁড়া-বাবুর দয়ালু বলে দুর্নাম পটিতে নেই। কিছু বোঝা গেল না।

বলাই বলে, 'তোমার বাবাই ত সব মাটি করলে, ছেলেবেলায় পড়াশুনোয় ভালো ছিলাম। সবাই বলত জলপানি পাব, তা অতদূর আর দেখবার ফুরসুৎ হয়নি ; এবার ভাবলাম এতদিনে বুঝি ভবিষ্যদ্‌বাণীটা ফলে গেল, সরকারের টাকাটা সৎপাত্রে পড়ল, তা তোমার বাবা হতে দিলে কি?'—রসিকতাটা ভালো জমে না। বলাই নিজেই হো হো করে হাসে। হাসিটাও যেন কেমন মনমরা। বলাইএর হ'ল কি?

চপলা কথা কয় না। বলাই আবার বলে, 'বিদেশে একটা চাকরি পাচ্ছি, যেতে বলো ত যাই—।'

'যমের বাড়ি একটা চাকরি মেলে না?'—চপলা তেমনি মুখ ঘুরিয়ে চলে যায়।

'মিলতে পারে, দরখাস্ত করে দেখিনি।'

বলাই বেরিয়ে যায়।

* * *

ওসমান বলে, 'সে কি আর এখানে আছে বাবু, যে তাকে দেখতে পাবেন? ছুট্‌কিকে এখন পায় কে?'

বলাই জিজ্ঞাসা করে, 'তার মানে?'

'খোঁড়া-বাবু তাকে মাসোহারা দেয় ত্রিশ টাকা—তার বাপকে দেয় দশ। তাছাড়া নগদ কত দিয়েছে কে জানে!'

আক্‌লু রাজী হ'ল?'

ওসমান হাতের টাকাটা দু'বার বাজিয়ে বলে, 'দুনিয়া গোলাম—'

বলাই খানিকক্ষণ কি ভাবে, তারপর বলে, 'হাঁ, খোঁড়া-বাবু নতুন খড়ের গোলা খুল্‌ল?'

'খুলবে না? পটির সবাইকে কানা করে দিলে রাবিশে আর ঘুষে। মুখার্জী-কোম্পানীর মাল এখন কোথা থেকে যাচ্ছে? চারটে লরীর ঠেলায় রাস্তা থরথর করছে রাতদিন!

বলাই বলে, 'বহুৎ আচ্ছা চল।'

চোখের চেহারা দেখে ভয় পেয়ে ওসমান বলে, 'কোথায় বাবু?'

'খোঁড়া-বাবুকে সেলাম দিতে।'

ওসমান ধরে রাখতে পারছিল না, কাতর হয়ে বললে, 'বাবু, বড্ড বেসামাল হয়ে পড়েছেন, রাতও অনেক হ'ল, ইদিকে নয়—বাড়ি চলুন।'

বলাই তার হাতটা ধরে টানতে টানতে, বলে, 'চুপ, নড়ালের পোল আর কতদূর বল্ না—'

'ওই ত দেখা যাচ্ছে বাবু।' ঘরে চলুন বাবু, রাত দুটো হ'ল।'

'তবে তুই যা' —বলাই তার হাতটা ছেড়ে দিলে, কিন্তু নিজে টাল সামলাতে না পেরে হোঁচট খেয়ে পড়ল। ওসমান নিজেও বেশ টলছিল, তবু কোনরকমে ধরে তুলে আবার মিনতি করে বললে, 'কোথায় চলেছেন বাবু?

'এইটে খোঁড়া-বাবুর নতুন গোলা, না?' বলাই থম্‌কে দাঁড়াল।

সমস্ত পটি নিস্তব্ধ। নড়ালের পোলের আলোগুলো নদীর স্থির জলে পড়ে ঝিক্‌ঝিক্ করছিল।

'ফটকের তালা ভাঙতে পারবি?'

ওসমান বলাইএর চোখের দিকে চাইল ; অন্ধকারে কিছু দেখা যায় না। বললে 'বাবু বাড়ি চলুন।'

'পারবি কি না বল্?'

অনেকক্ষণ পরে উত্তর এল, 'পারব।'

তালা ভাঙা হ'ল। পকেটের বোতলটা বার করে নিঃশেষ করে তেলটা ঢেলে বলাই বললে, 'দে, দেশলাইটা—'

* * *

লোকে লোকারণ্য! তিনটে দমকলে আগুন সামলাতে পারছিল না। আকাশ যেন তেতে রাঙা হয়ে উঠছে। পোনাঘাট ছাড়িয়ে কেঠোপটি পর্যন্ত বাতাসে পোড়া খড়ের গন্ধ আর উড়ো ছাই।

ওসমানের কাঁধে ভর দিয়ে যেতে যেতে বলাই বললে, 'দেখলি সেলাম? নেশাখোর মানুষ—আমাদের রাগ করতে নেই, তবে আমাদের সেলাম এমনি!'

কারা বলতে বলতে যাচ্ছিল, 'আহা, গরীব বেচারা গো, সর্বস্ব দিয়ে গোলাটি করেছিল।'

'গরিব বললে হবে কি বাপু! বেম্মশাপ। মহাপাতক না হলে অগ্নিদেব দেখা দেন না।'

'তোমার মাথা। পাশেই খোঁড়ার গোলাটা তাহ'লে রয়েছে কি করতে! যত মহাপাতক করেছিল ঐ নিরীহ গরীব বেচারী!'

বলাইএর কানে কোনো কথাই যায় না।

ঘাটের সঙ্গে গঙ্গাযাত্রীদের আশ্রয় নির্মাণ করা বোধহয় তখনকার প্রথা ছিল। তাই তখনকার কোন ধার্মিক জমিদার এই বাঁধান ঘাটটি ও তার সঙ্গে গঙ্গা-যাত্রীদের সুবিধার জন্য দুটি গৃহ নির্মাণ করে পুণ্যসঞ্চয় করেছিলেন।

তখন সে জমিদার বংশের অবনতি ঘটেছে। সেই জমিদারের এক অভাব-গ্রস্ত প্রপৌত্র সেই ঘর দুটিই ভাড়া দিয়ে পুণ্যের চেয়ে প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহ করেন। ভাড়া অবশ্য সামান্যই। কারণ সংস্কার অভাবে দুটি ঘরেরই জীর্ণদশা, গা-ময় ঘুঁটের প্রলেপ। একটিতে এক পক্ষীরাজের বংশাবতংস একাকী সগৌরবে বাস করেন, অপরটিতে থাকে তাঁর যান, আর তিনটি ছাগল, চারটি ছোট বড় ও মাঝারী কুকুর, একটি পুরুষ ও একটি নারী।

পুরুষটি একাধারে পক্ষীরাজের বংশধরের সেবক রক্ষক ও চালক—এক-দিন আধদিনের নয় গত পোনেরো বছরের। মালিক বদল হয়েছে বটে ঘোড়ার, কিন্তু সেবকের পদে এ পর্যন্ত আর কেউ প্রতিষ্ঠিত হয় নি। ঘোড়া ও মানুষ পাশাপাশি জীবনের পথে বার্দ্ধক্যে এসে পৌঁছেছে।

ঘোড়ার নাম কেউ কখনও বোধহয় রাখে নি—সহিসের নাম ঘমণ্ডি। সে নামকরণ সে বোধহয় নিজেই করেছিল। আরা জেলার অখ্যাত কোন গাঁ থেকে একদিন শৈশবে বর্ষার বাঁধ ভাঙ্গা সোন নদীর বন্যায় তাকে বাপ-মা, আত্মীয়-স্বজন আশ্রয় সমস্ত আপদ বালাই থেকে একেবারে মুক্ত করে কৌতূহলহীন সংসারের মাঝে ভাসিয়ে এনে ফেলেছিল। তারপর বিশ বৎসর সেই বন্যার নেশা তার কাটে নি? সংসারের আনাচে কানাচে গলিতে ঘুঁজিতে সে কোন লক্ষ্যহীন স্রোতের খামখেয়ালিতে অসহায় ভাবে ভেসে ফিরেছে; অপ্রত্যাশিত ভাবে আছাড় খেয়েছে, অযাচিত ভাবে আশ্রয় পেয়েছে, আবার অকারণে বিতাড়িত হয়েছে।

ত্রিশ বছর বয়সে স্থায়ী আশ্রয় সে পেল, পেল ওই ঘোড়াটির অনুগ্রহে, ওই গঙ্গাযাত্রীদের সাবেক চটিতে।

ঘোড়াটির তখন প্রথম যৌবন। মাথা সহজেই একটু গরম হয়ে ওঠে। একদিন হঠাৎ কি খেয়ালে চাট্ ছুড়ে সহিস বেচারীকে ঘায়েল করে গাড়ী উল্টে, ক্ষেপে দৌড় দিলে। জনাকীর্ণ রাস্তায় এক তুমুল কাণ্ড বাধ্‌ল। ক্ষেপা ঘোড়াকে থামান যায় না; সোজা রাস্তায় বহুদূর দৌড়ে বাধা পেয়ে একটু থামে, আবার ফিরে বিপরীত দিকে দৌড় দেয়। রাস্তার লোক চলাচল এক-রকম বন্ধ হয়ে গেল। একটি বৃদ্ধার ঘোড়ার ধাক্কায় খোয়ার ওপর পড়ে গিয়ে মাথা ফাটল। দু-চারজন অল্প সল্প আহত হ'ল। এই রকম দৌড়ের মাঝে হঠাৎ এক মোড়ের মাথায় গরুর গাড়ীতে বাধা পেয়ে ঘোড়াটি ক্ষণেকের জন্যে থামল।

ঘমণ্ডিব কিছুদিন থেকে কাজকর্ম ছিল না। সারাদিন চার পয়সার চানা চিবিয়ে, খইনি টিপে ঘুরে বেড়াত। সে কাছেই কোথায় ছিল। দিনকতক এর পূর্বে কোথায় কোচোয়ানী করায় এই জাতীয় অভিজ্ঞতাও তার ছিল। সে

হঠাৎ সাহস করে সামনে এসে লাগামটা ধরে ফেললে।

সে লাগাম সে এ পর্যন্ত আর কাউকে ধরতে দেয়নি।

খোঁজ করে যখন মালিকের ঘোড়া ফিরিয়ে দিতে এলো মালিক তাকেই অস্থায়ীভাবে সহিসের পদে বহাল করতে চাইলেন। সে রাজী হ'ল। সাবেক সহিসের পাঁজরায় দুটো হাড় ভেঙে গেছল—সে তখন হাসপাতালে।

হাসপাতাল থেকে ফিরে এসেও সে সহিসত্বের দাবি নিয়ে কোনদিন গোল করেনি, তবে ঘর্মাণ্ডকে এই দুঃসাহসের নোক্‌রী ছেড়ে দেবার জন্য সদুপদেশ দিয়েছিল। ঘর্মাণ্ড তা খেয়াল না করায় যাবার সময় চুপি চুপি ঘর্মাণ্ডর কানে অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে ছাড়তে পেড়াপিড়ি করার আসল কারণটি সে বললে, তারপর চোখ দুটো পাকিয়ে ঘাড় বাঁকিয়ে ঘর্মাণ্ড এই মোক্ষম সংবাদটির ওপর কি বলে শোনবার জন্যে অপেক্ষা করতে লাগল।

ঘর্মাণ্ড তাচ্ছিল্য ভরে মুখ বেঁকিয়ে বললে, 'ঝুটবাত্‌!'

ঝুটবাত্‌! সে নিজের চক্ষে দেখেছে—ঝুটবাত্‌। ভূতপূর্ব সহিস আরো বোঝাতে চেষ্টা করে—এ ঘরে কত লোক মরে গেছে তাদের ভূতগুলো যাবে কোথায়!

আর সে যে স্বচক্ষে রাত্তির বেলায় দেখেছে এই ঘোড়া প্রকাণ্ড একটা জীন্‌ হয়ে ছাদ ফুঁড়ে বেরিয়ে গেল। আর তার পাঁজরাই বা ভাঙল কেন! ঘোড়া ভূত তার লুকিয়ে দেখা টের পেয়েছিল বলেই না!

ঘর্মাণ্ড জানালে সে তাহলে ঘোড়া ভূত না দেখে এখান থেকে নড়বে না! তার ভূত দেখবার ভারি ইচ্ছে!

এই অন্যায় আবদারে আগেকার সহিস অত্যন্ত চটে গিয়ে পোঁটলা-পুঁটলি তুলে নিয়ে চলে যেতে যেতে জানিয়ে গেল—এই বেয়াড়াপণার জন্য ঘর্মাণ্ডকে পস্তাতে হবে। ভূতের সাথে ছেলেখেলা!

ঘর্মাণ্ডকে পস্তাতে হয় নি বোধহয়। তারপর পোনেরো বছর কেটেছে। ...ঘোড়াটি সামনের বাঁ পা তুলে বাতাস আঁচড়াবার ভঙ্গি করে। ঘর্মাণ্ড বলে 'এ বুঢ়ুয়া! তোহার ভুখ লাগল্‌ হো।'

বুঢ়ুয়া কান দুটি নেড়ে গলাটি বাড়িয়ে দেয়। তারা পরস্পরের নাড়ী নক্ষত্র জানে।

ঘোড়া ও মানুষ একত্র হল : এবার এল কুকুর! পোনেরো বছর আগে একদিন শীতের সমস্ত দীর্ঘ রাত ঘর্মাণ্ড জেগে কাটালে। সমস্ত রাত ধরে নিকটে কোথায় কটা সদ্যোজাত কুকুর ছানা এমন বিকট কান্না কেঁদেছে যে ঘুমোয় কার সাধ্য। সকালবেলা খোঁজ করতে দেখা গেল পথের একটা বেওয়ারিশ 'লেড়ি কুত্তা' স্থানাভাবে এই দারুণ শীতে ঘাটের সিঁড়ির ওপরই প্রসব করে মারা পড়েছে। দুটো তুলোর পুঁটলির মত নরম আকারহীন মাংসের ঢেলা, তখনও সেই শীর্ণ রোঁ-ওঠা কঙ্কালসার কুক্কুরীটির মৃতদেহের ওপর পড়ে মাইগুলো নিয়ে টানাটানি করছিল ও মাঝে মাঝে অসহায়ভাবে ক্ষীণ শব্দে কি প্রকাশ করছিল কে জানে! আর দুটি মাংসের ডেলা সমস্ত রাত উত্তাপের জন্যে কাৎরে তখন ঠাণ্ডা হয়ে গেছে একেবারে।

ঘর্মাণ্ড জীবিত বাচ্চা দুটোকে ঘরে এনে আশ্রয় দিলে। অনেক আদর যত্ন সত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত একটিই বাঁচল, অপরটিকে কোন রকমে রাখা গেল

না। ঘর্মণ্ডির সংসারে একটি প্রাণী বাড়ল।

...কুকুর বাচ্চাটি নড়বড়ে পায়ে ভর করে টল্‌তে টল্‌তে সমস্ত ঘর দোর তদারক করে বেড়ায়, থালাটাকে একবার শোঁকে, ঘোড়ার সাজগুলো একটু চেটে দেখে, দুটি ঘরের মাঝখানের দরজায় দাঁড়িয়ে—তীক্ষ্ন দৃষ্টিতে ঘোড়াটিকে পর্যবেক্ষণ করে সংক্ষিপ্ত ভাষায় নিজের বিরূপ মন্তব্য করে।

ঘোড়াটি একবার ঘাড় বাঁকিয়ে সন্দিগ্ধ ভাবে তার ওপর চোখ বুলিয়ে নেয়, তারপর এই নগণ্য সমালোচনা উপেক্ষা করে প্রশান্ত মনে পা ঠোকে, লেজ দুলিয়ে মাছি তাড়ায় ও নাসিকাধ্বনি করে।

এই নাকের শব্দে আপনাকে অত্যন্ত অপমানিত বোধ করে, কুকুর বাচ্চা কটুতর ভাষা প্রয়োগ করে।

একদিন এই থেকে একটু বিপদ ঘটল। নিছক গালাগালিতে কোন ফল না পেয়ে কুকুর বাচ্চা একটু মাত্রাতিরিক্ত ভাবে অগ্রসর হয়ে সেদিন ঘোড়ার ডান পায়ের ওপর আপনার দাঁতের শক্তি পরীক্ষা করে বসল।

ঘর্মণ্ডি উনুন ধরাচ্ছিল, হঠাৎ আকাশ-ফাটা আর্ত্তনাদে চমকে উঠে ছুটে গিয়ে দেখে বীর কুকুর-শাবক চিৎ হয়ে পড়ে প্রাণপণে চীৎকার করছে এবং ঘোড়াটি বিস্মিত হয়ে ঘাড় নামিয়ে এই ক্ষুদ্র বেয়াদবটির সর্বাঙ্গ শুঁকে দেখছে। নিরাপদ জায়গায় সরিয়ে আনা সত্ত্বেও কিছুক্ষণ কুকুর বাচ্চার ভয়ার্ত্ত চীৎকার থাম্‌ল না এবং কয়েক দিন সে দরজার চৌকাট পর্যন্ত মাড়াল না।

তারপর বোঝাপড়া অবশ্য হয়েছিল। একদিন দেখা গেল সে বেশ নির্ভয়ে ঘোড়ার পায়ের ফাঁকে খেলে বেড়াচ্ছে!

বয়সের সঙ্গে সাহস বাড়ল। রাস্তায় অপরূপ বেশে কাবলিওয়ালাকে যেতে দেখে একদিন সাজ পোশাকের অশোভনতা সম্বন্ধে সে তীব্র প্রতিবাদ করলে। ফিরে ল্যাজ নেড়ে নেড়ে ঘর্মণ্ডি অনুমোদন করল কিনা তাও একবার দেখে নিলে। একদিন ভল্লুক সমেত এক বাজিকরকে অন্যান্য সহযোগীর সঙ্গে বহুদূর পর্যন্ত ধাওয়াও সে করে এল।

সে এক স্মরণীয় দিন। কাপুরুষ ভল্লুক পালিয়ে ত গেলই. একবার ফিরে তাকাতেও সাহস করলে না। ঘর্মণ্ডিকে সেই বীরত্ব কাহিনী কণ্ঠ ও ল্যাজের সাহায্যে সে অনেক করে বুঝিয়ে দিলে। ঘর্মণ্ডি বুঝলে কিনা বলা যায় না। কিন্তু বুঝলেও এ বীরত্বের যথোচিত মর্যাদা সে যে দেয়নি এটা ঠিক—প্রতিদিনের মতই সে উচ্ছিষ্ট ভাত কটা থালায় রেখে ডাকলে—'লে দুখিয়া।'

দুখিয়া প্রতিদিনের মত ব্যস্ত হয়ে ছুটে গেল না। গোটা কতক ইঁদুর ঘরে উপদ্রব করত। এ পর্যন্ত বহুবার তাদের সম্মুখসমরে আহ্বান করেও দুখিয়া কিছু করে উঠতে পারে নি। অসভ্য ইঁদুরগুলো দেখা দিয়েই ঘরের কোণের গর্তে গিয়ে ভীরুর মত আশ্রয় নেয়। আজ ঘর্মণ্ডির এই আবেগহীন অভ্যর্থনায় অত্যন্ত ক্ষুণ্ণ হয়ে সেই মূষিকদের সদর দ্বারে দাঁড়িয়ে তাদের গর্ত আঁচড়ে সে হঠাৎ ভয়ানক হাঁকাহাঁকি ডাকাডাকি আস্ফালন সুরু করে দিলে। আজ সে একটা রক্তারক্তি করবেই।

অন্ধ ঘর্মণ্ডি! সে ভ্রূক্ষেপ না করে ঘোড়ার গা ডল্‌তে গেল। অগত্যা

আস্ফালন ত্যাগ করে দুখিয়াকে খেতেই আসতে হয়।

তারপর কিছুদিন বাদে ঘমণ্ডির ঘরের সামনের রাস্তায় দুখিয়ার পাণিপ্রার্থীদের সমাগম হতে সুরু হল। এবং সেই প্রণয়ীদের দ্বন্দ্ব কলহে আস্ফালনে রাস্তা সরগরম হয়ে উঠল। দুখিয়ার নাগাল পাওয়া এখন ভার! নারীর ছলা কলা কৌশল তার পুরোদস্তুর আয়ত্ত।

কয়েকমাস পরে ঘোড়ার ঘরের একটি নিরাপদ কোণে ঘাসের বস্তার ওপর আবার কটি তুলোর পুঁটলির মত বাচ্চা দেখা গেল।

ঘর্মাণ্ডর ঘরে এখন সেই দুখিয়ারই পুত্র-কন্যারা ঘুরে বেড়ায়।

সকালবেলা রাস্তার ধারের দরজায় একটা মোটা লোমের কম্বল মুড়ি দিয়ে বসে ঘমণ্ডি অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে দাঁতন করছিল। দুটো চট গায়ে বেশ করে জড়িয়ে অনিচ্ছুক ছাগলীটাকে হেঁচড়াতে হেঁচড়াতে দুলারী এসে দাঁড়াল।

"দুখিয়াকে ত দুরোজ ন দেখলু হম, কাঁহা গইল্ বা?"

রোজ রোজ এই গায়ে পড়ে আলাপ করা ঘমণ্ডির পছন্দ হয় না। আজ সে দাঁতন করবার ছুতোয় মুখ বুঁজে রইল। দুলারী অনিমন্ত্রিত হয়েই ধুপ করে মাটিতে বসে পড়ল, তারপর ছাগলের দড়িটা পায়ের সংগে বেঁধে জানালে,—এমন শীত সে কখনও দেখেনি। বাবুদের রকে শুয়ে মাঝ রাতে মনে হয় হাড়ের ভেতর পর্যন্ত হিম হয়ে গেছে।

দাঁতন আর কতক্ষণ ধরে করা যায়! ঘমণ্ডি দাঁতনের ছিবড়েগুলো থুতুর সংগে ফেলে বল্লে,—বুড়ো হলে অমন শীত একটু বেশী লাগে।

—বুড়ো, আমি বুড়ো? ঘরের ভেতর গরমে শুয়ে অমন সবাই বলতে পারে; হুঁ ওখানে শুক ত দেখি কে কত বড় জোয়ান।

ঘমণ্ডি সকৌতুকে এই আধাবয়সী স্থূলকায় মেয়েমানুষটির যুবতী থাকবার ইচ্ছা লক্ষ্য করে বল্লে,—আমি ত বুড়োই হয়েছি তুইও তাহলে বুড়ী।

এবার যে কারণেই হোক্ কথাটা দুলারীর অপ্রিয় হ'ল না। হাস্যের বেগে স্থূল শিথিল উদরের ভাঁজগুলি পর্যন্ত কাঁপিয়ে প্রায় লুটোপুটি খেয়ে দু-তিনবার আবৃত্তি করলে,—"বুঢ্ঢা আউর বুঢ্ঢি।" তারপর আবার হাসি।

এই অহেতুক উচ্ছ্বাসে হঠাৎ অত্যন্ত গম্ভীর হয়ে উঠে পড়ে ঘমণ্ডি কঠিন স্বরে বল্লে, 'রুপেয়াটো মিলি কি ন।'

হাসি থামিয়ে উঠে গুনচট্গুলো ভাল করে গায়ে জড়িয়ে নিয়ে অনিচ্ছুক ছাগলীটাকে একটা হেঁচকা দিয়ে দুলারী মুখ ভার করে বল্লে,—টাকা! টাকা! রোজ রোজ তাগাদা! টাকা যেন আমি দেব না! বলছি এই ছাগলের দুধের টাকা, বাবুদের বাড়ির মাইনের টাকা সব এক সংগে পেলে দেব। এ মাস কাবার হোক্ আগে! তারপর ছাগলীটাকে আর একটা হেঁচকা দিয়ে বল্লে, "উঠ্ বেটী!"

ঘমণ্ডি লোটা থেকে জল নিয়ে একটা কুলকুচো করে বল্লে, ও ওজর এই দু-মাস ধরে শুনছি; এবার যেন টাকা না নিয়ে এখানে আসা না হয়।

কিন্তু দুলারী তবু আসে, এবং টাকার কথাটা অবশ্য তার স্মরণ থাকে না। এসে দুখিয়ার বাচ্চাগুলোকে কোলে করে নাচিয়ে আদর করে। কোন-

দিন বা ঘমণ্ডির খাওয়া দাওয়া শেষ হলে যেচে বলে, "তু রখ্ দে। বর্তন হম্ মাল।" ঘমাণ্ড বেশী কথা কয় না—সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে তার দিকে একবার চায় তারপর বাসন কোষণগুলো ফেলেই রাখে। সন্ধ্যার সময় এসে ঘমাণ্ডর হাত থেকে হুঁকোটা নিয়ে টান্ দিতে দিতে দুলারী বলে,—বকরীটার আবার শীগ্গির ছানা হবে, বাবুদের বাড়ির চাক্রীও বেশ সুখের, তার অভাব কিসের? আণ্ডা বাচ্চা নেই যে খাওয়াতে হবে। গতর আছে, রোজগার করে খাসা সুখে সে আছে।

ঘমণ্ডিকে সম্প্রতি তার এক দোস্ত দেশে ফিরে যাবার সময় একটি তিতির পাখী বেচে গেছে। ঘমণ্ডি খাঁচাটা নামিয়ে অন্য মনে শিষ্ দেয়। এ সব কথা যেন তাকে বলা হচ্ছে না। আর এসব অর্থহীন কথার জবাব বা কি হতে পারে!

দুলারী হুঁকোটা ফিরিয়ে দিয়ে আপন মনেই বকে যায়—ঠাট্টা বট্কেরা তার ভাল লাগে না—হরদুঙ্গি সে দিনের ছোঁড়া, দারু পিয়ে মাতাল হয়ে সেদিন বলে কি না—দুলারী আমার পিয়ারী হবি? তার থোঁতা মুখ থেঁতা করে দিয়েছে সেদিন। হরদুঙ্গি একটা চেংড়া গোলদার! ঘর করতে গেলে কি আর লোক নেই!

ঘমণ্ডি নীরবে তামাক খেতে খেতে ডিবিয়ার আলোয় দুলারীর অত্যধিক পুষ্ট হাতের কব্জি থেকে কনুই পর্যন্ত আঁকা উল্কিগুলো কিছুক্ষণ পর্যবেক্ষণ করে, তারপর নেহাৎ তাচ্ছিল্যভরে জিজ্ঞাসা করে,—ছাগলের দুধের 'ভাও' কত আজকাল?

ছাগলের দুধের দাম! —দুলারীর চোখ একটু উজ্জ্বল হয়ে ওঠে!—ছাগলের দুধ টাকা টাকা সের! ছাগলের দুধ অমন সস্তা জিনিষ নয়! আর তার ছাগলী এই বাচ্চা হলেই ত রোজ দুসের দুধ দেবে!

ঘমণ্ডি হুঁকোটা দেয়ালে ঠেসান দিয়ে রেখে বলে,—তাই নাকি? বেশ মুনাফা আছে ত!

দুলারী অত্যন্ত গম্ভীর হয়ে আমিরী চালে বলে,—তব্ কা!

ঘমণ্ডি খানিকক্ষণ মাথা নীচু করে বসে থেকে শেষে কানা উঁচু একটা কাঁসি বার করে ঠোঙা থেকে আটা ঢালতে আরম্ভ করে।

দুলারী বলে—থাক্ থাক্ আজ না হয় 'রোটিটা' আমিই 'পাকিয়ে' দিয়ে যাচ্ছি।

দুলারী উঠে গিয়ে আটা মাখতে বসে। ঘমণ্ডি বলে—"তব্ তোহার ভি রোটি হিঁয়ে বনা লে।"

দুলারী বিনা আপত্তিতে আর খানিকটা আটা ঢেলে নিয়ে মাখতে মাখতে গল্প করে। কথায় কথায় বলে,—গলির ভেতর ডাগদর বাবুর বুড়ো কোচোয়ান নাকি ত্রিশ টাকা মাইনে পায়।

—ত্রিশ টাকা পায় না আরো কিছু! এ অঞ্চলে ত্রিশ টাকা ঘমণ্ডি ছাড়া কেউ পায় না!

রুটি তৈরী শেষ হলে দুলারী বাবুদের বাড়ীর কাজ সেরে আসবার জন্য উঠল। গাড়ীটার এক পাশে অত্যন্ত সংকীর্ণ একটুখানি জায়গায় দড়ির খাটিয়ার উপর কম্বল গায়ে দিয়ে ঘমণ্ডি শুয়ে ছিল। দুলারীকে উঠতে দেখে জিজ্ঞাসা করলে—"হো গইল্?"

"হাঁ হম্‌ অব্‌ যাওত্‌ বানি।"

ঘর্মাণ্ড খানিক চুপ করে থেকে জিজ্ঞাসা করলে—ছাগলের দুধ সত্যি টাকা টাকা সের ত?

অনিচ্ছুক ছাগলীটার গলার রসি ধরে টান্‌তে টান্‌তে দুলারী একদিন ঘর্মাণ্ডির আস্তানায় এসে উঠল। সে এগার বছর আগেকার কথা। শাঁক বাজল না, উলুধ্বনি হ'ল না,—কোন উৎসবের আয়োজন দেখা গেল না।

ঘরে একটু স্থানাভাব হয় বটে, কিন্তু সে এমন কিছু নয়। দুখিয়ার বাচ্চাগুলি বড় হয়েছে। তারা আপনা থেকেই গাড়ীর ভেতর রাত্রিবাস করবার বন্দোবস্ত করে নিয়েছে। এমন কিছু গোলমাল নেই। ছাগলীর বাচ্চা হ'লে ঘর্মাণ্ডি একদিন দুসের দুধ না হওয়ার জন্য গালাগাল করছিল বটে, কিন্তু দুলারীও তার জবাব দিয়েছিল—ত্রিশ টাকা মাইনে কোথায় গেল?

বছর যায়। একটা কুকুর মরে আর একটা বাচ্চা দেয়। প্রথম ছাগলীটা হঠাৎ একদিন কি খেয়ে এসে বমি করে চোখ উল্‌টে শেষ হয়ে গেল। আরেকটা রাস্তার ঘোড়ার গাড়ীতে চাপা পড়ে পা ভেঙে খোঁড়া হয়ে এল। একটা বেড়াল কোথা থেকে এসে ভাগ বসিয়েছে। দুলারীর দেহের পরিধি দিনের পর দিন বাড়ে। ঘর্মাণ্ডি কম্বল কাঁথা গুন্‌চট মুড়ি দিয়ে জ্বরে পড়ে, —দুলারীর স্থূল দেহের গেঁতোমি নিয়ে গালাগালি করে, সেরে ওঠে। বছর যায়।

সকালবেলা গলায় ঘুঙুর বাঁধা ছ-মাসের চঞ্চল দুরন্ত ছাগল ছানাটা সবার আগে উঠে বন্ধ দরজার কাছে লাফালাফি ঝাঁপাঝাঁপি করতে সুরু করে। দরজায় মাথা দিয়ে ঠেলা দেয়: থালা ঘটিগুলো পায়ে লেগে শব্দ করে ওঠে। দুলারী সংকীর্ণ জায়গাটুকুর মধ্যে অতি কষ্টে পাশ ফিরে ঘুমজড়িত বিরক্ত কণ্ঠে বলে "দেখ্‌ ত ওকর বদমাসী!" তবু বদমাসী থামে না। ছাগলছানা এক লাফে গাড়ীর ভেতর উঠে, ঘুমন্ত কুকুরগুলোকে মাড়িয়ে এক হট্টগোল বাধিয়ে তোলে। ঘর্মাণ্ডি চোখ রগড়ে উঠে বসে, তারপর উঠে দরজা খোলে। বেড়ালটা দুলারীর কোলের কাছ থেকে উঠে মাথা ঝাঁকিয়ে, পিঠ বেঁকিয়ে ল্যাজ তুলে পাগুলো টান করে আলস্য ভেঙে খোলা দরজা দিয়ে বেরিয়ে যায়। তিতিরটা খাঁচার থেকে তীক্ষ্ন উচ্চ কণ্ঠে আপনার অপ্রতিদ্বন্দ্বিতা ঘোষণা করে। ঘর্মাণ্ডি পা দিয়ে দুলারীকে একটা ঠেলা দিয়ে বলে "উঠ্‌ বুঢ্‌ঢি হাঁথি, উঠ্‌।"

মানুষ ও পশু জাগে, মানুষ ও পশু আবার রাত্রে গায়ে গায়ে তাল পাকিয়ে নিদ্রা যায়। সমস্ত দিন রান্না-বাড়া খাওয়া-দাওয়া আছে, কলতলায় জল নিয়ে ঝগ্‌ড়া আছে,—

"দিন ভর্‌ তু পানি ভরত্‌ রহি, আউর কৌন পানি ন লেব?"

অপর পক্ষ উত্তর দেয়—"হম্‌ ত আগাড়ি আয়ল্‌।"

"আগাড়ি আয়ল্‌ ত কা রাহা ভয়ল! তু দিন ভর পানি লেই? ই তোহার নানাকে কল ন হও।"—

ঘুঁটে দেওয়া আছে, সন্ধ্যা বেলায় জটলা আছে।

মাতোয়ালা গোলদার হরদুগিগ আসে তার সারেঙ্ নিয়ে, খড়ের গোলার রামজীবন আসে ঢোলক নিয়ে। দড়ির খাটিয়া পড়ে রাস্তায়। ঘর্মাণ্ড, রামজীবন, হরদুগিগ বসে। এমন কি বড় বাবুদের দরওয়ান মহাদেও পর্যন্ত মাথায় পাগড়ি বেঁধে এসে মাঝে মাঝে সে খাটিয়ায় বসতে দ্বিধা করে না।

দুলারী নীচে মাটিতে পা ছড়িয়ে বসে একটা কুকুরকে পায়ের ওপর শুইয়ে আঁটুল বাছে। মাঝে মাঝে একটা দুটো মন্তব্য প্রকাশ করে।

"বড়া খচ্চর হও উ হমার বিড়াল, চারগো চুহা আজ মারল্, বাকী খায়ল্ন, দাঁতোসে তনি কাট্ কাট্‌কে ফেক দেল—"

হরদুগিগ সারেঙ থামিয়ে তার রাঙা ঘোলাটে চোখ দুলারীর ওপর কিছু-ক্ষণ কৃত্রিম প্রশংসায় নিবদ্ধ করে বলে,—দিন দিন মোটা হয়ে দুলারী যে রকম খপসুরৎ হয়ে উঠ্‌ছে আর ত তাকে চুরী না করে থাকা যায় না, শুধু "ঘর্মাণ্ড চিনথ্ আদমী, উত হল্লা করি" এই যা বাধা।

দুলারী মুখ ভার করে রাগের ভান করে। সবাই হাসে।

ভেতর থেকে মশা তাড়াবার জন্যে ঘোড়ার পা ঠোকার শব্দ শোনা যায়। ঘর থেকে দুরন্ত ছাগল ছানাটা নানা ভাবে লম্ফ ঝম্প করতে করতে বাইরে এসে কি ভেবে থম্‌কে দাঁড়ায় আবার মাথা বাঁকিয়ে গলার ঘুঙুরগুলো বাজিয়ে কোন অদৃশ্য প্রতিদ্বন্দ্বীর বিরুদ্ধে তাল ঠুকে লাফ দিয়ে ঘরে গিয়ে ঢোকে।
—দিন যায়।

এগারো বছর কেটেছে। দুলারীর মাথার চুলে বেশ পাক্ ধরেছে, মাংস আরো ঢিলে হয়েছে। চোখের কোণ আরো কুঁচ্‌কেছে।

কদিন ধরে সে কোন ভৌজাইনের বেমারের কথা নিয়ে ঘ্যান ঘ্যান করছে। ঘর্মাণ্ড গাড়ী বার করে ঘোড়া জুত্‌ছিল। দুলারী আবার জানালে, তার ভৌজাইনের বেমার., তাকে দেশে যেতেই হবে।

ঘোড়া জুততে জুততে ঘর্মাণ্ড উত্তর দিলে,—কোন পুরুষে তার ভাইয়ের নাম পর্যন্ত শোনা যায় নি, আজ আবার ভাজ কোথা থেকে জন্মাল?

আজ আবার কোথা থেকে জন্মাবে? যেমন করে সবার জন্মায় তেমনি করে! দুলারী ত আর ভুঁইফোড় নয়, তার মা বাপ্ ভাই বোন সবাই আছে।

ঘোড়া জুতে পায়ে পট্টিটা জড়াতে জড়াতে ঘর্মাণ্ড বল্লে—বটে! এতদিন ত ভৌজাইন খবর নেয়নি একটি বার! আর আজ খবরটাই বা এল কেমন করে?

—তার দেশের লোক এসে তাকে খবর দিয়ে গেছে।

—বেশ বেশ! তা যাওয়া হবে কবে?

—আজই।

—আজই? বেশ। কিন্তু ঘর্মাণ্ড আসবার আগে যেন যাওয়া না হয়।

—তাই হবে। তাই হবে। দুলারী অমন চোর নয়।

—ঘর্মাণ্ড গাড়ী হাঁকিয়ে চলে গেল। কিন্তু দুপুর বেলায় তার সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম করে আরেক জনের জিম্মায় গাড়ী রেখে ফিরে এল। দুলারী ঘরে ছিল না। দরজা ভেজান, ভেতরে ঢুকে ঘর্মাণ্ড দেখলে পুঁটলি-পোট্‌লা বাঁধা ছাঁদা শেষ হয়েছে।

দুলারী গঙ্গার ঘাটে গেছল, ফিরে এসে ঘর্মাণ্ডকে দেখে একটু চমকে

উঠে বল্লে—মোট বাঁধতে মেহনৎ লাগে না—সব খোলা হয়েছে যে?

ঘর্মাণ্ডি চোখ রাঙিয়ে বল্লে,—খোলা হয়েছে যে? এ সব থালা ঘটি কার?

দুলারী এবার ক্ষীণ স্বরে বল্লে, "তোহার হও? লে তু বাহার করলে।"

সমস্ত পোঁট্‌লা-পুঁট্‌লি থেকে একে একে অনেক জিনিষই বার করে ফেলে ঘর্মাণ্ডি বল্লে,—আরো কি চুরি করা হয়েছে?

—হ্যাঁ চুরি করা হয়েছে! দেখ্‌না আউর কা হম্‌ চোরী করলু!

ঘর্মাণ্ডি খপ্‌ করে তার হাতটা ধরে ফেলে কাপড়টায় এক টান দিলে। এবার দুলারী সমস্ত সংযম ত্যাগ করে উচ্চ স্বরে রোদনের সঙ্গে ঘর্মাণ্ডির পিতৃ-মাতৃকুলের উদ্ধার সাধন করে মুক্ত হস্তে ঘর্মাণ্ডির ওপর কীল চড় ঘুঁসি আঁচড় কামড় বর্ষণ সুরু করে দিলে। তারপর এগার বছর ধরে ঘনিষ্ঠতম সম্বন্ধে জড়িত এই দুই পুরুষ ও নারীর মধ্যে যে নির্লজ্জ রণতাণ্ডব সুরু হ'ল তার বর্ণনা করা যায় না।

দুপুর হলেও রাস্তায় ভীড় হয়ে গেছল। ঘর্মাণ্ডি বহুক্ষণ ধ্বস্তাধ্বস্তি করে দুলারীর কোমর থেকে সাতটি দশ টাকার নোট ও খুচরা সাতটি টাকা বার করে নিয়ে অর্দ্ধউলঙ্গ অবস্থায় তাকে লাথিয়ে ঠেলে রাস্তায় বার করে দিলে। তারপর তার বাকী পোঁট্‌লা-পুঁট্‌লি রাস্তায় এক এক করে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে হাঁফাতে হাঁফাতে বল্লে,—"বেইমান্‌ চোট্টা!" তার কাপড় জামাও কিছু আস্ত ছিল না। সারা দেহে নখ ও দন্তের ক্ষত চিহ্ন।

ছিন্ন বিশৃঙ্খল চুল নিয়ে ছিন্ন অসম্বৃত বসনে দুলারী বাইরে থেকে ক্ষিপ্তের মত চীৎকার করে সমস্ত পাড়াকে তখন জানাচ্ছিল,—ডাকুতে তার টাকা কেড়ে নিচ্ছে, তার অনেক কষ্টে ছাগলের দুধ ঘুঁটে বেচে, মেহনৎ করে জমান টাকা!

হরদুঙ্গি ছুটে এসে জিজ্ঞাসা কল্লে,—কি ব্যাপার।

—কি আবার ব্যাপার! ভৌজাইনের বাড়ী যাবার নাম করে চুরী করে পালাবার মতলব! বেইমান্‌ চোট্টা...

"তুই বেইমান্‌, তু চোট্টা, তু ডাকু হ, দে দে হমার রুপয়া..."

দুলারী রাস্তায় বসে রোদনের সঙ্গে গালাগালি করতে লাগল।—তার হকের টাকা কেন ও ডাকু কেড়ে নেবে? এগার বছর ধরে সে কি মাগ্‌না দুধ ঘুঁটে বেচেছে!

রামজীবন বল্লে,—"মিট্‌মাট্‌ কর লে ভাই!"

হরদুঙ্গি বল্লে, "হাঁ ভাই মিট্‌মাট্‌ কর লে। এগার বরিষ দুনো এক এক সাথ রহলি।"

ঘর্মাণ্ডি তখন চৌকাটের ওপর বসে একটা কুকুর বাচ্চার গায়ে অন্যমনস্ক ভাবে হাত বুলোতে বুলোতে দুলারীর গালাগালির প্রত্যুত্তর দিচ্ছিল ; বল্লে, —এগার বছর ত কি হয়েছে! ও চোর আর এ চৌকাট মাড়াতে আসুক দেখি! বেইমান! ভৌজির বাড়ী যাবার ছুতোয় চুরী করা! ভাগ্যিস সে সময় মত এসেছিল!

দুলারী উঠে বল্লে, "হম্‌ থানেমে যাওত বানি।"

ঘর্মাণ্ডি বিদ্রূপ করে বল্লে, "যা তু থানেমে। হুঁয়ে তোহার ভৌজাইন হও।"

'পুন্নাম'

অসুখ আর কিছুতেই সারে না।

কাসি সর্দি সারে তো খোসে সর্বাঙ্গ ছেয়ে যায়, খোস গিয়ে লিভার ওঠে ঠেলে—তারপর ন্যাবায় ধরে। চার বছরের ছেলেটাকে নিয়ে যমে-মানুষে টানা-টানি চলেছে তো চলেইছে।

প্যাকাটির মতো সরু চারটে হাত-পা নড়বড় করে, ফ্যাকাশে হলুদবরণ মুখে কাতর অসহায় চোখ দুটি শুধু জ্বলজ্বল্ করে—সে-চোখে বিশ্বের সকল ক্লান্তি, সকল অবসাদ, সমস্ত বিরক্তি যেন মাখানো।

শিশুর চোখ সে নয়—জীবনের সমস্ত বিরস বিস্বাদ পাত্রে চুমুক দিয়ে তিক্তমুখে কোনো বৃদ্ধ যেন সে-চোখকে আশ্রয় করেছে। শুধু ওই অসহায় কাতরতাটুকু শিশুর।

সারাদিন কান্না আর অন্যায় বায়না। ছবিও এক-একসময় আর পারে না। হঠাৎ পিঠে এক থাবড় মেরে সে বলে, "মর না, মরলে যে হাড় জুড়োয় আমার।"

শিশু আরো জোরে নিশীথগগন বিদীর্ণ করবার আয়োজন করে। পাশের বিছানায় ললিত একবার পাশ ফিরে শোয়, একটু ছটফট করে, কিন্তু কিছু বলে না। আগে অনেকবার স্ত্রীকে সে এই নিয়ে ধমকেছে। দু-জনের এই নিয়ে ঝগড়াও হয়েছে। কিন্তু আজকাল আর কিছু বলতে পারে না। ছবির এই আকস্মিক অসহিষ্ণুতার পেছনে কি বিপুল বেদনা, হতাশা ও ক্লান্তির ভার যে আছে তা সে বোঝে। কিন্তু তবু বুকটা যেন টনটন ক'রে ওঠে।

কিন্তু উপায় নেই। ডকের মাল-তোলা ও নামানোর সামান্য সরকার। জাহাজ ডকে ভিড়লে তবে দু-পয়সা আসে। নইলে নিছক ব'সে থাকা ছাড়া উপায় নেই। মাসে যা আয় হয় তাতে মুদির ঋণ শোধাই চলে না, তা ডাক্তার। কিন্তু তবু সে কোনো ত্রুটি রাখেনি।

শিশু আকাশ ফাটিয়ে চিৎকার করে—সে-চিৎকার আর থামতে চায় না। সে-চিৎকারে বেদনা নেই—আছে শুধু যেন সমস্ত পৃথিবীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ।

ছবি রাগের মাথায় চাপড় মেরে ফেলে সন্তপ্ত হ'য়ে নানারকম ক'রে ভোলাতে চেষ্টা করে। ভীতভাবে স্বামীর বিছানার দিকে চেয়ে বোঝবার চেষ্টা করে স্বামীর অসময়ে নিদ্রার ব্যাঘাত হ'ল কি না। নিজের দু-চোখ সারাদিনের পরিশ্রমের ক্লান্তিতে ঘুমে জড়িয়ে আসে। কিন্তু শিশু কিছুতেই থামে না। আদর নয়, খেলনা নয়, কিছু সে চায় না। শুধু তার অন্তরের অসীম বিদ্বেষ কান্নার আকারে উথলে-উথলে ওঠে। কান্না নয়—সে সৃষ্টির প্রতি অভিশাপ।

ললিত ঘুমের ভান ক'রে প'ড়ে থাকে আর ভাবে হয়তো।

জীবনের অন্ধ নিষ্ঠুরতার কথা ভাবে না, নিজের বিপুল ব্যর্থতার কথা ভাবে না—দার্শনিক তত্ত্ব মীমাংসা করবার চেষ্টা করে না—ভাবে শুধু ডাক্তার বলেছে, ও-ছেলেকে চেঞ্জে নিয়ে না গেলে চলবে না—কিন্তু সে কেমন ক'রে সম্ভব।

শুনতে পায় ছবি কি কাতরভাবে কতরকম আদর ক'রে শিশুকে ভোলাবার চেষ্টা করছে।

"লখ্‌খি বাবা আমার, কাঁদে না ; কাল তোমাকে একটা লাল মটরগাড়ি কিনে দেব, তুমি ব'সে-ব'সে চালাবে—"

শিশুর সেই একঘেয়ে অশ্রান্ত চিৎকার—"কেন তুমি আমায় মারলে—"

ছবি আবার আদর ক'রে কোলে নেবার চেষ্টা করে। "শোনো না ; তুমি মটরগাড়িতে বসে ভোঁ-ভোঁ ক'রে হর্ন বাজাবে—"

শিশু হাত-পা ছুঁড়ে মাকে ঠেলে দিয়ে সেই একঘেয়ে সুর ধ'রে থাকে—"কেন তুমি আমায় মারলে—?"

হঠাৎ ললিতের মনে হয় সমস্ত ব্যাপারটা যেন অত্যন্ত হাস্যকর—পরিণত মনের এই শিশু সেজে তাকে ভোলাবার চেষ্টা, শিশুর এই মূঢ় স্বার্থপরতা. এর চেয়ে বিসদৃশ যেন আর কিছু হ'তে পারে না।

পরক্ষণেই সে নিজের এই মনে-হওয়ার জন্যে অত্যন্ত লজ্জিত হ'য়ে ওঠে। লণ্ঠনের আলোয় ছবির সারাদিনের পরিশ্রমে ক্লান্ত শুষ্ক মুখ, নিদ্রাবঞ্চিত কাতর দুটি চোখ দেখতে পায়। মনের এই অসংগত আচরণে নিজের ওপরই তার রাগ হয়।

তাদের দিকে পিছনে ফিরে লক্ষ্যহীনভাবে সে সামনের দেয়ালের দিকে চেয়ে আবার ভাবতে শুরু করে,—বিশৃংখল অসম্বদ্ধ ভাবনা।

না, বিয়ে ক'রে সে অন্যায় কিছু করেনি। করেছে কি? না, কখ্‌খনো না। ভগ্নীপতির বাড়িতে আশ্রিত হ'য়ে থেকে সামান্য পড়াশুনো শেষ ক'রেই তাকে কাজে ঢুকতে হয়েছে, ভগ্নীপতির আশ্রয়দানের ঋণশোধ করতে। বিয়ে তো সে করবে না-ই ঠিক করেছিল। আর সেজন্যে কারুর কোনো চাড় ছিল ব'লেও বোধ হয় না। বাংলা দেশের পুরুষ সাধারণত যে-বয়সে বিয়ে করে তা পেরিয়ে যাবার পরও সংকল্প অটুট ছিল কিন্তু টলেনি এমন কথা বলা যায় না। মনে মনে যেন একটা বিপুল অতৃপ্তি দিনরাত তাকে পীড়া দিয়েছে। বিয়ে,—পরিপূর্ণ জীবন, নারীর সাহচর্য, একটি একান্ত নিজস্ব সংসার রচনার আনন্দ, অস্পষ্টভাবে এই সমস্তর জন্য ক্ষুধা তার অন্তরকে ব্যথিত করেছে। চিরকৌমার্যের গৌরবে মন তার কোনোদিন উল্লসিত হ'য়ে আত্মপ্রসাদ লাভ করেনি, কেবলই অস্পষ্টভাবে মনে হয়েছে এই একক জীবন ব্যর্থ, পঙ্গু। দারিদ্রের কথা সে ভাবেনি এমন নয়, কিন্তু মন তার বারবার বিদ্রোহ ক'রে বলেছে মানুষের দেওয়া দারিদ্রের জন্যে জীবনকে নিষ্ফল ক'রে রাখবার কোনো অধিকার তার নেই।

চিন্তার ফাঁকে-ফাঁকে শুনতে পায় শিশু সেই এক গোঁ ধ'রে চিৎকার করছে, "কেন তুমি আমায় মারলে!"

কিন্তু কোথায় চেঞ্জে নিয়ে যাওয়া যায়? ললিত সম্ভব-অসম্ভব অনেক জায়গার কথা ভাবে। টাকারও দরকার। ছবির গয়নার আর কিছু নেই, শুধু দু-গাছি বালা—হাতে থাকলে ক্ষ'য়ে যাবার ভয়ে তোলা আছে। তার দাম কতই বা হবে! বড়ো জোর এক শো টাকা। তাই নিয়ে কোথায়ই বা চেঞ্জে যাওয়া যায় এবং ক'দিনই বা থাকা যায়। এসব ব্যাপার সম্বন্ধে সে সম্পূর্ণ অজ্ঞ।

কিন্তু শিশুর চিৎকার যে কিছুতেই থামতে চায় না। ললিত হঠাৎ উঠে

বসে। ছবি একেবারে অবসন্ন হ'য়ে প'ড়ে ওই চিৎকারের মাঝেই ব'সে ব'সে একটু ঢুলছিল। ললিতের ওঠার শব্দে সে চমকে সজাগ হ'য়ে ওঠে ; তারপর কান্নার ওপরেই ছেলেটার পিঠে সজোরে চাপড় মেরে বলে, "হ'ল তো! সকলের ঘুম ভাঙালে তো!—কোথা থেকে এমন রাক্ষস এসেছিল আমার পেটে!"

ললিত এবার ব্যথিত হ'য়ে বলে, "আঃ, আবার মারো কেন?"

"না, মারবে না! রাত-দুপুরে ডাকাত-পড়া চিৎকার ক'রে পাড়া-সুদ্ধ লোকের ঘুম ভাঙালে গা!"

"অসুখে ভুগে-ভুগেই না অমন খিটখিটে হয়েছে।" ব'লে ললিত শিশুকে কোলে নেবার চেষ্টা করে। শিশু কিছুতেই কোলে আসতে চায় না। সজোরে ছবির আঁচল মুঠিতে ধ'রে আরো জোরে চিৎকার শুরু করে।

ঝটকা দিয়ে আঁচল ছাড়িয়ে নিয়ে ছবি উঠে দাঁড়ায়, বলে, "তা মরুক না! মরলে যে বাঁচি।"

"ছিঃ, কি বলছ ছবি!"

এবার ছবি কেঁদে ফেলে, অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে বলে, "বলব আবার কি। ও যে বাঁচতে আসেনি সে কি আর বুঝতে পারিনি। এমনি ক'রে ভুগে, ভুগিয়ে হাড়মাস খাক ক'রে ও যাবে।

ছবি ললিতের দিকে পিছন ফিরে বোধ হয় আঁচলে চোখ মোছে।

শিশু শীর্ণ রক্তহীন হাত বাড়িয়ে ললিতের কোল থেকে 'মার কাছে যাব' ব'লে অশ্রান্তভাবে চিৎকার করে।

"ডাক্তার তো বলেছে চেঞ্জে নিয়ে গেলেই সারবে।" ললিতের মুখ থেকে কথাগুলো ঠিক আশ্বাসের সুরে যেন বেরুতে চায় না। ও-আশায় সে নিজেই যে বিশ্বাস হারিয়েছে।

ছবি উত্তর দেয় না। ছেলেটাকে স্বামীর কোল থেকে নিয়ে বিছানায় জোর ক'রে শুইয়ে ধমক দিয়ে বলে, "চুপ কর শিগ্‌গির, ফের চিৎকার করলে দরজা খুলে ওই রাস্তায় ফেলে দিয়ে আসব।" তারপর নিজে তার পাশে শুয়ে প'ড়ে স্বামীকে বলে, "তুমি শোও না গিয়ে। এমন ক'রে সারা রাত জাগলে চলবে? সারাদিন আপিসে খাটবে আর সারারাত ছেলের জ্বালায় দু-চোখের পাতা এক করতে পারবে না, এমন করলে শরীর টেঁকে!"

ললিত এসে বিছানায় শুয়ে প'ড়ে বলে, "তুমি তো একটুও ঘুমুতে পেলে না।"

"এই তো আমি শুয়েছি। এইবার ঘুমব।"

কিন্তু ঘুমনো তার হয় না। শিশু এবার নতুন বায়না ধরে। একটা বিশেষ নির্দিষ্ট স্থান দেখিয়ে মাকে বলে, "তুমি শুলে কেন? এইখানে বসো না!"

নির্দিষ্ট সেই স্থানটিতে ছবিকে বসতেই হবে। ছবি আদর করে, ধমক দেয়, মিনতি ক'রে বলে "লখ্‌খি বাবা, বড্ডো ঘুম পেয়েছে, একটুখানি শুই, —আচ্ছা এইখানটাতে শুচ্ছি—এবার তো হ'ল!" কিন্তু তাতে হয় না। সেই-খানটাতে শুলে হবে না, বসতে হবে।

শিশুর সেই এক পণ, "শুলে কেন, এইখানটাতে বোসো না।"

শুয়ে-শুয়ে ললিতের অসহ্য বোধ হয়। আবার উঠে ব'সে বলে, "ওকে নিয়ে একটু রাস্তায় বেড়িয়ে আসব?"

ছবি বিরক্ত হ'য়ে ওঠে, "তুমি আবার উঠলে কেন বলো তো?"

"ওর বায়না যে কিছুতেই থামছে না!"

"তাই জন্যে রাত-দুপুরে রাস্তায় বেড়াতে যেতে হবে! তুমি শোও দেখি।'

ললিত হতাশ হ'য়ে বিছানায় শুয়ে পড়ে। নিদ্রালস চোখ দু-হাতে রগড়ে নির্দিষ্ট জায়গায় ব'সে ছবি শিশুর বায়না নিবৃত্ত করে।

ললিত স্ত্রীর সে শ্রান্ত অবসন্ন মূর্তির দিকে চাইতে পারে না। পেছন ফিরে শুয়ে মনে-মনে চেঞ্জে যাবার টাকা সংগ্রহের অসংখ্য আজগুবি কল্পনা করে।

তারপর কখন বোধ হয় একটু তন্দ্রা আসে। কিন্তু খানিক বাদেই শিশুর চিৎকারে তন্দ্রা ভেঙে যায়। উঠে দেখে, ব'সে থাকতে-থাকতেই কখন আর না পেরে অত্যন্ত আড়ষ্টভাবে ছবির মাথাটা কাত হ'য়ে বিছানায় লুটিয়ে পড়েছে। এবং শিশু পা দিয়ে ঠেলে, হাত ধ'রে টেনে, নানা প্রকারে তাকে জাগাবার চেষ্টা ক'রে চিৎকার ক'রে কাঁদছে—"তুমি শুলে কেন! এইখানে বোসো না!"

এমনি চ'লে এসেছে দিনের পর দিন, রাতের পর রাত!

টিনের চালের একটি বড়ো ঘর, গোলপাতায় ছাওয়া ছোট্টো একটি নিচু রান্নাঘর আর একফালি সরু উঠন—এই নিয়ে সংসার। কলতলার পাশে একটা নামহীন বুনো গাছ বেড়ে উঠেছে : অসময়ে শীতকালে তাতে অপরিচিত অজস্র ফুল ধরে : তার না আছে গন্ধ, না আছে রূপ। তবু সেইটুকু শোভা।

ও যেন দীন সংসারের মুখে হতাশার হাসি।

এই ছোটো সংসারটির ভেতরেই কিন্তু মানুষের সেই পুরাতন কাহিনীর একটি ক্ষীণ ধারা শ্রান্তভাবে বয় দিন থেকে রাতে, রাত হ'তে আবার নতুন দিনে।—মানুষের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার অমানুষিক কৃচ্ছ্র সাধনার অসামান্য আত্মবলিদানের কাহিনীর ধারা।

হয়তো বিধাতারও চমক লাগে।

ললিত কিন্তু নিজেকে অন্যরকম বোঝায়। তার কাছে অপরিস্ফুটভাবে এসব শুধু আনন্দের ঋণ-শোধ, মনুষ্যত্বের গৌরবের মূল্যদান। তার বেশি কিছু নয়। জীবন শুধু মন্থর স্রোতে হালকা নৌকোর মতো অত্যন্ত সহজে ভেসে যাবে ভেবে তো সে বিয়ে করেনি। জীবনের অগ্নিপরীক্ষা, বিবাহের দায়িত্ব—অনেক কথাই সে যে আগে ভেবেছে।

তবু ঋণ যেন আর শোধ হ'তে চায় না। ছবির দিকে সে ভালো ক'রে আজকাল চাইতে পারে না। গলার কণ্ঠি দেখা যায়, চোয়ালের হাড় ঠেলে উঠেছে। পরিশ্রমে দুর্ভাবনায় উনিশ বছরের মেয়ের মুখে যেন ঊনপঞ্চাশ বছরের ক্লান্তি! খোকা তো দিনের পর দিন মৃত্যুর দিকে এগিয়ে চলেছে।

ডাক্তার সেদিন হঠাৎ একবার নিজে থেকে এসেছিল। গাড়ি থামিয়ে দরজার কাছে পা ফাঁক ক'রে দাঁড়িয়ে ওয়েস্টকোটের দু-পকেটে দু-হাতের বুড়ো আঙুল গুঁজে একটু সামনে ঝুঁকে, পরম আত্মীয়ের মতো স্নিগ্ধ অনুযোগের কণ্ঠে ব'লে গেল, "আপনারা এখনো চেঞ্জে নিয়ে যাননি! নাঃ, আপনারা ছেলেটাকে বাঁচতে দিলেন না দেখছি!"

ডাক্তার যেতে ললিত বললে, "কিন্তু ডাক্তার আমাদের একটু ভালোবাসে,

দেখেছ ছবি? ঠিক ব্যবসাদারি আমাদের সংগে করে না। না?”

ডাক্তারের সহৃদয়তার আলোচনায় খানিকটা সময় বেশ কাটল। ললিত মনে-মনে প্রতিজ্ঞা করলে, দু-এক দিনের মধ্যে যা-হোক-ক'রে টাকার যোগাড় সে করবেই। ছবি অন্য দিনের চেয়ে যেন একটু স্ফূর্তিভরে “কলের জল বুঝি যাবার সময় হ'ল” ব'লে কাজে গেল। সমস্ত সংসারের ওপর যে-বেদনার গুরু-ভার চেপে ছিল, সেটা যেন অনেকটা হালকা হ'য়ে গেল সামান্য একটি মানুষের ক্ষণিকের অভিনয়ে।

কিন্তু সে কতক্ষণ আর!

আবার রাত্রি আসে। ললিত শ্রান্ত হতাশ হ'য়ে ঘরে ফেরে। শিশু নিয়মিত বায়না ধরে। মার আঁচল চেপে শুয়ে থাকে, মাকে সে ছেড়ে দেবে না।

“রান্না-বান্না কিছু করতে হবে না আমার? এমনি ব'সে থাকলে চলবে?” —ছবি জোর ক'রে চ'লে যাবার চেষ্টা করে।

শিশুর কান্নায় কাতর হ'য়ে ললিত বলে, “থাক না, আমি না-হয় যা হোক বাজার থেকে কিছু কিনে আনছি। তুমি বোসো ওর কাছে।”

“হ্যাঁ, এই জল-কাদায় আপিস থেকে দু-কোশ পথ হেঁটে এলে, আবার এখনই যাবে বাজারে! ছেলের অত আদরে কাজ নেই! আর বাজারের খাবার তোমার সয় কোনোদিন?”

“একদিন খেলে কিছু হবে না। আর তুমিও একদিন জিরোও না!” ললিত যেন অনুনয় করে।

“না না, আমি রাঁধতে যাচ্ছি। এই বৃষ্টিতে বাজারে যেতে হবে না।” ছবি জোর ক'রে উঠে পড়ে। শিশু কেঁদে হাত-পা ছুঁড়ে একাকার ক'রে তোলে।

ললিত আর কথা না ক'য়ে বেরিয়ে যায়। বাইরে টিপটিপ ক'রে বৃষ্টি পড়ে, পথ কাদায় কাদা। পায়ে-পায়ে জুতো সে-কাদায় ব'সে যায়; ললিতের শ্রান্ত পা যেন কাদা থেকে উঠতে চায় না।

ওই রুগ্ন পাঁচ বছরের শিশুকে কেন্দ্র ক'রে এই ছোটো সংসারটি ক্লান্ত-পদে দুঃখের ভার বহন ক'রে নিঃশব্দে আবর্তন করে।

শিশুর অন্ধ অবোধ স্বার্থপরতার কাছে অহরহ বলিদান চলে।

ললিত ভাবে,—শিশু, ভবিষ্যৎ মানব সে, সে যে সব-কিছু দাবি করতে পারে, কোনো ত্যাগই তার জন্যে যে যথেষ্ট নয়।

ডাক্তার আর একদিন এসে বক্তৃতা দিয়ে গেছে—এবার আর সহৃদয়তার সুরে নয়, মুরুব্বিয়ানার চালে; চেয়ারে আলগোছে ব'সে কোলের ওপর টুপি খুলে ডান হাতে ছড়ি দোলাতে-দোলাতে, কোমরে বাঁ হাত দিয়ে ঘাড় বাঁকিয়ে অনেক কথা ব'লে গেছে,—শিশুকে সংসারে আনবার দায়িত্বের কথা, ভবিষ্যতের প্রতি কর্তব্যের কথা, ইত্যাদি।

যাবার সময় মোটরে উঠেও মুখ বার ক'রে বলেছে—“দেখুন, এমন ক'রে একটা মানুষকে পৃথিবীতে নিজের সুখের জন্যে এনে যারা তার প্রতি কর্তব্য করে না, তাদের জেল হওয়া উচিত—ঠিক বলুন, জেল হওয়া উচিত নয়?”

ললিত তেমনি আপিসে যায়-আসে, কিন্তু তার মুখ যেন কঠিন হ'য়ে গেছে পাথরের মতো। তার মনের গোপনে কি সংকল্প জন্ম নিয়েছে কে জানে!

খোকা সেরে উঠেছে। স্পষ্ট সেরে উঠেছে। খোলা বারান্দায় ডেকচেয়ারে ব'সে-ব'সে ললিত খোকার খেলা দেখে। ছবি চেয়ারের পিছনে দাঁড়িয়ে বলে, "কিন্তু কি সুন্দর জায়গা বাপু, আমার যেন আর কলকাতায় ফিরে যেতে ইচ্ছে করে না।" তারপর মুখ নামিয়ে ললিতের কানের কাছে চুপিচুপি আনন্দোজ্জ্বল মুখে বলে, "কাল খোকাকে কোলে নিতে গিয়ে আমার হাত দুটো টনটন ক'রে উঠল।"

রাঙামাটির দেশের রং যেন ছবিরও গালে লেগেছে ; শালবনের সজীবতা যেন তার সারা দেহে ঝলমল করে।

ললিত তার দিকে একবার মুখ ফিরিয়ে চায়, তারপর নীরবে কি যেন ভাবে।

ছবি খানিক বাদে হেঁকে বলে, "ছি খোকা, ছেড়ে দাও, ওর লাগবে।" খোকা তখন খেলার সাথীটির ঘাড়ের ওপর চেপে তার মাথাটি মাটিতে ঠোক-বার চেষ্টা করছে।

অগত্যা ললিত উঠে গিয়ে ছাড়িয়ে দেয়।

উৎপীড়িত ছেলেটি কিন্তু ধুলোমাখা মাথায় উঠে একটুও না কেঁদে ঈষৎ ম্লান হেসে মধুর কণ্ঠে বলে, "দেখুন তো কাকাবাবু, আমি কি ওকে ঘাড়ে করতে পারি!"

নিজের অজ্ঞাতে প্রতিবেশীর এই সুশ্রী সুন্দর মধুরকণ্ঠ ছেলেটির সঙ্গে নিজের ছেলের তুলনা ক'রে হঠাৎ ললিত মনে-মনে অকারণে অত্যন্ত পীড়া অনুভব করে।

ছেলেটি রোগা, মাথায় রেশমের মতো কোমল একমাথা দীর্ঘ চুল—নীলাভ চোখ দুটিতে, ছোট্ট মুখে ম্লান হাসিটি যেন লেগেই আছে।

ললিত খোকার কান ধ'রে ধমকে জিজ্ঞাসা করে,"কেন ওর মাথা মাটিতে ঠুকে দিচ্ছিলো? ঝগড়া না ক'রে থাকতে পারো না?"

খোকা মুখচোখ রাঙা ক'রে নীরব হ'য়ে থাকে। অপর ছেলেটি তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসে বলে, "না, ঝগড়া হয়নি তো! ও ঘোড়া-ঘোড়া খেলতে বললে কিনা, তাই আমি ওকে তুলতে পারিনি ব'লে আমার মাথাটি একবার মাটিতে ঠুকে দিয়েছিল। আমার তো লাগেনি!"

"না, ওর গায়ে কখ্‌খনো হাত তুলো না।" ব'লে খোকাকে ধমকে ললিত আবার ফিরে এসে বারান্দায় বসে।

ছবি একবার বলে, "খোকার সঙ্গে ওদের টুনু কিন্তু পারে না।" তারপর ললিতের গম্ভীর মুখ দেখে চুপ ক'রে যায়।

খোকা ও টুনুর খেলা কিন্তু জমে না। টুনুর সমস্ত সাধ্যসাধনা, মিনতি-অনুরোধ অগ্রাহ্য ক'রে খোকা ক্রুদ্ধমুখে গুম হ'য়ে ব'সে থাকে। তারপর হঠাং অকারণে প্রাণপণ শক্তিতে চিমটি কেটে দৌড়ে পালিয়ে যায়।

টুনু ককিয়ে কেঁদে ওঠে।

ছবি গিয়ে তাড়াতাড়ি তাকে কোলে তুলে নিয়ে খোকাকে বকতে শুরু করে।

শুধু ললিত চেয়ার থেকে ওঠে না, সমস্ত মুখ তার অকস্মাৎ বেদনায় কালো হ'য়ে যায়। টুনু শান্ত হ'য়ে খানিক বাদে যখন এসে বলে, "কাকা

বাবু, খোকা আমায় মেরেছে, আর আমি খেলতে আসব না।" তখন পর্যন্ত ললিত কথা কয় না, সামনের দিকে চেয়ে নীরবে কি ভাবে সে-ই জানে!

টুনু কিন্তু বিকালবেলা আবার এল।

খোকাকে নিয়ে তখন ললিত একটু লেখাপড়ার চেষ্টা করছে, এবং আধ ঘন্টা পরিশ্রমেও স্লেটের ওপর খোকাকে দিয়ে অ-কারের যৎসামান্য সাদৃশ্যেরও কোনো অক্ষর লেখাতে না পেরে হতাশ হ'য়ে উঠেছে।

টুনু এসে একপাশটিতে চুপ ক'রে বসল। ললিত বললে, "তুমি অ লিখতে পারো টুনু?"

একগাল হেসে টুনু বললে, "পারি কাকাবাবু, আমি বোধোদয় থেকে টানাও লিখতে পারি! লিখব কাকাবাবু?"

অবাক হ'য়ে ললিত বললে, "তুমি বোধোদয় পড়ো!"

"বোধোদয় আমার শেষ হ'য়ে গেছে। অ লিখে দেখাব কাকাবাবু?" ব'লে আগ্রহভরে টুনু স্লেটের দিকে হাত বাড়াল।

খোকা কিন্তু স্লেট দিলে না। দৃঢ়মুষ্টিতে স্লেট আঁকড়ে ধ'রে রইল।

"ওকে স্লেটটা দিতে বলুন কাকাবাবু"—টুনু অনুনয় ক'রে বললে, "আমি খুব ভালো ক'রে অ লিখে দেখাব।"

হঠাৎ কঠিন স্বরে ললিত বললে, "থাক, তোমার লিখতে হবে না, ও এখন পড়ছে, এখন তুমি বাড়ি যাও।"

টুনু অপ্রত্যাশিত কঠিন স্বরে ভীত হ'য়ে মুখটি কাঁচুমাচু ক'রে আস্তে-আস্তে চ'লে গেল।

ললিত কিন্তু আর এক মুহূর্তও ব'সে থাকতে পারলে না; টুনু যেতে না যেতে সে গম্ভীর মুখে উঠে বেরিয়ে গেল।

দেখা হ'তে ছবি জিজ্ঞাসা করলে, "আজ এরই মধ্যে পড়াশোনা হ'য়ে গেল? বাবা! ওকে নিয়ে তুমি যেরকম উঠে-প'ড়ে লেগেছ, জজ-মেজিস্টের না ক'রে আর ছাড়বে না!"

গম্ভীর মুখে ললিত শুধু বললে, "হুঁ।"

দু-দিন টুনু আর আসে না। ললিতের লজ্জা গ্লানি ও অনুশোচনার আর অন্ত নেই। খোকাকে নিয়ে একবার তাদের বাড়ি যাবার জন্যে বেরিয়েও সে মাঝপথ থেকে ফিরে এল। নিজের মাথা তার নিজের কাছে চিরকালের জন্যে হেঁট হ'য়ে গেছে।

পরদিন হঠাৎ সকালে বাইরের গেটের কাছে বেরিয়েই সে চমকে ডাকলে, "টুনু!"

গেটের পাশে দাঁড়িয়ে টুনু উৎসুক দৃষ্টিতে ভেতরের দিকে চাইছিল। ললিতকে দেখতে পেয়ে সে ভীত কুণ্ঠিতভাবে চ'লে যাবার উপক্রম করলে।

"তুমি আর খোকার সঙ্গে খেলতে আসো না কেন টুনু?"

সাদর সম্ভাষণে ভরসা পেয়ে টুনু অত্যন্ত কুণ্ঠিতভাবে বললে, "আপনি তা হ'লে বকবেন না তো কাকাবাবু?"

অকারণেই ললিতের চোখ অশ্রুসজল হ'য়ে উঠল ; এই ক্ষীণকায়, ফুলের মতো কমনীয় ছেলেটির সমস্ত কথাবার্তা আচরণে এমন একটি করুণ মাধুর্য আছে!

তাড়াতাড়ি তাকে বুকে তুলে নিয়ে ললাটে চুমু খেয়ে ললিত বললে, "না বাবা, কেন আমি তোমায় বকব!"

টুনুর মুখ তৎক্ষণাৎ হাসিতে উজ্জ্বল হ'য়ে উঠল—বললে, "আমি খেলতে যাই তা হ'লে?"

তাকে নামিয়ে দিয়ে ললিত বললে, "যাও।"

টুনু উল্লসিত হ'য়ে ছুটে গেল।

দু-দিন বাদে আজ প্রথম প্রসন্ন মনে ললিত বেড়াতে বেরিয়ে গেল।

কিন্তু ফিরে এসে সে-প্রসন্নতা তার রইল না।

দরজার কাছে থেকেই খোকার উচ্চ ক্রুদ্ধ কণ্ঠ শুনতে পাওয়া গেল।

"না, ওকে দুটো দিতে পারবে না মা! কেন, ও নিজের বাড়িতে গিয়ে খেতে পারে না? হ্যাংলা কোথাকার!"

লজ্জায়, বেদনায়, রাগে ললিতের কান পর্যন্ত রাঙা হ'য়ে উঠল। হিংসার এ জঘন্য রূপ ওইটুকু শিশুর মাঝে প্রকাশ পেল কোথা থেকে, ভাবতে-ভাবতে সে নিঃশব্দে আপনার ঘরে গিয়ে ঢুকল।

সেখান থেকে শুনতে পেল ছবি বোঝাবার চেষ্টা করছে—"না বাবা, ওরকম হিংসুটেপনা কি করতে আছে, ও তোমার ভাই হয় ; ও দুটো খাক, তুমিও দুটো খাও।"

টুনুর মিষ্ট গলা শোনা গেল—"আমি তো দুটো সন্দেশ খাব না কাকিমা ; আমার অসুখ করেছে কিনা, আমি একটুখানি খাব শুধু।"

"আচ্ছা বাবা, তুমি একটা নাও,—আর খোকন, এই তোমার দুটো, কেমন হ'ল তো?"

কিন্তু এও খোকার মনঃপূত নয়। "না, ওকে একটাও দিতে পারবে না, ওকে দাও না দেখি, আমি ওর হাত থেকে কেড়ে নেব।"

ছবি এবারে রেগে বললে, "কেড়ে নে না দেখি! তুই তো দুটো পেয়েছিস। ও একটা খেলে তোর অত হিংসে কেন?"

"কেন ও আমাদের বাড়ি খাবে! বাবা তো তাড়িয়ে দিয়েছিল, ও আবার এসেছে কেন?"

"বেশ করবে আসবে, বেশ করবে খাবে।"

ব্যাপারটা হয়তো সামান্য। কিন্তু ঘরে ব'সে-ব'সে শুনতে শুনতে ললিতের অসহ্য বোধ হচ্ছিল। তার জীবনের সমস্ত আশা, সমস্ত স্বপ্ন, সমস্ত সান্ত্বনা কে যেন মাড়িয়ে থেঁত্‌লে চ'লে গেছে।

সে নীরবে উঠে গিয়ে পাশের ঘরের দরজায় দাঁড়াল।

ছবি তখন টুনুর হাতে একটি সন্দেশ দিয়েছে। টুনু বলছিল, "আমি তো সবটা খাব না কাকিমা—আমার বড্ডো অসুখ করেছে কিনা! আমার তো খেতে নেই।"

কিন্তু তার কথা শেষ হ'তে না হ'তেই খোকা সজোরে হাত মুচড়ে সন্দেশটা কেড়ে নিয়ে বললে, "ঈস্, সন্দেশ ওকে খেতে দিচ্ছি কিনা!"

হাতের ব্যথায় টুনু কাতর হ'য়ে কেঁদে উঠল।

ছবি রেগে খোকার পিঠে চড় কষিয়ে দিলে।

ললিত যেমন নীরবে এসেছিল তেমনি নীরবে নিজের ঘরে ফিরে গেল।

* * *

ছবি এসে বললে, "আহা, ওদের টুনুর বড্ডো অসুখ গো!"

ললিত সন্ধ্যার অন্ধকারে বারান্দায় ব'সে ছিল, ব্যগ্রকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলে, "কার, টুনুর?"

"হ্যাঁগো, ওর মা তাই কাঁদছিল, ছেলেটা এমন ভালো জায়গায় এসেও সারল না। দিন-দিন কেমন যেন শুকিয়ে গেল।"

ললিত আবার মুখ ফিরিয়ে নীরবে দূরে অন্ধকার গিরিশ্রেণীর দিকেই বোধ হয় চেয়ে রইল।

ছবি ঘরে যাবার উদ্যোগ করতেই কিন্তু ললিত হঠাৎ আঁচল ধ'রে টেনে বললে, "শোনো!"

"কি?" ব'লে ছবি কাছে এসে দাঁড়াল।

আবার খানিকক্ষণ চুপচাপ।

"কি বলবে তাড়াতাড়ি বলো বাপু, আমার কাজ আছে।"

চেয়ারটা ছবির দিকে ঘুরিয়ে নিয়ে ব'সে ললিত বললে, "খোকা তো বেশ সেরে গেছে, না ছবি?"

"তাই তো মনে হচ্ছে।"

"তা হ'লে তুমি খুব খুশি হয়েছ তো?"

"কি যে কথা বলো তার মাথামুণ্ডু নেই, এ কি আবার জিজ্ঞেস করে নাকি মানুষ! আমি খুশি হয়েছি আর তুমি খুশি হওনি?"

ললিত শুধু বললে, "হুঁ।"

ছবি আবার চ'লে যাচ্ছিল। ফের তার আঁচল ধ'রে টেনে রেখে ললিত বললো, "এই খোকা হয়তো বড়ো হবে, মানুষ হবে, সংসার করবে—কি বলো ছবি?"

গলার স্বরটা ছবির কাছে যেন অস্বাভাবিক মনে হ'ল, বললে, "কি তুমি যা-তা বলছ বলো তো?"

"শোনো না, এই খোকা ভবিষ্যতের আশা; পুত্রপৌত্রাদিক্রমে ও পৃথিবীকে ভোগ করবে, ধন্য করবে, তাই জন্যে আমাদের এই এত আয়োজন, এত ত্যাগ, বুঝেছ?"

"যাও, ন্যাকামি আমার ভালো লাগে না!" ব'লে জোর ক'রে আঁচল ছাড়িয়ে ছবি চ'লে গেল।

ললিত অন্ধকারে ব'সে বোধ হয় সেই ভবিষ্যতের একটু আভাস কল্পনায় দেখবার চেষ্টা করতে লাগল।

ক'দিন বাদে হঠাৎ অর্ধরাতে কান্নার স্বরে ঘুম ভেঙে উঠে ছবি ললিতকে জাগিয়ে বললে, "শুনতে পাচ্ছ?"

ললিত বললে, "হুঁ।"

ছবি ভীত পাংশুমুখে বললে, "কান্নাটা টুনুদের বাড়ি থেকেই আসছে

না?"

"তাই তো মনে হচ্ছে।"

"কাল বড্ডো বাড়াবাড়ি গেছে, বোধ হয় মারা গেল।" ব'লে ছবি চোখ মুছলে।

ললিত বিছানা থেকে নেমে জানলার কাছে গিয়ে দাঁড়াল। তারপর ঘরের মধ্যে পায়চারি ক'রে বেড়াতে-বেড়াতে হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে বিকৃত স্বরে বললে, "টুনু ম'রে গেল আর আমাদের ছেলে বেঁচে উঠল—আশ্চর্য নয় ছবি?"

ছবি একবার শিউরে উঠল মাত্র, উত্তর দিল না। ললিত মাথা নিচু ক'রে পায়চারি ক'রে বেড়াতে-বেড়াতে বলে যেতে লাগল, "আমরা অনেক ত্যাগ করেছি, অনেক সয়েছি, আমাদের ছেলে বাঁচবেই যে ছবি! আমাদের ছেলের মতো আরো কোটি-কোটি ছেলে বাঁচবে, বড়ো হবে, রেষারেষি, মারামারি, কাটাকাটি ক'রে পৃথিবীকে সরগরম ক'রে রাখবে; নইলে আমাদের এত চেষ্টা, এত কষ্টস্বীকার যে বৃথা ছবি!"—স্বর তার অত্যন্ত অস্বাভাবিক। ছবি বিরক্ত হ'য়ে বললে, "তোমার মাথা খারাপ হয়েছে!"

"বোধ হয়!" ব'লে হঠাৎ ছবির হাতটা সজোরে ধ'রে ললিত উগ্রকণ্ঠে বললে, "চেঞ্জে আসবার টাকা কি ক'রে যোগাড় করেছি জানো ছবি? সন্তানকে পৃথিবীতে আনবার দায়িত্বে কি করেছি জানো?"

ছবি সে-মুখের চেহারায় অত্যন্ত ভয় পেয়ে বললে, "কি?"

"চুরি করেছি, জুয়াচুরি করেছি, লুকিয়ে জাহাজের গাঁটরি বিক্রি করেছি। ভবিষ্যতের মানুষের দাবি মেটাতে অন্যায় করিনি নিশ্চয়।"

"তা হ'লে কি হবে!"—ছবির স্বর ভয়ে কাঁপছিল।

ললিত তিক্তমুখে হেসে বললে, "কিছু হবে না, ভয় নেই। সেইটুকু মজা। এ-চুরি কখনো ধরা পড়বে না। চিরকাল ধ'রে শুধু আমাকে খোঁচা দেবে।"

ললিতের আকস্মিক উত্তেজনা কিন্তু যেমন বেগে এসেছিল, তেমনি বেগে শান্ত হ'য়ে এল।

দরজা খুলে বাইরে বারান্দায় সে বেরিয়ে গেল।

এবং শীতল স্নিগ্ধ অন্ধকারে কিছুক্ষণ নীরবে দাঁড়িয়ে থাকার পর তার মনে হ'ল এতখানি ক্ষুব্ধ বিচলিত হবার বুঝি কিছুই কারণ নেই।

বিশাল আকাশ নক্ষত্রের আলোয় যেন রোমাঞ্চিত হ'য়ে উঠেছে। তারই তলায় তার মনে হ'ল, এই মৌন সর্বংসহা ধরিত্রী যে যুগ-যুগান্তর ধ'রে বারবার আশাহত, ব্যর্থ হ'য়েও আজও প্রতীক্ষার ধৈর্য হারায়নি!

কুয়াশায়

হ্যারিসন রোড ও আমহার্স্ট স্ট্রীটের মোড়ে নেমে অত্যন্ত বাঁকাচোরা ক'টি গলিপথ পার হ'য়ে হঠাৎ একটি ছোট্টো রেলিং-ঘেরা জমি কোনোদিন কেউ হয়তো আবিষ্কার করতে পারে—অনেকে করেছেও।

আবিষ্কার কথাটার ব্যবহার এখানে নিরর্থক নয়, কারণ অত্যন্ত কুটিল গলির গোলকধাঁধায় ঘোরবার পর ক্লান্ত পথিকের কাছে ঠিক আবিষ্কারের বিস্ময় নিয়েই এই সামান্য জমিটুকু দেখা দেয়। পুরনো নোনাধরা ইঁটের মান্ধাতার আমলের তৈরি বাড়িগুলি ওই সামান্য রুগ্ন ঘাসের শয্যাটিকে কারাগারের প্রাচীরের মতো ঘিরে আছে। দেখলে কেমন মায়া হয়—ওর ঘাস-গুলির বিবর্ণতায় যেন পৃথিবীর দিগন্তবিস্তৃত প্রান্তরগুলির বিচ্ছেদের কান্না আছে।

মিউনিসিপ্যালিটির বাঁধানো দপ্তরে এ জমিটুকুর বড়ো গোছের একটা নাম নিশ্চয়ই আছে। সে-নাম আমরা জানি না, জানবার প্রয়োজনও নেই। নিকটবর্তী থানার পুরনো খাতায় এই ভূখণ্ডটিকে জড়িয়ে যে-বিবরণ লিপি-বদ্ধ আছে, তাই নিয়ে আমাদের কাহিনী।

পুলিশের লোকেদের সম্বন্ধে যতরকম নিন্দাই বাজারে চলুক না কেন, ভাব-প্রবণতার অপবাদ তাদের নামে এখনও কেউ বোধ হয় দেয়নি। তাদের বিবরণ সাহিত্য হবার কোনো দুরাশা রাখে না। পৃথিবীর সবচেয়ে বিস্ময়কর ঘটনাকে প্রতিদিনের শেয়ার-মার্কেটের রিপোর্টের মতো বর্ণহীন ও নীরস ক'রে লেখবার দুর্লভ বিদ্যা তাদের আয়ত্ত। তবু এই সামান্য রেলিং-ঘেরা তিন কাঠা পরিমাণ জমিটির ভেতরে দশ বছর আগে শীতের এক কুয়াশাচ্ছন্ন প্রভাতে এমন একটি ব্যাপার ঘটেছিল, যা তাদের নির্লজ্জ কলমের নিষ্ঠুর আঁচড় স'য়েও আজও বুঝি রহস্যমণ্ডিত হ'য়ে আছে। চারিদিকের জীর্ণ বাড়িগুলি থেকে ততোধিক জীর্ণ যে-মানুষগুলি আজ সন্ধ্যার ক্ষণিকের অবসরে এই ছোটো জমিটুকুতে দুর্বল নিশ্বাস নিতে আসে, তারা অনেকেই হয়তো সে-কথা আজ ভুলে গেছে কিংবা না ভুললেও স্মৃতির পুরনো পাতা সযত্নে তারা চাপা দিয়েই রাখে—উল্টে দেখবার ইচ্ছা বা অবসর কিছুই তাদের নেই।

তবু এখনও কেউ-কেউ ছেলেমেয়েদের লোহার রডের তৈরী দোলনার কাছে এসে থমকে দাঁড়ায়। দশ বৎসর আগের একটি প্রভাতের কথা ভেবে হয়তো শিউরেও ওঠে।

প্রভাত-সূর্যের আলো সেদিন তখনও ওই জমিটুকুর ঘন ধোঁয়াটে কুয়াশাকে তরল করবার সুযোগ পায়নি। সেই অস্পষ্ট কুয়াশায় দেখা গেছল —ছেলেদের দোলনার ওপরকার দণ্ড থেকে, কণ্ঠে মলিন দোরোখা জড়ানো একটি নারীর মৃতদেহ ঝুলছে। মেয়েটি কিশোরী নয় ; কিন্তু পূর্ণযৌবনাও তাকে বুঝি বলা চলে না। পরনে তার বিধবার মলিন বেশ : কিন্তু গলায় একটি সোনার হার। তা থেকে ও তার মুখ দেখে ভদ্র গৃহস্থ-পরিবারের সঙ্গে

তার সম্পর্ক অনুমান করা কঠিন নয়। মাথার দীর্ঘ রুক্ষ চুলের রাশ তার মুখ ছেয়ে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছিল; কিন্তু তারই ভিতর দিয়ে তার ঈষৎ-বিকৃত মুখ যারা দেখেছে, তারা কখনও তা ভুলতে পারবে ব'লে মনে হয় না। সে-মুখের অসীম ক্লান্তি ও অসহায় কাতরতা মৃত্যুও যেন মুছে দিতে পারেনি।

খবর পেয়ে পুলিশের লোকের আসতে দেরি হয়নি। এসমস্ত ব্যাপারে যা দস্তুর তা করতেও তারা ত্রুটি করেনি; তবু এই মৃত্যু-রহস্যের কোনো কিনারাই শেষ পর্যন্ত হ'ল না। যে-কুয়াশার মাঝে মেয়েটির জীবনের পরি-সমাপ্তি ঘটেছিল, তারই মতো দুর্ভেদ্য রহস্য তার সমস্ত অতীত জীবনেতিহাস আচ্ছন্ন ক'রে রইল। এই মৃত্যুর লজ্জা ও গ্লানি গায়ে পেতে নেবার জন্য কোনো আত্মীয়স্বজন তার থাকলেও, এগিয়ে এল না।

নামহীনা, গোত্রহীনা, পৃথিবীর অপরিচিতা হতভাগিনী নারীদের এক প্রতীকই বুঝি সেদিন নিশান্তের অন্ধকারে এই রেলিং-ঘেরা জমিটুকুর নির্জনতায় উদ্বন্ধনে সকল জ্বালা জুড়িয়েছে, ভাবতে পারতাম—

কিন্তু তা সত্য নয়। এই শোচনীয় সমাপ্তির কোথাও একটা আরম্ভও ছিল।

এই নিদারুণ কাহিনীর গোড়াকার পরিচ্ছেদগুলি জানতে হ'লে তেরো বছর আগেকার চকমেলানো যে বিশাল বাড়িটিতে প্রবেশ করতে হবে তার দেউড়ির দারোয়ান থেকে জীর্ণ দেয়ালের প্রত্যেক ফাটলে অস্তমিত গৌরবের চিহ্ন এখনও সুস্পষ্ট।

বৃদ্ধা রূপসীর মতো আজও তার গায়ে অতীত গৌরবের দিনের অলং-কারের দাগ মেলায়নি: তার লোল চর্মের মালিন্যকে ব্যঙ্গ ক'রে আজও সে-চিহ্নগুলি মানুষের চোখকে ব্যথিত করে।

জীর্ণ শতচ্ছিন্ন মলিন উর্দি প'রে আজও পুরনো দিনের বৃদ্ধ দারোয়ান দরজায় পাহারা দেবার ছলে ব'সে-ব'সে ঝিমোয়। পাহারা দেবার আর তার কিছু অবশ্য নেই। বড়ো রাস্তার ওপর বাড়ির আসল দেউড়ির দিক পূর্বতন উত্তরাধিকারী দেনার দায়ে অনেকদিনই বেচে দিয়েছেন। গলির ওপর আগের আমলের খিড়কি-দরজাই এখন একটু অদল-বদল ক'রে দেউড়িতে পরিণত হয়েছে। সে-দেউড়ি পার হ'য়ে সে-কালের বাঁধানো আঙিনা অতিক্রম ক'রে যে-মহলে পৌঁছনো যায়, চারিদিক থেকে সংকুচিত হ'য়ে এলেও তার আয়তন বড়ো কম নয়। মৌচাকের মতো সে-মহলের কুঠুরির পর কুঠুরি এখনও গুনে ওঠা ভার। কিন্তু পাহারা দেবার সেখানে কিছু নেই। অধঃপতিত প্রাচীন জমিদার-বংশের দরিদ্র উত্তরাধিকারীরা সেই অসংখ্য কুঠুরির পর কুঠুরিতে ভিড় ক'রে বাস করে। —কারুর সঙ্গে কারুর তাদের বিশেষ সম্পর্ক নেই। অতীত দিনের স্মৃতি ছাড়া সযত্নে রক্ষা করবার মতো মূল্যবান জিনিসেরও তাদের একান্ত অভাব।

তবু চিরদিনের রেওয়াজ-মতো বৃদ্ধ দারোয়ান দরজায় ব'সে থাকে এবং তারই পাশের কুঠুরিতে নায়েব, গোমস্তা, সরকার প্রভৃতির ব্যস্ত কলরবের পরিবর্তে সে-যুগের শেষ চিহ্ন এ-পরিবারের বিশ্বাসী সরকার মহাশয়ের তামাক খাবার মৃদু শব্দ শোনা যায়। যৎসামান্য যে-জমিদারি এখনও অবশিষ্ট

আছে তিনিই একাকী তার তত্ত্বাবধান করেন ও বর্তমানের অসংখ্য উত্তরাধিকারীদের মধ্যে তারই যৎসামান্য আয় বণ্টন করবার বন্দোবস্তও তাঁকে করতে হয়। অন্দরমহলের হেঁশেল ও বাহিরের এই একক সরকার মহাশয়ের দপ্তর —এই বৃহৎ বিচ্ছিন্ন পরিবারের একান্নবর্তিতার এই দুটি চিহ্নই এখনও বর্তমান।

সরকারের দপ্তর একান্ত সংকুচিত হ'য়ে এলেও হেঁশেল প্রকাণ্ড। পূর্বতন কর্তার উইলের নির্দেশমতে জমিদারির আয়েই তা চলে। বিরাট মহলের সমস্ত কুঠুরির অধিবাসীদের দু-বেলা এখন শুধু তার সঙ্গে আহারের সম্পর্কটুকু আছে। কিন্তু সে-সম্পর্কের গুরুত্ব বড়ো কম নয়। তিন-তিনটে বড়ো উনুন দিবারাত্র সেখানে নিবতে পায় না। মোক্ষদা ঠাকরুন দাঁতে গুল দিতে-দিতে চরকির মতো রাতদিন ঘুরে বেড়ান।

"হ্যাঁগা রামের মা, এই কি চাল ধোবার ছিরি! একবার কলে বসিয়েই তুলে এনেছ বুঝি!"

তারপর আর এক পাক ঘুরে এসে বলেন—"নাঃ, জাতজন্ম তুই আর রাখতে দিবি না বিন্দী, ওটা যে আঁশ-বঁটি লো! নিরিমিষ্যি হেঁশেলের কুটনোগুলো কুটলি তো ওতে? তোর আক্কেল কবে হবে বলতে পারিস?"

পিছন দিক ঘুরে বলেন—"তবেই হয়েছে মা! তোমার মতো নিড়বিড়ে লোককে কুটনো কুটতে দিলেই এ-বাড়ির লোক খেতে পেয়েছে, আজ সন্ধের আগে রান্না নামবে না!"

মেয়েটি লজ্জিত হ'য়ে আরও দ্রুত হাত চালাবার চেষ্টা করে। মোক্ষদা ঠাকরুন আবার বলেন, "তোমার নামটা ভুলে গেলাম ছাই!"

মেয়েটি মাথা নিচু ক'রে মৃদু কণ্ঠে বলে "সরমা।"

"হ্যাঁ হ্যাঁ সরমা—আমার ভাগ্নে-বউয়ের নামও যে ওই! ঠিক তোমারই মতো নামে চেহারায় হুবহু কি এক হ'তে হয় মা! রূপে গুণে কি বলব মা, একেবারে লক্ষ্মীঠাকরুনটি ছিল!"

মুখে এক খামচা গুল দিয়ে তিনি আবার বলেন, "দিদির পোড়া কপালে অমন গুণের বউ বাঁচবে কেন! সোয়ামীর কোলে মাথা রেখে ছেলে বুকে ক'রে লবডঙ্কা দেখিয়ে চ'লে গেল!" তারপর হঠাৎ সংকুচিত মেয়েটির সিন্দুরবিহীন সীমন্তরেখার দিকে চোখ পড়াতেই বোধ হয় কথাটা পাল্টে নিয়ে তিনি বলেন, "অত সূক্ষ্ম কাজে চলবে না মা! বলতে নেই, তবে এ রাবণের গুষ্টির রান্না মোটামুটি না সারলে কি হয়! হাত চালিয়ে নাও, হাত চালিয়ে নাও; ও খোলা-টোলা একটু-আধটু থাকলে আসবে যাবে না।"

পরক্ষণেই মোক্ষদা ঠাকরুনকে নূতন দিকের তত্ত্বাবধানে যেতে হয়। সরমা যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি কাজ সারবার চেষ্টা করে; কিন্তু বেশিক্ষণ তার নির্বিঘ্নে কাজ করার অবসর মেলে না।

"ও কি কুটনো হচ্ছে, না গরুর জাবনা কাটছ বাছা? দুমদাম ক'রে যা হোক করলেই তো হয় না। গরু-বাছুর নয়, মানুষে খাবে!"

সরমা চকিত ভীত হ'য়ে চোখ তুলে তাকায় এবং চিনতেও তার দেরি হয় না। গলায় রুদ্রাক্ষের মালা, গেরুয়া কাপড় পরা এই বিশালকায় স্ত্রীলোকটির সাথে ঘনিষ্ঠ পরিচয় না হ'লেও এই কয়দিনেই সে তাঁকে ভয় করতে

শিখেছে। ক্ষ্যান্ত পিসি ব'লে তিনি সাধারণত পরিচিত, কিন্তু হেঁশেলের মেয়েরা গোপনে বলে, "সেপাই" এবং বোধ হয় অন্যায় করে না। স্ত্রীলোকটির চেহারায়, ব্যবহারে, কথায়-বার্তায় এমন একটি পরুষ জবরদস্ত ভাব আছে যা দেখলে স্বভাবতই ভয় হয়।

ক্ষ্যান্ত পিসি অত্যন্ত কড়কণ্ঠে এবার বলেন, "হাঁ ক'রে তাকিয়ে আছ কি? ইংরিজি ফার্সি বলিনি। বাংলা কথাও বোঝো না!"

সরমা থতমত খেয়ে, তাড়াতাড়ি অথচ পরিপাটি ক'রে কুটনো কোটবার অসম্ভব চেষ্টায় মনোনিবেশ করে। কিন্তু রাশীকৃত তরকারির দিকে চেয়ে তার ভয় হয়। সত্যই এক বেলার মধ্যে তা সেরে ফেলবার কোনো সম্ভাবনা সে দেখতে পায় না।

ক্ষ্যান্ত পিসির তাড়াতাড়ি সেখানে থেকে নড়বারও কোনো লক্ষণ নেই। অনেকক্ষণ ধ'রে ভ্রূকুঞ্চিত ক'রে তাকে বিশেষভাবে নিরীক্ষণ ক'রে হঠাৎ তিনি বলেন, "তুমি আমাদের ফট্‌কের বউ না গা?"

কথাটা বুঝতে না পেরে সরমা অবাক হ'য়ে আবার মুখ তুলে চায়। তার মৃত স্বামীর নাম সে জানে এবং তা 'ফট্‌কে' নয়।

ক্ষ্যান্ত পিসি তার বিস্ময় দেখে অত্যন্ত বিরক্ত হ'য়ে বলেন, "আকাশ থেকে পড়লে কেন, বাছা! চোখের মাথা তো খাইনি, যে একবার দেখলে চিনতে পারব না! সেই তো ধুলো পায়ে ফিরে এসে ফট্‌কে আর মাথা তুললে না, এক রাত্রে কাবার। তারই বউ না তুমি?"

এবার সরমা মাথা নিচু ক'রে থাকে। এ-বাড়িতে তারই মতো আরও এক হতভাগিনীর জীবনে ঠিক একই ঘটনা ঘটেছে এ-কথা বিশ্বাসযোগ্য নয়। বিয়ে যখন তার হয়েছে, তখন সে তেরো বছরের বালিকা মাত্র এবং তখনকার দুদিনের পরিচয়ে স্বামীর সকল সংবাদ তার জানবার কথাও নয়। তবু এ-বাড়িতে তার স্বামীর ডাকনাম যে ওই ছিল, এখন আর তার তা বুঝতে বাকি থাকে না।

ক্ষ্যান্ত পিসি খানিক চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে থেকে অত্যন্ত নিষ্ঠুরভাবে বলেন—"কি কপাল ক'রেই এসেছিলে বাছা, ফট্‌কের মা'র সংসারটা ছারখার হ'য়ে গেল!"

তার ভাগ্য সম্বন্ধে এই উপাদেয় মন্তব্যগুলি সরমাকে আর কতক্ষণ সহ্য করতে হ'ত বলা যায় না, কিন্তু মোক্ষদা ঠাকরুন হঠাৎ ফিরে আসায় সে রেহাই পায়।

"তুই আবার এখানে ফপরদালালি করতে এলি কেন বল তো ক্ষ্যান্ত?" ব'লে মোক্ষদা ঠাকরুন এসে দাঁড়ান। তারপর সরমাকে দেখিয়ে বলেন—"একে নিড়বিড়ে মানুষ, তার ওপর তোর বক্তিমে শুনতে হ'লে এ-বেলায় আর ওকে কুটনো শেষ করতে হবে না।"

বাড়ির মধ্যে এই এক মোক্ষদা ঠাকরুনের সামনেই ক্ষ্যান্ত পিসির সব আস্ফালন শান্ত হ'য়ে যায়। ভেতরে-ভেতরে মোক্ষদা ঠাকরুনের কর্তৃত্বের হিংসা করলেও তার কাছে ক্ষ্যান্ত পিসি, কেন বলা যায় না—একেবারে কেঁচো হ'য়ে থাকেন।

এক গাল হেসে আপ্যায়িত করবার চেষ্টা ক'রে ক্ষ্যান্ত পিসি বলেন,

"ফপরদালালি করব কেন দিদি! চিনি-চিনি মনে হ'ল, তাই শুধোচ্ছিলুম—তুমি কি আমাদের ফটকের বউ? সেই এতটুকু বিয়ের কনেটি দেখেছিলুম, আর তো তারপর আসেনি!"

অত্যন্ত চ'টে উঠে মোক্ষদা ঠাকরুন বলেন—"তোর আক্কেল অমনিই বটে! শুধোবার আর কথা পেলিনে!"

অপ্রস্তুত হ'য়ে ক্ষ্যান্ত পিসির স'রে পড়তে দেরি হয় না। "একা তোমার কর্ম নয় মা"—ব'লে আরেকটা বঁটি টেনে নিয়ে মোক্ষদা ঠাকরুন সরমার সঙ্গে কুটনো কুটতে ব'সে যান। সরমা হাঁফ ছেড়ে বাঁচে।

ছেলেবেলা মা'র সঙ্গে তীর্থযাত্রায় গিয়ে সরমাকে একবার এক ধর্মশালায় থাকতে হয়েছিল। ঘরে-ঘরে অগণন যাত্রীর ভিড়। একই বাড়ির ভেতর পাশা-পাশি তাদের ছোটো-ছোটো সংসার দু-দিনের জন্য পাতা হয়েছে—অথচ কারুর সঙ্গে কারুর সম্বন্ধ নেই। বাইরে থেকে দেখলে মনে হয়, যেন কোনো বৃহৎ পরিবারের লোকে বাড়ি গমগম করছে অথচ ভেতরে একান্ত অপরিচিত, পরস্পরের প্রতি নিতান্ত উদাসীন মানুষের দল!

এ-বাড়িতে ক'দিন বাস ক'রে সরমার অস্পষ্টভাবে সেই ধর্মশালার কথাই মনে পড়ে বারবার। এ যেন চিরন্তন একটা ধর্মশালা।

ভোরের আলো দেখা দিতে না দিতে এ-বাড়ির হট্টগোল শুরু হয়। ঘরে-ঘরে বিভিন্ন সংসারের বিভিন্ন জীবনযাত্রার কলরব, উঠনে পরিচিত অপরিচিত বালক বৃদ্ধ বৃদ্ধার হাট।

হেঁশেলে তো যজ্ঞবাড়ির মতো ব্যস্ততা লেগেই আছে। দুপুরের খাওয়ার পাট চুকতে না চুকতেই রাত্রের আহারের আয়োজন শুরু হ'য়ে যায়। সমস্ত সংসার-যাত্রাটা বিরাট কলের চাকার মতো অমোঘভাবে চলে, অবশ্য অত্যন্ত পুরনো ভাঙা তৈলবিহীন কলের চাকার মতো এবং তারই কোথায় একটি ছোটো অংশের মতো আটকে গিয়ে সরমা আর সারাদিন নিশ্বাস ফেলবার অবসর পায় না।

গভীর রাত্রে সমস্ত কাজ শেষ ক'রে মোক্ষদা ঠাকরুনের সংগে নীরবে ছোটো একটি কুঠুরিতে যখন মলিন একটি শয্যায় সে শুতে যায়, তখন ক্লান্তিতে তার চোখের পাতা জড়িয়ে এসেছে। নিজের মনের সঙ্গে দু দণ্ড মুখোমুখি হ'য়ে বসবার তার আর উৎসাহ বা অবসর কিছুই নেই।

তবু সরমার দিন ভালোই কাটে, অন্তত দুঃখ করবার কিছু আছে, এ-কথা কোনোদিন তার মনে হয়নি।

বিধবা হবার পর ক'বছর তার বাপের বাড়িতে কেটেছে। বাপ-মা মারা যাবার পর ভায়েরা গলগ্রহ ব'লেই তাকে যে শ্বশুরবাড়িতে নামিয়ে দিয়ে গেছে, এ-কথা সে জানে এবং তার জন্যেও তার কোনো ক্ষোভ নেই।

সিঁথির সিন্দুর মুছলে বধূ ও কন্যারা হেঁশেলে আশ্রয় পায়, এই এ-বাড়ির সনাতন নিয়ম। সে-নিয়ম অনুসারেই শ্বশুরবাড়িতে পা দেবা মাত্র রন্ধনশালার বিরাট চক্রে সে জড়িয়ে গেছে। এবং পরিশ্রম এখানে যতই থাক, সে-চক্রের সঙ্গে আবর্তনে দিন ও রাত্রি যে তার নিশ্চিতভাবে পার হ'য়ে যায়, এইটাই তার পরম শান্তি।

হেঁশেলের বাঁধা জীবনযাত্রাতেও বৈচিত্র্যের একেবারে অভাব আছে বলা যায় না।

দোতলার পূর্বদিকের কোণের ঘরের বউটি ভারি মিশুক। সকাল হ'তে না হ'তে একটা বাটিতে খানিকটা বার্লি গুলে নিয়ে এসে হয়তো বলে, "দাও তো ভাই উনুনে একটু তাতিয়ে—ছেলেটার রাত থেকে জ্বর।"

সরমা তাড়াতাড়ি ব্যর্লি ফুটিয়ে এনে দেয়। বউটি যাবার সময়ে বলে, "দুপুরে পারো তো একবার যেও না ভাই, একটু কথা আছে!" সরমা ঘাড় নেড়ে জানায়—"যাবো।"

বউটি যেতে না যেতে পাশ থেকে কটুকণ্ঠে ব্যঙ্গ ক'রে হেঁশেলের আর একটি মেয়ে বলে, "একটু যেও না ভাই, কথা আছে! কথা মানে তো ছেলের কাঁথাগুলো সেলাই করিয়ে নেওয়া! খুব ধড়িবাজ বউ যা হোক! তোকেও যেমন হাবা মেয়ে পেয়েছে, তাই নাকে দড়ি দিয়ে খাটিয়ে নেয়!"

কথাগুলো যে একেবারে মিথ্যা নয় তা সরমাও কিছু-কিছু বোঝে ; তবু সলজ্জভাবে একটু হেসে বলে, "না, না, নাকে দড়ি দিয়ে খাটিয়ে নেবে কেন? একলা মানুষ ছেলেপুলে নিয়ে সামলাতে পারে না, তাই..."

সরমাকে কথাগুলো আর শেষ করতে হয় না। নলিনী খরখর ক'রে ব'লে ওঠে, "আমার ঘাট হয়েছে গো ঘাট হয়েছে, আর তোমায় কিছু বলব না। তোমার এত দয়া, মায়া, গতর থাকে করগে যাও না। আমার বলতে যাওয়াই ঝকমারি!" তারপর রাগে গরগর করতে-করতে নলিনী চ'লে যায়।

সরমা মনে-মনে একটু হেসে চুপ ক'রে থাকে। নলিনী মেয়েটিকে এই ক'দিনে সে বেশ ভালো ক'রেই চিনেছে। বয়স নলিনীর তার চেয়ে বিশেষ বেশি নয়, কিন্তু দেহের অস্বাভাবিক শীর্ণতার জন্য তাকে অনেক বড়ো দেখায়, তার শুকনো শীর্ণ মুখে বিরক্তি যেন লেগেই আছে। প্রসন্নমুখে তাকে কখনও কথা বলতে এ পর্যন্ত সে শোনেনি। তবু এই উগ্র মেয়েটির কঠিনতার অন্তরালে কোথায় যেন গোপন স্নেহের ফল্গুধারা প্রকাশের সুযোগের অভাবে রুদ্ধ হ'য়ে আছে ব'লে সরমার মনে হয়।

প্রথম দিন যেভাবে তার সঙ্গে আলাপ হয়েছিল, সে-কথা মনে করলে এখনও সরমার হাসি পায়। সবে সেদিন সে এ-বাড়িতে এসেছে। মোক্ষদা ঠাকরুনের জিম্মায় সরকার মশাই তাকে অন্দরমহলে এসে রেখে গেছেন। সারাদিন অপরিচিত লোকের মাঝে মোক্ষদা ঠাকরুনের ফরমাশে ছোটোখাটো হেঁশেলের কাজ সে করেছে ; কিন্তু আলাপ কারুর সঙ্গে তার বিশেষ হয়নি। মোক্ষদা ঠাকরুনের ভোলা মন। রাত্রে সকলের খাওয়া-দাওয়ার পর সরমার শোবার জায়গার ব্যবস্থা যে করা দরকার, এ-কথা তাঁর বোধ হয় মনেই ছিল না। লজ্জায় সরমা সে-কথা কাউকে জিজ্ঞাসা করতেও পারেনি। একে-একে সবাই হেঁশেল ছেড়ে চ'লে যাওয়া সত্ত্বেও সে হতাশভাবে রান্নাঘরের একধারে চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে ছিল।

হেঁশেলে চাবি দেবার ভার নলিনীর ওপর। দরজায় তালা লাগাতে গিয়ে হঠাৎ তাকে দেখতে পেয়ে অবাক হ'য়ে সে রুক্ষকণ্ঠে বললে, "ঢং ক'রে এখানে দাঁড়িয়ে আছ কেন বাপু, রাত একটা বাজতে যায়, শুতে যাও না!"

দুঃখে হতাশায় তখন সরমার কণ্ঠ রুদ্ধ হ'য়ে এসেছে। অস্ফুট স্বরে

সে শুধু বললে, "কোথায় শোব?"

অত্যন্ত কটু কণ্ঠে "আমার মাথায়!" ব'লে নলিনী চ'লে যাচ্ছিল, কিন্তু একটু পরে কি ভেবে ফিরে এসে সে বললে, "তুমি আজ নতুন এসেছ, না?"

এই অসহায় অবস্থায় নলিনীর কণ্ঠস্বরের রুক্ষতায় সরমার চোখে তখন জল এসেছে। এ-কথার সে উত্তর পর্যন্ত দিতে পারলে না।

কিন্তু নলিনী তখন উত্তরের প্রতীক্ষা না ক'রে একেবারে মোক্ষদা ঠাকরুনের ঘরে গিয়ে হাজির হয়েছে। নলিনীর তীক্ষ্ন কণ্ঠ সরমা সেখান থেকেই শুনতে পাচ্ছিল—

"বুড়ো হ'য়ে তোমার ভীমরতি হয়েছে, না! কিরকম আক্কেলটা তোমার বলো দেখি? নিজে তো বেশ আয়েশ ক'রে নাক ডাকিয়ে ঘুমচ্ছ, আর একটা মেয়ে যে চোদ্দ পো অধর্ম ক'রে তোমাদের আশ্রয়ে এসেছে তার শোবার কি ব্যবস্থা করেছ শুনি?"

মোক্ষদা ঠাকরুন অত্যন্ত লজ্জিত হ'য়ে তাড়াতাড়ি ঘুম থেকে উঠে ব্যস্ত-সমস্ত হ'য়ে এসে বলেছিলেন—"ছি, ছি, বড্ডো ভুল হ'য়ে গেছে মা! এক্কেবারে হুঁশ ছিল না। এসো মা এসো, এই আমার ঘরেই তোমার শোবার ব্যবস্থা করেছি।"

নলিনীর মুখ কিন্তু তবু থামেনি। মোক্ষদা ঠাকরুনকে যতদূর সম্ভব বাক্যবাণে জর্জরিত ক'রে শেষে সরমার দিকে ফিরে সে বলেছিল, "শোবে তো বিছানাপত্র কই?"

সরমা একটি তোরংগ ছাড়া আর কিছুই আনেনি; সেটা বৃহৎ রান্নাঘরের রকের এক কোণে তখনও প'ড়ে ছিল। তারই দিকে চেয়ে কাতরভাবে সরমা বলেছিল—"তা তো কিছু আনিনি।"

"না, তা আনবে কেন? এখানে তোমার জন্যে জোড়পালঙে গদি পাতা রয়েছে যে! এখন শোওগে যাও খালি মেঝেয়।"

মোক্ষদা ঠাকরুন সরমার মুখের অবস্থা দেখে তাড়াতাড়ি বলেছিলেন—"আহা-হা, না এনেছে, না এনেছে; তা ব'লে খালি মেঝেয় শুতে যাবে কেন? চলো মা চলো, আমার বিছানাপত্তর থেকে দু-জনের কোনোরকমে হ'য়ে যাবে এখন।"

"তা খুব হবে এখন! তোমার তো আছে একটা ছেঁড়া পচা কাঁথা, তার দু-পিঠে দু-জন শুয়ো!" কটু কণ্ঠে ব্যঙ্গ ক'রে নলিনী চ'লে গিয়েছিল।

কিন্তু খানিক বাদেই মোক্ষদা ঠাকরুনের ঘরে ঢুকে সজোরে একটা চাদর সমেত তোশক ও বালিশ মেঝেয় আছড়ে ফেলে নলিনী বলেছিল—"নাও গো নাও, এখন শ্রীঅঙ্গ ছড়াও। রাত দুপুরে যত হ্যাঙ্গাম।"

মোক্ষদা ঠাকরুন তখন নিজের যৎসামান্য শয্যাদ্রব্য সরমাকে ভাগ ক'রে দেবার ব্যবস্থা করছিলেন। নলিনীর ব্যবহারে অবাক হ'য়ে বললেন, "তোশক বালিশ সব দিয়ে গেলি, তা তুই শুবি কিসে লা?"

"থাক থাক, অত আদিখ্যেতায় দরকার নেই। আমার ভাবনা ভাবতে তো আমি কাউকে বলিনি।"—ব'লে সজোরে দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে নলিনী চ'লে গিয়েছিল।

মোক্ষদা ঠাকরুন হেসে সরমাকে বলেছিলেন, "কিছু মনে কোরো না মা;

যেটুকু ধার ওর মুখে—নইলে...”

নইলে যে কি মোক্ষদা ঠাকরুন ব'লে দেবার আগেই সরমা তখন বুঝে নিয়েছে।

তারপরও নলিনী কোনোদিন প্রসন্নমুখে তার সঙ্গে আলাপ করেছে ব'লে সরমা মনে করতে পারে না ; তবু কেমন ক'রে কোথা দিয়ে দু-জনে ঘনিষ্ঠ হ'য়ে উঠেছে। নলিনী দাঁত খিঁচিয়ে ছাড়া কথা বলে না, কিন্তু সরমার সঙ্গও ছাড়ে না।

আজও সে খানিক বাদে ঘুরে এসে আপন মনেই গজগজ করতে থাকে—“টান তো কত! ছেলের কাঁথা সেলাই করবার বেলা—‘একটা কথা আছে ভাই!’ ঘরদোরগুলো সাফ করিয়ে নেবার বেলা—‘তুই ভাই ঘর গুছোতে বড়ো ভালো পারিস।’ কই, বাপের বাড়ি থেকে তত্ত্ব আসার দিন তো ভুলেও একবার ডাকল না!”

সরমা এবার হেসে ফেলে বলে, “তুমি এবার হাসালে নলিনদি! বাপের তত্ত্ব এলে তা আমায় ডাকবে কেন?”

“তা বৈকি! বাঁদীগিরি করতে ডাকে তো তা হ'লেই হ'ল।”

সরমা নলিনীকে আর কিছু বলতে যাওয়া বৃথা বুঝে চুপ ক'রে থাকে। নলিনী নিজের মনেই একসময়ে ব'কে-ব'কে শান্ত হবে, সে জানে।

* * *

বছরের পর বছর ঘুরে যায়।

বেশির ভাগ একঘেয়েমি ও কিছু বৈচিত্র্য নিয়ে সরমার জীবন এমনি মসৃণভাবেই মনে হয় কেটে যাবে।

সে-জীবনকে কক্ষচ্যুত করবার মতো এমন কি-ই বা ঘটতে পারে! চারিধারের চিরন্তন পান্থশালায় যে-জীবনযাত্রা চলে, তার সঙ্গে বিশেষ কিছু সংস্পর্শ সরমার নেই। তার নিজের জীবন তো দিনের পর দিন প্রায় একই ঘটনাসমষ্টির পুনরাবৃত্তি।

বড়ো জোর একদিন মোক্ষদা ঠাকরুন ডেকে বলেন, “তরকারি-টরকারিগুলো গুছিয়ে এক থালা ভাত বেড়ে নিয়ে আয় তো মা আমাদের ঘরে। আমি ততক্ষণ জল ছড়া দিয়ে আসনটা পেতে ফেলি গে।”

রান্নাঘরের পাশের ঘরেই সাধারণত সকলের খাবার জায়গা হয়। আজ এই বিশেষ বন্দোবস্তে একটু অবাক হ'লেও কারণ জিজ্ঞেস করা সরমা প্রয়োজন মনে করে না।

কিন্তু ভাতের থালা নিয়ে ঘরে ঢুকেই অপরিচিত পুরুষ দেখে সে দরজার কাছে লজ্জায় জড়সড় হ'য়ে দাঁড়িয়ে পড়ে। দুটি হাতই তার ভাতের থালা ও ব্যঞ্জনের বাটি ধরতে গিয়ে জোড়া হ'য়ে আছে। মাথার ঘোমটাটা পর্যন্ত ভালো ক'রে তুলে দেবার উপায় নেই।

মোক্ষদা ঠাকরুন তাড়াতাড়ি বলেন, “ওমা, অমন ক'রে আবার থমকে দাঁড়ালি কেন? আরে ও যে নরু, আমার ভাইপো! ওকে আর লজ্জা করতে হবে না!”

তাঁর ভাইপো ব'লে লজ্জা করবার কোনো কারণ কেন যে নেই, তা বুঝতে না পারলেও ভাতের থালা হাতে ক'রে দাঁড়িয়ে থাকাটা সরমার বেশি অশোভন

মনে হয়। অত্যন্ত কুণ্ঠিতভাবে আসনের সামনে থালাটা সে নামিয়ে দিয়েই তাড়াতাড়ি ঘরের বার হ'য়ে যায়।

মোক্ষদা ঠাকরুন পেছন থেকে হেঁকে বলেন, "একটু নুন হাতে ক'রে আনিস মা? ওর আবার পাতে নুন না হ'লে চলে না।"

মাথার ঘোমটা ভালো ক'রে টেনে এবার সরমা নুন দিতে আসে। কিন্তু নুন দিতে গিয়ে হঠাৎ হাসির শব্দে সে চমকে ওঠে।

"তোমরা কি আমায় নোনা ইলিশ ক'রে তুলতে চাও পিসিমা?"

মোক্ষদা ঠাকরুন তাড়াতাড়ি সামনে এসে হেসে বলেন, "দেখেছ বেটির বুদ্ধি! নুন দিতে বলেছি ব'লে কি সেরখানেক নুন দিতে হয় পাগলি! অত নুন মানুষে খেতে পারে?"

সরমা লজ্জায় জড়সড় হ'য়ে দাঁড়িয়ে থাকে। মোক্ষদা ঠাকরুনের ভাইপো নরু অর্থাৎ নরেন বলে—"এ-বাটিটা তুলে নিয়ে যেতে বলো পিসিমা— দরকার হবে না।"

পিসিমা ব্যস্ত হ'য়ে ওঠেন—"সে কি রে! ও যে মাছের তরকারি। তোর ওসব বাই আছে ব'লে পুকুরের জ্যান্ত মাছ কিনে আনিয়ে রেঁধেছি যে!"

"জ্যান্ত মরা কোনো মাছই যে খাই না আর।"

মোক্ষদা ঠাকরুন অত্যন্ত ক্ষুণ্ণ হ'য়ে অনুযোগ করতে শুরু করেন—"এসব বিদ্‌ঘুটে বুদ্ধি আবার কবে থেকে হয়েছে? এই বয়সে মাছ ছেড়ে দিলি কোন দুঃখে..."

নরেন হেসে বলে, "মাছ খাই না ব'লে হা-হুতাশ না ক'রে নিরামিষ তরকারি আর একটু বেশি ক'রে আনতে বলো, পিসিমা। পাড়াগেঁয়ে মানুষ— লজ্জার মাথা খেয়েও সহজে পেট ভরে না।"

"কথার ছিরি দেখেছ!" ব'লে হেসে মোক্ষদা ঠাকরুন সরমাকে তরকারি আনতে ইঙ্গিত করেন।

নরেন একটু গলা চড়িয়ে বলে—"তা ব'লে নুনের মাপে যেন তরকারি না আসে।"

তরকারি দেবার জন্য ঘরে ঢুকে সরমা শুনতে পায় মোক্ষদা ঠাকরুন বলছেন—"সেই কথাই তো ভাবি বাবা; অমন লক্ষ্মী পিরতিমের মতো মেয়ের এমন কপাল হয়! পোড়ারমুখো বিধেতার মাথায় ঝাড়ু।"

তাকে দেখেই মোক্ষদা ঠাকরুন চুপ ক'রে যান। তার কথা কি সূত্রে উঠেছে বুঝতে না পারলেও, সরমা ঘোমটার ভেতর লজ্জায় লাল হ'য়ে ওঠে। তরকারির বাটিটা নামাতে গিয়ে কাত হয়; খানিকটা তরকারি মেঝেতে প'ড়েও যায়। কিন্তু সরমা সেখানে দাঁড়ায় না।

অত্যন্ত সামান্য একটি ঘটনা। কোথাও তা দাগ রেখে যায় না, রেখে যাবার কথাও নয়। নিত্য নিয়মিত হেঁশেলের জীবন সমানভাবেই চলে।

কিন্তু ঐ সামান্য ঘটনারই দেখা যায় পুনরাবৃত্তি ঘটেছে। ক্রমশ পুনরাবৃত্তির চেয়েও বেশি কিছু ঘটে।

সরমা বলে, "আলাদা একটা নিরামিষ তরকারি করতে দেব মাসিমা?"

মোক্ষদা ঠাকরুন গুল নিতে গিয়ে থতমত খেয়ে বলেন, "ওমা তাই তো!

ভাগ্যিস মনে ক'রে দিয়েছিস। বুড়ো হ'য়ে মাথার কি আর ঠিক আছে? নরু যে মাছ খায় না, তা আর খেয়াল নেই।"

নরেনকে আজকাল প্রায়ই কলকাতা যাতায়াত করতে হয়। এক-একদিন সে অনুযোগ ক'রে বলে, "তোমাদের ওপর বড়ো বেশি জুলুম করছি, না পিসিমা? আদর ফুরোবার আগে একটা নোটিশ দিও, মানে-মানে স'রে পড়ব।"

মোক্ষদা ঠাকরুন সরমাকে শুনিয়ে বলেন, "কথার ছিরি দেখছিস সরো। তিন নয়, পাঁচ নয়, আমার ভায়ের এক বেটা—আমার সঙ্গে উনি কুটুম্বিতা করছেন।"

সরমার আগের সংকোচ অনেকটা কেটেছে। নরেনের সামনে ঘোমটা না খুললেও মৃদুস্বরে দু-একটা কথা আজকাল বলে।

"এখানকার রান্নায় বোধ হয় অরুচি হয়েছে মাসিমা!"

নরেন কিছু বলবার আগেই মোক্ষদা ঠাকরুন ব'লে ওঠেন, "সে-কথা আর বলতে হয় না! যার রান্না খেয়ে ও মানুষ, সে যে কত বড়ো রাঁধিয়ে তা যদি না জানতুম। দাদা তাই ঠাট্টা ক'রে বলত না—'আমাদের বাড়ি জ্বরজ্বারি কারো কখনও হবে না মোক্ষদা, তোর বউদি যা রাঁধে সব পাঁচন!"

নরেন হেসে বলে, "ভাজের রান্না ননদের কোনো কালে ভালো লাগে না পিসিমা। কি ভাগ্যি দ্রৌপদীর ননদ ছিল না, নইলে মহাভারতে তাঁর রান্নার সুখ্যাতি আর ব্যাসদেবকে লিখতে হ'ত না।"

সকলে হেসে ওঠে। সরমা মুখে কাপড় চাপা দিয়ে বেরিয়ে যায়।

দুপুরবেলা মোক্ষদা ঠাকরুন সরমাকে ঘরে ডেকে নিয়ে বলেন, "বেটার কাণ্ড দেখেছিস সরো!"

কাণ্ড দেখে সরমা যতটা অবাক হয়, কেন বলা যায় না লজ্জিত হয় তার চেয়ে বেশি। দু-খানি গরদের থান নরেন দু-জনের জন্য রেখে গিয়েছে।

মোক্ষদা ঠাকরুন বলেন "কখন চুপিচুপি রেখে পালিয়েছে, জানতেই কি পেরেছি ছাই।"

কিন্তু তা ব'লে মোক্ষদা ঠাকরুন অসন্তুষ্ট হয়েছেন মনে হয় না। প্রথমে বলেন বটে—"পয়সাকড়ি ওরা খোলামকুচি মনে করে, জানিস সরো! নেহাত যদি কিছু দিতেই ইচ্ছে হয়েছিল একটা সুতির থান দিলেই তো পারতিস বাপু। এ-গরদ কিনতে যাবার কি দরকার!" কিন্তু তার পরেই তাঁর মুখে হাসি দেখা যায়। "তা হোক, ছেন্দা ক'রে দিয়েছে, পরিস বাপু। বিধবা মানুষ, পুজো-আচ্চার জন্যে একটা শুদ্ধ বস্তুর থাকাও দরকার। আমার পুরনোখানা তো ধোকরা জালি হ'য়ে ছিল। নিজের কি আর কেনবার ক্ষ্যামতা আছে! ভাগ্যিস নরু দিলে, এখন প'রে বাঁচব!"

হাত পেতে গরদের থানটি সরমাকে নিতে হয়, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে লজ্জায় তার মুখ রাঙা হ'য়ে ওঠে। মনে-মনে নরেনের ব্যবহারে কেমন যেন একটু অস্বস্তিই সে অনুভব করে। নিজের পিসিমাকে গরদের থান প্রণামী দিতে চায়, সে দিক; কিন্তু তার সঙ্গে সরমাকেও এমন বিব্রত করা কেন! এ-দান প্রত্যাখ্যান করাও যায় না, কিন্তু নিতেও যে তার বাধে।

কিন্তু মোক্ষদা ঠাকরুনের এসব দিকে দৃষ্টি নেই। নিজের খুশিতেই মত্ত হ'য়ে তিনি বলেন, "পর না মা একবার, দেখি।"

সরমার কোনো আপত্তি তাঁর কাছে টেকে না। সেইখানেতেই তাকে গরদের কাপড়খানি মোক্ষদা ঠাকরুন পরিয়ে ছাড়েন।

তারপর ধীরে-ধীরে যা ঘটে, তার সমস্ত ইতিহাস বর্ণনা করা কঠিন। ভাগ্যের অভিশাপে একান্ত প্রতিকূল আবেষ্টনের মধ্যে যে-বীজ চিরদিন নিজের মধ্যে সুপ্ত থাকতে পারত, তাই দেখা যায় একদিন কোথাকার এতটুকু ইঙ্গিতে ও আশ্বাসে হঠাৎ পল্লবিত হ'য়ে উঠেছে।

সরমাকেই বা কি দোষ দেব? স্বামীকে সে চেনবার অবসর পর্যন্ত পায়নি। তার জীবনে প্রথম যে-পুরুষ সমবেদনা ও সহানুভূতির ভিতর দিয়ে যৌবনের অপরূপ রহস্যে মণ্ডিত হ'য়ে দেখা দিলে—সে নরেন।

মোক্ষদা ঠাকরুন বলেন, "পড় তো মা কি লিখেছে?"

সরমার পড়তে গিয়ে বারেবারে বেধে যায়। চিঠির খানিকটা পড়ার পরও সরমাকে থামতে দেখে মোক্ষদা ঠাকরুন, বলেন, "আর কিছু লেখেনি?" সরমা চুপ ক'রে থাকে। আর যা নরেন লিখেছে তা এমন কিছু অসাধারণ নয়; তবুও সরমার মুখ দিয়ে তা বেরুতে চায় না। কিন্তু মোক্ষদা ঠাকরুনের জিজ্ঞাসু প্রশ্নের উত্তরে তাকে শেষ পর্যন্ত পড়তেই হয়। নরেন লিখেছে, "তোমাকে প্রণাম জানাবার সঙ্গে-সঙ্গে তোমার পাতানো বোনঝিকে আশীর্বাদ করবার লোভটুকু কোনোরকমে সামলে নিলাম পিসিমা। আশীর্বাদ করবার কিই বা আছে? সারাজীবন তোমাদের ওই হেঁশেলের আগুনে শুকিয়ে-শুকিয়ে মরবার চেয়ে বড়ো সৌভাগ্য যার জন্য কল্পনা করতে পারি না, তাকে আশীর্বাদ করার চেয়ে নিষ্ঠুর পরিহাস আর কিছু হ'তে পারে না।"

মোক্ষদা ঠাকরুন কেন বলা যায় না, হঠাৎ মুখ ফিরিয়ে নেন। সরমার সমস্ত বুকের ভেতরটা কেন যে অমন মোচড় দিয়ে ওঠে, সে ভালো ক'রে বুঝতে পারে না।

কিন্তু সর্বনাশ যা হবার তা হ'তে তখন আর বাকি নেই। নিজের জীবনের নিরবচ্ছিন্ন ঊষরতায় সুখী না হ'লেও, দুঃখ করবার যে কিছু আছে এ-কথা সরমা এতদিন জানবার অবসর পায়নি। হঠাৎ নরেন তাকে জীবনের গভীরতম দুঃখের সঙ্গে মুখোমুখি ক'রে দাঁড় করিয়ে দেয়। সরমা নিজের প্রতি সমবেদনা করতে শেখে। মরুভূমি হঠাৎ মেঘের চোখ দিয়ে নিজের ব্যর্থতা দেখতে পায়।

সরমা নিজেকে সংবরণ করার চেষ্টা করেনি এমন নয়। নরেনের চিঠি পড়বার পর তার মনে যে-ভাঙন ধরে তা নিবারণ করবার জন্যে একবার সে সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করেছে।

সারাদিন সে একরাত্রের অস্পষ্টভাবে দেখা স্বামীর মুখ মনে করবার চেষ্টা করে। স্নান ক'রে ভিজে কাপড় তার গায়েই শুকোয়। দোতলার বউটির ঘরে গিয়ে নিজে-নিজেই সে তার ছেলেপুলের জামা সেলাই করতে বসে।

তারপর রাত্রে সরমা স্বামীকে স্বপ্ন দেখে। তার বিছানার অত্যন্ত কাছে তিনি এসে দাঁড়িয়েছেন, মনে হয়। মুখে তাঁর প্রসন্ন হাসি। ধীরে ধীরে সরমার বিছানার ধারে ব'সে একটি হাতে তিনি সরমাকে জড়িয়ে নত হ'য়ে তার মুখের ওপর ঝুঁকে পড়েন। কিন্তু এ কি! এ যে নরেনের মুখ! সরমা ধড়মড় ক'রে জেগে উঠে বসে। সারারাত সেদিন আর সে ঘুমতে সাহস পায় না।

* * *

অনেক দিন বাদে নরেন আবার এসেছে। পিসিমা উদ্বিগ্ন হ'য়ে বলেন, "এই এক মাসে এমন রোগা হয়েছিস কেন রে? গালের হাড়-টাড় একেবারে ঠেলে উঠেছে যে। ভালো ক'রে খাস-টাস না বুঝি।"

নরেন হেসে বলে, "এই যদি ভালো ক'রে না খাওয়ার চেহারা হয় পিসিমা, তা হ'লে তোমাদের বাড়িতে বোধ হয় দুর্ভিক্ষ লেগেছে। তোমার বোনঝিটির যা দশা দেখছি......"

পিসিমা হঠাৎ সরমা সম্বন্ধে সচেতন হ'য়ে বলেন, "হ্যাঁ রে, মেয়েটা যখন এল কেমন ননীর পুতুলটির মতো চেহারা! ক'দিনে যেন শুকিয়ে দড়ি হ'য়ে গেছে!"

নিজের চেহারার আলোচনায় সরমা লজ্জা পেয়ে ঘরের বার হ'য়ে যায়! নরেন সেদিকে চেয়ে কি বলতে গিয়ে থেমে যায়। নরেন শুধু রোগা হয়নি, এক মাসে যেন অনেক বদলে গিয়েছে।

খাওয়া-দাওয়ার পর দেখা যায়—নরেন একলা ঘরে অশান্তভাবে পায়চারি ক'রে বেড়াচ্ছে। চ'লে যাবার আগে একসময়ে সরমার বিছানার তলায় অনেক দ্বিধাদ্বন্দ্বের পর একটি চিঠি সে লুকিয়ে রেখে যায়।

সরমার হাতে সে-চিঠি দেবার সুযোগ তার মেলিনি এমন নয়; কিন্তু কেন বলা যায় না, সে-সাহস সে শেষ পর্যন্ত সঞ্চয় করতে পারেনি।

সে-চিঠিতে কি সে লিখেছিল কে জানে, কারণ সরমার হাতে সে-চিঠি পড়েনি; পড়লেই বুঝি ভালো হ'ত।

মোক্ষদা ঠাকরুন বিকালে ঘর ঝাঁট দেবার সময়ে তাঁর নিজের ও সরমার দু-জনের বিছানা নতুন ক'রে ঝেড়ে তোলেন। সামান্য একটা কাগজ ঘরের আবর্জনার সঙ্গে বাইরে কোথায় পরিত্যক্ত হয়েছিল কে জানে! কারুর হাতে সে-চিঠি কোনোদিন পড়েছিল কিনা তাও বলা যায় না।

* * *

পরের দিন নরেন আবার এল। একরাত্রে তার যেন আরো পরিবর্তন হ'য়ে গেছে। পিসিমা বললেন—"এই শীতের রাতে কোথায় শুতে যাস, কষ্ট হয়, হয়তো! তার চেয়ে সরকার মশাইকে ব'লে দিই, যে ক'টা দিন এখানে থাকিস বাইরের ঘরে শোবার বন্দোবস্ত ক'রে দিক।"

"আর দরকার হবে না পিসিমা! আজই চ'লে যাচ্ছি।"

পিসিমা অবাক হ'য়ে বললেন—"সে কি রে? এবারে যে এত তাড়াতাড়ি যাচ্ছিস?"

"বাড়িতে যাচ্ছি না পিসিমা, এবার অনেক দূরে! কখনও ফিরব কিনা তাই জানি না।" —ব'লে নরেন একটু হাসল।

পিসিমা রাগ ক'রে বললেন—"যত সব অলক্ষুনে কথা! আর দূরদূরান্তরে যাবারই বা তোর কিসের দরকার! এত লোকের দেশে অন্ন হচ্ছে আর তোর হয় না?"

নরেন চুপ ক'রে রইল।

"জানি না বাপু, যা ভালো বুঝিস তাই কর!" —ব'লে পিসিমা অত্যন্ত বিমর্ষ হ'য়ে বেরিয়ে গেলেন।

সরমাও চ'লে যাচ্ছিল; কিন্তু নরেন হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে তার পথ রোধ

ক'রে বললে, "একটু দাঁড়াও!"

নরেনের এরকম চেহারা সরমা কখনও দেখেনি। বিমূঢ়ের মতো সে দাঁড়িয়ে পড়ল।

খপ্ ক'রে সরমার হাতটা ধ'রে ফেলে নরেন এবার বললে, "তুমি আমার চিঠির উত্তর দেবে না, আমায় ঘৃণা করবে, আমি জানতাম সরমা ; কিন্তু তবু আমি ও-চিঠি না লিখে থাকতে পারিনি। আমায় ক্ষমা করতে হয়তো তুমি পারবে না, তবু এইটুকু শুধু জেনো যে তোমায় অসম্মান করবার উদ্দেশ্য আমার ছিল না।"

সরমা এসব কথার কোনো মানেই খুঁজে না পেয়ে ভীত অস্ফুট স্বরে বললে, "আপনি এসব কি বলছেন?"

নরেন সরমার হাতটা ছেড়ে দিয়ে অত্যন্ত ক্ষুণ্ণ-স্বরে বললে, "তুমি তা হ'লে না প'ড়েই আমার চিঠি ফেলে দিয়েছ! যাক, ভালোই হয়েছে!

নরেন নিঃশব্দে গিয়ে বিছানার ওপর ব'সে পড়ল। ঘর থেকে চ'লে যাবার কোনো বাধাই আর সরমার ছিল না ; কিন্তু যেতে সে পারলে না। খানিক চুপ ক'রে থেকে ধরা-গলায় বললে, "কোনো চিঠি তো আমি পাইনি!"

নরেন এবার অবাক হ'য়ে বললে, "চিঠি পাওনি কিরকম? কি হ'ল তা হ'লে চিঠির!" সরমার বিছানাটা সে নিজেই এবার উল্টেপাল্টে খুঁজে বললে, "এইখানেই তো চিঠি রেখেছিলাম!"

এ-ব্যাপারের গুরুত্ব তখনও সরমা বোঝেনি। এই অবস্থাতেও এবার একটু না হেসে সে পারলে না ; বললে, "বিছানার ভেতরে চিঠি রাখলেই আমি চিঠি পাব এ-কথা আপনি ভাবলেন কেমন ক'রে!"

নরেনের মুখ তখন কিন্তু আশংকায় পাংশু হ'য়ে গেছে, সে ভীত স্বরে বললে, "কিন্তু সে-চিঠি যদি আর কারও হাতে প'ড়ে থাকে সরমা?"

এ-সম্ভাবনার কথা সরমার মনে এতক্ষণ জাগেনি। নরেনের কথায় হঠাৎ এ-বিপদের গুরুত্ব উপলব্ধি ক'রে অত্যন্ত শঙ্কিত হ'য়ে উঠে শেষ আশায় ভর ক'রে সে বললে, "আপনি চিঠি রেখেছিলেন তো ঠিক!"

"রেখেছিলাম বৈকি!"—ব'লে নরেন বিছানাটা আর একবার উল্টেপাল্টে তন্নতন্ন ক'রে খুঁজে দেখল। চিঠি কোথাও নেই।

এই বৃহৎ অনাত্মীয় পরিবারে সেই চিঠি কারুর হাতে পড়ার পর কি যে কেলেংকারি হ'তে পারে তা কল্পনা ক'রে সরমার সমস্ত দেহ তখন আড়ষ্ট হ'য়ে এসেছে। দোষ তার থাক বা না থাক, এতক্ষণে কথাটা কিরকম কুৎসিত-ভাবে কত লোকের ভেতর জানাজানি হ'য়ে গেছে কে জানে! হয়তো মোক্ষদা ঠাকরুন পর্যন্ত জানতে পেরেছেন! সকালে হেঁশেলে যা-যা ঘটেছে সমস্তই তার ভীত মনের কাছে এখন বিকৃতরূপে দেখা দেয়। তার মনে হয়, সবাই যেন এ-কথা আগে থাকতে জেনে তার সঙ্গে আজ অদ্ভুত ব্যবহার করেছে। তার স্থির বিশ্বাস হয়, সে ভালো ক'রে লক্ষ্য না করলেও সকলের দৃষ্টিতেই আজ সন্দেহ ও বিদ্বেষ ছাড়া আর কিছু ছিল না। সরমার পৃথিবী হঠাৎ অন্ধকার হ'য়ে আসে। এর পর সে সকলের মাঝে মুখ দেখাবে কেমন করে?

সরমা অসহায়ের মতো হঠাৎ এবার কেঁদে ফেললে। এ-বাড়িতে এসে আর কিছু না শিখুক, কলংককে সে ভয় করতে শিখেছে। এই অপ্রত্যাশিত ঘটনায়

বিপদের পরিমাণটা তার কাছে অস্বাভাবিকরূপে বড়ো হ'য়েই দেখা দিল।

সরমা না কাঁদলে কি হ'ত বলা যায় না, কিন্তু তার সেই অশ্রুসজল, কাতর অসহায় মুখ দেখে নরেনের মাথার ভেতর কি যেন সহসা ওলট-পালট হ'য়ে গেল। এতদিনকার সমস্ত সংযম ভুলে হঠাৎ সরমাকে নিবিড়ভাবে বুকের ভেতর সে জড়িয়ে ধরলে।

"কাঁদবার কি হয়েছে, সরমা! এ-বাড়িতে তোমার কলঙ্ক হ'য়ে থাকে, তাতেই বা ভাবনা কি! এ-বাড়ি ছাড়া পৃথিবীতে কি আর আশ্রয় নেই।"

সরমা উত্তর দিল না ; কিন্তু নরেনের বাহুবন্ধন থেকে নিজেকে মুক্ত করবার চেষ্টাও তার দেখা গেল না। নরেনের বুকে মাথা রেখে ফুলে-ফুলে সে কাঁদতে লাগল।

তার মাথার চুলে গভীর স্নেহভরে হাত বুলোতে-বুলোতে নরেন বললে, "এখানকার এই নিরর্থক ব্যর্থ জীবন থেকে তোমাকে সরিয়ে নিয়ে যাবার কথাই আমি চিঠিতে লিখেছিলাম সরমা। কিন্তু তা এভাবে সম্ভব হবে আমি ভাবিনি। কে জানে হয়তো বিধাতারই তাই অভিপ্রায় ; নইলে সে-চিঠি অমন ক'রে হারাবে কেন?"

সরমা তবু কথা বললে না। কান্না তার তখনও থামেনি ; কিন্তু তার মনে হচ্ছিল, এ-কান্না যেন তার নিজের মনের হতাশা বেদনা থেকে উঠছে না। নিজের মনের পৃথক কোনো অস্তিত্বই যেন তার আর নেই। বিপুল প্রবল দুর্বার কোনো রহস্যময় স্রোতে তাকে যেন এখন ভাসিয়ে নিয়ে চলেছে ; তার মনের ছোটোখাটো ভাবনা চিন্তা ভয়ের কোনো মূল্যই যেন আর সেখানে নেই।

নরেন আবার কি বলতে যাচ্ছিল, হঠাৎ কে একটি মেয়ে ঘরের একেবারে ভেতরে এসে তাদের দেখে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। নরেনের মুখের কথা মুখেই আটকে রইল, সরমা অস্ফুট স্বরে 'নলিনদি' ব'লে লজ্জায় একেবারে রাঙা হ'য়ে উঠল।

নলিনী যে-কাজেই আসুক, বেশিক্ষণ সে আর দাঁড়াল না। তাদের দিকে একবার বিস্মিতভাবে তাকিয়ে, যেমন এসেছিল তেমনিই নিঃশব্দে সে বার হ'য়ে গেল। বিমূঢ় নরেন ও সরমা তখনও তেমনিভাবে বাহু-বন্ধনে আবদ্ধ হ'য়ে আছে।

অনেকক্ষণ পরে নরেন ম্লান হেসে বললে, "আমাদের পথ ক্রমশ সংকীর্ণ হ'য়ে আসছে সরমা।"

সমস্তদিন সরমা অসুখের নামে সেদিন ঘরেই প'ড়ে রইল। বাইরে এতক্ষণ কি হচ্ছে, তা কল্পনা করবার সাহস পর্যন্ত তার ছিল না। বাইরে যাই হোক, কেলেঙ্কারির ঢেউ যে তার ঘর পর্যন্ত এসে তাকে লাঞ্ছিত করেনি, এরই জন্য সে সকলের কাছে কৃতজ্ঞ বোধ করছিল। মোক্ষদা ঠাকরুন একসময়ে ঘরে এসে তার অসুখের খোঁজ নিয়ে গেছলেন : কিন্তু তাঁর মুখের দিকে চাইতে পর্যন্ত সরমা সাহস করেনি। তাঁর কুশল-প্রশ্নের ভেতর তিরস্কারের ইঙ্গিত না থাকলেও, আশ্বস্ত হবারও সে কিছু পায়নি। নরেনের প্রস্তাব সম্বন্ধেও সে বিশেষ কিছু ভেবেছে এমন নয়। তার মনের সমস্ত গতিই যেন রুদ্ধ হ'য়ে

গেছে। আনন্দ বিষাদের অতীত কোনো লোকে পৌঁছে তার হৃদয় স্তব্ধ হ'য়ে আছে ব'লে মনে হয়। শুধু এইটুকু সে জানে যে, এ-বাড়িতে তার বাস করা এখন থেকে অসম্ভব, তাকে যেতেই হবে।

সেদিন গভীর রাত্রে দেখা যায়, সর্বাঙ্গ দোরোখায় জড়িয়ে ছায়ামূর্তির মতো একটি মেয়ে বিরাট জীর্ণ বাড়িটির নির্জন আঙিনা কম্পিত বুকে পার হ'য়ে চলেছে। অন্দরমহল পার হ'য়ে বার-বাড়ির আঙিনা। শীতের অন্ধকার রাত্রে তার চারিধারে কুঠুরিগুলি বিশাল অতিকায় জীবের মতো ভয়ংকর দেখায়। মেয়েটি সে-আঙিনাও পার হ'য়ে দরজার কাছে এসে থমকে দাঁড়ায়। বৃদ্ধ দারোয়ান পাশে খাটিয়ায় নাক ডাকিয়ে ঘুমচ্ছে।

মেয়েটি নিঃশব্দে দরজা খোলবার চেষ্টা করে। কিন্তু এ কি! দরজায় যে তালা দেওয়া!

এ-দরজা বন্ধ থাকতে পারে, এ-কথা সরমার মনে হয়নি। দারুণ হতাশায় তার চোখে জল আসে। হঠাৎ পেছনে কার মৃদু পদশব্দ শুনে তার বুক কেঁপে ওঠে। নিঃশব্দে সে দরজার পাশে স'রে দাঁড়ায় বটে ; কিন্তু তখন মন তার গভীরতম হতাশায় অসাড় হ'য়ে গেছে। পদশব্দ আরো কাছে আসে, তারপর হঠাৎ অন্ধকারে সরমা শুনতে পায়, কে যেন খুব কাছে চুপিচুপি তার নাম ধ'রে ডাকছে। কান্নার আক্ষেপ কোনোরকমে দমন ক'রে সরমা চুপি-চুপি বলে, "কে, নলিনদি?"

"হ্যাঁ রে কালামুখী!" ব'লে নলিনী আরো এগিয়ে এসে তার গায়ে হাত দিয়ে তীক্ষ্মস্বরে বলে, "মরতে চলেছ?"

সরমা এবার একেবারে যেন ভেঙে পড়ে, দাঁড়াবার শক্তিটুকু যেন তার আর নেই। সেইখানেই ধীরে-ধীরে ব'সে পড়ে, সে ধরা-গলায় কি যেন বলবার চেষ্টা করে, কিন্তু নলিনী হঠাৎ মৃদুকণ্ঠে তাকে ধমক দিয়ে বলে, "চুপ!"

তারপর হঠাৎ তালায় চাবি লাগাবার শব্দে সরমা চমকে ওঠে। নলিনদি করছে কি!

দূরের রাস্তার একটা স্তিমিত আলোর রেখা চোখে পড়তেই সরমা বুঝতে পারে দরজা খোলা হয়েছে। বিমূঢ়ভাবে সে উঠে দাঁড়ায়। নলিনী কটু কণ্ঠে বলে, "চিতা তৈরি, আর দাঁড়িয়ে কেন? যাও।" সরমা সমস্ত সাবধানতা ভুলে, এবার ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠে বলে, "আমি যাব না, নলিনদি।"

নলিনী তার কাঁধে একটা হাত রাখে, কিন্তু পূর্বের মতোই তীব্র-কণ্ঠে বলে, "ঢং আর ভালো লাগে না। আমায় দরজা বন্ধ করতে হবে, যাও।"

সরমা হতাশভাবে আর একবার বলে, "কিন্তু নলিনদি—"

"কিন্তু, আর কিছু নেই তো! মন যার ভেঙেছে, ঘরে থেকে ভড়ং ক'রে তার কি স্বর্গ হবে?"

সরমা ধীরে-ধীরে বাইরে গিয়ে দাঁড়ায়। হঠাৎ তার হাতের মধ্যে কি একটা শক্ত মোড়ক গুঁজে দিয়ে নলিনী বলে, "এই তোমার গলার দড়ি!"

তারপর দরজা বন্ধ হ'য়ে যায়।

পা চলে না, সরমাকে তবু চলতে হয়। পিছনে দরজা বন্ধ, তবু কেন বলা যায় না—ফিরে-ফিরে সে সেদিকে না তাকিয়ে পারে না। নলিনী তার হাতে কি গুঁজে দিয়েছে তা সে বুঝতে পারছে। নলিনীর সধবা অবস্থার

এটি একটি সোনার হার। এটির দিকে তাকিয়ে তার চোখের জল আর বাধা মানতে চায় না।

বেশিদূর তাকে অবশ্য যেতে হয় না। গাড়ি নিয়ে নরেন কাছেই দাঁড়িয়ে আছে, দেখা যায়। যন্ত্রচালিতের মতো সরমা নরেনের হাত ধ'রে গাড়িতে ওঠে। নরেন কখন পাশে এসে বসে, কখন গাড়ি চলতে শুরু করে, কিছুই সে টের পায় না।

কল্যাণের হোক, অকল্যাণের হোক, দুটি নরনারীকে এই অনির্দিষ্ট জীবনের যাত্রা-পথে পাঠিয়েই গল্প সমাপ্ত করা যেত ; কিন্তু তা হবার নয়। সরমাকে একেবারে ভেস্তে দেবার জন্য তখনও ভাগ্যদেবতার হাতে এমন অপ্রত্যাশিত নিষ্ঠুর চাল ছিল, কে জানত!

ছ্যাক্‌রা গাড়ি শীতের রাত্রিতে নিস্তব্ধ পথ মুখরিত ক'রে অলস-মন্থর গতিতে চলতে থাকে। পাশাপাশি ব'সে থেকেও সরমা ও নরেনের মনে হয় —যেন তারা কোনো দুর্লঙ্ঘ্য সাগরের দুই তীরে বিচ্ছিন্ন হ'য়ে আছে। হঠাৎ সরমা একটু ন'ড়ে-চ'ড়ে বসে।

নরেন বলে, "তোমার কষ্ট হচ্ছে সরমা?"

"না, কিন্তু তোমার পকেটে কি আছে, গায়ে একটু যেন ফুটল।"

চলতিপথে রাস্তার একটা গ্যাসের আলো গাড়ির ভেতরে এসে পড়েছে। নরেন পকেট থেকে যা বার করে তা দেখতে পেয়ে সরমা চমকে উঠে বলে, "এ কি! এ-খেলনা কেন?"

নরেন একটু লজ্জিত হ'য়ে বলে, "ছেলেটার জন্যে কাল কিনেছিলাম, পকেটেই র'য়ে গেছে।"

সরমা নিশ্বাস রোধ ক'রে অস্পষ্টস্বরে জিজ্ঞাসা করে—"কার জন্যে বললে? তোমার ছেলে-মেয়ে আছে?"

নরেন হেসে বলে, "বাঃ, তা জানতে না!"

সরমা অস্পষ্ট স্বরে জিজ্ঞাসা করে—"তোমার স্ত্রী?"

নরেন একটু হেসে বলে, "সে তো দেশে।"

সর্পদষ্টের মতো গাড়ির ভেতর থেকে উঠে দাঁড়িয়ে সরমা তীক্ষ্ণস্বরে বলে, "গাড়ি থামাও।"

নরেন অবাক হ'য়ে বলে, "কেন, পাগল হ'লে নাকি।"

"থামাও বলছি, শিগ্‌গির!" সরমার কণ্ঠস্বর অস্বাভাবিকরকম তীক্ষ্ণ।

নরেন তাকে জড়িয়ে ধ'রে বসাবার চেষ্টা ক'রে বলে, "কি পাগলামি করছ! তুমি এসব জানতে না নাকি?"

সরমা উন্মত্তের মতো তার বাহুবন্ধন থেকে নিজেকে মুক্ত ক'রে বলে, "জানতাম মানে?"

"বাঃ, পিসিমার কাছে শোনোনি!"

"পিসিমার সঙ্গে এই কি আমার আলোচনার বিষয়! তুমি গাড়ি থামাও!"

নরেন কাতর স্বরে বলে, "কিন্তু তুমি আমাকে ভুল বুঝছ সরমা, আমি তোমায় ফাঁকি দিতে চাইনি। আমার সব কথা শোনো আগে!"

সরমা রাগে দুঃখে অপমানে কেঁদে ফেলে বলে, "না গো না, তোমার পায়ে পড়ি : আমি বাড়ি ফিরে যব, গাড়ি থামাও।"

সরমাকে শান্ত করবার সমস্ত চেষ্টা নরেনের নিষ্ফল হ'য়ে যায়। সরমার উত্তেজনা দেখে শেষ পর্যন্ত সে একটু ভীতই হ'য়ে পড়ে—সরমা যেন প্রকৃতিস্থ নয়। একান্ত অনিচ্ছায় সে গাড়ি থামাতে আদেশ দেয়। কিন্তু গাড়োয়ানকে বিদায় দেবার পর সরমাকে আর একবার বোঝাবার চেষ্টা করে; সে বলে, "সে-বাড়িতে তোমার আর ফেরা অসম্ভব, তুমি বুঝতে পারছ না সরমা! তারপর একটু থেমে আবার বলে, "তোমাকে সত্যিই আমি ঠকাতে চাইনি, আমি ভেবেছিলাম, আমার সব কথা তুমি জানো। আর এসব জেনেও তোমার এত বিচলিত হবার কি আছে সরমা, বুঝতে পারছি না। আমাদের অতীত যেমনই কেন হোক না, এখনকার ভালোবাসাই আমাদের জীবনের সবচেয়ে বড়ো সত্য নয় কি?"

সরমা কোনো উত্তর না দিয়ে নীরবে চলতে শুরু করে। কোথায় সে যাবে, নিজেই জানে না। পৃথিবীতে কোনো আশ্রয় আর তার নেই এ-কথা সে বোঝে, তবু তার যাওয়া চাই: নরেনের কাছ থেকে, তার নিজের কাছ থেকে, সমস্ত পৃথিবীর কাছ থেকে তাকে বুঝি দূরে স'রে যেতেই হবে। নরেন সংগে-সংগে যেতে-যেতে বলে, "তোমার এ-বিপদের জন্যে আমি দায়ী সরমা! আমায় তুমি অন্তত তার প্রায়শ্চিত্ত করবার অবসরটুকু দাও। আমি শপথ ক'রে বলছি, আমার সংগে গেলে, তোমার অসম্মান কখনও আমি করব না!"

কিন্তু সরমার থামবার কোনো লক্ষণ দেখা যায় না। কিছু দূর গিয়ে হঠাৎ ফিরে দাঁড়িয়ে সে উন্মত্তভাবে ব্যাকুল স্বরে বলে, "দোহাই তোমার, আমার সংগে আর এসো না। একলা গেলে এখনও আমার আশ্রয় মিলতে পারে। আমার সে-পথও নষ্ট কোরো না!"

এর পর নরেনের পক্ষে আর সংগে যাওয়া অসম্ভব। তবুও আর একবার অপরিচিত পথে গভীর রাত্রে একলা হাঁটার বিপদের কথা সে সরমাকে বোঝাতে চেষ্টা করে, কিন্তু সরমা অটল।—পথ সে চেনে, তার সঙ্গে কারো যাবার প্রয়োজন নেই।

নরেন আর এগুতে পারে না। ধীরে-ধীরে সরমা শীতের রাতের কুয়াশায় অদৃশ্য হ'য়ে যায়।

* * *

সেদিন শীতের রাত্রে একটি ক্লান্ত কাতর মেয়ে অর্ধোন্মত্ত অবস্থায় কলকাতার নিস্তব্ধ নির্জন পথে-পথে কোথায় যে ঘুরে ফিরেছিল, কেউ তা জানে না। শুধু এইটুকু আমরা জানি যে হঠাৎ একসময়ে গলির গোলকধাঁধায় ঘুরে-ঘুরে ক্লান্ত হ'য়ে সে একটি ছোট্ট রেলিং-ঘেরা জমি আবিষ্কার করে।

পৃথিবীর সমস্ত দ্বার যখন বন্ধ হ'য়ে গেছে, তখন এই বিবর্ণ ঘাসের জমিটুকু সরমাকে বহুকালের হারানো মেয়ের মতো কোল দিয়ে তার ব্যর্থ জীবনের উপর কুয়াশার যবনিকা টেনে দিয়েছিল।

হয় তো

গভীর দুর্যোগের রাত্রি......

ভীত শহর যেন এই অন্ধকার ঝড়ের রাত্রে নিরাপদ আশ্রয়ে নিজেকে সংকুচিত করিয়া গোপনে রাখিতে চায়।

নির্জন পথের যেখানে-যেখানে গ্যাসের আলো পড়িয়াছে, সেখানে মাটি আর চোখে পড়ে না—শুধু বৃষ্টিধারাহত জল চিক্‌চিক্‌ করিতেছে দেখা যায়। পথের ধারের গাছগুলি ঝড়ের তাড়নায় অসহায় বন্দীর মতো মাটির শৃংখল ছিঁড়িবার জন্য যেন উন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছে।।

এমনি রাত্রিতে আকাশের উৎপীড়নে বিপর্যস্ত পৃথিবীকে হঠাৎ বড়ো অসহায় বলিয়া মনে হয়। অকস্মাৎ যেন এই ক্ষুদ্র গ্রহটির দুর্বল কয়েকটি প্রাণীর ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে গভীর হতাশায় মন আচ্ছন্ন হইয়া যায়।

পথের ধারে গ্যাসের আলোগুলি কেমন নিষ্প্রভ হইয়া গেছে—সমস্ত মানবজাতির আশার সংগে, কেন জানি না, তাহার একটি উপমা বারবার মনে আসিতে চায়।

বাস হইতে নামিয়া নির্জন কর্দমাক্ত পথ দিয়া, বৃষ্টির ঝাপটা হইতে দেহকে বাঁচাইবার নিষ্ফল চেষ্টা করিতে-করিতে এমনি সব চিন্তা লইয়া বাড়ি ফিরিতেছিলাম। কিন্তু মানবজাতির ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে অস্পষ্ট হতাশা ছাড়া আরেকটি ভয় মনের গোপনে ছিল—সে-আশঙ্কা ব্যক্তিগত ও তাহার হেতু অত্যন্ত স্পষ্ট।

পথ অনেকখানি ; মাঝে একটা নূতন অর্ধসমাপ্ত সেতু পার হইতে হইবে। সেতুটি এখনও চলাচলের উপযুক্ত হইয়া ওঠে নাই। চলিবার রাস্তা সংকীর্ণ। ধারের রেলিং দেওয়া হয় নাই। সাধারণ অবস্থাতেই এক-একটি কাঠের তক্তার উপর সন্তপর্ণে পা রাখিয়া চলিতে হয়—এই দুর্যোগের রাত্রে সে-সেতু পার হইতে বিশেষ বিপদের সম্ভাবনা। মনে-মনে সেই বিপদের সম্মুখীন হইবার জন্যই সাহস সঞ্চয়ের চেষ্টা করিতেছিলাম।

পোলের নিকট আসিয়া কিন্তু অনেকটা আশ্বস্ত হইলাম। সারাদিনের ভিতর পোলটির নির্মাণকার্য বেশ অগ্রসর হইয়া গিয়াছে। ধারে রেলিং দেওয়া হয় নাই কিন্তু কাঠের তক্তার ফাঁক দিয়া গলিয়া পড়িবার ভয় আর নাই—কাঠগুলি মজবুত করিয়া ইতিমধ্যে জোড়া হইয়াছে।

চেন দিয়া ঝোলানো পোলটি ঝড়ের বেগে দুলিতেছিল। ভয় যে একটু না হইতেছিল এমন নয় কিন্তু শেষ পর্যন্ত মরিয়া হইয়া তাহার উপর পা বাড়াইয়া দিলাম। পোল পার না হইলে এই ঝড়বৃষ্টি মাথায় করিয়া আরও এক মাইল পথ ঘুরিয়া যাইতে হয়।

পা দিয়াই বুঝিলাম ঝড়ের সহিত যুঝিয়া এই দোদুল্যমান পোল পার হওয়া সহজ কথা নয়। শুধু সাহস নয়, শক্তিরও প্রয়োজন। ঝড়ের বেগ খোলা নদীর উপর এমন প্রচন্ড হইয়া উঠিয়াছে যে প্রতি মুহূর্তেই একেবারে নিচে গিয়া পড়িবার সম্ভাবনা।

লোকজন কেহ কোথাও নাই। এই জনহীন সেতুর উপর অহংকার বিসর্জন

দিয়া হামাগুড়ি দিয়া গেলেই বা ক্ষতি কি—চিন্তা করিতে-করিতে কিছুদূর অগ্রসর হইয়াছি এমন সময়—

থমকিয়া দাঁড়াইয়া পড়িলাম। পোলের এপার হইতে একটি টিমটিমে কেরোসিনের বাতি প্রাণপণ চেষ্টা করিয়া ওপারের অন্ধকারকে একটু তরল করিতে পারিয়াছে মাত্র।

সেই তরল অন্ধকারে দুইটি অস্পষ্ট মূর্তি চোখে পড়িল। তাহারা ওধার হইতে পোল পার হইবার জন্য চেষ্টা করিতেছে। তাহাদের একটি মূর্তি নারীর।

এই অন্ধকার দুর্যোগের রাত্রে দুইটি নরনারী কি এমন প্রয়োজনে এই বিপদসংকুল সেতুপথ পার হইতে আসিয়াছে, এ-কথা ভাবিয়া সেদিন থমকিয়া দাঁড়াই নাই।

এ দুর্যোগের রাতে এরূপ ব্যাপার যতই কৌতূহলজনক হোক না কেন বিস্ময়কর নয়।

কিন্তু ওপারের তরল অন্ধকারে দুইটি নাতিস্পষ্ট নরনারী-মূর্তির যে-আচরণ চোখে পড়িল তাহা সত্যই অসাধারণ।

মেয়েটি আসিতে চায় না। শুধু পোল পার হইবার ভয়ে, না আর কোনো গভীরতর আশঙ্কা জানি না, সমস্ত শক্তি দিয়া প্রাণপণে পুরুষটির আকর্ষণ সে যেন প্রতিরোধ করিতে চাহিতেছিল। ঝড়ের শব্দের ভিতর দিয়া তাহাদের যে কয়েকটি কথা শুনিতে পাইতেছিলাম তাহাতে পুরুষটি তাহাকে আশ্বাস দিতে চাহিতেছে বলিয়াই মনে হইল।

ঝড়ের সহিত যুঝিয়া তখন সেতুর মাঝামাঝি আসিয়া পৌঁছিয়াছি। দেখিলাম শেষ পর্যন্ত মেয়েটি অত্যন্ত যেন অনিচ্ছার সহিত রাজী হইয়াছে। পুরুষটি তাহার হাত ধরিয়া ওদিক হইতে পোলের উপর অগ্রসর হইতে লাগিল।

আরো খানিকটা অগ্রসর হইয়া তাহাদের মুখোমুখি হইলাম। পুরুষ ও মেয়েটি উভয়েই সর্বাঙ্গে তিনপুরু কাপড় মুড়ি দিয়া আছে। কিন্তু সেই কাপড়ের জঙ্গলের ভিতরেই কেরোসিন তেলের বাতির অস্পষ্ট আলোকে মেয়েটির মুখটি চকিতে দেখিয়া আর একবার চমকিয়া উঠিলাম।

শীর্ণ রুগ্ন মুখে দুইটি দীর্ঘায়ত চোখ—সে-চোখে অসহায় আতঙ্কের যে-ছবি প্রত্যক্ষ করিলাম তাহা মানুষের চোখে সম্ভব বলিয়া ভাবি নাই। কৌতূহল বাড়িয়াই যাইতেছিল। কিন্তু উপায় কি!

পোল প্রায় পার হইয়া আসিয়াছি। এমন সময় পিছনে অমানুষিক চিৎকার শুনিয়া চমকিয়া ফিরিয়া দাঁড়াইলাম।

সর্বনাশ!

আমার চোখের উপর অসহায় চীৎকার করিয়া মেয়েটি পোলের ধার হইতে টাল সামলাইতে না পারিয়া নিচে পড়িয়া গেল। যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি সেখানে ছুটিয়া গেলাম। পুরুষটি বোধ হয় আতঙ্কে হতবুদ্ধি হইয়া গিয়াছিল। যেভাবে সে কাঠের মতো আড়ষ্ট হইয়া দাঁড়াইয়া আছে, তাহাতে তাহার নিকট কোনো সাহায্য পাইবার আশা নাই বুঝিলাম।

কিন্তু অন্ধকারে এই ঝড়ের ভিতর গভীর নদী হইতে মেয়েটিকে উদ্ধার

করিবার জন্য আমিই বা কি করিতে পারি!

এতক্ষণে স্রোতের টানে সে কোথায় তলাইয়া গিয়াছে, কে জানে! সাঁতার জানিলেও এই রাত্রে তাহাকে নদী হইতে উদ্ধার করা একরকম অসম্ভব!—সাঁতারও জানি না।

হঠাৎ বহু নিম্ন হইতে অস্পষ্ট কাতর আহ্বান শুনিয়া চমকিয়া উঠিলাম। পর মুহূর্তেই তাহার শাড়ির প্রান্তটুকু চোখে পড়িল।

পড়িবার সময় তাহার শাড়ির একটি অংশ কেমন করিয়া লোহার একটি বল্টুতে আটকাইয়া গিয়াছে—মেয়েটি জলে পড়ে নাই। কাপড়ের সহিত জড়াইয়া নিম্নমুখ হইয়া অন্ধকার নদীর উপর ঝুলিতেছে।

ঠেলা দিয়া অপরিচিত লোকটির আচ্ছন্ন ভাব দূর করিবার চেষ্টা করিয়া বলিলাম—"শিগ্‌গির এসে ধরুন, এখনও হয়তো টেনে তুলতে পারি।" লোকটি যন্ত্রচালিতের মতো আসিয়া আমার আদেশ পালন করিল।

মেয়েটি সেদিন নিশ্চিত মৃত্যু হইতে শেষ পর্যন্ত রক্ষা পাইয়াছিল। কৃতজ্ঞতা বিনিময়ের তখন সময় ছিল না, পরিচয় জিজ্ঞাসারও নয়—নইলে অনেক কথাই হইতো শুনিতে পারিতাম।

সাবধানে তাহাদের পার করিয়া দিয়া আবার সেই পোলের উপর দিয়া সভয়ে পার হইবার সময় যে কয়টি কথা শুনিতে পাইয়াছিলাম তাহাই আমার মনে চিরন্তন সন্দেহ ও বিস্ময় জাগাইয়া রাখিয়াছে।

মেয়েটি পুরুষের সহিত চলিয়া যাইতে-যাইতে বলিতেছিল—"কি আশ্চর্য দেখো, প'ড়ে যাবার সময় আমার যেন মনে হ'ল, তুমি আমায় ঠেলে দিলে। পা ফসকে তো পড়িনি, আমার যেন ঠিক মনে হ'ল তুমি ঠেলে দিলে......"

তাহাদের কথা ক্রমশঃ অস্পষ্ট হইয়া আসিতেছিল। লোকটির হাসি শুনিতে পাইলাম। সে যেন বলিতেছিল......

"পাগল! কি যে বলো আমি ঠেলে দেব তোমায়......"

সে-ঘটনাটি ভুলিতে পারি নাই। সময়ে অসময়ে সেই বিপদসংকুল সেতুর উপর অস্পষ্টভাবে দেখা মূর্তি দুইটি সম্বন্ধে নানা সন্দেহ, নানা প্রশ্ন মনে জাগে। তাহারা সেই ঝড়ের রাত্রে কেন কোথা হইতে সে-পোল পার হইতে আসিয়াছিল, মেয়েটি কেমন করিয়া পড়িয়া গিয়াছিল, রক্ষা পাইয়া অমন কথাই বা সে বলিল কেন এবং তাহার পর তাহারা কোথায় যে গেল তাহার কিছুই জানি না। তবু তাহাদের সম্বন্ধে অস্পষ্টভাবে নানা কথা মন রচনা করে।

সেই অসাধারণ ঘটনা ও সেই অস্পষ্ট দেখা দুইটা মূর্তিকে কেন্দ্র করিয়া একটি কাহিনী মনের ভিতর আপনা হইতেই গড়িয়া ওঠে।

প্রকাণ্ড সাতমহলা দালান।

কিন্তু এখন আর তাহার কিছুই অবশিষ্ট নাই। চারিধারে শুধু ভাঙা নোনাধরা ইট-কাঠের স্তূপ। বাহির হইতে দেখিলে ভূতুড়ে পোড়ো বাড়ি বলিয়া মনে হয়। এই জরাজীর্ণ বাড়িটির কোনো গোপন কক্ষে এখনো তাহার মুমূর্ষু প্রাণ ধুকধুক করিতেছে। এ-কথা সহজে বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হয় না। দিনের বেলায় সে-প্রাণের কোনো লক্ষণই দেখা যায় না। দেউড়ির সিং-দরজা ভেদ করিয়া যে-অশ্বত্থগাছটি শাখায় প্রশাখায় বিপুল হইয়া বাড়িয়া

উঠিয়াছে তাহার পত্রচ্ছায়ায় বসিয়া ঘুঘু ডাকে। কাঠবেড়ালির দল নির্ভয়ে ভূতপূর্ব বারবাড়ির ধ্বংসাবশেষের উপর দিয়া পরস্পরকে তাড়া করিয়া ফেরে।

এই ধ্বংসাবশেষের অন্তরালে কোথায় মানুষের জীবনের ধারা বহিয়া চলিয়াছে তাহার সন্ধান পাওয়া সহজ নয়।

রাত্রে কিন্তু বহুদূর হইতে দেখা যায় ধ্বংসস্তূপের মাঝখানে কোথা হইতে ক্ষীণ আলোকের রেখা আসিতেছে। এ-বাড়ির ইতিহাস যাহাদের জানা নাই, বিদেশী সেসব পথিক ভয়ও যে পায় না এমন নয়।

গাঁটছড়া বাঁধা হইয়া এই ধ্বংসাবশেষের পাশে একদিন লাবণ্য পালকি হইতে নামিয়াছিল। বাপের বাড়ি হইতে যে-ঝি সঙ্গে আসিয়াছিল সে তো মাটিতে পা দিয়াই ঝংকার দিয়া বলিয়াছিল—"কেমনতর বেআক্কেলে বেহারা গা! এই বাড়িটার সামনে নামালে—বরকনের অকল্যাণ হবে না!

যে-পুরোহিত বরপক্ষের হইয়া বিবাহ দিতে গিয়াছিলেন পথে তাঁহার সহিত পরিচারিকার কযেকবার বাক্‌যুদ্ধ হইয়া গিয়াছে। তাঁহার দিক দিয়া বিশেষ সুবিধা করিতে না পারিলেও, সম্বোধনের দূরত্বটা ঘুচিয়া গিয়াছিল।

তিনি দাঁত খিচাইয়া জবাব দিলেন, "মর মাগী, ভূতুড়ে বাড়ি হ'তে যাবে কেন? নিয়োগীদের সাতপুরুষের কোটা—এ-তল্লাটে জানে না এমন লোক নেই। ওর কাছে হ'ল ভূতুড়ে বাড়ি!"

ঝি কপালে চোখ তুলিয়া সবিস্ময়ে বলিয়াছিল—"ওমা, এরা বলে কি গো! এই পোড়োবাড়িতে মানুষ থাকে!" তাহার পর কন্যার পিতার উদ্দেশ্যেই বোধ হয় কঠোর মন্তব্য করিয়া বলিয়াছিল—"মিন্‌সে পয়সা খরচের ভয়ে করলে কি গো! মেয়েটাকে সাপের কামড়ে মেরে ফেলতে এই জঙ্গলে পাঠালে!"

অবগুণ্ঠিত লাবণ্য তখন স্বামীর সহিত গাঁটছড়া-বাঁধা হইয়া পালকি হইতে নামিয়াছে।

পুরোহিত ঝিয়ের সহিত বাক্যব্যয় নিষ্ফল মনে করিয়াই বোধ হয় পথ দেখাইয়া আগে চলিতে শুরু করিয়াছেন।

পথ দেখানোটা কথার কথা নয়, একান্ত প্রয়োজন। ভাঙা ইট-কাঠের স্তূপের উপর দিয়া, হাঁটুভর জঙ্গলের ভিতর দিয়া সুড়ঙ্গের মতো অন্ধকার বহুদিনের সঞ্চিত শেওলার ভ্যাপসা গন্ধভারাক্রান্ত পথ দিয়া পদে পদে হোঁচট খাইতে-খাইতে লাবণ্য তাহার স্বামীর পিছু-পিছু চলিতেছিল। পিছনে ঝি বাধ্য হইয়া তাহাদের অনুসরণ করিতে-করিতে আপন মনেই গজগজ করিতেছিল—"সাত জন্মে এমন বিয়ের কথা কোথাও শুনিনি মা। বিয়ে করতে এল, তার বর-যাত্তর নেই, বরকর্তা নেই! ট্যাংট্যাং ক'রে এক মড়িপোড়া পুরুত এল বরকে নিয়ে; আব খোঁজ নিলে না, শুধুলে না, মেয়েটাকে হাত-পা বেঁধে ধ'রে দিলে গা! আর এরা কোথাকার আকখুটে গো! জ্ঞাত-গোত্তর নেই, পাড়াপড়শী নেই, বিয়ে ক'রে এল তা বরকনেকে বরণ করতে এল না কেউ! শ্যাল-কুকুরের বিয়েতেও যে এর চেয়ে নেমকানুন আছে..."

লাবণ্য এত কথা শুনিতে বোধ হয় পায় নাই। আচ্ছন্নের মতো ভীত অসহায়ভাবে চলিতে-চলিতে শুধু তাহার মনে হইতেছিল, কেহ যদি শুধু হাতটা বাড়াইয়া একবারটি তাহাকে ধরে তাহা হইলে সে বাঁচিয়া যায়।

কিন্তু কেহ হাত বাড়াইল না।

গজগজ করিতে-করিতে একসময়ে ঝি ঝংকার দিয়া উঠিল—"বলি, ও মুখপোড়া বামুন, কোন চুলোয় নিয়ে চলেছ শুনি?"

ব্রাহ্মণ এইবার উত্তর দিলেন—"তোকে গোর দিতে রে মাগী!"

উত্তরে ঝি যাহা বলিতে শুরু করিল, তাহাতে আর যাহাই হোক লাবণ্যের প্রথম স্বামিগৃহে পদার্পণের পুণ্যক্ষণ মধুর হইয়া উঠিল না।

ঝিয়ের আস্ফালন কতক্ষণ চলিত বলা যায় না। সহসা অন্ধকার পথ কাহার সুমধুর কলহাস্যে মুখরিত হইয়া উঠিল।

ঝি চমকিয়া চুপ করিল। লাবণ্য ঘোমটা ঈষৎ ফাঁক করিয়া এই সুমধুর হাস্যের উৎস ঠাওর করিয়া দেখিবার চেষ্টা করিল।

যে হাসিয়াছিল তাহারই অপরূপ কণ্ঠ শোনা গেল—"দাদা যে চুপিচুপি বউ এনে ফেলেছে গো!"

অন্ধকার পথ তখন শেষ হইয়াছে। সামনেই নাতিবৃহৎ অঙ্গন এবং সেই অঙ্গনের চারিধার ঘিরিয়া ঘরের সারি।

আলোতে আসিয়া দাঁড়াইতেই শাঁখ বাজানো থামাইয়া যে-মেয়েটি আসিয়া লাবণ্যের মুখের ঘোমটা সরাইয়া আর একবার মধুর হাস্যে সমস্ত বাড়ি মুখর করিয়া তুলিল, তাহার মুখের দিকে একটি নিমেষের জন্য চাহিয়া চোখ নামাইলেও লাবণ্যের বিস্ময়ের আর অবধি রহিল না।

নারীর দেহে এত রূপ সম্ভব, লাবণ্যের কখনও জানিবার সুযোগ হয় নাই।

মেয়েটি হাসিয়া বলিল—"ওমা কেমন বউ গো, প্রণাম করে না কেন! প্রণাম করতে জানে না?"

কাহাকে প্রণাম করিতে হইবে কিছুই বুঝিতে না পারিয়া লাবণ্য হেঁট হইয়া মেয়েটিকে প্রণাম করিতে যাইতেছিল। মেয়েটি খিলখিল করিয়া হাসিয়া সরিয়া গিয়া বলিল—"আমাকে নয় গো, আমাকে নয়, পিসিমাকে দেখতে পাচ্ছ না?"

লাবণ্য দেখিল। দেখিয়া বুঝি অজ্ঞাতে একটু শিহরিয়া উঠিল।

শকুনির মতো শীর্ণ বীভৎস মুখের কানা একটি চোখের ভয়ংকর দৃষ্টি দিয়া মূর্তিমতী জরা যেন তাহাকে বিদ্ধ করিতেছে।

লাবণ্যের সংসার শুরু হইল।

ঝি দুই দিন থাকিবার পর ভুতুড়ে বাড়ি সম্বন্ধে নানারূপ অসংলগ্ন মন্তব্য করিয়া চলিয়া গিয়াছে। চারিটি মাত্র প্রাণী এই বিশাল ভগ্ন প্রাসাদের অভ্যন্তরে অপেক্ষাকৃত নিরাপদ তিনটি ঘরে বাস করে। উপরে নিচে চারি-ধারে শুধু আগাছার জঙ্গল ও অব্যবহার্য পরিত্যক্ত ঘরের সারি। তাহার কোনোটির কড়িকাঠ ঝুলিয়া ছাদ পড়ো-পড়ো হইয়াছে। কোনোটার দেয়াল ধসিয়া পড়িয়াছে। মাকড়সা, চামচিকে ও ইঁদুর তাহাদের সবগুলিকেই দখল করিয়া আছে।

পোড়ো বাড়ির ঘরগুলির মতো বাড়ির বাসিন্দাগুলিও রহস্যময়। পিসিমা বলিয়া প্রথম যাঁহাকে প্রণাম করিতে হইয়াছিল, তাঁহার দেখাই বড়ো মিলে না। অন্ধকার একটি কোণের ঘরে সারাদিন তিনি খুটখাট করিয়া কি যে করেন কিছুই জানিবার উপায় নাই। সে-ঘরে কাহাকেও প্রবেশ করিতে দিতে যে

তিনি চাহেন না, এ-কথা বুঝিতে লাবণ্যের বিশেষ বিলম্ব হয় নাই। দৈবাৎ কখনও সামনাসামনি পড়িয়া গিয়া চোখাচোখি হইয়া গেলে তিনি এমনভাবে তাহার দিকে তাকান যে, অকারণে লাবণ্যের বুকের ভিতর পর্যন্ত হিম হইয়া যায়।

স্বামীকেও সে বুঝিতে পারে না। সারাদিন কাজ-কর্ম লইয়া একরকম সে ভুলিয়া থাকে। রাত্রে শয়নঘরে ঢুকিতে তাহার কেমন যেন ভয় করে।

ঘরটি প্রকাণ্ড। কড়িকাঠ যেখানে-যেখানে দুর্বল, সেখানে বাঁশের ঠেকো দিয়া তাহাকে জোর দিবার চেষ্টা করা হইয়াছে বলিয়া বড়ো অদ্ভুত দেখায়। দুইধারে দুইটি জানালা। একটি খুলিলে সম্মুখের প্রকাণ্ড বাঁশবাগান ও পুকুর চোখে পড়ে। আরেকটি বন্ধই থাকে। একদিন খুলিতে গিয়া ভয়ে আর লাবণ্য সে-চেষ্টা করে নাই। সে-জানালার পাশেই অব্যবহার্য একটি অন্ধকার ঘর ভাঙা কাঠ-কাঠরা জঞ্জালে বোঝাই হইয়া আছে। জানালা খুলিবা-মাত্র ঝটপট কিসের একটা শব্দ শুনিয়া সভয়ে আবার লাবণ্য বন্ধ করিয়া দিয়াছিল। হয়তো চামচিকাই হইবে, কিন্তু লাবণ্যের ভয় যায় নাই।

লাবণ্য ঘরে ঢুকিয়া হয়তো দেখে স্বামী আগে হইতেই বিছানায় বসিয়া আছে। তাহার দিকে ভ্রুক্ষেপও নাই। সংকুচিতভাবে সে খানিকক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকে, তাহার পর ধীরে-ধীরে হয়তো বিছানার এক পাশে বসে। স্বামী তবুও ফিরিয়া চাহে না ; নিজের চিন্তাতেই তন্ময় হইয়া থাকে।

তাহার পর হঠাৎ একসময়ে স্বামী তাহাকে জড়াইয়া ধরিয়া আদরে চুম্বনে একেবারে অভিভূত করিয়া দেয়। স্বামীর কঠিন বাহুবন্ধনের ভিতর নিশ্চিন্ত আরামে আত্মসমর্পণ করিতে গিয়া কিন্তু লাবণ্য সম্পূর্ণ সফল হয় না—তাহার মনের কোথায় যেন একটি বাধা থাকিয়া যায়।

সস্নেহে তাহাকে কাছে বসাইয়া বাম বাহু দিয়া তাহার কণ্ঠ জড়াইয়া ধরিয়া স্বামী জিজ্ঞাসা করে—"তোমার এখানে কষ্ট হচ্ছে না তো লাবণ্য?"

লাবণ্য ঘাড় নাড়িয়া জানায়—না, তাহার কষ্ট হইতেছে না।

"আমাকে তোমার পছন্দ হয়েছে তো?"

অত্যন্ত সাধারণ স্বামী-স্ত্রীর প্রশ্নোত্তর। সলজ্জভাবে 'হুঁ' বলিয়া লাবণ্য স্বামীর বুকে মুখ লুকাইয়া ফেলে।

কিন্তু এই সাধারণ কথাবার্তা হঠাৎ অসাধারণ রূপ গ্রহণ করে। স্বামী সজোরে তাহার মুখটা তুলিযা হঠাৎ উগ্রকণ্ঠে বলে—"অত্যন্ত সহজে হুঁ ব'লে ফেললে, কেমন? পছন্দ হওয়াটা তোমাদের কাছে এমনি সহজ ব্যাপার!"

লাবণ্য কিছু বুঝিতে না পারিয়া সবিস্ময়ে চাহিয়া থাকে। স্বামীর গলা আরও চড়িয়া যায়—

উত্তেজিতভাবে বলিতে থাকে—"একবার জড়িয়ে ধ'রে কাছে টেনে নিলেই পছন্দ হ'য়ে গেল! এই তো পছন্দের দাম? কেমন, না?"

লাবণ্য চুপ করিয়া থাকে।

স্বামী বিছানা হইতে উঠিয়া পড়িয়া ক্ষিপ্তের মতো জিজ্ঞাসা করে, "বলো, চুপ ক'রে আছ কেন? উত্তর দিতে পারো না?"

এ-কথার উত্তরে কি বলিতে হইবে কিছু বুঝিতে না পারিয়া লাবণ্য চুপ করিয়া থাকে। স্বামী অশান্তভাবে ঘরের ভিতর পায়চারি করিয়া বেড়ায়।

কিন্তু স্বামীর উত্তেজনা যেমন বেগে আসে তেমনি তাড়াতাড়ি শান্ত হইয়া যায়। শান্তভাবে আবার তাহার কাছে আসিয়া বসিয়া বলে—"রাগ করলে লাবণ্য?"

লাবণ্য ধরা-গলায় বলে, "না, তুমি অমন করছিলে কেন?"

"ও কিছু নয়, তোমার সঙ্গে একটু ঠাট্টা করলাম! তুমি আমায় সারা-জীবন সত্যি ভালোবাসবে তো? —বাসবে?"

লাবণ্যের মুখে হাসি দেখা দেয়। আরেকবার স্বামীর বুকে মাথা রাখিয়া সে ধীরে-ধীরে অর্ধস্ফুট স্বরে বলে, "তুমি বুঝি বাসবে না?"

কিন্তু স্বামীর ঠাট্টার সমাপ্তি ওইখানেই নয়। অর্ধেক রাত্রে হঠাৎ ঘুম ভাঙিয়া হয়তো লাবণ্য দেখে—ঘরের দেয়ালে টাঙানো বাতিটি উজ্জ্বলভাবে জ্বলিতেছে এবং স্বামী বিছানায় উঠিয়া বসিয়া তাহার মুখের দিকে অপলক দৃষ্টিতে তাকাইয়া আছে।

সে-দৃষ্টিতে অনুরাগের কোমলতা নাই—সে-দৃষ্টি তীব্র, তীক্ষ্ন!

লাবণ্য চোখ খুলিয়া চাহিতেই স্বামী যেন অপ্রস্তুত হইয়া চোখ ফিরাইয়া লইয়া সরিয়া বসে।

লাবণ্য জিজ্ঞাসা করে—"অমন ক'রে উঠে বসেছিলে কেন গো?"

"নাঃ, কিছু না—তুমি ঘুমের মধ্যে কি যেন বলছিলে তাই শুনছিলাম!"

"কি বলছিলাম?"

"না, না, বলোনি কিছু। যদি কিছু বলো তাই শুনছিলাম।" —বলিয়া কথাটাকে উড়াইয়া দিয়া স্বামী তাহার উঠিয়া পড়ে।

আর একদিন ভোরের বেলা ঘুম হইতে উঠিয়া লাবণ্য অবাক হইয়া গেল। ঘরের ভিতর তখনও অন্ধকার। দেয়ালের আলো তেলের অভাবে বোধ হয় নিবিয়া গিয়াছে। কিন্তু সকাল হইতেও আর দেরি নাই। পূর্বদিকের জানালা দিয়া বাঁশবাগানের মাথায় আকাশের রং ঈষৎ লাল হইয়া উঠিতেছে দেখা যায়। বিছানা হইতে উঠিয়া গিয়া হঠাৎ বাধা পাইয়া লাবণ্য দেখিল, তাহার অঞ্চল-প্রান্ত নিজের কাপড়ের খুঁটের সহিত স্বামী শক্ত করিয়া বাঁধিয়া রাখিয়াছে। স্বামীর এই রসিকতায় মনে মনে হাসিয়া ধীরে-ধীরে সে গেরো খুলিয়া লইতেছিল এমন সময়ে কাপড়ে সামান্য টান লাগায় স্বামী জাগিয়া উঠিল।

কিন্তু জাগিয়া উঠিয়া সে এমন কাণ্ড যে করিয়া বসিবে এ-কথা লাবণ্য কল্পনাও করিতে পারে নাই। সবলে তাহার হাত চাপিয়া ধরিয়া স্বামী তীক্ষ্ন-কন্ঠে জিজ্ঞাসা করিল—"কোথায়? কোথায় যাচ্ছ এত রাত্রে? কোথায়?"

স্বামীর ঘুমের ঘোর এখনও কাটে নাই মনে করিয়া লাবণ্য হাসিয়া বলিল —"স্বপ্ন দেখছ নাকি! আমি গো আমি! হাত ছাড়ো, লাগছে!"

স্বামী কিন্তু উচ্চতর কণ্ঠে বলিল—"হ্যাঁ হ্যাঁ তুমি, তুমি; তোমায় চিনি! কোথায় যাচ্ছ বলো শিগগির; নইলে খুন ক'রে ফেলব!"

এবার লাবণ্য একটু বিরক্তই হইল—বলিল, "খুন করবার আগে ভালো ক'রে একটু চোখ দুটো রগড়ে দেখো! ভোর হয়েছে, উঠতে হবে না?"

পূর্বের জানালা দিয়া আকাশের রক্ত আভা তখন ঘরের ভিতর পর্যন্ত ঈষৎ রাঙাইয়া দিয়াছে। সেইদিকে চাহিয়া হাত ছাড়িয়া দিয়া স্বামী খানিক চুপ করিয়া রহিল। তাহার পর হঠাৎ হোহো হাসিয়া বলিল—"চোর ব'লে

আরেকটু হ'লে তোমায় খুন করতে যাচ্ছিলুম আর কি! ভারি বিশ্রী স্বপ্ন দেখছিলুম।”

হয়তো কথাটা সত্য! কিন্তু লাবণ্যের মনে কেমন একটি সন্দেহ জাগিতে থাকে। কাপড়ে গিঁট দেওয়ার রসিকতাটা কেমন যেন বিসদৃশ ঠেকে।

স্বামীকে সে বুঝিতে পারে না বটে কিন্তু এ-বাড়ির সুন্দরী মেয়েটিকে তাহার আরও দুর্জ্ঞেয় বলিয়া মনে হয়। বয়সে সে তাহার চেয়ে কিছু বড়োই হইবে—নাম মাধুরী। সে যে এ-বাড়ির কে, এই পরিবারটির সহিত তাহার সম্বন্ধ যে কি, তাহা জানিবার উপায় নাই। তাহার স্বামীকে সে দাদা বলিয়া সম্বোধন করে—সুতরাং ভগিনীস্থানীয়া কেহ হইবে। কিন্তু আপনার ভগিনী যে নয়, এ-বিষয়ে শুধু চেহারা দেখিয়া নয়, তাহার আচরণ দেখিয়াও নিঃসন্দেহ হওয়া যায়।

মাধুরীর বিবাহ হইয়াছে কি না বলা অসম্ভব। সে চওড়াপাড় শাড়ি পরে, সর্বাঙ্গে তাহার বহুমূল্য অলংকার সারাক্ষণ ঝলমল করে, পায়ে আলতা পরিয়া বিম্বফলের মতো অধর দুটি তাম্বুলে রঞ্জিত করিয়া সারাদিন সে পটের ছবিটি সাজিয়া থাকে। অথচ তাহার মাথায় সিঁদুর নাই এবং বিবাহের বয়স অনেকদিন পার হইয়াছে বলিয়াই মনে হয়।

তাহার গতিবিধিও রহস্যময়। সারাদিন সে যে কোথায় থাকে কোনো সন্ধান পাওয়া যায় না। হঠাৎ কখন কোথা হইতে আসিয়া লাবণ্যের গলা জড়াইয়া ধরিয়া চুমা খাইয়া হয়তো বলে—“তোকে বড্ডো ভালোবেসে ফেলেছি ভাই ; চ, তোকে নিয়ে কোথাও পালাই।”

অর্থহীন অসংলগ্ন কথা ; তবু লাবণ্যকে হাসিয়া জবাব দিতে হয়—“কোথায় পালাব ?”

“কেন দিল্লি, লাহোর! তুই সাজবি বর, আমি হব তোর কনে। তুই মালকোঁচা মেরে কাপড় পরবি আর ছোটো-বড়ো চুল ছেঁটে পাঞ্জাবি চড়িয়ে উড়ুনি উড়িয়ে বেরুবি আর আমি তোর পাশে ঘোমটা দিয়ে থাকব। রোজগার ক'রে খাওয়াতে পারবি তো?”

লাবণ্য বলে—“কেন, তুমিই বর হও না!”

“দূর, তা হ'লে মানাবে কেন? আমার এ-রূপ কি কোঁচা চাদরে ঢাকা যাবে রে হতভাগী!” বলিয়া হাসিয়া আবার মাধুরী উধাও হইযা যায় এবং খানিকবাদেই হয়তো আবার ফিরিয়া আসিয়া রন্ধনরতা লাবণ্যের কড়ায় এক খামচা নুন টপ্ করিয়া ফেলিয়া দিয়া বলে—“বাপের বাড়ি খালি গিলতে শিখেছিলি বুঝি? রাঁধতেও শিখিসনি ছাই!”

লাবণ্য শশব্যস্ত হইয়া বলে—“ও কি করলে ঠাকুরঝি! নুন যে দিয়েছি একবার!

“বেশ তো, খেতে গিয়ে দাদার মুখ পুড়ে যাবে, আর তুই গাল খাবি!” বলিয়া মাধুরী হাসিতে থাকে। সে-হাসি দেখিলে সব অপরাধ, সব অন্যায় মার্জনা করা যায়।

কড়াটা নামাইয়া ফেলিয়া লাবণ্য হাসিয়া বলে, “তুমি ভারী দুষ্টু।”

“আর তুই লক্ষ্মীর প্যাঁচাটি!” বলিয়া রাগ দেখাইয়া মাধুরী চলিয়া

যায়। লাবণ্য হাসিতে থাকে।

মাধুরীর হালচালই এমনি। লাবণ্য তাহাকে না ভালোবাসিয়া থাকিতে পারে নাই। এই ভয়ংকর বাড়িটির ভিতর লাবণ্যের শঙ্কিত সন্ত্রস্ত মন শুধু এই মেয়েটির কাছে আসিয়াই যেন হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচে। প্রথম দিন হইতেই তাহার অদ্ভুত আচরণের পরিচয় সে পাইয়াছে। তবু মুগ্ধ হইয়াছে।

ফুলশয্যার রাত্রে আয়োজন অনুষ্ঠান কিছুই তাহাদের হয় নাই। বাপের বাড়ির ঝি তখন উপস্থিত। ইহাদের কাণ্ডকারখানা সম্বন্ধে নানা কঠোর মন্তব্য উচ্চস্বরে অনেকক্ষণ ধরিয়া করিয়াও কোনো ফল না হওয়ায় অবশেষে ঝি নিজেই তাহাকে সারা বিকাল সাজাইয়া গোছাইয়া শয়নঘরে ঠেলিয়া পাঠাইয়া দিয়াছিল।

নির্জন ঘর। জড়সড় হইয়া একা সে-ঘরে বসিয়া থাকার জন্য লজ্জা ও ভয়ের তাহার আর সীমা ছিল না। মাধুরী সকালে একবার তাহাকে দেখা দিয়াই সেই যে অন্তর্ধান হইয়াছিল, সারাদিন তাহার আর দেখা মিলে নাই। স্বামীও কোথায় বাহির হইয়া গিয়াছেন। কখন ফিরিবেন কে জানে? কত রাত তাহাকে এমনি নিঃসংগভাবে নির্জন ঘরে কাটাইতে হইবে, ঝি-এর কাছে পুনর্বার ফিরিয়া যাওয়া উচিত কিনা—ভাবিতে-ভাবিতে লাবণ্য হঠাৎ চোখে হাত চাপা পড়ায় চমকিয়া উঠিল। প্রথমে মনে হইয়াছিল, স্বামীই বুঝি আসিয়াছেন কিন্তু পরক্ষণেই বুঝিতে পারিল এমন কোমল অংগুলি পুরুষের হইতে পারে না। সংগে-সংগে হাসি শুনিয়া তাহার সন্দেহ সহজেই দূর হইয়া গেল।

মাধুরী খিলখিল করিয়া হাসিয়া তাহার চোখ ছাড়িয়া দিয়া সামনে আসিয়া হাত মুখ নাড়িয়া চোখের অপরূপ ভংগী করিয়া বলিল, "মেয়ের কি আস্পর্ধা, উনি ভেবেছেন ও'র বর বুঝি এসে চোখ টিপছে! বরের দায় পড়েছে!"

পরিচয় তখনও গভীর হয় নাই, তবু লাবণ্য না বলিয়া থাকিতে পারে নাই—"যাঃ, আমি বুঝি তাই ভেবেছি!"

"তবে কি ভেবেছ শুনি? ও-পাড়ার বেন্দা বোষ্টম এসে চোখ টিপছে!"

"যাঃ" বলিয়া চোখ তুলিয়া মাধুরীর দিকে চাহিয়াই লাবণ্য একেবারে অবাক হইয়া গিয়াছিল।

সর্বাংগ পুষ্পাভরণে অলংকৃত করিয়া মাধুরী সাক্ষাৎ বনদেবীর মতোই সাজিয়া আসিয়াছে। সে-রূপ দেখিয়া চোখ ফেরানো দুষ্কর। এত ফুলই বা সে কোথা হইতে সংগ্রহ করিল কে জানে?

"অমন ক'রে অবাক হ'য়ে দেখছিস কি বল দেখি?"—বলিয়া লাবণ্যের পাশে বসিয়া পড়িয়া আবার বলিল, "এখন বল দেখি, তোর ফুলশয্যা না আমার?"

অদ্ভুত কথা! তবু লাবণ্য হাসিয়া বলিয়াছিল—"তোমারই তো দেখছি!"

"শেষ পর্যন্ত দেখতে পারবি তো?" বলিয়া সহসা কলহাস্যে সমস্ত ঘর মুখরিত করিয়া মাধুরী জোর করিয়া লাবণ্যকে ঠেলিতে-ঠেলিতে আবার বলিয়াছিল—"তবে বেরো ঘর থেকে! দেখি তোর বুকের জোর!"

লাবণ্য হাসিতেছিল। ঠেলা দিতে-দিতে সত্য-সত্যই তাহাকে দরজার কাছ

পর্যন্ত সরাইয়া লইয়া গিয়া হঠাৎ মাধুরী থামিয়া বলিয়াছিল—"এই যে মহিদা! আর বুঝি তর সইল না? এই নাও বাপু, তোমার বউ এখনও পর্যন্ত আস্তই আছে! আরেকটু হ'লেই ঠেলে ঘরের বার ক'রে দিয়েছিলাম আর কি?"

মহিম দরজায় দাঁড়াইয়া ছিল। মুখ তাহার অত্যন্ত গম্ভীর। মাধুরীর রসিকতা তাহাকে স্পর্শই করে নাই যেন।

স্বামীর সামনে পড়িয়া গিয়া লাবণ্য একেবারে লজ্জায় জড়সড় হইয়া 'ন যযৌ ন তস্থৌ', অবস্থায় দাঁড়াইয়া পড়িয়াছিল। মাধুরী তাহাকে হিড়হিড় করিয়া টানিয়া একেবারে বিছানার উপর ফেলিয়া দিয়া বলিল—"নে তাড়াতাড়ি দখল কর ভাই; আমি যাই। মানুষের মন তো, মতিভ্রম হ'তে কতক্ষণ!"

মহিমের দিকে হাসিয়া একবার চাহিয়া মাধুরী বাহির হইয়া গিয়াছিল কিন্তু কিছুক্ষণ বাদেই ফিরিয়া আসিয়া দরজা হইতে একটা পুঁটুলি ঘরের ভিতর ফেলিয়া দিয়া বলিয়াছিল—"তোমার বউ-এর ফুলের গহনা নাও মহিদা, তাড়াতাড়িতে দিতে ভুলে গিয়েছিলাম।"

মহিম গম্ভীর মুখে পুঁটুলিটি তুলিয়া লইয়া বিছানার উপর নামাইয়া খুলিয়া ফেলিতেই কিন্তু দেখা গিয়াছিল তাড়াতাড়ি খুলিবার দরুন বা পুঁটুলি করিয়া বাঁধিবার জন্য যে-কারণেই হোক ফুলগুলি সমস্তই চটকানো।

মাধুরীর সব আচরণের অর্থ বোঝা যাক বা না যাক, লাবণ্য সেইদিনই তাহাকে ভালোবাসিয়া ফেলিয়াছিল।

রহস্যপুরীর মাঝখানে এমনি করিয়া দ্বিধায় দ্বন্দ্বে ভয়ে আনন্দে লাবণ্যের দিন একরকম কাটিয়া যাইতেছিল। বিমাতা-শাসিত বাপের বাড়িতে সুখের সহিত পরিচয় তাহার বড়ো বেশি হয় নাই, সুতরাং এখানকার দুঃখে অভাবে বড়ো বেশি বিচলিত হইবার তাহার কথা নয়। এ-বাড়ির রহস্য এবং ভীতিও ক্রমশ তাহার গা-সওয়া হইয়া আসিতেছিল। বাপের বাড়ি হইতে কালেভদ্রে খোঁজ লইতে আসে—সেখানে যাইবার কিন্তু তাহার আর উপায় নাই সে বোঝে। বুঝি তাহার ইচ্ছাও নাই। এখানেও কোনোরকমে জীবনের দিনগুলি কাটাইয়া দিবার সাহস ও সহিষ্ণুতা সে অনেকটা সঞ্চয় করিয়া ফেলিয়াছিল। কিন্তু তাহা হইবার নয়—

সকালবেলা। দূরে কোথায় যাইতে হইবে, তাই তাড়াতাড়ি সেদিন মহিম খাওয়া সারিয়া লইয়াছে। পান দিবার জন্য লাবণ্য ঘরে ঢুকিয়াছিল। মহিম তাহাকে বুকের কাছে টানিয়া লইয়া বলিল—"আমি কিন্তু আজ যদি না আসতে পারি, তোমার একলা রাত্রে শুতে ভয় করবে না তো লাবণ্য?"

ভয় তাহার করে—করিবেই, কিন্তু স্বামীকে সে-কথা বলিয়া উদ্বিগ্ন করা উচিত হইবে কিনা বুঝিতে না পারিয়া সে চুপ করিয়া রহিল।

মহিম আবার জিজ্ঞাসা করিল—"কি গো, বলো না, ভয় করবে?"

একটু ইতস্তত করিয়া লাবণ্য বলিল—"না, ভয় আর কি?"

"না, ভয় আর কি?' ভয় তোমার হবে কেন? একলা শুতেই তুমি চাও. একলাই ভালোবাসো, কেমন?"

সে-স্বরে ব্যঙ্গের আভাস পাইয়া বিস্মিত হইয়া মুখ তুলিয়া লাবণ্য

দেখিল, স্বামীর মুখ অস্বাভাবিকরকম কঠিন হইয়া উঠিয়াছে। স্বামীর অদ্ভুত আচরণের সহিত তাহার এতদিনে ভালো করিয়াই পরিচয় হইয়াছে। একটু ক্ষুণ্ণ-স্বরে বলিল, "ভয় পাব না বললেও দোষ হয় নাকি? জানি না বাপু!"

"না, দোষ আর কি"—বলিয়া মহিম সে-কথা চাপা দিল।

কিন্তু কিয়ৎক্ষণ পরেই তাহাকে ডাকিয়া বলিল—"যাবার আগে তোমাকে একটা জিনিস দেখিয়ে যেতে চাই! দেখবে?"

"কি জিনিস?"

"এসো আমার সঙ্গে।"

স্বামীর এই ছেলেমানুষিতে সায় দিবে কিনা লাবণ্য বিচার করিতেছিল কিন্তু মহিম তাহাকে সে-অবসর দিল না। হাত ধরিয়া একপ্রকার জোর করিয়া টানিয়াই তাহাকে যেখানে আনিয়া দাঁড় করাইল, সেটি পরিত্যক্ত একদিকের মহলের পুরাতন অব্যবহার্য একটি ঘর।

মরচে-পড়া তালা খুলিয়া লাবণ্যকে ভিতরে ঢুকাইয়া তাহার হাতে একটি দেশলাই দিয়া মহিম বলিল, "আচ্ছা, এই দেশলাইটা জ্বালো দেখি।"

লাবণ্য দেশলাই জ্বালাইতেছিল, হঠাৎ পিছনে দরজা বন্ধের শব্দ শুনিয়া সবিস্ময়ে তাকাইয়া দেখিল, স্বামী বাহিরে গিয়া দরজা ভেজাইয়া দিয়াছেন। শুধু তাই নয়, দরজায় শিকলি তোলার শব্দও পাওয়া গেল।

এ আবার কিরকম ঠাট্টা! লাবণ্য বলিল, "ও কি করছ; ভাঁড়ার এলো রেখে এসেছি। এখন আমার রঙ্গ করবার সময় নেই! খোলো তাড়াতাড়ি।"

কিন্তু দরজার ওদিক হইতে কোনো সাড়াশব্দ শোনা গেল না।

লাবণ্য আবার বলিল—"এখন কি ছেলেমানুষির সময়। তোমার এঁটো থালা-বাটি সব প'ড়ে আছে; পিসিমা, ঠাকুরঝি কেউ খায়নি—খোলো।"

কিন্তু তথাপি কেহ উত্তর দিল না।

এবার লাবণ্যের ভয় হইল। অন্ধকার ঘরের ভিতর কিছুই দেখা যায় না—শুধু এখানে-ওখানে নানাপ্রকার শব্দ হইতে থাকে।

লাবণ্য দরজায় সবেগে করাঘাত করিয়া নববধূর পক্ষে অশোভন উচ্চ কাতরকণ্ঠে ডাকিল—"ওগো কেন এমন করছ? খুলে দাও, আমার ভয় করছে।"

কোথাও কাহারও সাড়াশব্দ নাই। স্বামীকে সে একটু চিনিতে শিখিয়াছে। —মনে হইল যদি সে দরজায় তালা দিয়া একেবারে চলিয়াই গিয়া থাকে! যদি এ ক্ষণিকের পরিহাস না হয়?

ভাবিতেই তাহার সর্বাঙ্গে কাঁটা দিয়া উঠিল। এখান হইতে চিৎকার করিয়া গলা চিরিয়া ফেলিলেও কেহ যে শুনিতে পাইবে না এ-কথা সে ভালো করিয়াই বোঝে। এই অন্ধকার নির্জন পরিত্যক্ত ঘরে তাহাকে সারা দিনরাত্রি কতক্ষণ যে কাটাইতে হইবে কে জানে! আশঙ্কায় উদ্বেগে কাঁদিয়া ফেলিয়া আর একবার স্বামীকে মিনতি করিয়া কাতরস্বরে সে বলিল—"ওগো তোমার পায়ে পড়ি, খুলে দাও, কেন আমায় এমন ক'রে কষ্ট দিচ্ছ?"

সে-মিনতি কেহ শুনিল না। শুনিবার কেহ ছিল বলিয়াও মনে হয় না।

কতক্ষণ এইভাবে যে তাহার কাটিয়াছে সে জানে না। ভয়ের চরম অবস্থা পার হইয়া অবসাদে তাহার সমস্ত দেহমন তখন প্রায় নিস্পন্দ হইয়া আসি-

য়াছে। লাবণ্যের মনে হইল, কে যেন দরজার পাশ দিয়া চলিয়া যাইতেছে। প্রাণপণে চেষ্টা করিয়া সে ডাকিল—"কে"?

বাহিরের পদশব্দ থামিল।

লাবণ্য অস্ফুট কণ্ঠে আর একবার বলিল—"আমায় খুলে দাও না গো!"

পরমুহূর্তেই সুমধুর হাস্যধ্বনি শোনা গেল—"ওমা, তুই এখানে!"

তাহার পর শিকলি খুলিয়া ঘরে ঢুকিয়া মাধুরী বলিল, "আর আমি এই ভেবে নিশ্চিন্ত হ'য়ে ব'সে আছি যে তুই পালিয়ে গেছিস! দেখ দেখি তোর অন্যায়! এমন ক'রে মানুষকে হতাশ করে?"

তাহার কথায় বুঝি মড়ার মুখেও হাসি ফোটে। ম্লান হাসিয়া লাবণ্য বলিল, "যমের বাড়ি ছাড়া পালাব কোথায় ঠাকুরঝি!"

যেন সাগ্রহে তাহার মুখের কাছে মুখ আনিয়া মাধুরী বলিল—"দূর, যমের বাড়ি যাবি কেন? পৃথিবীতে আর জায়গা নেই! পালাবি বল, সব বন্দোবস্ত ক'রে দিই তা হ'লে। বাড়ির মাছিটি পর্যন্ত টের পাবে না।"

তাহার কথার ধরনে এত দুঃখেও লাবণ্যের মুখে আবার হাসি দেখা দিল। খানিক চুপ করিয়া থাকিয়া হঠাৎ জিজ্ঞাসা করিয়া বসিল—"কিন্তু ও কেন অমন করে ঠাকুরঝি, বলতে পারো? কি আমার অপরাধ?"

"তোর অপরাধ নয়? মরতে কেন এ-বাড়িতে তুই এসে জুটেছিস? পালাতে বললাম, তা কথাটা যেন গায়েই মাখলি না—তোর অপরাধ নয়?" কিন্তু খানিক বাদেই গম্ভীর হইয়া বলিল—"এ-বাড়ির এমন দশা কেন জানিস?"

লাবণ্য তাহার গলার স্বরে বিস্মিত হইয়া উৎসুকভাবে জিজ্ঞাসা করিল, "কেন?"

মাধুরীর উত্তেজিত কণ্ঠ শোনা গেল—"মেয়েমানুষের শাপে, হাজার-হাজার মেয়েমানুষের শাপে এ-বাড়ির প্রত্যেকটি ঘরের ভিত পর্যন্ত ঝাঁজরা হ'য়ে গেছে। সাতপুরুষ ধ'রে এরা মেয়েমানুষের এমন অপমান লাঞ্ছনা নেই, যা করেনি। তাদের সে-অভিশাপ যাবে কোথায়! যা নিয়ে একদিন ছিনিমিনি খেলেছে তারই জন্য দুর্ভাবনা আজ তোর বরের বুক কুরে-কুরে খাচ্ছে! ও যে সেই বংশের শেষ বাতি!"

কথা কহিতে-কহিতে তাহারা তখন অঙ্গনের আলোকে নামিয়া আসিয়াছে। সে-আলোয় মাধুরীর মুখের চেহারা দেখিয়া লাবণ্যের বিস্ময়ের আর সীমা রহিল না। অমানুষিক রাগে ও ঘৃণায় তাহার সেই পরম সুন্দর মুখ বীভৎস হইয়া উঠিয়াছে।

মাধুরীর সব কথা ভালো করিয়া লাবণ্য সেদিন বুঝিতে পারে নাই। কিন্তু তাহার মনের কোণে একটি অহেতুক আতঙ্কের সঞ্চার হইয়াছিল। সে-আতঙ্ক স্বামীর আচরণে ক্রমশ বাড়িয়াই চলিল।

স্বামীকে এখন প্রায়ই দূরে যাইতে হয়। ছুতা করিয়া নয়, সোজাসুজি সবলেই মহিম তাহাকে ঘরের ভিতর পুরিয়া চাবি বন্ধ করিয়া দিয়া যায়। স্বামী চলিয়া যাইবার পর মাধুরী আসিয়া তাহাকে মুক্ত করিয়া দেয়, এই-টুকুই যা সান্ত্বনা। আবার স্বামী আসিবার পূর্বে মাধুরী তাহাকে ঘরের ভিতর পুরিয়া দরজা বন্ধ করিয়া রাখে।

কিন্তু একদিন এ-কৌশল ফাঁক হইয়া গেল।

মহিম তাহাকে বন্দী করিয়া চলিয়া গিয়াছিল। মাধুরী আসিয়া দরজা খুলিয়া বলিল, "মজা দেখবি তো আয়—"

"কি মজা?"

"পিসিমার ঘরে কি আছে দেখবি? পিসিমা আজ ভুলে ঘরে তালা না দিয়েই কোথায় বেরিয়েছে!"

সভয়ে লাবণ্য বলিল, "না, না, দরকার নেই, পিসিমা এসে পড়বে।"

কিন্তু মাধুরী ছাড়িবার পাত্রী নয়, বলিল, "এলেই বা; মেরে তো আর ফেলতে পারবে না দু-দুটো জোয়ান মেয়েকে!"

লাবণ্য তবুও আপত্তি করিতেছিল, মাধুরী তাহাকে একরকম জোর করিয়া টানিয়া লইয়া গেল।

পিসিমা ঠিক তালা দিতে ভোলেন নাই তবে দৈবাৎ চাবি ঠিক লাগে নাই, তালা আলগাই আছে। মাধুরী দরজা খুলিয়া লাবণ্যকে টানিয়া লইয়া ঘরে প্রবেশ করিল।

ঘর অন্ধকার। সে-অন্ধকারে চোখ অভ্যস্ত হইয়া যাওয়ার পর দেখা গেল, সংকীর্ণ ঘরে কোথাও আর স্থান নাই, ছোটো বড়ো বাক্স-পেঁটরা, সিন্দুক, বাসন-কোসন, কাপড়-চোপড়ে ছাদ পর্যন্ত বোঝাই হইয়া আছে।

লাবণ্য ভয়ে-ভয়ে বলিল, "দেখা তো হ'ল, চলো এবার যাই।"

মাধুরী বলিল, "দূর, এখনো কিছুই দেখিসনি।" তাহার পর ঝট করিয়া একটা বাক্সের তালা খুলিয়া সে প্রথমেই যে-জিনিসটি বাহির করিয়া আনিল, অন্ধকারেও তাহার স্বরূপ বুঝিয়া লাবণ্য চমকাইয়া উঠিল।—সে-কালের জড়োয়া গহনা! লাবণ্যের মনে হইল, অন্ধকারে তাহার মূল্যবান পাথরগুলি হিংস্র সরীসৃপের চোখের মতোই যেন তাহার দিকে ক্রূর দৃষ্টিতে চাহিয়া আছে। লাবণ্যের বুকের ভিতরটা অকারণ ভয়ে শুকাইয়া আসিতেছিল। বলিল, "চলো, চলো ঠাকুরঝি, আমার ভালো লাগছে না।"

"তুই তো আচ্ছা ভয়-কাতুরে!" মাধুরী সশব্দে বাক্সটা মেঝের উপর উজার করিয়া ফেলিয়া বলিল—"নে, বেছে নে। বুড়ির ঘরে এমন জিনিস জমা হ'য়ে থেকে কোনো লাভ আছে কি?"

"না, না, ঠাকুরঝি চলো!" কিন্তু মাধুরীর চোখ দুইটাও তখন কিসের উন্মত্ততায় জ্বলিতেছে। বাক্সের পর বাক্স, পাত্রের পর পাত্র সে মেঝের উপর উপুড় করিয়া ফেলিতেছিল। কঠিন স্বরে বলিল, "না, দেখি আগে সব।"

গহনা, টাকা, মোহর, মণিরত্ন—এই প্রাচীন লুপ্তপ্রায় পরিবারের সমস্ত সম্পদ বৃদ্ধা বুঝি তাহার ঘরে সঞ্চিত করিয়া রাখিয়াছে। সেই সম্পদ আগ-লাইয়া ডাইনীর মতো সে দিনরাত্রি বসিয়া থাকে—অন্ধকারে তাহাদের দিকে চাহিয়া থাকিতে থাকিতে প্রাণহীন প্রস্তরের অস্বাভাবিক জ্যোতির প্রখরতা তাহার চোখেও যেন ফুটিয়া উঠিয়াছে।

সহসা লাবণ্য 'মাগো' বলিয়া অস্ফুট চিৎকার করিয়া উঠিল। মাধুরী চোখ তুলিয়া দেখিল, বৃদ্ধা দরজায় দাঁড়াইয়া হিংস্র শ্বাপদের মতো তাহাদের দিকে চাহিয়া আছে। সে শুধু এক মুহূর্তের জন্য—পরক্ষণেই শোনা গেল বৃদ্ধা সশব্দে দরজা বন্ধ করিয়া বাহির হইতে শিকল তুলিয়া দিতেছে। সঙ্গে-সঙ্গে

মাধুরীর কলহাস্যে ঘর মুখরিত হইয়া উঠিল।

লাবণ্য কাতরকণ্ঠে বলিল, "কি হবে ঠাকুরঝি!"

"হবে কি আবার, গয়না পার আয়—!" বলিয়া মাধুরী একছড়া মুক্তার হার লাবণ্যের গায়ের উপর ছুঁড়িয়া দিল।

সারাদিন বন্দী থাকিবার পর সন্ধ্যায় মহিম পিসিমার সহিত আসিয়া দরজা খুলিল। ইতিমধ্যে কি তাহাদের কথাবার্তা হইয়াছিল বলা যায় না কিন্তু মহিম এ-ব্যাপারের উল্লেখ পর্যন্ত করিল না। এক-গা গহনা পরিয়া পিসিমার দিকে তাচ্ছিল্যের দৃষ্টি হানিয়া মহিমের দিকে ফিরিয়া ব্যঙ্গের হাসি হাসিয়া মাধুরী বাহির হইয়া গেল। পিসিমা বা মহিম তাহাকে কেহ কোনো বাধা পর্যন্ত দিল না।

নীরবে রাত্রি কাটিল।

সকাল হইতে দুপুর পর্যন্ত কোনো কথাই হইল না। বিকালে হঠাৎ মহিম আসিয়া বলিল, "চলো যেতে হবে!"

লাবণ্য সবিস্ময়ে স্বামীর মুখের দিকে চাহিল, কিছু বুঝিতে পারিল না।

মহিম আবার বলিল, "ওঠো, যেতে হবে!"

"কোথায়?"

"জানি না।" মহিম আলনা হইতে একটা চাদর লইয়া তাহার গায়ের উপর ছুড়িয়া দিয়া বলিল, "আর কিছু নিতে হবে না, ওঠো।"

তাহার গলার স্বরে ভয় পাইয়া লাবণ্য উঠিয়া দাঁড়াইল। কাতরকণ্ঠে একবার শুধু প্রশ্ন করিল, "কোথায় যাবে?"

মহিম উত্তর দিল না। তাহার একটি হাত শক্ত করিয়া ধরিয়া ধীরে-ধীরে অগ্রসর হইল।

আবার সেই অন্ধকার সুড়ঙ্গের মতো পথ, আবার সেই হাঁটুভর জংগল, ইট-কাঠের স্তূপ পার হইয়া লাবণ্য স্বামীর সহিত বাহির হইয়া আসিল। পিছনে বাড়ির আঙিনায় সর্বাঙ্গ অলংকারে ভূষিত করিয়া সুন্দরী মাধুরী তাহাদের যাত্রাপথের দিকে সকৌতুক দৃষ্টিতে চাহিয়াছিল, এইটুকু শুধু সে দেখিয়া আসিয়াছে। এ-বাড়িতে প্রথম প্রবেশের সময় যে-কলহাস্য তাহাকে অভ্যর্থনা করিয়াছিল, সেই কলহাস্যই বিদায়ের বেলায় তাহার কর্ণে ঝংকৃত হইতে লাগিল।

ট্রেনে সারা পথ কোনো কথা হয় নাই। শহরে যখন আসিয়া পৌঁছিল তখন রাত্রি হইয়াছে। তাহার উপর দারুণ দুর্যোগ! সারা শহরের উপর ঝড় ও বৃষ্টির উচ্ছৃঙ্খল মাতামাতি চলিয়াছে।

একটা গাড়ি ভাড়া করিয়া মহিম লাবণ্যকে লইয়া উঠিয়া বসিল। গাড়োয়ান জিজ্ঞাসা করিল, "কোথায় যেতে হবে হুজুর?"

"যেখানে খুশি।"

গাড়োয়ান এমন কথা হয়তো আগেও শুনিয়াছে। সে দ্বিরুক্তি না করিয়াই গাড়ি হাঁকাইয়া দিল।

গাড়ি কিছুক্ষণ চলিবার পর মহিম প্রথম কথা বলিল এবং কথা বলিল যেন একেবারে নতুন মানুষ হইয়া।

বলিল, "তোমায় অনেক কষ্ট দিয়েছি লাবণ্য; এতদিনের ব্যবহারে আমায়

মনে-মনে তুমি ঘৃণা করতে শুরু করেছ কিনা তাও জানি না ; কিন্তু একটি কথা বুঝে আজ আমায় ক্ষমা করতে অনুরোধ করছি লাবণ্য। ও-বাড়ির হাওয়া পর্যন্ত বিষাক্ত—এইটুকু জেনে তুমি আমায় মার্জনা করতে পারবে নাকি কখনো ?"

অন্ধকারে ডান হাতটি বাড়াইয়া স্বামীর হাতটি খুঁজিয়া লইয়া লাবণ্য এই স্নেহস্বরে অভিভূত হইয়া গিয়া বলিল—"কেন তুমি এসব কথা বলছ, বলো দেখি মনে আমার কিছু থাকলে তোমার সঙ্গে এমন ক'রে আসতে পারতাম কি ?"

মহিম গাঢ়স্বরে ডাকিল, "লাবণ্য।"

লাবণ্য স্বামীর বুকে মাথা রাখিয়া বলিল—"কি ?"

"আবার আমরা সহজ মানুষের মতো সংসার আরম্ভ করতে পারি না কি লাবণ্য ? সাতপুরুষের পাপ দেহ থেকে ধুয়ে ফেলে আবার নতুন জন্ম পাওয়া যায় না কি ? যেখানে কেউ আমাদের জানে না এমন জায়গায়, একেবারে নতুন ক'রে জীবন আরম্ভ করলে আবার আমি সহজ হ'তে পারব না কি ?"

"কেন পারবে না ?"

"তুমি জানো না লাবণ্য, কত বাধা, রক্তের ভেতর কত বিষ জ'মে আছে ! কিন্তু এ-বিষ থেকে আমি মুক্ত হবই, শুধু যদি তোমার ভালবাসা পাই।"

"তোমায় আমি ভালোবাসি না ?"

"বাসো, বাসো জানি, কিন্তু অসুস্থ মনে অকারণ সন্দেহ জাগে। সে-সন্দেহে মিছে পুড়ে মরি, তোমাকেও পোড়াই। তুমি শুনে হাসবে লাবণ্য কিন্তু তুমি ও-কথাটি প্রতিদিন আমাকে ব'লে স্মরণ করিয়ে দিলে আমি যেন জোর পাই।"

গাড়োয়ান ঝড়বৃষ্টির মধ্যে উদ্দেশ্যবিহীনভাবে ঘুরিয়া-ঘুরিয়া হয়রান হইয়া একসময়ে বলিল—"সারা রাত ধ'রে তো ঘুরতে পারি না বাবু।"

"আচ্ছা থাক।"—বলিয়া সেই ঝড়বৃষ্টির মধ্যে অপরিচিত স্থানেই মহিম হঠাৎ লাবণ্যের হাত ধরিয়া নামিয়া পড়িল।

গাড়োয়ান ভাড়া বুঝিয়া পাইয়া অবাক হইয়া কি ভাবিতে-ভাবিতে চলিয়া গেল সেই জানে।

মহিম বলিল, "ভয় করছে না তো লাবণ্য ?"

চাদরটা ভালো করিয়া মুড়ি দিয়া স্বামীর বুকের কাছে ঘেঁষিয়া দাঁড়াইয়া লাবণ্য বলিল—"না, কিন্তু কোথায় যাবে ?"

"চলো না যেদিকে খুশি ! ঝড়বৃষ্টি থামলে যেখানে গিয়ে উঠব সেইখানে ভাবব আমাদের নবজন্ম হ'ল।"

লাবণ্য কথা কহিল না। স্বামীর হাত ধরিয়া নীরবে চলিতে শুরু করিল।

উদ্দেশ্যহীন চলা। কোন সময়ে তাহারা ছোট্টো নদীটির ধারে আসিয়া পৌঁছিয়াছে জানিতেও পারে নাই। মহিম বলিল—"চলো, ওই পোল পার হ'য়ে যাব !"

এবার লাবণ্য একটু ইতস্তত করিল। বলিল—"কিন্তু ও-পোল ভাঙা কি না কে জানে, যদি প'ড়ে যাও !"

"তুমিও আমার সঙ্গে পড়বে। পারবে না পড়তে ?"

আবার তাহার চোখের সেই অদ্ভুত দৃষ্টি দেখিয়া লাবণ্য চমকিয়া উঠিল। গাড়ির নিরাপদ আশ্রয়ে লাবণ্যকে বুকের কাছে ধরিয়া যে-স্বপ্ন সে দেখিয়াছিল, এতখানি পথ হাঁটিতে-হাঁটিতে তাহা মহিমের মন হইতে কখন লুপ্ত হইয়া গিয়াছে! কি বিশ্বাস নারীকে করা যায়? কি তাহার প্রেমের মূল্য? আজ যে ভালোবাসিয়াছে কাল বিশ্বাসঘাতকতা করিতে তাহার কতক্ষণ! তাহার চেয়ে এই মধুরতম মুহূর্তটিকেই চিরন্তন করিয়া রাখিয়া নিশ্চিন্ত হওয়া যায় না কি? এই সন্দেহের দোলা হইতে চিরদিনের মতো রক্ষা পাইয়া তাহার ক্লান্ত মন যে তাহা হইলে পরম বিশ্রাম লাভ করিতে পারে! ভালোবাসা জীবনে যদি আপনাকে অপমানই করে তখন তাহাকে মৃত্যুর মধ্যে অমর করিয়া রাখিলে ক্ষতি কি?

লাবণ্যের হাত ধরিয়া দোদুল্যমান সেতুর উপর দিয়া লইয়া যাইতে-যাইতে অকস্মাৎ মহিম তাকে ঠেলিয়া দেয়......

... ...

তাহার পরের কথা বলিয়াছি। আমার কাহিনী ঐখানেই আসিয়া থামিয়াছে। পোল পার হইয়া মহিম লাবণ্যকে লইয়া কোথায় গিয়াছে আমি জানি না। আমার কল্পনার অন্ধকারে তাহারা বিলীন হইয়া গিয়াছে।

কে জানে, মাধুরী হয়তো জনহীন ধ্বংসাবশিষ্ট প্রাসাদের কক্ষে-কক্ষে এখনো প্রেতিনীর মতো ঘুরিয়া বেড়ায়! হয়তো আর কোথাও জীবনের সেতু হইতে মহিম লাবণ্যকে কবে ঠেলিয়া দিয়াছে!

কয়েকটা দিন এমনি করিয়াই কাটিয়া যাইতেছে। ভূপতি বাড়ি আসে অনেক রাত করিয়া, দরজায় দুইটা মৃদু টোকা দেয়, দরজা খুলিবার পর ঘরে গিয়া ঢোকে নীরবে। জামা-কাপড় ছাড়িয়া হাত মুখ ধুইবার পর ঘরে খাবার আসনে আসিয়া বসে, খাবার-দাবার সামনেই সাজানো। আহার শেষ করিয়া নিঃশব্দে গিয়া বিছানায় শুইয়া পড়ে। সারাক্ষণের মধ্যে বিনতির সহিত একটা কথাও বিনিময় হয় না। একই বাড়িতে যে দুইটি লোক পরস্পরের অত্যন্ত কাছাকাছি বাস করিতেছে এবং আজ সাত বৎসর ধরিয়া করিয়া আসিতেছে তাহার কোনো পরিচয় তাহাদের ব্যবহারে নাই। তাহাদের মধ্যে যেন অসীম মহাদেশের ব্যবধান। দুই হাত মাত্র তফাতে বড়ো তক্তাপোশটার দুইধারে যাহারা রাত্রি যাপন করে তাহাদের সম্বন্ধ এত ঘনিষ্ঠ বলিয়া বুঝি এতখানি সুদূরে তাহারা পরস্পরের কাছ হইতে সরিয়া যাইতে পারিয়াছে। কিন্তু শুধু সুদূর বলিলে ইহাদের মধ্যকার ব্যবধান বুঝি কিছুই বোঝানো যায় না।

সকালে উঠিয়া ভূপতি নিজেই বাজারে চলিয়া যায়। বাজার হইতে ফিরিয়া মোটটা নামাইয়া দেয় রান্নাঘরের ধারে। আহারের পর নিজের ঘরে গিয়া অফিস যাইবার জন্য প্রস্তুত হয়।

সংসারের কাজ কিন্তু ঠিক নিয়মমতো সুশৃঙ্খলভাবেই চলিতেছে। কোথাও একটুকু গোল নাই। বাহির হইতে চেষ্টা করিলেও সেখানে কোনো অসংগতি কেহ দেখিতে পাইবে না।

স্বামী-স্ত্রীর মধ্যকার স্তব্ধতাটা সেইজন্যই আরও ভয়ংকার। সাধারণ মান-অভিমানের ক্ষণিক পালা ইহা নয়, ঘনিষ্ঠতম সম্বন্ধে আবদ্ধ এই দুইটি নরনারীর অসাধারণ এই বিমুখতার হেতু তাহাদের অতীত ইতিহাসেও পাওয়া যাইবে কিনা সন্দেহ। বাহিরের ইতিহাসে সব-কিছু কি ধরা পড়ে!

বিবাহ হইয়াছিল নিতান্ত সাধারণভাবে। ভালো ছেলে খুঁজিবার সাহস বিনতির বাপ-মায়ের ছিল না। বাড়িঘর আত্মীয়স্বজন না থাক, উপার্জনক্ষম ও স্বাস্থ্যবান বলিয়া ভূপতিকে কন্যাদান করিতে পারিয়া তাঁহারা নিশ্চিন্ত হইয়াছিলেন। শুধু স্বামী ও শাশুড়ীকে লইয়া বিনতিকে সংসার করিতে হইবে। দা-দেইজী না থাকায় একরকম ভালোই থাকিবে। ছেলেটি অবশ্য কেমন একটু......

কেমন একটু যে কি তা অবশ্য তাঁহারা ঠিক স্পষ্টভাবে নিজেরাই বুঝিতে পারেন নাই। তবু খটকা একটু লাগিয়াছিল। এই খটকা লাগাও আশ্চর্য। সত্যিই ভূপতিকে দেখিয়া বা তাহার সহিত আলাপ করিয়া খুঁত ধরিবার কিছু পাওয়া যায় না। বিনতির বাপ-মায়ের সচেতন মনে নয়, তাহার চেয়ে গভীর কোনো স্তরে যেন সন্দেহের ছায়া দেখা দিয়াছিল। সে-ছায়াকে তাঁহারা শেষ পর্যন্ত আমল দেন নাই। না দেওয়াই স্বাভাবিক।

বিনতি তখন চোদ্দ-পনেরো বছরের লাজুক ভীরু একটি নিতান্ত নিরীহ প্রকৃতির মেয়ে। ফুলশয্যার রাতে নিজের শরীরের তুলনায় অনেক বড়ো

ভারি জামা-কাপড়ের বোঝায় আড়ষ্ট ও জড়সড় হইয়া শয্যাপ্রান্তে গিয়া বসিয়াছিল।

রাত তখন অনেক। নিমন্ত্রিতদের ভোজনের হাঙ্গামা চুকিবার পর ভূপতি আসিয়া আগেই শয্যার উপর মাথার নিচে হাত রাখিয়া চিত হইয়া শুইয়া পড়িয়াছে। আত্মীয়স্বজনের অভাবে পাড়া-প্রতিবেশীরাই বিনতিকে সাজাইয়া আচার-অনুষ্ঠান পালন করাইয়া ঘরে পাঠাইয়া দিয়াছে।

বিনতি ঘরে ঢুকিতে ভূপতি একবার ফিরিয়া চাহিয়াছিল। তাহার পর সে নিজে উঠিয়া সমবেত মেয়েদের কৌতুকহাস্য উপেক্ষা করিয়া সশব্দে দরজাটা বন্ধ করিয়া আবার বিছানায় আসিয়া শুইয়া পড়িল।

বিছানায় উঠিবার সময় পাশের বালিশটা বুঝি অসাবধানে পা লাগিয়া মাটিতে তখন পড়িয়া গিয়াছে। বিনতি নিজের অজ্ঞাতসারে স্বাভাবিক কর্তব্যবোধেই সেটা তুলিয়া বিছানায় আবার রাখিয়া দিতেই ভূপতি পা দিয়া আবার সেটা মেঝেয় ফেলিয়া দিল।

বিস্মিত ও একটু ভীতভাবেই বিনতি স্বামীর দিকে ফিরিয়া চাহিয়াছিল। না, ভয় করিবার কিছু নাই! ভূপতি হাসিতেছে নিঃশব্দে।

এবারে কৌতুক অনুভব করিয়া বিনতি নিজের হাসিটুকু বুঝি গোপন করিতে পারে নাই। মাথার কাপড়টা ভালো করিয়া টানিয়া দিয়া আবার সে বালিশটা মেঝের উপর হইতে তুলিয়া রাখিতে যাইতেছিল, এমন সময় ভূপতি আবার পা ছুঁড়িল। বালিশটা বিনতির হাত হইতে পড়িয়া তো গেলই, আর একটু হইলে বুঝি আঘাত তার হাতেও লাগিত।

বিনতি এবারে ঠিক কৌতুকটা উপভোগ করিতে পারিল না।

কিন্তু সচকিত হইয়া সে হাত সরাইয়া লইতেই ভূপতির উচ্চহাসি শোনা গেল। ভূপতি তখন বিছানার উপর উঠিয়া বসিয়াছে।

বিনতিও হাসিল কিন্তু এবার আর বালিশ তুলিবার চেষ্টা করিল না। খাটের একেবারে শেষপ্রান্তে দেয়ালের কাছে সরিয়া দাঁড়াইল।

ভূপতি খানিক তাহার দিকে চাহিয়া থাকিয়া হাসিতে-হাসিতে বলিল, "কই বালিশটা তুললে না?"

বিনতি একবার তাহার দিকে সকৌতুক ভর্ৎসনার দৃষ্টিতে তাকাইয়া মাথা নত করিল। ঘোমটার ভিতর হইতে তাহার মুখ আর দেখা যায় না।

"তোলো বালিশটা।"

মুখ নিচু করিয়াই বিনতি মাথা নাড়িয়া জানাইল, সে তুলিবে না। তাহার পর ফিক করিয়া একটু হাসিয়াও ফেলিল।

ভূপতি বিছানার উপর তাহার দিকে সরিয়া আসিল এবার। তারপর তাহার হাতটা হঠাৎ ধরিয়া ফেলিয়া বলিল, "বালিশটা কিন্তু না তুললে হবে না।"

স্বামী তাহাকে এই প্রথম স্পর্শ করিয়াছেন।

বিনতি তখন ভয়ে আনন্দে লজ্জায় কেমন-একরকম হইয়া গিয়াছে। জড়সড় হইয়া সরিয়া গিয়া দুর্বলভাবে হাতটা একটু ছাড়াইবার চেষ্টা করিল কিন্তু পারিল না। তাহার শরীরে যেন আর এতটুকু জোর নাই—সমস্ত অবশ হইয়া আসিতেছে, অপূর্ব আনন্দ-শিহরণে।

তাহারই ভিতর কানে আসিয়া বাজিল—"তোলো বলছি।"

বিনতি আবার সচকিত হইয়া মুখ তুলিয়া স্বামীর দিকে না তাকাইয়া পারিল না। আশ্চর্য! গলার স্বর যেন রূঢ় বলিয়াই মনে হইয়াছিল কিন্তু মুখে তাহার কোনো আভাসই নাই! ভূপতি হাসিতেছে।

বিনতি সাহস পাইয়া অস্ফুট লজ্জাজড়িত স্বরে বলিল, "আর ফেলে দেবে না তো?"

"আগে তোলো তো।"

স্বামীর সঙ্গে প্রথম পরিচয়ের পদ্ধতিটা একটু অস্বাভাবিক বলিয়া মনে হইলেও বিনতি সমস্ত ব্যাপারে একটু অস্বাভাবিক কৌতুকপ্রিয়তার বেশি আর কিছু দেখিতে পায় নাই। দেখিবার ছিল কি কিছু?

সে বালিশটা তাড়াতাড়ি তুলিয়া বিছানার উপর ফেলিয়া দিয়া মৃদুস্বরে বলিয়াছিল—"হয়েছে তো!"

কিন্তু সে-পালা তখনও শেষ হয় নাই। বিনতিকে আর একবার বালিশটা কুড়াইতে হইয়াছিল। কৌতুকের চেয়ে বিস্ময় বুঝি তাহার মনে তখন প্রবল।

অস্বাভাবিক হইলেও অত্যন্ত অর্থহীন একটা ঘটনা। বিনতির মনে তাহার স্মৃতিও থাকিবার কথা নয়। কিন্তু যত দিন গিয়াছে বিনতির মনে হইয়াছে যে প্রথম রাত্রির ব্যাপারটিতেই বুঝি তাহাদের ভবিষ্যত-জীবনের ইঙ্গিত ছিল।

সংসারে গোড়া হইতেই একটু খিটিমিটি বাধিয়াছে। গায়ে মাখিবার মতো এমন কিছু হয়তো নয়। কিন্তু তাহার ভিতর স্বামীর ব্যবহারের যে-পরিচয় পাইয়াছে তাহা তাহার অনুকূল হইলেও বিনতির মনে কোথায় যেন একটা অহেতুক আশংকা তাহাতে জাগিয়া উঠিয়াছে।

শাশুড়ী ওই একটি মাত্র ছেলেকে লইয়া আজ কুড়ি বৎসর হইল বিধবা হইয়াছেন। ভূপতির বয়স তখন ছিল পাঁচ বৎসর। পরের সংসারের আশ্রিত হিসাবে মানুষ হইয়া একদিকে ঔদাসীন্য এমনকি নির্যাতন ও অন্যদিকে মায়ের অতিরিক্ত অন্ধ স্নেহ ও আদর পাইয়া ভূপতি হয়তো ঠিক স্বাভাবিক-ভাবে বাড়িয়া উঠিতে পারে নাই। তাহার প্রকৃতি প্রশ্রয় ও পীড়নের মাঝে অক্ষম বিদ্রোহে বিকৃত হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু এ-কথা মানিলেও তাহার সব অদ্ভুত আচরণের অর্থ পাওয়া যায় না।

শাশুড়ী বিনতির বিবাহের বছর দুই বাদেই মারা গিয়াছেন। আগেকার কথা জানা নাই কিন্তু জীবনের শেষ দুই বৎসর তিনি বড়ো কষ্ট পাইয়াছেন এবং সে-কষ্টের কারণ বিনতি নয়।

শাশুড়ী-বধূর ছোটোখাটো গরমিল হয়তো আপনা হইতেই ঘুচিয়া যাইতে পারিত। শাশুড়ীর দিক হইতে স্নেহ না থাক বিদ্বেষ ছিল না, বিনতিরও ভালোবাসা না থাক শ্রদ্ধা ও কর্তব্যবোধ ছিল। কিন্তু মাঝে হইতে ভূপতি সমস্ত গোলমাল করিয়া দিয়াছে।

রান্নাঘরে সামান্য কি একটা কাজের ত্রুটি লইয়া বিনতি হয়তো একটু বকুনি খাইয়াছে শাশুড়ীর কাছে। ব্যাপারটা এমন কিছুই নয়। স্বামীকে তাহা নিজে হই'তে জানাইবার কথা বিনতি কল্পনাও করে নাই।

ফোর্থ পণ্ডিতমশাই-এর খাবার ব্যবস্থাটা এইখানেই হয়। এক কোণে লোহার একটা তোলা উনুন, ক'টা অত্যন্ত নোংরা কলঙ্ক-পড়া পেতলের থালা বাটি বাসন ও গোটাকতক তরকারির খোসা প'ড়ে আছে। ঘরের সিমেন্ট অধিকাংশ জায়গায়ই উঠে গেছে—জঞ্জাল ও ধুলো নির্বিঘ্নে বহুদিন ধ'রে সেখানে বৃদ্ধি পাচ্ছে নিরাপদ আশ্রয়ে—তাদের সে-আশ্রয় থেকে বঞ্চিত হবার সম্ভাবনা সম্প্রতি আছে ব'লে মনে হয় না।

ফোর্থ পণ্ডিতমশাই-এর রান্নার দৌলতে এক ধারের দেয়াল কড়িকাঠ ও ছাদ ধোঁয়ার কালিতে স্থায়ীভাবে রঞ্জিত। অন্যান্য অংশে কালি না থাকলেও ঝুলের অভাব নেই। জোড়া বেঞ্চির এক ধারে বিছানাটি গুটিয়ে রেখে ফোর্থ পণ্ডিতমশাই কাপড় সেলাই করছিলেন। বিশেষ কাউকে উদ্দেশ না ক'রেই বললেন, "কাপড়ের দরটা তবু কিছু নেমেছে, কি বলেন?"

কেউ কিছুই বলল না। ফোর্থ পণ্ডিতমশাই উত্তরের অপেক্ষামাত্র না ক'রে সেলাই ক'রে চললেন।

লোকটিকে সবাই একটু অবজ্ঞার দৃষ্টিতে দেখে—এমনকি নিরীহ সেকেণ্ড পণ্ডিতমশাই পর্যন্ত। চেহারাটি তাঁর ভক্তি বা সম্ভ্রম উদ্রেক করবার মতো নয় বটে! মাথায় খাটো, চৌকোনা দেহটি মাথা থেকে পা পর্যন্ত আগাগোড়া কালো-কালো বড়ো-বড়ো লোমে আচ্ছন্ন—মুখে খোঁচা-খোঁচা সুবৃহৎ গোঁফ-দাড়ির জঙ্গল। এই লোমশ কদাকার দেহটি তিনি আবার সর্বদা অনাবৃতই রাখেন—ধুতি ছাড়া আর কিছু তাঁর গায়ে কদাচিৎ দেখা যায়; ক্লাসে পড়াবার সময় এক জোড়া খড়ম পায়ে থাকে বটে। কথা বেশি তাঁকে বলতে শোনা যায় না, কিন্তু যে ক'টি কথা কন তার অধিকাংশই অপ্রাসঙ্গিক ও উদ্দেশ্যহীন। কথা বলার পর নিজেই বোধ হয় নিজের নির্বুদ্ধিতায় লজ্জিত হন। কথাটা যেন তিনি বলেননি এমনি ভাব দেখাবার চেষ্টা করেন তখন। লোকটির মুখে সশঙ্ক দীনতার গভীর ছায়া আছে, নিজের ও পরের কাছে সর্বদাই যেন তিনি কি লাঞ্ছনা আশঙ্কা করছেন।

টিকে বেশ ধ'রে উঠেছিল; প্রস্তুত কলকেটি হুঁকোর মাথায় চড়িয়ে হাতটি এগিয়ে দিয়ে সেকেণ্ড পণ্ডিতমশাই বললেন—"নিন মশাই!"

বললাম, "মাপ করবেন।"

হেড পণ্ডিতমশাই পেছনে এসে দাঁড়িয়ে ছিলেন, হাত বাড়িয়ে হুঁকোটা নিয়ে বললেন, "তামাক খান না, ওই সিগারেটগুলো খান তো! ওগুলোর কাগজ যে মশাই থুতু দিয়ে জোড়ে—তা জানেন? সদ্য ওই মেম মাগীদের থুতু—"

ঘৃণায় এক ধাবড়া থুতু পণ্ডিতমশাই ঘরের দেয়ালেই ফেললেন। তারপর হুঁকোর খোলটি ডান হাতের কর্কশ চেটো দিয়ে মুছে একটি টান দিয়ে ধোঁয়া ছেড়ে বললেন—"পায়েস ছেড়ে আমানি!"

পণ্ডিতমশাই সকল দিক দিয়ে আদর্শ স্কুলের পণ্ডিত। কোনো খুঁত নেই, বয়স তাঁর চল্লিশের কিছু বেশি হবে হয়তো, কিন্তু মনের বয়স তাঁর নিরূপণ করা কঠিন। সে-মন তিনি উত্তরাধিকার-সূত্রে কোন বৃদ্ধ-প্রপিতামহের সংকীর্ণ জগৎ থেকে বহন ক'রে এনেছেন। পরম শ্রদ্ধার সঙ্গে তিনি সে-মনের সমস্ত সংস্কার ও দম্ভস্ফীত অন্ধতাকে লালন করেন।

দেব'খন।"

"আমার যে আজই দরকার, মাসের চালডালগুলো আনিয়ে নিতে হবে।"

ভূপতি আবার খবরের কাগজে মনোনিবেশ করিয়া বলিয়াছে—"আচ্ছা ওর কাছেই দেব'খন। চেয়ে নিও যা দরকার।"

আঘাত হিসাবে এইটুকুই যথেষ্ট। মা একেবারে মর্মাহত হইয়া ফিরিয়া যাইতেছিলেন। নির্বিকার নিষ্ঠুরতা এতদূর পর্যন্ত বুঝি কোনরকমে বোঝা যায়। ভূপতি কিন্তু তাহার পরও কাগজটা সরাইয়া বলিল—"বউ-এর কাছে হাত পেতে নিতে আবার মান যাবে না তো!"

মা আর সহিতে পারে নাই। পারা সম্ভবও বুঝি নয়। হঠাৎ ফিরিয়া দাঁড়াইয়া অশ্রুরুদ্ধকণ্ঠে যা নয় তাই বলিয়া মনের সমস্ত রুদ্ধবেদনা ও ক্ষোভ প্রকাশ করিয়াছেন। বলিয়াছেন যে, মা বলিয়া সম্মান না করুক, পঁচিশ বৎসর ধরিয়া তিনি যে দুঃখভোগ করিয়া তাহাকে পালন করিয়াছেন তাহার পুরস্কার কি এই!

ভূপতি তবু হাসিয়া বলিয়াছে—"ছেলে-বউ-এর উপর রাজত্ব করবার লোভেই তা হ'লে এত কষ্ট ক'রে মানুষ করেছিলে!"

মা এ-কথার উত্তর দিবার ভাষাই বুঝি খুঁজিয়া পান নাই। সেইদিন হইতে তিনি নিজেকে সমস্ত সংসার হইতে সরাইয়া লইয়াছেন। বিনতির করিবার কিছু ছিল না। শাশুড়ী মনে-মনে তাহাকেও যে দোষী ভাবিবেন ইহা স্বাভাবিক। তাঁহার সন্তোষ-বিধানের দুর্বল চেষ্টারও তাই তিনি ভুল অর্থ করিয়াছেন। বিনতি শেষ পর্যন্ত হাল ছাড়িয়া দিয়াছে।

স্বামীকে কিন্তু তখন হইতেই বিনতি ভয় করে। স্বামীর এ-সমস্ত ব্যবহার সত্যই দুর্বোধ। স্ত্রীর প্রতি উৎকট ভালবাসার পরিচয় যে ইহা নয় তাহা বিনতি ভালো করিয়া জানে। তবে এই অসাধারণ হৃদয়হীনতার মূল কোথায়?

বিনতি বুঝিতে পারে না। বুঝিতে পারে না বলিয়াই তাহার সমস্ত মনে গভীর অর্থহীন আশঙ্কার ছায়া জাগিয়া থাকে। সর্বদাই একটা অস্বস্তি, একটা নামহীন অস্পষ্ট আতঙ্ক যেন সে অনুভব করে স্বামীর সংস্পর্শে।

শাশুড়ীর মৃত্যুর পর তাহা যেন আরও গভীর হইয়া উঠিল। সংসারে আর কেহ নাই। স্বামীর কাছে নিজেকে সম্পূর্ণভাবে খুলিয়া ধরিতে পারিলে এই নিঃসংগতাই মধুর হইয়া উঠিতে পারিত। কিন্তু খুলিয়া ধরা দূরে থাক, ক্রমশ তাহাদের সম্বন্ধ যেন আরও আড়ষ্ট হইয়া পড়িতেছে। অদৃশ্য প্রাচীর কে যেন গড়িয়া তুলিতেছে দু-জনের মাঝখানে। নিজের মধ্যে নিরবচ্ছিন্নভাবে আবদ্ধ হইয়া থাকিবার দরুন বুঝি বিনতির অদ্ভুত একটা পরিবর্তন দেখা দিয়াছে। সে ভীরু সরল মেয়েটি বিদায় লইয়াছে অনেকদিন আগেই। বিনতির প্রকৃতি ক্রমশ রুক্ষ হইয়া উঠিয়াছে, শিথিলতা আসিয়াছে তাহার সব কাজে। সংসারের কাজ সে নিয়মমতোই করিয়া যায় কিন্তু তাহাতে যেন আর গা নাই। নিজের সম্বন্ধে সে উদাসীন। ভবিষ্যৎ তাহার কাছে অন্ধকার, সেজন্য সে মাথাও ঘামায় না। কোনোমতে দিনটা কাটানোই তাহার যথেষ্ট।

রাত্রে অবশ্য তাহার ঘুম আসিতে চায় না। ঘুমাইলেও সে সচকিতভাবে ক্ষণে-ক্ষণে জাগিয়া ওঠে।

কিন্তু তাহাদের জীবনে যে গাঢ় ভয়াবহ ছায়া নামিয়া আসিয়াছে, সত্যই ভূপতি কি তাহার হেতু? হৃদয়হীন নির্বিকার মানুষ তো সংসারে বিরল নয়। তাহাদের সহিত ঘর করা সুখের নয়, সহজও নয়, কিন্তু সম্ভব। ভূপতির ভিতর কি নির্বিকার হৃদয়হীনতারও বেশি কিছু আছে!

বোঝা যায় না কিছুই। বাহির হইতে দেখিতে গেলে তাহার কিছুমাত্র পরিবর্তন হয় নাই। যে অদৃশ্য প্রাচীর পরস্পরের মধ্যে বিনতি সারাক্ষণ অনুভব করে, ভূপতির কাছে তাহার অস্তিত্বই নাই বলিয়া মনে হয়।

বরাবর যেমন ছিল সে এখনও তেমনই আছে। বিনতির সহিত স্পষ্ট কোনো দুর্ব্যবহার সে করে না, তাহাকে শাসন করে না, তাহার সংসার পরিচালনার স্বাধীনতায় পর্যন্ত বাধা দেয় না এতটুকু।

স্ত্রীর সহিত সে যে-আলাপ করে তাহাকে সহজ বলিয়াই মনে হয়। কণ্ঠও তাহার একান্ত সরল।

"তোমার চুল যে সব উঠে যাচ্ছে!"

বিনতি ধোপার বাড়ির ফেরত কাপড়গুলো পাট করিয়া তোরঙ্গে তুলিতেছিল, উত্তর দেয় নাই।

ভূপতি আবার বলিয়াছে—"কি ভাগ্যি তোমার কপাল ছোটো। চওড়া কপালের ওপর চুল উঠে গেলে মেয়েদের ভারি খারাপ দেখায়।"

বিনতি এবার রুক্ষস্বরে বলিয়াছে—"পোড়াকপালে উঠলে দেখায় না।"

"তুমি আয়নায় দেখেছ?" ভূপতি হাসিয়া উঠিয়াছে।

"আয়নায় দেখবার দরকার নেই, আমি জানি।"

"তা হ'লেও চুল থাকলে পোড়াকপাল ঢাকা থাকে। কালই একটা ভালো তেল আনতে হবে।"

কাপড়গুলো তুলিয়া তোরঙ্গ বন্ধ করিয়া বিনতি বলিয়াছে—"দরকার নেই আমার। আমার চুল উঠলে ক্ষতি নেই।"

"একটু আছে যে। চুল উঠে গেলে সিঁথিতে যে সিঁদুর পড়বে না ঠিকমতো। সেটাও তো দরকার ; কি বলো?"

বিনতি চুপ করিয়াছিল।

ভূপতি আবার বলিল, "কালই একটা তেল আনব।"

ভূপতি তাহার পরদিন সত্যই একটা তেল লইয়া আসিয়া বলিল—"এই নাও, রোজ ঠিকমতো মেখো!"

মাথার তেলের শিশি এতো ছোটো দেখিয়া বিনতি না জিজ্ঞাসা করিয়া পারে নাই—"এত ছোটো শিশি যে : এ তো একবার মাখলেই ফুরিয়ে যাবে।"

ভূপতি ঈষৎ হাসিয়া বলিল—"ওটা মাথার নয়, কপালে লাগাবার জন্যে, প'ড়ে দেখো না—পোড়া-ঘায়ে ধন্বন্তরি ব'লে লিখেছে।"

অতীত যুগের সে নিরীহ লাজনম্র মেয়েটি কি করিত বলা যায় না, কিন্তু এখনকার বিনতি নিজেকে আর সংবরণ করিতে পারে নাই। একেবারে যেন ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিয়া সে সবলে শিশিটা ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়াছে।

মেঝের উপর ছড়ানো তেল ও কাঁচের ভাঙা টুকরার দিকে চাহিয়া ভূপতি শুধু বলিয়াছে—"তোমার হাতের তাগ নেই।"

তাহার কণ্ঠস্বরে একটুকু বিস্ময় বা উত্তেজনার আভাস নাই।

স্বামী-স্ত্রীর আলাপ এমনি ধরনের। ভূপতি কোনোদিন হয়তো সকাল-বেলা খবরের কাগজ পড়িতে-পড়িতে ডাকিয়া বলে—"শুনে যাও।"

বিনতি কি একটা কাজে ভাঁড়ারে যাইতেছিল, দাঁড়াইয়া পড়িয়া বলে—"কেন?"

"শুনে যাও না।"

বিনতি কাছে আসিলে খবরের কাগজের একটা জায়গা তাহাকে দেখাইয়া ভূপতি বলে—"পড়ো না, ভারি মজার খবর একটা।"

"আমার সময় নেই এখন।"—বলিয়া বিনতি চলিয়া যাইবার উপক্রম করিলে ভূপতি হঠাৎ তাহার আঁচলটা ধরিয়া ফেলিয়া বলে—"খুব আছে। এইটুকু পড়তে আর কতক্ষণ।"

বিনতি অগত্যা কাগজটা হেলাভরে হাতে তুলিয়া লয়। কিন্তু পড়িতে-পড়িতে তাহার মুখ অন্ধকার হইয়া ওঠে। নিঃশব্দে কাগজটা স্বামীর কোলের উপর নামাইয়া দিয়া কঠিন মুখে চলিয়া যাইবার উপক্রম করিতে ভূপতি তাহাকে ধরিয়া বলে—"ভারি মজার—না?"

বিনতি স্বামীর চোখের দিকে তীব্র দৃষ্টিতে চাহিয়া গম্ভীর মুখে বলে—"হুঁ!"

"পৃথিবীতে কাউকেই বিশ্বাস নেই। কিছুই আশ্চর্য নয়, কি বলো?"

"না।" বলিয়া বিনতি হাতটা ছাড়াইয়া এবার চলিয়া যায়।

ভূপতি তখনকার মতো আর কিছু বলে না। কিন্তু খাবার সময়, প্রথম ভাতের গ্রাস মুখে তুলিতে গিয়া হঠাৎ নামাইয়া রাখিয়া বলে—"এমনি নিশ্চিন্তে বিশ্বাসে সে-লোকটাও তো মুখে ভাত তুলেছিল! সারাদিন খেটেখুটে হয়রান হ'য়ে এসেছে, ক্ষিধেয় সমস্ত অন্ধকার দেখছে। কেমন ক'রে বেচারা জানবে সেই অন্ধকারই চিরদিনের মতো নেমে আসবে। কেমন ক'রে জানবে তার জীবনের ওই শেষ গ্রাস।"

বিনতি বুঝি একটু শিহরিয়া ওঠে। সেদিকে একবার চাহিয়া ভূপতি বলিয়া যায়—"তার স্ত্রী নিশ্চয়ই তখন তার সামনে ব'সে। স্বামীর জন্যে অনেক যত্নে, অনেক পরিশ্রমে সে অমন খাওয়ার আয়োজন করেছে—ক্ষিধে শুধু মিটবে না, জীবনের ক্ষিধে একেবারে শেষ হ'য়ে যাবে। কেমন ক'রে স্বামী সে-গ্রাস মুখে তোলে তাকে দেখতে হবে তো!"

ভূপতির মুখে একটু হাসির রেখা যেন দেখা দেয়। সে আবার বলে—"তার স্ত্রীর সেই সাগ্রহে ব'সে থাকা আমি যেন দেখতে পাচ্ছি। অমন সে কত দিন কত রাত আগেও বসেছে, কিন্তু এত আগ্রহ নিয়ে বোধ হয় নয়।"

হঠাৎ বিনতি সেখান হইতে উঠিয়া বাহিরে চলিয়া গিয়াছে।

কিন্তু ভূপতিরও একটু পরিবর্তন বুঝি দেখা দেয়। বিনতি কিছু না বলিলেও নিজে হইতে সে একদিন বাড়িতে ঝি রাখার বন্দোবস্ত করিয়াছে। একদিন অফিস ফেরতা গোটাকতক রঙিন ছিটের কাপড় আনিয়া নিজেই বিনতিকে বলিয়াছে—"সস্তায় পেয়ে গেলুম! বহরে বড়ো কম, তবে ছোটো পেনি ক'টা হ'তে পারে।"

বিনতি সন্তানসম্ভবা। শরীর তাহার অত্যন্ত ভাঙিয়া পড়িয়াছে। গায়ে

যেন রক্ত নাই, হাত পা শীর্ণ।

সন্তানলাভের কল্পনায় আনন্দ হয়তো তাহারও আছে কিন্তু উৎসাহ নাই। উৎসাহ তাহার আর কিছুতেই নাই। হয়তো ইহা তাহার ক্লান্ত দুর্বল শরীরেরই প্রতিক্রিয়া, হয়তো তাহার চেয়েও বেশি কিছু। হয়তো ভাবী-সন্তান সম্বন্ধেও তাহার আশঙ্কা আছে। ভূপতিরই ছায়া যদি তাহার মধ্যে দেখা দেয়! তেমনি অপরিচিত, ভয়ংকর দূরত্ব যদি থাকে তাহার মধ্যে! মাতৃত্ব দিয়াও যদি তাহাকে আপন করা না যায়! বিনতি সে-কথা ভাবিতে চায় না, ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে উদাসীন থাকিবার চেষ্টা করে।

ভূপতির চোখে মুখে কিন্তু কেমন যেন একটুকু উজ্জ্বলতা দেখা দিয়াছে। একদিন সে হঠাৎ জিজ্ঞাসা করিল—"এই বিছানাটুকু পেতে এত হাঁফাচ্ছ কেন?"

বিনতি উত্তর দিল না। সে সত্যই ক্লান্ত, অত্যন্ত দুর্বল। কোনোরকমে মনের জোরে সে যেন খাড়া হইয়া কাজ করিয়া বেড়ায়, তাহার সমস্ত শরীর কিন্তু প্রতিবাদ করে। একবার শুইলে তাহার যেন আর উঠিতে ইচ্ছা করে না। মনে হয় ঘুম যদি মৃত্যুর মতো গাঢ় হইয়া নামে তাহা হইলেও যেন আর কিছু আসে যায় না।

ভূপতির সন্তান যেন এখন হইতেই তাহার বিরুদ্ধে শত্রুতা শুরু করিয়াছে। তাহার সমস্ত প্রাণশক্তি সে নির্মমভাবে শোষণ করিয়া লইবে।

ভূপতি একদিন হঠাৎ ডাক্তার ডাকিয়া আনিল নিজ হইতেই। বিনতি ডাক্তার দেখাইতে চায় না কিন্তু তবু আপত্তি টিকিল না। ডাক্তার ওষুধপত্র লিখিয়া দিয়া গেল। সাবধানে থাকিবার জন্য উপদেশ দিয়া গেল অনেক।

ভয়, হ্যাঁ ভয় একটু আছেই বৈকি! ডাক্তার ভূপতির জিজ্ঞাসার উত্তরে তাহাই বলিয়া গিয়াছে।

ডাক্তার চলিয়া যাইবার পর বিনতি অদ্ভুতভাবে হাসিয়া বলিল—"ডাক্তার ডাকতে গেছলে কেন? আমি মরব না, ভয় নেই!"

ভূপতি উত্তর দিয়াছিল—"বলা যায় না, তুমি এখন তা পারো।"

বিনতি মরে নাই, কিন্তু মৃত্যুর একেবারে প্রান্তে উপনীত হইয়া একটি মৃত সন্তান প্রসব করিয়াছে।

নিরাপদে ভালোভাবে প্রসব যাহাতে হয় সেজন্য ভূপতি স্ত্রীকে হাসপাতালে রাখিয়াছিল। মৃত সন্তান প্রসব করিবার পর বিনতির নিজের জীবন লইয়াই অনেকক্ষণ টানাটানি চলিয়াছে। সেটাকে খানিকটা সামলাইবার পর ভূপতি স্ত্রীকে দেখিবার অনুমতি পাইয়াছিল। যে-ডাক্তারের উপর বিনতির ওয়ার্ডের ভার ছিল তিনি বলিয়াছেন—"এ-যাত্রায় খুব আপনার বরাত-জোর মশাই। কেটে ছিঁড়ে ছেলেটাকে সময়মতো না বার করলে স্ত্রীকে আপনার বাঁচানো যেত না।"

অদ্ভুতভাবে ডাক্তারের দিকে তাকাইয়া ভূপতি বলিয়াছে—"আপনাকে আমার ধন্যবাদ দেওয়া উচিত।"

ডাক্তারই কেমন যেন বিব্রত হইয়া গিয়া বলিয়াছেন—"না, ধন্যবাদ কিসের! এ তো আমাদের কর্তব্য!"

"কর্তব্যই ক'জন বোঝে!" বলিয়া ভূপতি একটু হাসিয়াছে।

বিনতির ঘরে ঢুকিবার সময়ও বুঝি তাহার মুখে সেই হাসিটুকু লাগিয়া ছিল। শুভ্র শয্যার সংগে একেবারে যেন মিশাইয়া বিনতির দেহ পড়িয়া আছে। গলা পর্যন্ত শাদা চাদরে ঢাকা। শীর্ণ মুখটুকু চাদরের মতোই বিবর্ণ।

কিন্তু ভূপতি গিয়া কাছে দাঁড়াইতে তাহার চোখে যে-দৃষ্টি ফুটিয়া উঠিয়াছে তাহার অর্থ একান্ত দুর্বোধ। আশংকাই তাহাকে বলিতে পারা যাইত কিন্তু তাহার সহিত দৃপ্ত অবজ্ঞার শানিত ঝিলিক কেমন করিয়া মিশিয়া গিয়াছে। মৃত্যুর দ্বার হইতে বিনতি কি ইহাই সংগ্রহ করিয়া আনিল!

ভূপতি পাশের চেয়ারে বসে নাই। খানিক নীরবে দাঁড়াইয়া থাকিয়া বলিয়াছে—"আবার তো ফিরে যেতে হবে।"

"তাই তো ভাবছি।"—বিনতির সুর অস্ফুট কিন্তু তবু অসাধারণ তীক্ষ্নতা তাহাতে।

হাসপাতাল হইতে বিনতিকে তাড়াতাড়ি ছাড়িতে চাহে নাই। তাহার বিপদ না কাটিলে তাহারা ছাড়িয়া দিতে পারে না জানাইয়াছে। কিন্তু ভূপতি জেদ করিয়া সময় পূর্ণ হইবার পূর্বেই তাহাকে নানারকম চেষ্টা-চরিত্র করিয়া বাড়িতে লইয়া আসিয়াছে।

সেই ডাক্তার বলিয়াছেন—"আপনি ভুল করছেন মশাই। স্নেহ ভালোবাসা বড়ো জিনিস, কিন্তু রোগ হাসপাতালের এই হৃদয়হীন কলের মতো সেবাতেই সারে। আর ক'টা দিন রাখলেই তো আর ভয় থাকত না।"

ভূপতি অদ্ভুত উত্তর দিয়াছে—"আপনাদের সব কথা যদি বিশবাস করতে পারতুম!"

কিন্তু বাড়িতে ফিরিয়া দিন-দিন আশ্চর্যভাবে বিনতি সবল সুস্থ হইয়া উঠিয়াছে। মৃত্যুকে এমন করিয়া তুচ্ছ করিবার জোর সে কোথায় পাইল কে জানে? তাহার চোখে যে শানিত অবজ্ঞা আজকাল উদ্ধত হইয়া আছে তাহা-তেই কি তাহার সেই গোপন নূতনলব্ধ শক্তির ইংগিত আছে!

স্বামী-স্ত্রীর কথাবার্তা বন্ধ হইয়াছে মাত্র কয়েকদিন। ব্যাপারটা বোধ হয় এমন কিছু নয়। ভূপতি অফিস হইতে ফিরিয়া জামা-কাপড় না ছাড়িয়াই একদিন বলিয়াছে—"শিগ্গির তৈরি হ'য়ে নাও, এখুনি বেরুতে হবে।"

অত্যন্ত স্বাভাবিক আদেশ। গত দুই বৎসর স্বামীর সংগে হাসপাতালে ছাড়া আর কোথাও গিয়াছে বলিয়া মনে পড়ে না।

বিনতি একটু বিদ্রূপের স্বরেই বলিয়াছে—"কোথায়?"

"বায়স্কোপের দুটো পাস পেয়ে গেলাম এমনি। পয়সা দিয়ে তো আর হবে না। চলো দেখেই আসি।"

"তুমি দেখে এসো।"—বলিয়া বিনতি চলিয়া যাইবার উপক্রম করিয়াছে।

ভূপতি দরজা আগলাইয়া বলিয়াছে—"কেন, তুমি যাবে না কেন! আমার সংগে যেতে কি ভয় করে নাকি?"

বিনতি হাসিয়াছে একটু। আজকাল সে হাসে। বলিয়াছে—"ঘরেই যখন কাটাতে পারলুম এতদিন, তখন বেরুতে আর ভয় কিসের?"

ভূপতি তাহার দিকে চাহিয়া কি যেন তলাইয়া দেখিবার চেষ্টা করিয়া বলিয়াছে—"তা হ'লে চলো না।"

"আচ্ছা চলো।"

একবার ট্রাম বদল করিয়া আর একটা ট্রামে উঠিবার সময় বিনীতি বলিয়াছে —"কাছাকাছি বুঝি বায়স্কোপ ছিল না।"

"ছিল, কিন্তু অমনি দেখবার পাস ছিল না।"

সিনেমা সত্যই শহরের আর এক প্রান্তে। ভূপতি সেখানে গিয়া স্ত্রীকে উপরে মেয়েদের সিটে উঠাইয়া দিয়াছে। বিনীতি একবার বলিয়াছিল— "একসঙ্গে বসলেও তো ক্ষতি ছিল না।"

"না নীচে বড়ো ভিড়, কষ্ট পাবে।"

বিনীতি অদ্ভুতভাবে হাসিয়া সিনেমার ঝির সঙ্গে উপরে উঠিয়া গিয়াছে।

ভূপতি তাহার পর কি করিত বলা যায় না। কিন্তু পরিচিত একজনের সঙ্গে দেখা হইয়া গেল। লোকটা হাসিয়া বলিল—"শখ তো মন্দ নয়, এই এত দূর এসেছিস বউকে বায়স্কোপ দেখাতে।"

"তা হলে আর শখ কিসের!"—বলিয়া ভূপতি নিজেও বায়স্কোপের হলে গিয়া ঢুকিয়াছে। বন্ধুটিও পাশেই বসিয়াছিল, সে একবার ভূপতিকে চিমটি কাটিয়া বলিয়াছে—"অত ঘন-ঘন ওপরে তাকাসনি। তোর বউ পালিয়ে যাবে না।"

ভূপতি যেন সংকুচিত হইয়া পড়িয়া বলিয়াছে—"না না, ভারি লাজুক। ঠিকমতো জায়গা পেলে কিনা দেখছিলুম।"

বায়স্কোপ আরম্ভ হইবার খানিক পরেই কিন্তু উসখুস করিতে-করিতে হঠাৎ সে উঠিয়া পড়িয়াছে।

"আবার কি হ'ল?"—বন্ধু জিজ্ঞাসা করিয়াছে।

"কিছু না, আমি আসছি।"

বন্ধু হাসিয়া বলিয়াছে—"বুঝেছি : এমন বায়স্কোপ দেখানো কেন? ঘরে শিকলি দিয়ে রাখলেই পারতিস।"

ভূপতি আর কোনো কথা বলে নাই। তাড়াতাড়ি হল হইতেই বাহির হইয়া রাস্তার ধারে একটা ট্যাক্সিতে সটান উঠিয়া বসিয়া একদিকে চালাইতে বলিয়াছে।

ট্যাক্সিতে স্টার্ট দিবার পরও ড্রাইভারকে থামিয়া থাকিতে দেখিয়া বিরক্ত মুখে ভূপতি কি যেন বলিতে যাইতেছিল। কিন্তু সে-কথা আর বলা হয় নাই। ট্যাক্সিচালকের দৃষ্টি অনুসরণ করিয়া দরজাটা নিজেই খুলিয়া ধরিয়া হাসিমুখে সে বলিয়াছে—"এসো, ঠিক সময়ে এসে পড়েছো।"

বিনীতি ভিতরে উঠিয়া আসিয়া বসিয়া পড়িয়া বলিয়াছে—"হ্যাঁ, তোমায় বেরুতে দেখলাম যে।"

"লক্ষ্য করেছিলে বুঝি?"

"তা করছিলাম।"

খানিকক্ষণ আর কোনো কথা হয় নাই। বিনীতি হঠাৎ বলিল—"তুমি এমন কাঁচা কাজ করবে ভাবিনি। তোমায় দেখতে না পেলেও কিছু আসত যেত না। আমি বাড়ির ঠিকানা জানি। তোমার নামটাও বলতে পারতাম লোককে! একসঙ্গে এমন ক'রে না হোক খানিক বাদেই গিয়ে উঠতাম। সব দিক ভেবে বোধ হয় কাজ করোনি।"

"না, সবই ভেবেছিলাম। মনের ঘেন্নায় তুমি তো নাও ফিরতে পারো, সেইটের ওপর জোর দিয়েই যা ভুল করেছিলাম।"

"মনের ঘেন্নায় মানুষ কি করতে পারে, কেউ জানে কি?"—বিনতির সেই বুঝি শেষ কথা। তাহার পর ট্যাক্সিতেই তাহারা বাড়ি ফিরিয়াছে নিঃশব্দে। মৃত্যুর মতো সে-নিঃশব্দতা সমস্ত সংসার এমন ভারাক্রান্ত করিয়া আছে।

অন্যান্য কথা হয়তো তাহারা আবার কহিবে, সংসারের প্রয়োজনে, পরস্পরকে আহত করিবার অদম্য প্রেরণায়, কিন্তু তবু অন্তরের এ-নিঃশব্দতার ভার ঘুচিবার নয়। জীবনের একটিমাত্র বিলাস চরিতার্থ করিবার জন্য এ-নিঃশব্দতার নির্বাসন তাহাদের নিঃসঙ্গ আত্মা স্বেচ্ছায়ই বরণ করিয়া লইয়াছে।

তাহারা পরস্পরকে আর বুঝি ছাড়িতেও পারিবে না। প্রেম নয়, তাহার চেয়ে তীব্র, তাহার চেয়ে গভীর উন্মাদনাময় বিদ্বেষ ও বিতৃষ্ণার শৃঙ্খলে তাহারা পরস্পরের সহিত আবদ্ধ। সে-শৃঙ্খল তাহারা ছিঁড়িলে আর বাঁচিবার সম্বল কি রহিল—জীবনের কি আশ্রয়? পরস্পরের জন্য তাহারা বাঁচিয়া থাকিতেও চায়।

ভবিষ্যতের ভার

সেকেণ্ড পণ্ডিতমশাই-এর বয়স অনেক হয়েছে—ষাটের চেয়ে সত্তরের কাছা-কাছি। দড়ির মতো পাকানো লম্বা দেহটি, সামনের দিকে একটু নুয়ে পড়েছে। আজকাল গোঁফ-চুল সবই পেকেছে। চোখ বুজিয়া সামনের দিকে একটু ঝুঁকে বললেন, "আপনাকে নিয়ে এই পনেরোজন হেড মাস্টারকে আসতে যেতে দেখলাম। আজকের কথা তো নয়—এ-ইস্কুল সবে তখন আরম্ভ হ'ল। দশ-আনির বড়ো কর্তা তখন বেঁচে, ভারি ভালো লোক ছিলেন! সেক্রেটারি তখন অনাথবাবু কিনা, তাঁকে ডেকে বললেন, 'আমার এই বার-বাড়িটা তো প'ড়েই থাকে, এর দুটো ঘরে তোমাদের ইস্কুল হয় না, হ্যা?'

"সেই বড়ো-বড়ো দুটো ঘর নিয়ে ইস্কুল আরম্ভ হ'ল। সে কি আজকের কথা, এই একচল্লিশ বছর হ'ল!"

চোখ বুজিয়ে শীর্ণ মাথাটি একটু নুইয়ে একধারে কাত ক'রে কথা বলা পণ্ডিতমশাই-এর অভ্যাস। মুখখানা যৌবনে কিরকম ছিল এখন দেখে কিছু-তেই কল্পনা করা যায় না। এক-একজন লোকের যৌবন ছিল ব'লে কিছুতেই বিশ্বাস হয় না। তারা যেভাবে জীবন আরম্ভ করে, শেষ যেন তেমনি ক'রেই করে।

দেহে বা মুখে অতিরিক্ত মাংস পণ্ডিতমশাই-এর একরত্তিও নেই। কোনো কালে ছিলও না বোধ হয়। তা হ'লে চামড়া শিথিল হ'য়ে দু-একটা আরও রেখা মুখে দেখা যেত বোধ হয়।

প্রথম দেখলে মনে হয়, সে-মুখ সদা-প্রসন্ন। বিশেষ লক্ষ্য করলে বোঝা যায়, সে-প্রসন্নতা মনের নয়, মুখের মাংসপেশীর মাত্র!

পণ্ডিতমশাই ব'লে যাচ্ছিলেন, "গবর্নমেন্টের ইস্কুল হ'লে এতদিন কবে পেন্‌সান পাবার কথা। ইস্কুল ঠাঁই-নাড়া হ'লই তো ছ'বার।"—কথা কইতে-কইতে পণ্ডিতমশাই-এর টিকেটা নিবে এসেছিল। চোখ চেয়ে তিনি তাতে ফুঁ দিতে শুরু করলেন।

টিফিনের সময়ে মাস্টারদের বিশ্রাম করবার ঘরে ব'সে কথা হচ্ছিল। ঘরটি শুধু মাস্টারদের,—বিশ্রামের যতটা হোক বা না হোক, শয়ন আহারাদির বটে। ছোটো-ছোটো বেঞ্চি জুড়ে এক পাশে সেকেণ্ড পণ্ডিত অন্য পাশে ফোর্থ পণ্ডিতমশাই-এর শোবার ব্যবস্থা করা হয়েছে। ছেলেদের জল খাবার কলসিটাও ঘরের এক কোণে থাকে,—আজ বাইরে রোদে শুকোতে দেওয়া হয়েছে। বহুদিন বাসি জল না ফেলা ও কেউ তদারক না করায় নাকি এত বেশি পোকা হয়েছিল যে, ধমক দিয়েও ছেলেদের জলে পোকা হবার নালিশ বন্ধ করা যায়নি। অবশেষে কাল থেকে কলসিটাকে রোদে দেওয়া হচ্ছে। ঘরের এক দেয়াল থেকে আর এক দেয়াল পর্যন্ত পেরেকে পুঁতে দড়ি খাটানো। তাতে পণ্ডিতমশাইদের ক'টি ময়লা ছেড়া কাপড়-জামা ঝুলছে। সংখ্যায় সেগুলি অত্যন্ত কম, তাদের নতুন ব'লে ভ্রম করবারও উপায় নেই।

সেকেণ্ড পণ্ডিতমশাই বাইরে কোনো ছাত্রের বাড়ি পড়িয়ে খেয়ে আসেন।

আপিসে যাইবার সময় খাইতে বসিয়া ভূপতি হঠাৎ বলিয়াছে—"আর একটা ঝি না রাখলে চলছে না, কি বলো মা!"

মা ছেলের আহারের সময় বরাবর কাছে আসিয়া বসেন। হাতের পাখাটা থামাইয়া একটু বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছেন—"কেন! ঝি তো আমাদের দরকার নেই!"

ভূপতি খানিকক্ষণ কোনো কথা বলে নাই। নিঃশব্দে আহার করিতে করিতে হঠাৎ আবার বলিয়াছে—"একটাতেই ঠিক চলছে কি!"

মা ঠিক অর্থটা না বুঝিলেও ইঙ্গিতটুকু বুঝিয়াই গুম হইয়া গিয়াছেন।

ভূপতি আবার বলিয়াছে—"না-হয় আর একটা বিয়েই করি! এমন তো কত লোক করে!"

মায়ের হাতের পাখা থামিয়া গিয়াছে। ক্ষোভে দুঃখে চোখে জলও আসিয়াছে বুঝি।

ভূপতি তবু কিন্তু ক্ষান্ত হয় নাই। বলিয়াছে—"এ যুগের ছেলেরা তো আর মায়ের সম্মান রাখে না। মাতৃভক্তির জন্যে স্ত্রী-ত্যাগ করলে একটা কীর্তিও থাকবে।"

মা কাঁদিয়া ফেলিয়া বলিয়াছেন—"আমি তো বউকে কিছু বলিনি বাবা। ঘর-সংসার করতে হ'লে একটু শিক্ষা দিতে হয়। বউ যদি তাতে রাগ করে, না-হয় আর কিছু বলব না।"

লজ্জায় বিনতির মাটির সঙ্গে মিশাইয়া যাইতে ইচ্ছা করিয়াছে। শাশুড়ী নিশ্চয় ভাবিয়াছেন যে সে-ই স্বামীর কাছে ভর্ৎসনার কথা লাগাইয়াছে।

স্বামীকে রাত্রে নির্জনে সে একবার অত্যন্ত ক্ষুণ্ণভাবে বলিয়াছে—"ছি, ছি, তুমি মাকে অমন ক'রে কালকে কেন বলতে গেলে বলো তো! আমি কি তোমায় কিছু বলেছি?"

ভূপতি হাসিয়াছে—"না, আর একটা বিয়ে করতে তুমি বলোনি বটে!"

"তাও তুমি পারো!"—বিনতির মুখ দিয়া বাহির হইয়া গিয়াছে।

ভূপতি আবার তেমনি হাসিয়া বলিয়াছে—"আমার শক্তিতে তোমার অগাধ বিশ্বাস আছে দেখে সুখী হলাম।"

ইহার পর আর এ-সম্বন্ধে কোনো কথা বলা বিনতির নিরর্থক মনে হইয়াছে।

কিন্তু এমন ঘটনা তাহাদের সাংসারিক জীবনে ওই একটিই নয়। সংসারের মসৃণ সামঞ্জস্যকে ভাঙিয়া চুরিয়া বিশৃংখল বিকৃত করিয়া তোলায় ভূপতির যেন অহেতুক একটা আনন্দ আছে। তাহার চেয়েও বেশি—ছোটোখাটো নিষ্ঠুরতাই যেন তার বিলাস।

সংসারের খরচপত্র আগে মা-ই করিতেন। টাকাকড়ি তাঁহার হাতেই থাকিত। মাস শেষ হইবার পরও টাকা না পাইয়া মা একদিন আসিয়া বলিয়াছেন—"হাতে যে আর কিছু নেই রে! মাইনে পেতে এবারে এত দেরি যে!

ভূপতি খবরের কাগজ পড়িতেছিল। মুখ না তুলিয়াই বলিয়াছে—"দেরি কোথায়!"

"আজ সাত দিন হ'যে গেল, দেরি নয়!"

"মাইনে তো অনেক দিন পেয়েছি। ও দেওয়া হয়নি বুঝি তোমায়। আচ্ছা

যে-বর্তমান পদে-পদে তাঁর জগতের সব-কিছুর মূল্য পালট ক'রে দিচ্ছে, তার ভালো মন্দ সব-কিছুকে নির্বিচারে দাঁত খিঁচনোই তাঁর একমাত্র সুখ। রক্তহীন শীর্ণ চেহারা ; দীর্ঘকালের অজীর্ণ রোগ ও এই বিদ্বেষ মিলে মুখে একটা স্থায়ী বিরক্তির ছাপ এঁকে দিয়েছে। জুতো পায়ে দেন না—জামা গায়ে দেন না, উড়ানি ও চাদর সম্বল। মোট কথা, কঠোরভাবে তিনি ব্রাহ্মণের সমস্ত কর্তব্য পালন করেন এবং সেজন্য তাঁর অহংকারের সীমা নেই।

হুঁকোয় আরও দুটো টান দিয়ে বললেন, "তার চেয়ে বিড়ি ভালো।—ও ম্লেচ্ছর থুতু খাওয়ার চেয়ে ভালো।"

"A lot you know"—সেকেন্ড মাস্টারমশাই পা ফাঁক ক'রে দাঁড়িয়ে সিগারেট সমেত ঠোঁট দুটি এক পাশে ফাঁক ক'রে বললেন, "কি জানেন সিগারেটের? Have you any idea? কলে মিনিটে হাজার-হাজার তৈরি হ'য়ে আসছে—untouched by hand—এ কি আপনার নোংরা হাতে গুড় আর তামাক পাতা চটকানো!"

সেকেন্ড মাস্টারমশাই-এর বয়স অল্প। যেমন বেঁটে তেমনি রোগা। ভাঙা-গালে ও বসা-চোখে ঠুলির মতো বড় গগ্‌ল চশমাটা অত্যন্ত বিসদৃশ দেখায়। পা ফাঁক ক'রে হাত পেছনে নিয়ে দাঁড়ালে ঠিক মর্কট ব'লে ভ্রম হয়। কিন্তু তাঁর পৃথিবীর যাবতীয় বিষয়ে জ্ঞান নাকি অসীম এবং সে-জ্ঞানের পরিচয় তিনি সুযোগ পেলে কখনো দিতে ছাড়েন না।

হেড পণ্ডিতমশাই চ'টে গিয়েছিলেন। একধারের ঠোঁট ঘৃণাভরে একটু তুলে নোংরা কালো ক'টি দাঁত বার ক'রে বললেন, "আপনি কি বিলেত গিয়ে দেখে এসেছেন? ওদের বিজ্ঞাপন পর্যন্ত তো দৌড়! ওরা সব ধর্মপুত্তুর যুধিষ্ঠির—সব ছাঁকা সত্যি কথাগুলি আপনার মতো ভক্তদের জন্যে লিখে রেখেছে! বেদ মিথ্যে হবে তবু বিলেতে ছাপা বিজ্ঞাপন সে কি কখনও মিথ্যে হ'তে পারে? রামঃ—!"

সিগারেট আমি খাই না, সে-কথা জানিয়ে তখন আর লাভ নেই।

তর্ক অনেক দূর চলত হয়তো। কিন্তু ছেলেগুলো হুড়হুড় ক'রে ঘরে এসে ঢুকে পড়ল।

"স্যার! টিফিনের ঘন্টা হ'য়ে গেছে স্যার! তবু ফণে ঘন্টা বাজাতে দিচ্ছে না স্যার!"

হাঁফাতে-হাঁফাতে নালিশটুকু শেষ ক'রে ছেলেরা একটা ভয়ংকর কিছু প্রতিবিধানের আশায় সমস্ত মাস্টারদের মুখের দিকে চেয়ে হাঁ ক'রে রইল।

থার্ড পণ্ডিতমশাই দেহের তুলনায় অত্যন্ত অপরিসর একটি বেঞ্চের উপর শুয়ে এতক্ষণ নাক ডাকিয়ে একটু বিশ্রাম ক'রে নিচ্ছিলেন. এখন স্থূল দেহ-ভার অতি কষ্টে তুলে চোখ রগড়ে বললেন—"সব হাড় ভেঙে দেব. পাজী কোথাকার. গোলমাল কিসের রে!"—তারপর আবেষ্টনটা স্মরণ হওয়ায় আমা-দের দিকে চেয়ে একটু লজ্জার হাসি হেসে বললেন. "কি হয়েছে. এ-ঘরে কেন?"

ছেলেগুলো এবার সমস্বরে পূর্বের নালিশের পুনরাবৃত্তি করল।

"কই. ঘণ্টা কোথায় দেখি চল!"

"ফণের কাছে স্যার!"

"চল, ফণের পিঠের আজ চামড়া থাকবে না।"

এসব কাজে থার্ড পণ্ডিতমশাই-এরই উৎসাহ বেশি ; স্থূল শিথিল দেহের সমস্ত মাংসপেশী প্রতি পদভরে নাচিয়ে তিনি ছেলের দলের সঙ্গে বেরিয়ে গেলেন।

ফণে স্কুলের দুর্দান্ত বিভীষিকা। প্রতিদিন সে স্কুলের একঘেয়ে ইতিহাসে একটি বিপ্লবের সৃষ্টি করে। সবাই পেছনে গেলাম। দেখা গেল ঘন্টাটা টেবিলের ওপর যথাস্থানেই আছে। শুধু ফণের কোনো চিহ্ন নেই এবং টিফিনের ছুটি মিনিট পনরো আগে শেষ হবার কথা।

ক'টা ছেলে স্বেচ্ছপ্রণোদিত হ'য়ে চারিদিক খুঁজে এসে হাঁফাতে-হাঁপাতে খবর দিলে, "ফণে স্যার দেয়াল টপকে পালিয়েছে—বইগুলো স্যার ফেলে গেছে কিন্তু"—ও থার্ড পণ্ডিতমশাই-এর বৃহৎ মুষ্টির গাঁট্টা খেয়ে নীরবে ক্লাস গেল।

ঘন্টা বাজল। মৌচাকের মতো গুঞ্জনের সঙ্গে স্কুলের কাজ আরম্ভ হ'ল।

শহরতলির সামান্য বাংলা স্কুল।

শহরতলিটিও প্রাচীন ও দরিদ্র। যে নগণ্য পাকা বাড়িগুলি এখনো তার গৌরব রক্ষা করে তাদের সবারই অতি জীর্ণ দশা। রাস্তাগুলি অপরিসর ও অপরিষ্কার এবং তারই ধুলোর ওপর দিয়ে প্রতিদিন সেখানকার তথাকথিত মধ্যবিত্ত ও নিম্নমধ্যবিত্ত সম্প্রদায় অতিকষ্টে করুণ সহিষ্ণুতার সঙ্গে নগ্ন দারিদ্র্যকে নামমাত্র আবরণে ঢাকবার কঠিন চেষ্টায় যাতায়াত করে।

প্রতিদিন সাড়ে-দশটায় ভাঙা স্কুল-বাড়ির আলোকবিরল পাঁচটি ঘরে তাদেরই শ'খানেক ক্ষীণদেহ পুত্র-পৌত্র জীর্ণ মলিন বেশে মানুষের বহুযুগ-সঞ্চিত জ্ঞান ও বিদ্যার উত্তরাধিকার গ্রহণের উপযুক্ত হবার আশায় এসে জড়ো হয়।

স্কুলের হেড মাস্টার। পনরো দিন হ'ল কাজে ঢুকেছি।

বাড়িতে মামা বলেন—"এখন কাজে ঢুকেছিস থাক—নেই-মামার চেয়ে কানা-মামা ভালো! কিন্তু চারিধারে নজর যেন ঠিক থাকে। যত পারিস অ্যাপ্লিকেশন ক'রে যাবি, স্টেট্সম্যান রোজ পড়িস তো!"

চুপ ক'রে থাকি।

মামা আরও বলেন, "সাধ ক'রে কেউ কি আর মাস্টারি করে! বলে দশ বছর মাস্টারি করলে গোরু হয়, বিশ বছরে গাধা! ছেলে ঠেঙিয়ে ঠেঙিয়ে মাথা খারাপ হ'য়ে যাবে। পাঁচ বছর মাস্টারি করেছে শুনলে মার্চেণ্ট আপিসে ঢুকতেই দেয় না—"

মামার সব কথা কানে যায় না। অনেক সুবৃহৎ আশা ও কল্পনা মনকে অধিকার ক'রে থাকে।

স্ত্রী ভাতের থালা রেখে বাতাস করতে-করতে হয়তো বলে, "কিন্তু মাইনে যে বড়ো কম, চলবে তো?"

এবার মুখ খোলে।

"আজকের বাজারে চাকরি করলে, কী এর চেয়ে ভালো ক'রে চলত?

বেলা দশটা থেকে রাত সাতটা পর্যন্ত হাড়ভাঙা খাটুনি খেটে সাহেবের গালাগাল হজম ক'রে না-হয় আর ক'টা টাকা বেশি পেতাম। সে না-হয় কোমকেলের চাড় পরতে—আর এ না-হয় কাচের চাড় পরবে—এ কি তার চেয়ে খুব খারাপ চলা হ'ল?"

বলতে-বলতে খাওয়া থামিয়ে উত্তেজিত হ'য়ে উঠি। উমা তাড়াতাড়ি সাগ্রহে মাথা নেড়ে মতে সায় দেয়।

আরও উত্তেজিত হ'য়ে বলি, "এ কত বড়ো সম্মানের কাজ!"

"নিশ্চয়ই! তুমি কিন্তু মোটে খাচ্ছ না! ও-চচ্চড়ি আবার ফেলে রাখলে কেন?"

"এই যে, খাই।"—তাড়াতাড়ি কয়েক গ্রাস মুখে তুলে গিলে ফেলে বলি, "শুধু সম্মান? এ কত বড়ো কাজ বলো দেখি! কেরানিগিরির সঙ্গে এর তুলনা হয়! না খেতে পেয়ে মরলেও যে এতে সান্ত্বনা থাকবে—কিছু ক'রে মরলাম। এ তো আর মামা যা বোঝে সেই ছেলে-ঠ্যাঙানো নয়। মানুষ জাতটাকে গ'ড়ে তোলবার ভার আমাদের ওপর, তা জানো? প্রাণ দিয়ে করলে এর চেয়ে বড়ো শক্ত কাজ আর আছে! বিলেতে, তুমি যা বললে বুঝবে—শুধু কি ক'রে শেখানো উচিত তাই ঠিক করবার জন্যে কত লোক জীবনপাত করছে! এ তো আর মাটি-কাঠ-পাথর নিয়ে কাজ নয়, আসল মানুষ নিয়ে কাজ..."

"ও সেই তোমার আনা ওলটা, বুঝেছ না! খুব তো তেঁতুল দিয়ে একবার সেদ্ধ ক'রে ফেলেছি, আর বোধ হয় লাগবে না—লাগছে কি?"

"না, বেশ লাগছে!"

"তবু লাগছে?"

বিরক্ত হ'য়ে বলি, "আর কিছু তো বোঝো না—বাংলাটাও কি বুঝতে নেই! বেশ লাগছে মানে ভালো লাগছে।"

... ...

স্কুলে যাই।

থার্ড পণ্ডিতমশাই গেট থেকেই পরম পরিচিত শুভানুধ্যায়ীর মতো সুপুষ্ট নাতিলঘু বাঁ হাতখানি কাঁধের ওপর রেখে এক পাশে টেনে নিয়ে যান ও সুবৃহৎ মুখখানি মুখের অস্বস্তিকর রকম নিকটে এনে, হাপরের মতো অতিগোপন ফিসফিস স্বরে বলেন, "নতুন এখানে ঢুকলেন তো! হালচালও এখানকার কিছু জানেন না। তাই একটু সাবধান ক'রে দিচ্ছি!"—সঙ্গে-সঙ্গে ঈষৎ আরক্ত চোখ দুটি স্ফীত ও বৃহত্তর হ'য়ে তাঁর উপদেশ সমর্থন করে।

তিনি ব'লে যান, "পরের কথায় হেলবেন না মশাই, কারুর না, এই যে আমি বলছি আমার কথাতেও না, ও আমার কাছে ন্যায্য কথা।—আমি ব'লে তো আর পীর নই। একেবারে আপরাইট অ্যাজ এ কোকোনট ট্রি। নতুন পেয়ে সবাই একবার বাজিয়ে দেখবে কিনা, দুনিয়ার নিয়মই এই! কিন্তু বোল দেবেন একেবারে কাটা-কাটা—ঢিমে-তেতালা কখনো নয়, নেভার।"

হাপরে ফিসফিস ক্রমে সুস্পষ্ট হাঁড়িগলায় এসে পৌঁছয়। "একটু ফ্রেণ্ডলি অ্যাড্‌ভাইস দিলাম, কিছু মনে করবেন না যেন!" একটি মোলায়েম হাসি দিয়ে মনে করবার সব-কিছু মুছিয়ে দিয়ে হঠাৎ মুখটা আবার নামিয়ে এনে পণ্ডিতমশাই চুপিচুপি বলেন—"একটা মজা দেখবেন? হট ক'রে আজ

জিজ্ঞেস ক'রে দেখবেন দেখি, সেভেন্থ ক্লাসের রেজেস্ট্রিতে চোদ্দজনের নাম, আর ক্লাসে পনেরোজন হয় কি ক'রে! অমনি ঘুরতে-ঘুরতে ক্লাসে ঢুকে বেটপ্‌ক জিজ্ঞেস ক'রে বসবেন, বুঝেছেন? তারপর দেখবেন রগড়খানা! অনেক মজা আছে মশাই এইটুকুর মধ্যে—বহুৎ রগড়—"

হঠাৎ সুর বদলে পণ্ডিতমশাই বলেন, "চলুন!" এবং স্কুলে ঢুকতে-ঢুকতে আর একবার স্মরণ করিয়ে দেন, "সেভেন্থ ক্লাসে, বুঝেছেন! অমনি বেটপকা জিজ্ঞেস ক'রে বসবেন!"

মনটা দ'মে যায় একটু হয়তো।

ঘণ্টা বাজে। স্কুল বসে। পাশের ঘরের গোলমালে পড়ানো যায় না। উঠে গিয়ে দেখি, সেকেণ্ড মাস্টারমশাই এসে পোঁছননি; কোনোদিনই তিনি সময়ে এসে পোঁছন না। ছেলেগুলোকে নিজের ক্লাসে নিয়ে এসে বসাই।

প্রায় আধঘণ্টা বাদে দু'খানা মোটা-মোটা বই হাতে ক'রে সেকেণ্ড মাস্টার-মশাই আসেন। বইগুলোর নাম পড়া যায় এমনভাবেই টেবিলের ওপর রেখে বলেন, "আপনি আবার কষ্ট ক'রে এ-ঘরে এসেছেন। কিছু দরকার ছিল না।" বইগুলোর দিকে তাকিয়ে বলেন, "পড়বেন নাকি একখানা? নিন না, ওয়েল্‌-সের এখানা নিন—গার্কিরখানাও নিতে পারেন, যেটা খুশি—! আমার ওসব দু'-দু'বার পড়া হ'য়ে গেছে, তবু আবার পড়ি—স্‌প্লেণ্ডিড বুকস! কোনটা দেব?"

বিনীতভাবে বলি, "এখন পড়বার সময় হবে না।"

বইগুলো তুলে নিয়ে করুণামিশ্রিত অবজ্ঞার সঙ্গে তিনি বলেন, "এসব বালাই বুঝি নেই আপনার? মন্দ নয়; আমার কিন্তু মীট অ্যাণ্ড ড্রিঙ্ক মশাই।"

রুগ্ন বিবর্ণ ফ্যাকাশে মুখ ও শীর্ণ খর্ব দেহ দেখলে সে-কথা বিশ্বাস হয় বটে!

ছেলেদের ডেকে নিয়ে, দেরি হবার জন্যে বিন্দুমাত্র লজ্জিত না হ'য়ে তিনি চ'লে যান।

দেরি করা সম্বন্ধে কয়েকদিন ধ'রেই বলব-বলব ক'রেও কিছু বলতে পারছি না।

আবার পড়ানোয় মন দিই। ফার্স্ট ক্লাসের তিনটি মাত্র ছেলে। কুঁজো হ'য়ে বুড়োর মতো মাথা নিচু ক'রে নির্জীবের মতো আনমনাভাবে চুপ ক'রে থাকে। এক-একসময় মিছেই ব'কে মরছি মনে হয়, মনে হয় কিছুই শুনছে না। চোদ্দ-পনেরো বছর সব বয়স—মুখে জৌলুস নেই—চোখে জ্যোতি নেই!—হঠাৎ নিজের বিরক্তি ধরে। মনে হয়, আমার শুষ্ক বই-এর ব্যাখ্যার চেয়ে আলো বাতাস ও পুষ্টির এদের ঢের বেশি প্রয়োজন।

তবু পড়িয়ে চলি। কোথা থেকে, মাঝে-মাঝে একটা অত্যন্ত দুর্গন্ধ আসে। ছেলেগুলো মুখ চাওয়াচাওয়ি করে—নাকে কাপড় দেয়।

"কিসের দুর্গন্ধ বলো তো?"

ক্ষ্যাপাটের মতো একটা অত্যন্ত নোংরা রোগা ছেলে উঠে দাঁড়িয়ে ছেঁড়া কোটের নিঃসঙ্গ বোতামটিকে বাঁ হাতে নাড়তে-নাড়তে বোকার মতো হেসে হড়বড় ক'রে বলে, "পায়রা পচেছে স্যার, ওই যে পায়রাগুলো আছে স্যার, তাই খোপের মধ্যে প'চে গেছে স্যার, প্রায় স্যার প'চে যায়। ভয়ানক গন্ধ

স্যার! হোয়াক্ থ্ন!"—ছেলেটা জানলায় গিয়ে থুতু ফেলে।

বারান্দায় কার্নিসের ওপর অনেকগুলো পায়রা থাকতে দেখেছি বটে।

উৎকট দুর্গন্ধ। একটা কিছু বিহিত করা দরকার।

মাস্টারমশাইরা বলেন—"ওখানে কে উঠবে মশাই। ও খানিক বাদে গন্ধ আপনিই যাবে'খন।"

বেয়ারাটা মই ছাড়া অতদূর উঠতে পারবে না বলে।

বাইরে যাবার ছুতো ক'রে ছেলেগুলো বাইরে এসে দাঁড়ায়, দাঁড়িয়ে দেখে।

মাস্টাররা নাকে কাপড় দিয়ে এসে ওপর দিকে চেয়ে মাথা নাড়েন।

সেকেণ্ড মাস্টারমশাই রুমাল নাকে দিয়ে বলেন, "রট্ন্ প্লেস, পায়রাগুলো পর্যন্ত রট্ন্।"

একটা ছেলে হঠাৎ কাউকে কিছু না ব'লে অত্যন্ত ক্ষিপ্রতা ও কৌশলের সংগে জানলার গরাদে, দরজার মাথা ইত্যাদি ব্যবহার ক'রে অর্ধেক পথ উঠে গিয়ে বলে, "আমি উঠে পেড়ে দেব স্যার?"

"আমি উঠে পেড়ে দেব স্যার!" ভেংচিয়ে ছড়ি তুলে থার্ড পণ্ডিতমশাই বলেন, "তোমায় কে বাহাদুরি দেখাতে বলেছিল বাঁদর? নেমে এসো, দেখাচ্ছি—সব কাজে বাঁদরামি!"

তাঁকে থামিয়ে বলি, "পারে যদি উঠুক না! আর কোনোরকম বন্দোবস্ত যখন হচ্ছে না—"

"আশকারা পায় মশাই!"

ফণে ততক্ষণ কারুর কথা শোনবার অপেক্ষা না রেখে দরজার মাথায় গিয়ে উঠেছে। কড়িকাঠের ফোকরের ভেতর হাত ভ'রে একটা মরা আধপচা পায়রার ছানা বার ক'রে হেসে বলে, "পায়রার ছানা স্যার! পায়রাগুলো হাতে আবার ঠুকরে দেয়!"

ছেলেটা স্কুলের চক্ষুশূল এবং নিরবচ্ছিন্ন শান্তির একমাত্র ব্যাঘাত। তবু ছেলেটাব উজ্জ্বল দুষ্টুমিভরা চোখ দুটি কেমন যেন ভালো লাগে। এখানকার নির্জীব স্থবিরতার মাঝে ও-ই যেন একটুখানি সজীব চঞ্চলতা—!

দুর্গন্ধ পচা পায়রার একটা কিনারা হয়। মাস্টার ও ছেলেরা আবার ঘরে গিয়ে ঢোকে। থার্ড পণ্ডিতমশাই যাবার সময় আর একবার ইশারা ক'রে তাঁর কথাটা স্মরণ করিয়ে দিয়ে যান।

একটু ঘুরে দেখতে বেরোই।

সেকেণ্ড মাস্টারমশাই বই পডছিলেন। আঙুল রেখে সেটি মুড়ে অত্যন্ত অলসভাবে ঈষৎ বিরক্তিভরে উঠে দাঁড়ান। ছেলেগুলো লেখা থামিয়ে উঠে দাঁড়ায়।

বলেন, "আমার মেথড হচ্ছে কী জানেন—খালি লেখা, ছেলেদের খালি লিখতে দেওয়া। আমি এই ছ-মাসে এ-মেথডে ওয়াণ্ডারফুল রেজাল্ট পেয়েছি। শুধু মুখে পড়ানোর চেয়ে এ ঢের এফেক্টিভ। চোখ, কান ও হাতের সেন্সেশান সমস্ত দিয়ে ব্রেন নলেজটা রিসিভ করে কিনা!" একটু দর্পের হাসি হেসে আবার বলেন, "কাজটাতে একদম আমার লাইকিং নেই যদিও, তবু মেথড অফ টিচিং নিয়ে একটু-আধটু এক্সপেরিমেন্ট করেছি,—আপনি 'ড্যাল্টনের মেথড' সম্বন্ধে পড়েছেন নিশ্চয়!"

শুকনো একচিমটে মানুষটির ছোট্টো মুখের অর্ধেকের বেশি 'গগল'টাই অধিকার ক'রে আছে। ওইটুকু মুখ থেকে এইসব অহংকারের কথা ভারি হাস্যকর লাগে।

বলি, "ছেলেদের 'অ্যাটেণ্ডেন্স'টা এ-ক'দিন খাতায় তুলতে ভুলে গেছেন, অনুগ্রহ ক'রে আজ তুলে রাখবেন।"

"ও, 'সরি'—মনে ছিল না।"

যেতে-যেতে বুঝতে পারি লোকটি অত্যন্ত অবজ্ঞাভরে আমার দিকে চেয়ে আছেন।

একই ঘরের দুই প্রান্তে হেড পণ্ডিত ও থার্ড পণ্ডিতমশাই-এর ক্লাস। টুঁ শব্দটি নেই। দুইজনেরই বিশ্বাস তাঁর মতো ডিসিপ্লিন কেউ রাখতে জানে না এবং প্রত্যেকেই অপরের এই 'ডিসিপ্লিন' রাখবার ক্ষমতাকে অত্যন্ত অবজ্ঞার চক্ষে দেখেন। এক ঘরে দু-জনার ক্লাস থাকলে আর রক্ষে নেই। দু-জনে প্রতিযোগিতা ক'রে ডিসিপ্লিন রাখতে শুরু করেন।

ছেলেরা পাংশুমুখে সভয়ে নিশ্বাসটুকু পর্যন্ত টানতে দ্বিধা করে।

নিস্তব্ধ ক্লাসে শুধু দুই পণ্ডিতমশাই-এর গলা শোনা যায়—মাঝে-মাঝে।

"পেন্সিল ঠুকছে কে রে! শব্দ-টব্দ করা চলবে না বাপু; এটা মামার বাড়ি নয়,—ইস্কুল। এদিকে আয় দেখি।"

চপেটাঘাতের শব্দ শোনা যায়।

প্রত্যুত্তরে থার্ড পণ্ডিতমশাই এক পর্দা চড়িয়ে ধরেন—"পা দোলাচ্ছিস কেন রে কেষ্টা? কি ব'লে দিয়েছি আমি কাল? শুধু চুপ ক'রে থাকলেই আমার ক্লাসে সাত খুন মাপ হবে না বাপু, এ বড়ো কঠিন ঠাঁই; হাত, পা, মাথা কিছু নড়বে না—একেবারে পুতুলটি হ'য়ে থাকতে হবে।"

হেড পণ্ডিত মনে-মনে বোধ হয় এর পাল্টা চাল খোঁজেন।

নিস্তব্ধ ক্লাস ভয়ে আড়ষ্ট হ'য়ে থাকে।

থার্ড পণ্ডিতমশাই ইশারায় আমায় সে-কথাটা আর একবার স্মরণ করিয়ে দেন।

ফোর্থ পণ্ডিতমশাই-এর ক্লাসে অত্যন্ত গোলমাল—

হেড পণ্ডিত ও থার্ড পণ্ডিতমশাই-এর শাসনে রুদ্ধবেগ সমস্ত দৌরাত্ম্য সুদ সমেত তারা ফোর্থ পণ্ডিতমশাই-এর ক্লাসে মুক্ত ক'রে দেয়।

কেউ তাঁকে মানে না। চারিধারে ভিড় করে দাঁড়ায়। পণ্ডিতমশাই পাখার বাঁট দিয়ে এলোপাথাড়ি প্রহার ক'রে তাড়াবার চেষ্টা করেন। ছেলেদের ভারি একটা খেলা মনে বোধ হয়। পাখার বাঁটের নাগালের বাইরে দাঁড়িয়ে তারা হাসতে থাকে।

"স্যার, নগেন স্যার, চেয়ারের পেছনে দাঁড়িয়ে।"

"না স্যার"—অত্যন্ত চতুরতার সঙ্গে নগেন নিজের জায়গায় গিয়ে হাসে।

অগত্যা পণ্ডিতমশাই ওঠেন, দাঁত খিঁচিয়ে বলেন, "সক্কলের এক ঘা ক'রে বেত।" এবং পরক্ষণেই দাড়ি-গোঁফের জংগল ভেদ ক'রে অকারণ হাসিটুকু প্রকাশ পায়।

ছেলেরা হৈচৈ করে—"হ্যাঁ স্যার, হ্যাঁ স্যার!"এবং স্বেচ্ছায় হাত বাড়িয়ে হাসে।

পণ্ডিতমশাই পাখার বাঁটের এক-এক ঘা ক'রে মেরে যায়।
"হ্যাঁ রে অনিল, তোর না ফার্স্ট বেঞ্চিতে জায়গা ?"
ছেলেরা চিৎকার ক'রে বলে, "হ্যাঁ স্যার, ও একবার মার খেয়েছে স্যার, আবার খাবার জন্যে নেমে এসে বসেছে স্যার—!"
"আর তোকে মারব না তো।"
অনিল অনুনয় ক'রে বলে, "আর একবার স্যার!"
একটা ছেলে চেঁচিয়ে জানায়, "ওই আপনার ডাল ভিজে গেল স্যার, বৃষ্টি পড়ছে।"
পণ্ডিতমশাইয়ের ডাল রকে খবরের কাগজের ওপর শুকোয়। তাড়াতাড়ি মার ফেলে পণ্ডিতমশাই ডাল তুলতে দৌড়ান। সত্যিই বৃষ্টি পড়ছে।
ধীরে-ধীরে সেখান থেকে চ'লে আসি। কিছু বলতে পারি না কেন জানি না। আসবার পথে দেখি, বৃদ্ধ সেকেণ্ড পণ্ডিতমশাই ক্লাসে টেবিলের ওপর পা তুলে দিয়ে ঘুমচ্ছেন। মাথাটা চেয়ারের পেছনে কাত হ'য়ে ঝুলে পড়েছে। ঘুমন্ত মুখ তাঁর চিরপ্রসন্নতার আভাস হারিয়ে অত্যন্ত ক্লান্ত ও কাতর দেখায়।
আবার টিফিনে ফণের নূতন কীর্তির তদন্ত করতে হয়। সেকেণ্ড পণ্ডিতমশাই-এর ঘুমবার সময় সে নাকি রেজেস্ট্রি খুলে সমস্ত অনুপস্থিত চিহ্নগুলি উপস্থিতের চিহ্ন করে দিয়েছে। শুধু নিজের নামটি ক'রেই সে নাকি ক্ষান্ত থাকেনি, অত্যন্ত পরার্থপরতার সঙ্গে ক্লাসের সকলকেই নিজের গৌরবে সমান অধিকার দিয়েছে।
স্কুলের দিন এমনি ক'রে কাটে।

"কাপড় কেনাটা এবারে না-হয় থাক—" উমা বলে।
বুঝি সবই। তিন মাস ধ'রে অত্যন্ত পুরনো কাপড় দুটো সেলাই ক'রে কোনোরকমে চালাবার ইতিহাসটাও তার জানি। তবু চুপ করে থাকি। কিছু দিন ধ'রে আর একটা টিউশনির চেষ্টা দেখছি ; এখনো যোগাড় করে উঠতে পারিনি।
"মুদি কাল আবার এসেছিল, ওর আর কেরোসিন-তেলওয়ালারটা দিয়ে দিলেই এখন চলবে। অন্যগুলো দু-দিন দেরি করলে ক্ষতি নেই।"—একটু হেসে উমা আবার বলে, "খোকার জামার কাপড় আর কিনতে হবে না, তোমার সেই ছেঁড়া শার্টটা থেকে খোকার কেমন জামা করেছি দেখবে?"
অত্যন্ত খুশীর ভান ক'রে উমা তাড়াতাড়ি জামাটা এনে দেখায়। হাসি-মুখে বলি—"বাঃ, চমৎকার হয়েছে তো! ওই ছেঁড়া জামাটা থেকে এমন সুন্দর হ'ল ? তুমি দেখছি অ্যারেবিয়ান নাইট্‌সের জাদুকরী!"
এবার সত্যিকারের আনন্দে তার মুখ উজ্জ্বল হ'য়ে ওঠে, বলে, "তোমার সব কথায় ঠাট্টা!"
কিন্তু আনন্দটাকে বেশিক্ষণ ধ'রে রাখা যায় না। কখন দেখি তা উবে গেছে।
মনে-মনে সংকল্প করি, এবার আর একটা টিউশনি যোগাড় করবই।
ম্লানমুখে উমা একসময় বলে, "মামারা আর এখানে আসবেন না, বোধ

হয় কিছু মনে ক'রে গেছেন।"

"কেন?"

"যত্ন-টত্ন কিছুই তো করতে পারিনি। সত্যি তাদের ভালো ক'রে যত্ন না করতে পেরে এমন লজ্জা হত!" —ব'লে উমা একটু হাসবার চেষ্টা করে। তারপর বলে, "তাঁরা তো আর রোজ আসেন না, পাঁচ-দশ বছরে এক-বার! তাও যত্ন করতে পারলাম না!"

সত্যি কথা। কিন্তু যত্ন না করতে পারাতেই মুদির কাছে দ্বিগুণ ঋণ হ'য়ে গেছে। স্বজনপ্রীতি হয়তো অন্তরের স্বতঃস্ফূর্ত জিনিস, কিন্তু তার পরিচয় দেবার সৌভাগ্য সকলের হয় না। আত্মীয়স্বজন আসার আনন্দের পেছনে অত্যন্ত স্থূল অত্যন্ত হীন দুর্ভাবনাটাকে কোনোরকম ধমক দিয়েই চেপে রাখবার উপায় নেই।

"তুমি অত ভাবছ কেন বলো তো? এ-মাসে না হয়, আর-মাসে কাপড়-চোপড় কিনলেই তো হবে। ত্রিশটা দিন বই তো নয়—ও-মাসে তো আর উপ্‌রি খরচ নেই।"

কিন্তু ও-মাসেও হয় না।

হঠাৎ ডাক্তার ও ডাক্তারখানার বিল বেড়ে ওঠে। খোকার অত্যন্ত অসুখ। অনেক কষ্টে সেরে ওঠে।

উমা বলে, "দেখো, এ-মাসটাও কাপড় না হ'লে চ'লে যাবে। সেমিজটায় তালি লাগিয়ে নিয়েছি, কাপড়ের তলায় থাকবে, তালি থাকলেই বা কে দেখতে যাচ্ছে।" খানিক থেমে বলে, "তোমার জুতো জোড়াটা যেন এবারেও কিনতে ভুলে যেও না।"

"পাগল হয়েছ! আমি নেহাত আহাম্মুক তাই জুতো কিনব বলেছিলুম। হাফ্‌সোল আর হিল লাগিয়ে এই তিনটি জায়গায় তালি দিলে এ-জুতোকে আর ছ-মাসের মতো দেখতে-শুনতে হবে না। কি রকম মজবুত জুতো এ—!"

উমা কি জানি কেন অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে থাকে।

খানিক বাদে বলে, "খোকার একটা বিলিতি দুধ এনো!"

"এই সেদিন বিলিতি দুধ এল, এর মধ্যে ফুরিয়ে গেল! এরকম খরচ করলে তো পারা যায় না।" —একটু বিরক্তই হই।

মুখ ম্লান ক'রে উমা বলে—"এরকম আর কী খরচ করি। ডাক্তার তবু কতবার ক'রে খাওয়াতে বলেছিল, আমি তো শুধু সকালে একবার রাত্রে একবার খাওয়াই, আর বাকি তো শুধু অ্যারারুট দিই।"

জোর ক'রে বলি—"ডাক্তাররা ওরকম ঢের বলে। অ্যারারুট বেশি ক'রে দিও। বিলিতি দুধ যখন ছিল না তখন আর এ-দেশে ছেলে বাঁচত না?" নিজের বেদনাময় সন্দেহের কাঁটাটাও বোধ হয় ওই দিয়ে উড়িয়ে দেবার চেষ্টা করি।

ইনফ্যাণ্ট-ক্লাসের ছেলেগুলো বসতে পায় না, মাটিতে বসে। ক'টা বেঞ্চির অত্যন্ত দরকার। ঘরটাও বড়ো অন্ধকার : পেছন দিকে একটা জানালা ফোটালে ভালো হয়।

সেক্রেটারিমশাই অত্যন্ত ভদ্রলোক, কিন্তু তাঁর হাত নেই। বললেন, "বোর্ড থেকে না হুকুম দিলে আমি তো কিছু করতে পারি না।"

অনেক দিন বাদে বোর্ড থেকে সংবাদ এল। জানালাটা সম্বন্ধে এখন কিছু করা যায় না। জানালার পেছনের জায়গাটাই অপরের। তারা বোধ হয় জানলা খুলতে দেবে না। তা ছাড়া, বাড়িওয়ালা থাকেন বিদেশে, তিনি জানালা হয়তো খুলতে চাইবেন না—ইত্যাদি অনেক হাঙ্গামা। সুতরাং জানালা খোলা হবে না।

বেঞ্চ সম্বন্ধে কথা এই যে, ইনফ্যাণ্ট-ক্লাসের ছেলের সংখ্যার কিছু ঠিক নেই। কখনও বাড়ে, কখনও কমে। সুতরাং তার জন্যে স্কুলের টাকার এই টানাটানির সময় বেঞ্চ কেনা সুবুদ্ধির কাজ নয়। অন্য ঘর থেকে একটা নিয়ে চালিয়ে দিলেই হবে।

হয়তো কথাগুলো বিবেচকের মতো। কিন্তু মনটা ভালো নেই। কিছুদিন আগেই বোর্ড থেকে এক রহস্যময় আদেশ এসেছে মাস্টারদের ওপর—আর স্কুলে নির্দিষ্ট পাঠ্যের অতিরিক্ত কিছু পড়িয়ে যেন সময় নষ্ট করা না হয়।

প্রথমটা কিছু বুঝতে পারিনি। হঠাৎ একদিন মনে হ'ল মাঝে-মাঝে বাইরের বই থেকে ছেলেদের আমি গল্প-গাছা বলি বটে। সেটা দূষণীয় ভাবিনি এবং তা লুকোবার কোনো চেষ্টাও আমার ছিল না। কিন্তু সে-সংবাদ বোর্ডের কানে হঠাৎ গেলই বা কি ক'রে তাও বুঝতে পারি না।

কিছুদিন আগে ইনফ্যাণ্ট-ক্লাসকে এক ঘণ্টা আগে ছুটি দেওয়ার নিয়ম নিয়েও একটু গোল হয়েছে।

হুকুম এসেছে—"অনুগ্রহ ক'রে প্রচলিত নিয়ম পরিবর্তন করবেন না।"

পাঠ্য-পুস্তকের তালিকা সম্বন্ধে নতুন প্রস্তাব করতে গিয়েও অমনি বিফল হয়েছি।

থার্ড পণ্ডিতমশাই একধারে ডেকে নিয়ে গিয়ে বলেছেন, "আপনারা ছেলেমানুষ—এখনও সরল প্রকৃতির, ওসব সংসারের মারপ্যাঁচ তো এখনও বোঝেন না। আপনি সরল মনেই গেলেন নতুন বই বদলাতে, লোকে তো আর তা বুঝবে না। তারা ভাবলে, আপনি বইওয়ালাদের কাছে ঘুষ খেয়েছেন। ওরকম খায় যে মশাই! আপনি যে সরল মানুষ তা তো আর লোকে বুঝবে না..."

সমস্ত গাটা কেমন যেন রিরি ক'রে উঠেছে। পণ্ডিতমশাই-এর আকস্মিক অন্তরঙ্গতার কারণও বুঝে উঠতে পারিনি। স্কুলে ঢোকবার প্রথম দফাতেই তাঁর সঙ্গে তাঁর একটা অনুরোধ নিয়ে একটু ঠোকাঠুকি হয়েছিল।

অনুরোধ না রাখার পরের দিনই তিনি হঠাৎ টিফিনের সময় নিজে থেকেই ব'লে উঠেছিলেন, "হেডমাস্টারমশাই বলছিলেন, সব ছেলের নাম তো রেজেস্ট্রিতে নেই—সেটা তো ভালো কথা নয়।"

অত্যন্ত 'কিন্তু' হ'য়ে ফোর্থ পণ্ডিতমশাই বলেছিলেন, "দেখুন, এই তিন দিন বাদেই ওর বাপ এসে ভর্তি ক'রে দেবে, এই দু-দিন অমনি বসছে। অমনি আসে আমি আর বারণ করতে পারি না..."

অত্যন্ত বিরক্ত হয়েছিলাম—"আমি তো এরকম কোনো কথা বলিনি, আপনিই তো বরং আমায় এ-খোঁজটা করতে বলেছিলেন থার্ড পণ্ডিতমশাই।"

সেইদিন থেকে পণ্ডিতমশাই একটু এড়িয়ে-এড়িয়ে চলতেন। হঠাৎ তাই এই আত্মীয়তা একটু বিস্ময়কর লাগল সেদিন।

টিফিনের ঘণ্টায় বিশ্রাম-ঘরে চ্নপ ক'রে ব'সে থাকি। কোথাকার রেল-ভাড়া ক'পয়সা কমেছে উৎসাহের সংগে সেই আলোচনা চলে।

পাশে ব'সে সেকেণ্ড মাস্টার থার্ড পণ্ডিতমশাইকে কোন কোন বড়ো-বড়ো সাহিত্যিকের সংগে তাঁর কিরূপ অন্তরঙ্গতা আছে তারই গল্প বলেন। তিনি যে নিজেও একজন সাহিত্যিক এ-কথা সম্প্রতি তিনি প্রকাশ করেছেন এবং এই বিস্ময়কর সংবাদ প্রকাশ হবার পর থেকে নিজেদের সৌভাগ্য সম্বন্ধে সচেতন হ'য়ে সমস্ত স্কুল একটু ব্যতিব্যস্ত হ'য়ে পড়েছে। ছাড়া ছাড়া দু-একটা কথা শুনতে পাই—

"এ-ইস্কুলে আর ক'দিন আছি বলুন......কি জানেন, ক্রিয়েটিভ ওয়ার্কের সংগে এসব কাজ করা চলে না......কোনোরকমে প'ড়ে আছি বৈ তো নয়...... লেখাটা পেইং হ'তে আমাদের দেশে একটু দেরি লাগে কিনা......বিশেষত ভালো লেখা......বিলেতে হ'লে কি আর ভাবতে হ'ত! নতুনের কদর কি এদেশে বোঝে......"

এই ছোট্টো শুকনো মানুষটির দৃঢ় বিশ্বাস, হতভাগ্য এই দেশ অত্যন্ত নির্বোধ ব'লেই তাঁর অসামান্য প্রতিভার উপযুক্ত সম্মান অবিলম্বে দিতে পারছে না। পণ্ডিতমশাইও শোনেন ব'লে মনে হয় না।

এই নিত্যনৈমিত্তিক একঘেয়েমি অসহ্য বোধ হয়। হাঁপিয়ে উঠি।

ফণেও স্কুল ছেড়ে দিয়েছে। নিরবচ্ছিন্ন শান্তিতে স্কুল চলে।

তার শেষ কীর্তি পকেটের ভিতর জ্যান্ত হেলে সাপ এনে ক্লাসের মধ্যে ছেড়ে দেওয়া। থার্ড পণ্ডিতমশাই-এর কাছে বেদম মার খেয়ে তারপর সে আর স্কুলে আসেনি। তার বাপ এসে স্কুলে ব'লে গেছে—তার নাকি বিদ্যা হবার কোনো আশা নেই—সবাই তাই বলে।

দু-একটা ছেলে এসে খবর দিয়েছিল—সে নাকি এবার তার বাপের ব্যবসা দেখবে। সবাই বলেছিল—"বেনের ছেলে তো!"

দুটো টিউশানিই গেছে।

খোকার অত্যন্ত লিভারের দোষ হয়েছে। চিকিৎসা চলছে।

আজকাল আবিষ্কার করেছি, রাত্রে শুধু দুটি ছাতু খেয়ে থাকলে শরীর ভারি হালকা থাকে, অজীর্ণ হবার কোনো সম্ভাবনা থাকে না।

উমা বলে—"ওসব সেমিজ-টেমিজ আজকালের ফ্যাশান বৈ তো নয়! বয়স হয়েছে, আর বাপু লজ্জা করে পরতে—তা সেকেলে বলুক আর যাই বলুক লোকে।"

উমার বয়স উনিশ হয়েছে বটে।

... ...

সেদিন অতি কষ্টে রাগ সামলেছি।

মাথাটা সকাল থেকে অত্যন্ত ধরা। তবুও পড়িয়ে যাই।

পড়াতে-পড়াতে একটি ছেলের প্রতি কেমন সন্দেহ হয়—শুনছে না। জিজ্ঞাসা করলে কিছু বলতে পারে না। ধমক দিয়ে আবার পড়াতে আরম্ভ করি।

হঠাৎ চোখে পড়ে ছেলেটা বই আড়াল দিয়ে অন্য কী পড়ছে।

বই-এর পেছনে ডিটেক্‌টিভ উপন্যাস ধরা পড়ে।

সমস্ত রক্ত যেন এক মুহূর্তে মাথায় উঠে যায়—

"পাজী কোথাকার! আমার মুখ দিয়ে ফেনা উঠছে আর তুমি ডিটেক্‌টিভ উপন্যাস পড়ছ!"—কান ধ'রে হিড়্‌হিড় ক'রে ছেলেটাকে টেনে নিয়ে আসি।

নিজের পৈশাচিক রাগে নিজেই হঠাৎ বিস্মিত হ'য়ে তাকে ছেড়ে দিই। সামান্য কারণে এমন রাগ তো আমার কখনো হ'ত না!

এবার বর্ষাটা বড্ডো বেশিদিন ভোগাচ্ছে। জুতোটা আরও দু-মাস বেশ পায়ে দেওয়া যেত। বর্ষার জন্যেই যা অনবরত ভেতরে জল ঢুকছে। তা ব'লে এই ক'দিন বর্ষার জন্যে এমন জুতোটা ফেলে দিয়ে আব্যর এক জোড়া কেনা তো আর যেতে পারে না!

সর্দিটা বোধ হয় এই ভিজে পায়ে থাকার জন্যেই বাড়ছে। মাথাটা আজকাল রোজই ধরে। কেমন যেন গায়ে জোর পাই না।

উমা চিন্তিতভাবে মুখের দিকে চেয়ে বলে—"তোমার কিন্তু গলার হাড় দেখা দিচ্ছে! তুমি আজকাল মোটে ভালো ক'রে খাও না।"

হেসে তার পিঠ চাপড়ে বলি, "হাড় থাকলেই দেখা যায়—"

স্কুলের শেষ দুটো ঘণ্টায় মাথার যন্ত্রণা অসহ্য হ'য়ে ওঠে।

ডাক্তার বলেছে, "কিছুদিন রেস্ট্‌ নিন না—আপনিই সেরে যাবে।"

বলি, "হ্যাঁ, এইবার নেব ভাবছি—আচ্ছা এর কোনো ওষুধ-টোষুধ দেওয়া চলে না তো?"

"কিছু না। শুধু বিশ্রাম নিলে আপনি সেরে যাবে।"

ক্লাসে শেষ দু-ঘণ্টায় কিছুতেই বই খুলে পড়তে পারি না।

আর সত্যিই মাঝে-মাঝে লিখতে দেওয়া তো আর খারাপ নয়। লেখাটাও তো দরকার। আমি তো আর ফাঁকি দেবার জন্যে লেখাচ্ছি না—লেখার ভেতর দিয়েও তো ছেলেদের বেশ আনন্দের সঙ্গে শিক্ষা দেওয়া যায়! ভেবেচিন্তে লেখার একটা খেলাও তো বার করা যেতে পারে।

ছেলেদের বলি—"কে কোন অক্ষর নিবি বল।"

"এফ, স্যার"—"আর"—"সি"......

"বেশ। আজকের পড়া থেকে নিজের-নিজের অক্ষর যে ক'টা কথার আগে আছে খুঁজে-খুঁজে খাতায় লিখে ফেল দেখি। দেখি কার ভাগে ক'টা অক্ষর পড়ে।"

বেশি ক'রে ছেলেদের আর বোঝাতে হয় না। ক'দিন ধ'রেই তারা এ-খেলা করছে—জানে। তারা উৎসাহের সঙ্গে বলে, "হ্যাঁ স্যার।"

এই তো বেশ লেখার পদ্ধতি! ধরতে গেলে মাথা থেকে বেশ ভালো মতলবই বেরিয়েছে!

একটা ছেলে অত্যন্ত তাড়াতাড়ি খাতা দিয়ে বলে, "আমার 'ওয়াই' ছিল স্যার, হ'য়ে গেছে।"

"আচ্ছা এবার 'ই' ধরো—"

ছেলেরা কী বোঝে জানি না? কেউ আর খাতা নিয়ে আসে না।
হঠাৎ ঘণ্টার শব্দে জেগে উঠি।
চমকে দেখি—
ঘুমচ্ছিলাম...
টেবিলের ওপর পা তুলে দিয়ে চেয়ারের পিঠে মাথা রেখে ঘুমচ্ছিলাম!

নিরিবিলি দেখে হনু একটু নিশ্চিন্ত হ'য়ে গা চুলকোবার যোগাড় করছে, এমন সময়ে ওপরে আওয়াজ হ'ল—"হুম, হুম!" দিনদুপুর হ'লে কি হয়—জায়গাটা বেজায় অন্ধকার, তাই হনু প্রথমটা দেখতে পায়নি। এবার চমকে এদিক-ওদিক চেয়েই উর্ধ্বশ্বাসে দে লাফ। এ-ডাল থেকে আর ডালে, সে-ডাল থেকে একেবারে আর এক গাছে। ওঃ, খুব ফাঁড়াটা কেটে গেছে। আর একটু হ'লেই হয়েছিল আর কি! গেছো প্যাঁচার অক্ষয় পরমায়ু হোক, দিনকানা ব'লে আর কখনও তাকে হনু ক্ষেপাবে না।

শিকার ফসকে চকচকে ছুরির মতো চোখ তুলে, চিতা একবার গেছো প্যাঁচার দিকে তাকালে। ডালটা নাগালে পেলে একবার চুকলি খাওয়ার মজাটা দেখিয়ে দিত।

কিন্তু গেছো প্যাঁচা হুতুম নির্বিকার—ধ্যানগম্ভীর বুদ্ধমূর্তি যেন। আধবোঁজা চোখের তলা দিয়ে চিতার দিকে শান্তভাবে তাকিয়ে বললে,—"কাজটা কি ভালো হচ্ছিল বন্ধু—বিশেষ এই দিনদুপুরবেলা?"

চিতা নীচে থেকে ফ্যাঁস ক'রে উঠল—"দিনদুপুরবেলা মানে?"

হুতুম গম্ভীরভাবে বললে—"মানে, আজকাল তোমরা বনের শাস্তর-টাস্তর সব উল্টে দিলে কিনা! দিনরাতের বিচার আর নেই। অথচ তোমার ঠাকুরদা চাঁদনি রাতে পর্যন্ত রক্তপাত করত না।"

চিতা চ'টে উঠে গা ঝাড়া দিয়ে বললে—"রেখে দাও তোমার ওসব শাস্তর। শাস্তর মানবার জন্যে উপোস ক'রে মরতে হবে নাকি! ঠাকুরদা শাস্তর মানবে না কেন! তাদের তো আর আমার মতো সাত সন্ধে নীরক্ত উপোস করতে হ'ত না, ক্ষিধেয় পেট পিঠ একও হ'য়ে যেত না। তখন থাবা বাড়ালে কিছু না হোক একটা খরগোশও মিলত।"

হুতুম চোখ বুজেই বললে—"এত অধর্ম ছিল না ব'লেই মিলত।"

চিতা চ'টে কাঁই হ'য়ে উঠছিল ক্রমশ। চুকলি খাবার পর গেছো প্যাঁচার এই ভণ্ডামি অসহ্য। কিন্তু ডালটা নেহাত উঁচু আর পলকা ব'লেই তাকে এবার একটা হাই তুলে স'রে পড়তে হ'ল। যাবার সময় শুধু একবার ব'লে গেল—"দিনের চোখ গেছে, রাতের চোখও যাক তোর!"

হুতুম কিছুই গায়ে না মেখে শুধু বললে—"হুম।"

খানিক বাদে আবার সাবধানে এদিক-ওদিক তাকাতে-তাকাতে হনু এসে হাজির। মউতাতে গেছো প্যাঁচার চোখ তখন আবার বুজে আসছে।

হনু বললে—"দেখলে দাদা চিতার নেমকহারামিটা! তুমি না থাকলে তো সাবড়েই দিয়েছিল!"

হুতুম বাজে কথা বেশি কয় না, বললে—"হুম।"

হনুর একটু বেশি কিচিরমিচির করা স্বভাব। সে ব'লেই চলল—"অথচ এই আর অমাবস্যায় ওর কি উপকারটা না করেছি? বারশিঙার জলায় মাছের লোভে গেছলেন। এদিকে বুড়ো ময়াল যে কাচ্চাবাচ্চা সমেত ওইখানেই আড্ডা

গেড়েছে সে-খবর তো রাখেন না। জামগাছ থেকে সাবধান না করলে সেই রাতেহ হ'য়ে গেছল আর কি!"

হুতুমের কাছে কোনো উত্তর না পেয়ে হনু আবার বললে—"আমিই প্রাণ বাঁচালাম আর আমাকেই কিনা তাগ!"

হুতুম এবার চোখ তুলে তাকিয়ে গম্ভীরভাবে বললে—"এ তো আর নতুন দেখছিস না বাপু! ও-জাতের ধারাই তো এই। থাবায় যারা নখ লুকোয় তাদের আবার বিশ্বাস করে নাকি? হুম!"

হনু পিঠ চুলকে বললে—"কিন্তু কি করা যায় বলো তো দাদা! বনে তো আর টিকতে দিলে না। এক দণ্ড স্বস্তি যদি থাকে! একা রামে রক্ষা নেই সুগ্রীব দোসর! গাছে চিতা, নিচে কেঁদো ; দাঁড়াই কোথায়?"

হুতুম বললে—"হুম।"

হনু হতাশভাবে বললে—"একটি উপায় বাতলাতে পারো না হুতুমদা! তোমার এমন মাথা!"

মাথার প্রশংসায় খুশী হ'য়ে হুতুম বললে—"উপায় আছে, কিন্তু পারবি কি?"

"পারব না! খুব পারব। শুধু একা আমি তো নয়, বনের সবাই অতিষ্ঠ হ'য়ে উঠেছে। এই তো কাল কেঁদো বাগে পেয়ে কাকিনীর দফা রফা করেছে। বয়ার তো রেগে আগুন হ'য়ে গেছে ; ঘুরে বেড়াচ্ছে বুনো মোষের পাল নিয়ে। একবার সুবিধে পেলে হয়।"

হুতুম তাচ্ছিল্যভরে বললে—"ওসব চারপেয়ের কর্ম নয়।"

হনু হুতুমের এই দুর্বলতাটুকু জানে। হুতুম আর সব দিকে খুব বিজ্ঞ, খুব ধীর? কিন্তু মানুষের মতো দু-পায়ে হাঁটে ব'লে সেও যে মানুষের জ্ঞাতি তার এই ধারণার বিরুদ্ধে কিছু বললে আর রক্ষা নেই।

হনু নরম হ'য়ে তোষামোদ ক'রে বললে—"দু-পেয়ে ব'লেই না তোমার কাছে আসি পরামর্শের জন্য।"

হুতুম খুশী হ'য়ে বললে—"তবে শোন।" কিন্তু কথা আর কিছু হ'ল না। দূরের মাদারগাছের ডালের ওপর বুঝি একটা কেন্নোর মতো পোকা একটুখানি উঁকি মেরেছিল। শোঁ ক'রে একটা শব্দ হ'ল ; তারপরেই দেখা গেল হুতুম উড়ে গেছে সেখানে।

হনু খানিক অপেক্ষা করল, কিন্তু হুতুমের আর দেখা নেই। পোকার খোঁজে সে তখন ডাল ঠোকরাতে ব্যস্ত। আর তার আশা নেই বুঝে হনু খানিক বাদে স'রে পড়ল। হুতুমের মর্জির খবর সে রাখে।

'তরঙিগয়া'র জঙ্গলে সত্যিই বড়ো গোলমাল। অবশ্য জঙ্গলে আর শান্তি কবে মেলে? জঙ্গলের বাসিন্দারাও সে-কথা জানে না এমন নয়, তবু এত উপদ্রব তারা কখনও ভোগ করেনি। বনের ঘুপসি অন্ধকারে ব'সে শলাপরামর্শ চলে, শোনা যায় হা-হুতাশ, কিন্তু সব চুপিচুপি। কোথায় কেঁদো আছে ওত পেতে কে জানে! কে জানে কোন ডালে চিতা আছে ঘুপটি মেরে।

এ-বছর ভয়ানক খরা। ব্যরাশিঙার জলা ছাড়া সব জায়গায় জল গেছে শুকিয়ে, কিন্তু তেষ্টায় ছাতি ফেটে গেলেও সেখানে যাবার উপায় নেই।

বাচ্চা-কাচ্চা সমেত বুড়ো ময়াল সেখানে আড্ডা গেড়েছে। তাদের যদি বা এড়ানো যায় কেঁদোর হাতে নিস্তার নেই। কেঁদো একেবারে শেকড় গেড়ে বসেছে সেখানে। এর আগে এমন কখনও হয়নি। কেঁদো তখন বনে এসেছে, দু-দশটা মেরেছে আবার চ'লে গেছে অন্য বনে। এবার তারও যেন আর নড়বার নাম নেই। কিন্তু জল বিহনে আর ক'দিন থাকা যায়! তেষ্টায় পাগল হ'য়েই বুনো মোষের মা কাকিনী গেছল মরিয়া হ'য়ে বারশিঙার জলায়। সেখানে পেছন থেকে পড়ল এসে ঘাড়ে কেঁদো। কাকিনী পিছল জমিতে পাশ ফিরতে না ফিরতেই গর্দান গেল ভেঙে।

সেই থেকে বনের কেউ আর ঘেঁষতে চায় না সেদিকে। 'দুন' পাহাড়ে চিকারার দল ছটফট করছে, জলে নামতে সাহস হয় না। কলজে ফেটেই ক'টা মরল। 'ঝাঁকাল' হরিণের নতুন লোমের জৌলুস নেই—সেই ফ্যাকাশে হলদেই দেখায়। মেটে কালো গাউজের দল ঘুরে বেড়ায় বনে-বনে। কালোয়ার গাউজকে দেখলে সত্যিই কান্না পায়। এই খরার দিনে জলে 'গারি' নিতে না পেয়ে তার যা দুর্দশা!

কালোয়ার গাউজের বউ ঢুলানির সঙ্গে সেদিন হনুর দেখা। হাড্ডিসার চেহারা হয়েছে : গায়ের লোম গেছে উঠে।

বুনো নোনাগাছে হনু ছিল ব'সে। ঢুলানি নিচে দিয়ে যেতে-যেতে ওপরে খসখসে আওয়াজ শুনে চমকে কান খাড়া ক'রে দাঁড়াল। হনু তাড়াতাড়ি অভয় দিয়ে বললে—"না গো না, চিতা নয়, হনু!"

হতাশভাবে ঢুলানি বললে—"আর চিতা হ'লেই বা কি! এখন চিতায় থাবা মারলেই হাড় জুড়োয়। এ-যন্ত্রণা আর সহ্য হয় না।"

দরদ জানিয়ে হনু বললে—"অমন কথা বলতে আছে! এমন দিন কি আর থাকবে?"

ঢুলানি এ-কথায় সান্ত্বনা পায় না। বললে—"থাকবে ব'লেই তো মনে হচ্ছে। কেঁদো আর চিতার কি মরণ আছে?"

হনু গম্ভীর হ'য়ে বললে—"আছে বৈকি, কিন্তু উপায় করতে হবে!"

ঢুলানি একটু উৎসাহিত হ'য়ে বললে—"উপায় কিছু ঠাউরেছ নাকি?"

"সেদিন গেছলাম তো তাই হুতুমের কাছে। কিন্তু জানো তো ওদের চাল? গায়েই সহজে মাখতে চায় না।"

ঢুলানি ওপর দিকে চেয়ে ছিল এতক্ষণ, এবার বললে—"দুটো পাকা নোনা ফেলে দাও ভাই, জিভটা একটু ভিজুক, জলের তার তো ভুলেই গেছি।"

হনু ক'টা পাকা দেখে নোনা ফেলে দিয়ে বললে—"আচ্ছা, ঝোপেঝাড়ে ঘোরো, চন্দ্রচূড়ের দেখা পাও না, না-হয় কালকেউটের? ওদের ব'লে দেখলে বোধ হয় কাজ হয় : এক ছোবলেই কাবার।"

নোনা চিবোতে-চিবোতে ঢুলানি বললে—"পাগল! ওরা কারুর উপকার করবে! বলতে গেলে আমাদেরই দেবে ছুবলে। সেই যে কথায় আছে—

পা নেই, বুকে হাঁটে
ডিমের ছা মাকে কাটে।

—ওরা তো আর মার দুধ খায় না।"

হনু মাথা নেড়ে বললে—"তা বটে। তা না হ'লে ওই বারশিঙার জলার

বুড়ো ময়াল একদিন কেঁদোর গায়ে পাক দিতে পারে না? তা তো দেবে না—তার বদলে হাড়-পাঁজরা ভাঙবে যত চিতল আর খাউট্টা হরিণের। নাঃ, হুতুমের কাছে একবার যেতেই হয় পরামর্শ করতে। বুড়োটার যে দেখাই পাওয়া যায় না।”

ঢুলানি গাছের গায়ে দু-বার শিং ঘ'ষে চ'লে যেতে-যেতে বললে—“কি হয় না-হয় খবরটা দিও।”

হনু এক ডাল থেকে আর ডালে লাফিয়ে ব'সে বললে—“সন্ধ্যাবেলা ‘থলায়’ গেলেই পাব তো?”

ঢুলানি বিষণ্ণভাবে বললে—“থলাই কি আর কেউ যায়? সে-আমোদের দিন গেছে। খবর দিও ‘দুন’ পাহাড়ের তলায়...”

ঢুলানি আরও কিছু হয়তো বলত; কিন্তু হঠাৎ শোনা গেল কাছেই কেঁদোর কাসি। ঢুলানি মাথা তুলে পিঠে শিঙে ঠেকিয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে দিলে ছুট। হনু দুটো ডাল আরও ওপরে উঠে বসেছে ততক্ষণে।

ক'দিন বাদে আবার হুতুমের সংগে হনুর দেখা। সবে সকাল হয়েছে, আগের রাতে হুতুমের ভোজটা একটু ভালোরকমই হয়েছে মনে হ'ল। দু-চোখ বুঁজিয়ে গাছের কোটরে হুতুম যেন ধ্যানে বসেছিল।

আগের রাত্রে নতুন শিঙের চামড়া ঘ'ষে তোলবার সময় ‘কালশিঙে’ চিতার হাতে মারা গেছে। হনু সেই খবরটা ‘দুন’ পাহাড়ে চিকারার দলে প্রচার করবার জন্য তাড়াতাড়ি চলেছিল, হঠাৎ গাছের কোটর থেকে ‘হুম’ শুনে চমকে দাঁড়াল।

তারপর দেখতে পেয়ে বললে—“এই যে দাদা! ক'দিন ধ'রে তোমাকে বাদাম খোঁজা করছি।”

হুতুমের মেজাজটা আজ ভালো, বললে—“কেন হে?”

“কেন আবার বলতে হবে? তোমাদের মতো বিজ্ঞ, বুদ্ধিমান দু-পেয়ে থাকতে এ-বনে আমরা সবাই কি মারা পড়ব বলতে চাও। দোহাই হুতুমদা, একটা উপায় বাতলাও।”

হুতুম বললে—“হুম, বলব'খন।”

হনু অস্থির হ'য়ে উঠেছিল: বললে—“না, বলবখ'ন নয়, এখনই। তোমার দেখা তো আর তপিস্যে করলেও মেলে না, এখন যখন পেয়েছি আর ছাড়ছিনে।”

হুতুম বললে—“হুম, বলছি, উপায় তো বলতে পারি, কিন্তু লাভ কি?”

“কি যে বলো হুতুমদা, লাভ কি? এই নখ-চোরা দুটো মরলে আর আমাদের ভাবনা কি?”

হুতুম গম্ভীরভাবে বললে—“আর ভাবনা থাকবে না তো?”

“নিশ্চয়ই না।”

হুতুম বললে—“হুম, তবে শোনো। বারশিঙার জলা পেরিয়ে কসাড় বন ছাড়িয়ে যে দু-পেয়েদের গাঁ—চিনিস?”

হনু বললে—“খুব চিনি, আমার ভাই খাটো ল্যাজকে সেখানেই 'তা ধ'রে রেখেছে।”

হুতুম বললে—"হুম! সে-গাঁ থেকে দু-পেয়ে আনতে হবে।"

হনু একটু হতাশ হ'য়ে বললে—"যাঃ, তারা আসবে কেন?"

হুতুম বললে—"হুম, আসবে রে, আসবে। 'দুন' পাহাড়ের রাঙা নুড়ি দেখেছিস, ভোরবেলার সূর্যির মতো লাল। সেই নুড়ির টানে আসবে।"

হনু শুনে তো অবাক। বললে—"সে-নুড়ি তো চেখে দেখেছি, না যায় দাঁতে ভাঙা, না আছে কোনো রস। সেই নুড়ি নিয়ে কি হবে দু-পেয়ের?"

হুতুম একটু চ'টে উঠে বললে—"তুই দু-পেয়ের হালচাল কিছু জানিস?"

হনু অগত্যা চুপ করল। হুতুম আবার বললে—"কসাড় বনের ধারে গারোবাদার পাশে দু-পেয়েরা আসে বেত কাটতে; তাদের সেই নুড়ি দেখাতে হবে।"

"কেমন ক'রে দেখাব?"

"কেমন ক'রে আবার দেখাবি! বেত-বনে নুড়ি ছড়িয়ে রেখে দিগে যা; এদিক-ওদিক আর কিছু ছড়াস। দু-পেয়ের চোখ সব দেখতে পায়।"

হনু অবাক হ'য়ে বললে—"তা না-হয় দেখল, কিন্তু আমাদের তাতে কি হবে? কেঁদো আর চিতাকে সামলাবে কে?"

হুতুম গম্ভীর হ'য়ে বললে—"সে-ভাবনা তোর কেন? যা বললাম কর আগে, তারপর ব'সে-ব'সে দেখ কি হয়। অতই যদি বুঝবি তা হ'লে গায়ে পালক গজাবে যে!"

হাজার হ'লেও হুতুম জ্ঞানীগুণী লোক। এ-ঠাট্টা নীরবে হজম ক'রে হনু বললে—"তবে কুড়ুই গে নুড়ি, কেমন? ঠিক বলছ তো হুতুমদা, এতেই হবে?"

হুতুম শুধু বললে—"হুম।"

* * *

তারপর ক'বছর কেটে গেছে। 'তরঙ্গিয়া'র জঙ্গলের আর সে-চেহারা নেই। জঙ্গল অনেক সাফ হ'য়ে গেছে। কত গাছ যে কাটা পড়েছে তার ঠিক-ঠিকানা নেই। 'দুন' পাহাড়ের ওপরে আর নিচে কাঠের আর পাথরের বাসা। দু-পেয়েরা রাতে সেখানে ঘুমোয় আর দিনে পাহাড় কেটে খানখান করে। গোটা পাহাড়টাই বুঝি তারা ফেলবে খুঁড়ে।

হনুর আজকাল ভারি বিপদ। বন্ধুবান্ধব কেউ আর বড়ো 'তরঙ্গিয়া'য় নেই। তবু বন ছাড়তেও তার মন কেমন করে। তাই কোনোরকমে সে প'ড়ে আছে।

সেদিন হঠাৎ বাদামগাছে হুতুমের সঙ্গে দেখা। গাছপালা গেছে ক'মে: দিনের বেলা বনে আজকাল তেমন অন্ধকার হয় না। হুতুম তাই চোখে বড়ো কম দেখে। হনু 'দাদা' ব'লে ডাক দিতে প্রথমটা তো চিনতেই পারল না।

তারপর মিটমিট ক'রে খানিক ঠাউরে বললে—"কে হনু নাকি? আছিস কেমন?"

হনু ম্লানভাবে বললে—"আছি আর কেমন দাদা।"

হুতুম আবার চোখ বুঁজবার উপক্রম করছিল, হনু বললে—"তরঙ্গিয়া'র জঙ্গলের কি হাল হয়েছে দেখেছ তো দাদা!"

হুতুম একটু অবাক হ'য়ে বললে—"কেন, কেঁদো আর চিতা তো অনেক-দিন মারা পড়েছে! সেই খরার বছরেই না?"

"তা তো পড়েছে, কিন্তু সেই সঙ্গে আমরাও যে লোপাট হ'য়ে গেলুম। সারাদিন ঘুমও, খোঁজ তো আর কিছুর রাখো না? 'দুন' পাহাড়ের চিকারার বংশে বাতি দেবার যে কেউ নেই। দু-পেয়ের যে-বাজ-লাঠিতে কেঁদো গেছে তাতেই চিকারার দফা রফা। গাউজদের যে-ক'টা বাকি ছিল কোন বনে যে গেছে কোনো পাত্তা নেই। ঝাঁকাল দু-একটা আছে এখনও, কিন্তু আর বেশি দিন নয়, বাজ-লাঠিতে গেল ব'লে। বুড়ো ময়াল পর্যন্ত তল্লাট ছেড়ে গেছে। দিনরাত গুড়ুম-গুড়ুম, দিনরাত খটাখট। এ-গাছ পড়ছে, ও-গাছ পড়ছে। দু-দণ্ড তো আর স্বস্তি নেই।"

হুতুম বললে—"হুম।"

"তোমার কথায় নুড়ি ছড়িয়ে প্রথমটা তো ভালোই হ'ল। আজ দু-জন, কাল চারজন, দু-পেয়েরা ক্রমে-ক্রমে ঝাঁকে-ঝাঁকে আসতে লাগল 'তরঙ্গিয়া'য়। তারা কেঁদোকে মারল বাজ-লাঠিতে, চিতাকে ধরল ফাঁদে। আমরা তো একে-বারে স্বর্গ পেলাম হাতে। ওমা, তারপর আমাদেরই পালা কে জানত? 'দুন' পাহাড়ে তারা যেদিন বাসা বাঁধল তারপর থেকেই আমাদের হ'ল সর্বনাশ! কেঁদো আর চিতা তবু একটা-দুটোর বেশি মারত না, এদের হাতে দলকে দল সাবাড়।"

হুতুম গম্ভীর মুখে বললে—"হুম।"

"ভালো করতে গিয়ে এ কি হ'ল বলো তো?" হনু কাঁদো-কাঁদো হ'য়ে বললে—"'তরঙ্গিয়া'র এ-দশা তো চোখে দেখা যায় না।"

হুতুম চোখ বুজে প্রশান্তভাবে বললে—"যা হবার ঠিক তাই হয়েছে ; চোখ বুজে থাকতে শেখো, কিছু দেখতে হবে না!"

সংসার সীমান্তে

সত্যই এ-কাহিনী লিখিতে ইচ্ছা করে না। মনে হয় যে দুটি মানুষকে লইয়া এই গল্পের আয়োজন, তাহাদের কথা লিখিবার অধিকার আমার নাই। যাহাদের জন্য লিখিতেছি তাহারাই শুধু যে নিজেদের কঠিন ঔদাসীন্যের দ্বারা ইহাদের অপমান করিতে পারে তাহা নয়, এই দুইটি জীবনের গভীর মর্ম বুঝিবার মতো দরদ আমারও আছে কিনা সন্দেহ হয়। হৃদয়ের উদ্বৃত্ত আমাদের আর কতটুকু! নিজেকে ছড়াইয়া আশপাশের কয়েকজনকে বিলাইতেই তো তাহা ফুরাইয়া যায়। আর উদারতা? এই শব্দটিকে এ-পর্যন্ত কতভাবেই না লাঞ্ছিত করিয়া আসিয়াছি!

তবু একবার বলিবার চেষ্টা করিয়া দেখি—

বিশ্রী বাদলের রাত। সারাদিন সূর্যের দেখা পাওয়া যায় নাই, ঝুপঝুপ করিয়া বৃষ্টি পড়িয়াছে, গভীর রাত্রেও তাহার বিরাম নাই। কয়দিনে এ-বৃষ্টি থামিবে কে জানে।

শহরের এক প্রান্তের যে-রাস্তাটিতে আমাদের গল্প শুরু হইবে সাধারণ অবস্থাতেই তাহাতে চলা দায়। গোরুর গাড়ি ও মোটরলরির চাকায় তাহার যে-হাল হইয়া থাকে তাহা বর্ণনা করা কঠিন। দিনরাত্রের অবিশ্রান্ত বৃষ্টিতে তাহার আরও শ্রী ফিরিয়াছে, পাশের নর্দমার সহিত তাহাকে আর পৃথক করিয়া চিনিবার উপায় নাই।

রাস্তাটির নাম না-ই বলিলাম—দুই পার্শ্বের যে কুৎসিত খোলা ও টিনের চালে ছাওয়া খুপরিগুলি তাহার শোভা-বর্ধন করিয়াছে, তাহাদের চেহারা হইতেই রাস্তাটির পরিচয় মিলিবে।

গভীর বাদলের রাতে রাস্তাটি একেবারে নির্জন হইয়া আসিয়াছে। আলোর ব্যবস্থা কোনকালেই ভালো নয়। যেটুকু ছিল বৃষ্টিতে তাহাও নষ্ট হইয়া গিয়াছে।

সেই অবিশ্রান্ত বর্ষণধ্বনিমুখর অন্ধকারে দেখা যায়, রাস্তার ধারে একটি চালার সামনে স্তিমিতভাবে অত গভীর রাত্রেও কেরোসিনের ডিবিয়া জ্বলিতেছে। বৃষ্টির ঝাপটা হইতে সযত্নে দুই হাতে কেরোসিনের ধূমবহুল শিখাটিকে যে আড়াল করিয়া বসিয়া আছে তাহার দুরাশার বুঝি আর অন্ত নাই। কিংবা হয়তো হতাশার শেষ সীমায় সে আসিয়া পৌঁছিয়াছে, তাহার মৃত মনের কাছে বাহিরের দুর্যোগের কোনো অর্থই আর নাই। প্রত্যহের অভ্যাসবশতই ক্লান্ত হতাশ চোখে পথের দিকে প্রতীক্ষায় সে বসিয়া আছে।

কেরাসিনের ডিবিয়ার মৃদু আলোয় তাহাকে ভালো করিয়া দেখা যায় না। হাত দিয়া শিখাটিকে আড়াল করিবার দরুন তাহার মুখে ও দেহে গাঢ় ছায়া পড়িয়াছে। সত্য কথা বলিতে কি, দেখিবার আর সেখানে কিছু নাই। কোনোদিন তাহার দেহে ও মুখে প্রাণের শিখার দ্যুতি ছিল কিনা তাহাই সন্দেহ হয়। ধূম ও কালিই এখন তাহার সর্বস্ব। নারীত্ব ও যৌবনের সে একটা বিকৃতি মাত্র।

ভিতর হইতে নিদ্রাজড়িত কণ্ঠে কে একবার বলিল, "হ্যাঁ লা রজনী, বার-দরজা বন্ধ করতে হবে না! সমস্ত রাত ব'সে থাকবি নাকি? এ-বৃষ্টিতে যে পথে কুকুর-বেড়াল বেরোয় না!"

দরজা হইতে রজনী কর্কশকণ্ঠে কুৎসিত ভাষায় যে-উত্তর দিল অন্য সময় হইলে তাহা হইতেই একটা তুমুল ঝগড়ার সূত্রপাত হইতে পারিত। কিন্তু যাহার উদ্দেশে কথাগুলা বলা হইতেছিল নিদ্রার ঘোরে সে বোধ হয় ভালো করিয়া শুনিতে পায় নাই। আগামীকল্যের জন্য মুখরোচক কলহটি সে মুল-তুবি রাখিল এমনও হইতে পারে।

গায়ের কাপড় আরও একটু ভালো করিয়া জড়াইয়া রজনী দরজাতেই তেমনিভাবে বসিয়া রহিল। কাপড়-চোপড় তাহার ভিজিয়া একাকার হইয়া গিয়াছে। যেখানটায় পা রাখিয়াছিল সেখানেই কাদা হইয়াছে প্রচুর। পা দুইটা যেন ঠাণ্ডা বরফ হইয়া গিয়াছে মনে হইতেছিল। তবু ইহার মধ্যে রজনীর উঠিলে চলে না। হয়তো এই দুর্যোগের রাত্রেও মাতাল হইয়া কেহ এ-পথে আশ্রয়ের সন্ধানে আসিতে পারে! নেশার ঝোঁকে সে তো আর বাদ-বিচার করিবে না!

আরও ঘন্টাখানেক এইভাবেই কাটিয়া গেল। হঠাৎ রজনী সচকিত হইয়া কান খাড়া করিয়া রহিল। অন্ধকারে কিছুই দেখা যায় না। কিন্তু তাহাদের রাস্তাটা যে-ধারে কিছুদূর অগ্রসর হইয়া ক্রমশ ভদ্র হইবার চেষ্টা করিয়াছে, খোলার চালা পরিত্যাগ করিয়া একটি-দুইটি কোঠা ও ভদ্র গৃহস্থবাড়ি দুই পাশে পাইয়াছে, সেখান হইতে যেন কাদার ভিতর কাহার পদশব্দ পাওয়া যাইতেছে। পদশব্দ ক্রমশই দ্রুত অগ্রসর হইতে লাগিল। নাঃ, কোনো মাতালের পায়ের শব্দ এ নয়। কাদার ভিতর দিয়া দ্রুতবেগে কে যেন ছুটিয়া আসিতেছে বলিয়াই মনে হয়।

রজনী নিরাশ হইল। জলবৃষ্টির ভিতর দিয়া কেহ যে ঊর্ধ্বশ্বাসে তাহার ঘরে আশ্রয় লইতে আসিতেছে না, ইহা ঠিক। একলা বসিয়া থাকিতে একটু বুঝি তাহার ভয়ও করিতে ছিল। ভয় অবশ্য তাহার অমূলক, মানুষের কাছ হইতে আশঙ্কা করিবার তাহার আর কিছু নাই। জীবনের চরম ক্ষতি তাহার হইয়া গিয়াছে।

রজনী জোর করিয়া বসিয়া ছিল। হঠাৎ অন্ধকারের ভিতর হইতে কৃষ্ণ-কায় একটি বিশাল মূর্তি বাহির হইয়া আসিল। আশ্চর্যের বিষয় রজনীর দরজার কাছে আসিয়াই সে থামিয়াছে। পিছন দিকে একবার সে ফিরিয়া চাহিল, তাহার পর রজনীকে একেবারে বিস্মিত করিয়া দিয়া তাহারই কাছে আসিয়া চাপা-গলায় তাড়াতাড়ি বলিল, "চ, তোর ঘরে চ।"

রজনী সত্যই এই আকস্মিক সম্ভাষণে বিহ্বল হইয়া পড়িয়াছিল। প্রথমটা সে কোনো কথা বলিতেই পারিল না। স্থাণুর মতো যেখানে বসিয়া ছিল সেখানেই নিশ্চল হইয়া রহিল।

কিন্তু তাহার বাকস্ফূর্তি হইবার পূর্বেই লোকটা অদ্ভুত এক কাণ্ড করিয়া বসিল। হঠাৎ নিচু হইয়া ফুঁ দিয়া তাহার কেরোসিনের আলোটি নিভাইয়া দিয়া সে বলিল, "ঢং ক'রে তবু ব'সে আছে দেখো—কই তোর ঘর?"

এই অদ্ভুত ব্যবহারে ভীত হইয়া রজনী চিৎকার করিয়া উঠিতে যাইতে-

ছিল, কিন্তু লোকটা তাহার পূর্বেই তাহার মুখে হাত চাপা দিয়াছে। রজনীর কণ্ঠ আর শোনা গেল না।

লোকটা চুপিচুপি তাহার কানের কাছে মুখ লইয়া গিয়া বলিল, "ভয় নেই, চেঁচাসনি।"

রজনী ভীত ক্রুদ্ধ হইয়া লোকটার হাত ঠেলিয়া দিবার একটু চেষ্টা করিল। কিন্তু সে-চেষ্টা বৃথা। লোকটা অসুরের মতো শক্তিতে তাহার গলার কাছটা চাপিয়া ধরিয়া আছে, বেশি জোর-জবরদস্তি করিলে বুঝি টিপিয়াই মারিবে।

অগত্যা বাধ্য হইয়াই সে চুপ করিল। লোকটা নিজেই উৎসাহী হইয়া টিনের দরজাটা বন্ধ করিয়া দিয়া আবার বলিল, "কি, এইখানেই দাঁড়িয়ে থাকব সারারাত!"

রজনী সত্যই ভয় পাইয়াছিল, বলিল, "না, তুমি যাও!"

লোকটা অন্ধকারে রজনীর কণ্ঠ খুঁজিয়া লইয়া এক হাত দিয়া তাহা জড়াইয়া ধরিয়া হাসিয়া বলিল, "দূর, কোথায় যাব এত রাতে!"...

আরও কিছু সে বলিতে যাইতেছিল, হঠাৎ বাহিরে রাস্তায় কয়েকজনের পদশব্দ শোনা গেল। সঙ্গে-সঙ্গে দেখা গেল লোকটার ভাব-ভঙ্গিও একেবারে বদলাইয়া গিয়াছে। সেই মুহূর্তেই রজনীর মুখে হাত ঢাকা দিয়া তীক্ষ্ন চাপা-গলায় সে বলিল, "টুঁ শব্দটি করেছিস কি খুন করে ফেলব।"

রজনী অবশ্য চেষ্টা করিলেও শব্দ করিতে পারিত না, লোকটা যে-জোরে হাত চাপা দিয়াছে। বাহিরের পদশব্দ তাহাদের দরজার কাছে আসিয়া বুঝি খানিক থামিল। কয়েকটা লোক কি যেন বলাবলি করিতেছিল। তাহার পর আবার পদশব্দ দূরে মিলাইয়া যাইতেই লোকটা তাহার হাত তুলিয়া লইয়া হাসিয়া বলিল, "কেমন ভয় দেখিয়ে দিলাম, দেখলি?"

কিন্তু ব্যাপারটা যে ঠাট্টার নয় তাহা রজনী বুঝিয়াছিল। লোকটাকে মনেমনে অত্যন্ত ভয় করিতে আরম্ভ করিলেও সে মৃদুস্বরে একবার আপত্তি জানাইয়া বলিল, "আমি দরজা খুলে দিচ্ছি, তুমি যাও—আজ আমার শরীর খারাপ।"

লোকটা এবার জোরে হাসিয়া উঠিল, "হুঁ, শরীর তো বেজায় খারাপ, তাই বাদলা রাতে রাস্তায় হাওয়া খাচ্ছিলি—না? নে ছেনালি রাখ। কোথায় তোর ঘর?

নিরুপায় হইয়া রজনী বলিল, "দাও, টাকা দাও তা হ'লে আগে।"

অন্ধকারে তাহার হাতের মধ্যে সত্যই একটা টাকা গুঁজিয়া দিয়া লোকটা বলিল, "নে, ; হ'ল তো!"

রজনী এবার ধীরে-ধীরে পাশের দাওয়ায় উঠিয়া তাহার ঘরের চাবি খুলিল। ঘর বলিলে তাহাকে অতিরিক্ত সম্মান দেওয়া হয় ; দু-ধারে দুই টিনের পার্টিশনে মধ্যবর্তী খানিকটা অপরিসর মাত্র মেঝেতে কোনোকালে বোধ হয় সিমেন্ট দেওয়া হইয়াছিল, এখন তাহার চিহ্নও নাই। নোংরা একটি বিছানা ও একটি ভাঙা তোরঙ্গই অবশ্য অধিকাংশ স্থান জুড়িয়া আছে—মেঝের বাকি অংশ যেটুকু দেখা যায় তাহা বহুদিনের বহু মানুষের পদাঘাতে ক্ষত বিক্ষত।

উপরে খোলার চাল। সেখানকার একটি বাঁশ হইতে তার দিয়া টাঙানো

চিমনি-ভাঙা হ্যারিকেন লণ্ঠনটি মিটমিট করিয়া জ্বলিতেছিল। রজনী ঘরে ঢুকিয়া তাহার আলোটাই একটু বাড়াইয়া দিল। তাহাতে আলোকের অভাব কিন্তু দূর হইল না। শিখাটি আরও বেশি ধূমোদ্গিরণ করিতে লাগিল মাত্র।

মেঝের উপরকার ময়লা ছিন্ন বিছানায় একটা বালিশের উপর কনুই-এর ভর দিয়া লোকটা তখন বসিয়াছে।

রজনী তাহার দিকে চাহিয়া বিরক্ত হইয়া বলিল, "কি করলে বলো তো? জুতোটা বাইরে খুলে রেখে আসতে হয় না! সমস্ত ঘর যে কাদায় কাদা হ'য়ে গেল—এ মুক্ত করবে কে?"

সত্যই লোকটার ছেঁড়া জুতার সংগে রাস্তার প্রচুর কাদা ঘরে আসিয়া ঢুকিয়াছে।

ঘরে আসিয়া লোকটার চেহারা ও মেজাজ দুই-ই যেন বদলাইয়া গিয়াছে মনে হইল। রজনীর কথায় হাসিয়া জুতা-জোড়া পা হইতে খুলিতে-খুলিতে সে বলিল, "ঈস্, কি আমার রাজপ্রাসাদ রে! জুতোর কাদায় নোংরা হ'য়ে যাচ্ছে!"

কথাগুলার পিছনে কিন্তু আঘাত করিবার ইচ্ছা আছে বলিয়া মনে হইল না। গলার স্বরে ও বলিবার ভঙ্গিতে হাসিয়া ফেলিয়া রজনী বলিল, "তোমারই বা কি এমন সোনার খড়ম যে বিছানায় উঠতে চায়!"

ছেঁড়া জুতা দুইটা পা হইতে খুলিয়া উপুড় করিয়া ধরিতেই পোয়া-খানেক ময়লা জল তাহা হইতে বাহির হইল। লোকটা হাসিয়া বলিল, "এমন জুতোর তুই নিন্দে করিস! দেখেছিস এ ড্যাঙ্গায় হ'ল জুতো, আর জলে নামলেই নৌকা!"

ময়লা জলে ঘরটা আরও নোংরা হইয়া যাইতেছিল, কিন্তু এবার রজনী রাগ করিতে ভুলিয়া গেল।

লোকটাকে এই সময়ের মধ্যে সে বেশ ভালো করিয়া দেখিয়া লইয়াছে। বাহিরে তাহাকে যতখানি বিশালাকায় মনে হইতেছিল ততখানি জবরদস্ত চেহারা তাহার নয়। মাঝারি দোহারা গড়ন। কেমন একটু পাকাইয়া গিয়াছে। হাত-পায়ের শিরগুলো দড়ির মতো মোটা-মোটা। মুখখানা চোয়াড়ে হইলেও কেমন যেন কুৎসিত নয়। চোখে ও ঠোঁটের কোণে সর্বদাই একটু হাসির ভাব লাগিয়া আছে—নির্দোষ ব্যঙ্গের হাসি। সমস্ত মুখখানা বুঝি সেইজন্যই একেবারে আকর্ষণ-শক্তি হারায় নাই। বয়স অবশ্য তাহাকে দেখিয়া বুঝিবার উপায় নাই। রজনীর মনে হইল ত্রিশ হইতে চল্লিশের মধ্যে যে-কোনো বয়স তাহার হইতে পারে। কিন্তু যাহাই হউক লোকটার স্বাস্থ্য ও শক্তি অটুট আছে।

লোকটা তাহার ভিজা জামা খুলিতেছিল, বলিল, "শুকনো একটা কাপড় থাকে তো দে—পরি।"

"শুকনো কাপড় কাঁদছে! থাকলে আমি এই ভিজে কাপড়ে থাকি!"—বলিয়া রজনী হাসিল।

"ওই ভিজে কাপড়ে থাকবি নাকি সারারাত?" লোকটা অবাক হইয়া তাহার দিকে চাহিল।

"তা ছাড়া কি করব?"

লোকটা "হুঁ" বলিয়া চুপ করিয়া রহিল।

বিছানার উপর ন্যাকড়ায় জড়ানো একটা কি জিনিস পড়িয়া ছিল। রজনী হঠাৎ সেইদিকে হাত বাড়াইয়া বলিল, "ওতে কি আছে দেখি!"

এই সামান্য ব্যাপারে লোকটা এমন চটিয়া যাইবে কে জানিত। নিমেষের মধ্যে পুঁটুলিটাকে রজনীর নাগালের বাহিরে সরাইয়া সে ক্রুদ্ধ হইয়া বলিল, "খবরদার বলছি, ওধারে হাত বাড়ালে হাত ভেঙে দেব।"

খরখর করিয়া রজনী জবাব দিল, "ঈস, কি আমার সাতরাজার ধন নিয়ে এসেছিস, ছুঁলে ক্ষয়ে যাবে!"

লোকটা এ-কথার উত্তর দিল না। পুঁটুলিটা নোংরা একটা বালিশের তলায় রাখিয়া তাহার উপর মাথা দিয়া শুইয়া পড়িল।

কথায়-বার্তায় এতক্ষণ তাহাদের পরস্পরের প্রতি সন্দিগ্ধ বিরোধের ভাব যেটুকু কাটিয়া গিয়াছিল সেটুকু আবার এখন ঘনাইয়া আসিয়াছে মনে হইল। এই লোকটাকে শেষমুহূর্তে পয়সার লোভে ও পীড়নের ভয়ে ঘরে স্থান দেওয়ার জন্য এখন রজনীর আফসোস হইতেছিল। সে তো তখন ইচ্ছা করিলে চেঁচাইয়া বাড়ির সকলকে জাগাইয়া তুলিতেও পারিত। লোকটা কিছু এক মুহূর্তেই তাহাকে গলা টিপিয়া মারিয়া ফেলিতে পারিত না। এই উগ্র প্রকৃতির অপরিচিত লোকটার সহিত সারারাত একত্র কাটাইবার চিন্তায় রজনীর ভয় করিতে লাগিল। লোকটা খুনে-ডাকাত কি না কে জানে! সারারাত সে জাগিয়া কাটাইবে বলিয়া সংকল্প করিল। ঘরের দরজায় ভিতর হইতে চাবি দিয়া চাবিটি গোপনে আঁচলের খুঁটে বাঁধিয়া আলো নিবাইয়া যখন সে শুইয়া পড়িল তখন রাত দুইটা।

অনেক রাত পর্যন্ত সে জোর করিয়া জাগিয়া ছিল। কিন্তু ভোরের দিকে শরীরে আর সহিল না। কখন যে সে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে তাহার মনে নাই।

সকালে সচকিত হইয়া চোখ খুলিবার সঙ্গে-সঙ্গে রজনী টের পাইল বাড়িতে বিষম হট্টগোল বাধিয়াছে। বাড়ির অন্যান্য অধিবাসিনীরা তাহার রাত্রের অতিথির কথা জানে না। কয়েকজন তাহার ঘরে ঢুকিয়া তীব্রস্বরে ভর্ৎসনাও করিতে শুরু করিয়াছে।

"হ্যাঁ লা, তোর আক্কেল কি বল দেখি! সদর-দরজা হাট ক'রে, নিজের দরজা খুলে দিব্যি নাক ডাকিয়ে ঘুমচ্ছিস!

রজনী ধড়মড় করিয়া এবার বিছানায় উঠিয়া বসিল। সত্যই ঘরে কেহ কোথাও নাই। দরজা সত্যই খোলা!

কে আরেকজন বলিল, "আমরা সবাই তো বেহুঁশ হ'য়ে ঘুমচ্ছি, যদি সব চুরিই হ'য়ে যেত!"

কিন্তু চুরি যা হইবার রজনীরই হইয়াছে। তাহার আঁচল হইতে চাবি লইয়া যে দরজার তালা খুলিয়াছে টাকাটি লইতে সে ভোলে নাই। রজনীর সমস্ত মুখ কঠিন হইয়া উঠিল। অশ্রুর উৎস একেবারে শুকাইয়া না গেলে সে বুঝি কাঁদিয়াই ফেলিত। কিন্তু তবু কাহাকেও সে কিছু বলিল না। এই নিদারুণ প্রবঞ্চনার কথা কাহাকেও বলিয়া সে হাস্যাস্পদ হইতে চাহে না।

তাহাদের রাস্তারই এক গৃহস্থবাড়িতে গতরাত্রে সিঁধ কাটিবার চেষ্টা কাহারা করিয়াছিল বলিয়া দুপুরবেলা যখন সংবাদ পাওয়া গেল তখনও

মনের সন্দেহ সে মনেই চাপিয়া রাখিল।

বিশাল পৃথিবীর দুইটি হতভাগ্য নরনারীর প্রথম মিলনের ইতিহাস এমনি কুৎসিত, এমনি স্বার্থ ও লোভের কালিতে কলঙ্কিত।

এই মিলনই একাধারে প্রথম ও শেষ হইতে পারিত। কিন্তু ভাগ্যের ইচ্ছা অন্যরূপ।

দুপুরবেলা। রজনীর তখনও রান্নার আয়োজন চলিতেছে। সংকীর্ণ দাওয়ার উপর বসিয়া শিলে করিয়া সে বাটনা বাটিতেছিল, হঠাৎ দরজার সামনে একজনকে দেখিয়া চমকাইয়া উঠিল।

লোকটা দিব্য ভোল ফিরাইয়া আসিয়াছে। ফরসা কাপড়, গায়ের জামাটাও বোধ হয় নূতন। তালিমারা জুতাটায় আর কিছু না হউক বেশ করিয়া কালি মাখাইয়া চকচকে করা হইয়াছে। মাথার ঝাঁকড়া চুলের মাঝখান দিয়া লম্বা টেরি কাটা।

তবু রজনী চিনিল। লোকটা দরজায় দাঁড়াইয়া তাহার দিকেই চাহিয়া দাঁত বাহির করিয়া হাসিতেছিল। রজনী মুখ তুলিতেই কাছে আসিয়া বলিল, "কি গো, চিনতে পারো?"

ঘৃণায় রাগে সহসা রজনীর শরীর রিরি করিয়া উঠিল। জীবনের উপর, ভাগ্যের উপর যত আক্রোশ তাহার মনের মধ্যে জমা হইয়াছিল সমস্ত যেন আজ মিলিত হইয়া পথ খুঁজিয়া পাইয়াছে। কোনো জবাব না দিয়া উন্মত্তের মতো নোড়াটা তাহার দিকে ছুঁড়িয়া মারিল।

নোড়াটা লাগিলে কি হইত বলা যায় না, কিন্তু সৌভাগ্যের বিষয় উপযুক্ত সময়ে লোকটা মাথাটা সরাইয়া লইয়াছিল। নোড়াটা প্রচণ্ড শব্দে সামনের টিনের দেওয়ালে গিয়া লাগিল।

আশেপাশে যাহারা ছিল তাহারা শব্দ শুনিয়া হাঁ-হাঁ করিয়া ছুটিয়া আসিল। লোকটা তখনও দাঁড়াইয়া-দাঁড়াইয়া হাসিতেছে।

নোড়ার আঘাতটা ফসকাইয়া যাওয়ায় মনে-মনে আশ্বস্ত হইলেও রজনীর রাগ তখনও যায় নাই। চিৎকার করিয়া সকলকে ডাকিয়া সে জানাইতে লাগিল যে এই বদমাশ লোকটাই সেদিন তাহাদের রাস্তার গৃহস্থবাড়িতে সিঁধ কাটিয়াছে এবং তাহার আঁচল হইতে টাকা খুলিয়া পলাইয়াছে। তাহাকে ধরিয়া পুলিসে দেওয়া হউক।

চিৎকার শুনিয়া বাড়ির সমস্ত মেয়েরা এবং কয়েকটি পুরুষ তখন জড়ো হইয়াছে। লোকটা এমন কাণ্ড হইবে বোধ হয় আশা করে নাই। মুখে হাসির ভান করিলেও সে এবার পলাইবার পথ খুঁজিতেছিল।

কিন্তু এতগুলো লোক তাহাকে একা পাইয়াছে। রজনীর কথা বিশ্বাস হউক আর না হউক তাহারা এমন মজা ছাড়িবে কেন? একজন হঠাৎ সাহস করিয়া তাহার ঝাঁকড়া চুল ধরিয়া টানিয়া বলিল, "শালা চোর, আবার ভদ্র-লোক সেজে এসেছে!" আর যায় কোথায়! অন্য সকলে বোধ হয় এই প্রেরণা-টুকুর অপেক্ষাতেই ছিল। সকলে মিলিয়া লোকটার উপর ঝাঁপাইয়া পড়িল। কিল, চড়, লাথি যে যাহা পারিল মারিতে কসুর করিল না। লোকটা জোয়ান, কিছুক্ষণ সে যুঝিবার চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্ত মারও সে সেইজন্যই বেশি খাইল। তাহার জামা-কাপড় ছিঁড়িয়া আধমরা না করিয়া দেওয়া পর্যন্ত মেয়ে-

পুরুষ কেহ নিরস্ত হইল না। বোধ হয় হ্যাঙ্গামের ভয়েই শুধু পুলিসে দিতে তাহারা বাকি রাখিল।

রজনী মারামারিতে যথাসম্ভব যোগ দিয়াছে। এখন দাওয়ার উপর দাঁড়াইয়া হাঁফাইতে-হাঁফাইতে গাল পাড়িতেছিল, "আঁচল থেকে টাকা খুলে নেবে না, পাজি বদমাশ কোথাকার!"

বাড়ির বাহিরেও তখন পথিকদের ভিড় জমিয়া গিয়াছে। অতিরঞ্জিত হইয়া ইতিমধ্যে ব্যাপারটা মুখে-মুখে ফিরিতেছে, নানাজনে নানারকম মন্তব্যও করিতেছিল।

লোকটা তখন অবসন্নভাবে উঠানের উপর পড়িয়া। গায়ের মাথার অনেক জায়গা কাটিয়া রক্ত বাহির হইতেছে। কাতরভাবে সে ধুঁকিতেছিল।

কে একজন বাহির হইতে খবর দিল যে মারামারির সংবাদ শুনিয়া পুলিস আসিতেছে।

আরেকজন বলিল, "পুলিস এলে তো যারা মেরেছে তাদেরও ছাড়বে না বাপু! চোরকে ধরিয়ে দিতে পারো, মারবার তোমরা কে? আর মার ব'লে মার! লোকটা তো ম'রে গেছে!"

কথাটা মিথ্যা নয়, যুক্তিযুক্তও বটে। যাহারা এতক্ষণ সোৎসাহে হাত চালাইয়াছিল তাহারা যে যার সরিয়া পড়িবার চেষ্টা করিল।

জনমতের গতি ফিরিয়াছে। একজন বলিল, "চোর ব'লে যে মারলে, চোর চিনলে কে শুনি? চোর কি ওর গায়ে লেখা আছে!"

বাহির হইতে একজন আসিয়া সহানুভূতি জানাইয়া বলিল, "তুমিও তো আচ্ছা লোক হে, মার খেয়ে চুপ ক'রে প'ড়ে আছ! থানায় চলো একটা ডায়েরি ক'রে আসি, মারার মজাটা সব টের পেয়ে যাবে!"

উঠিবার শক্তি ছিল না বলিয়াই বোধ হয় লোকটা কোনো উত্তর না দিয়া চুপ করিয়া পড়িয়া রহিল। যাহারা মারিয়াছিল তাহাদের অনেকেরই পুলিসের ভয়ে রাগটা তখন রজনীর উপর গিয়া পড়িয়াছে।

বাড়ির ভিতর হ্যাঙ্গামা হইবার ভয়ে বাড়ির অধিস্বামিনী ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছিল। রজনীর কাছে আসিয়া ঝংকার দিয়া বলিল, "দোষ তো এই মাগীর। 'চোর' 'চোর' ব'লে পাড়া মাথায় ক'রে তুললে কে? এখন ঠেলা সামলাক।"

রজনীর গালাগাল খানিক আগেই বন্ধ হইয়া গিয়াছে। সমস্ত ব্যাপারটার এই পরিণতি দেখিয়া ভয়ে সে কাঠ হইয়া দাঁড়াইয়া ছিল।

দু-একজন প্রহৃত লোকটাকে তখনও থানায় গিয়া ডায়েরি করাইবার জন্য পীড়াপীড়ি করিতেছে।

বাড়িওয়ালী আবার তীব্রস্বরে বলিল, "ঢং ক'রে দাঁড়িয়ে আছিস যে বড়ো। লোকটা ওইখানেই প'ড়ে থাকবে নাকি? থানা-পুলিস না হ'লে সুখ হচ্ছে না,—না।"

কেন বলা যায় না, প্রহৃত হইয়াও থানায় যাইবার আগ্রহ লোকটার বিশেষ নাই। বাড়িওয়ালীর ধমক খাইয়া ভয়বিহ্বল রজনী তাহাকে আসিয়া তুলিয়া ধরিবার চেষ্টা করিতে গেলে সে নিজেই কষ্ট করিয়া উঠিয়া ধীরে-ধীরে রজনীর কাঁধে ভর দিয়া তাহারই ঘরে গেল।

থানায় খবর দিয়া অন্যায়ের প্রতিকার করিবার জন্য যাহারা ব্যস্ত হইয়াছিল তাহারা ইহাতে খুশী হইতে পারিল না। বাহিরের দরজার কাছে ঘোট অনেকক্ষণ ধরিয়া চলিল।

লোকটা কোন প্রকার হ্যাঙ্গামা না করিয়া রজনীর ঘরে যাওয়ায় বাড়িওয়ালী অনেকটা আশ্বস্ত হইয়াছিল। রজনীর ঘরে ঢুকিয়া আহত ব্যক্তির শুশ্রূষা সম্বন্ধে অনেকক্ষণ ধরিয়া বহু মূল্যবান সদুপদেশ দিয়া যখন সে বিদায় হইল তখনও রজনী জল দিয়া তাহার ক্ষতস্থানগুলি ধোয়াইয়া দিতেছে।

বাড়িওয়ালী চলিয়া যাইবার পর লোকটা একবার উঠিবার চেষ্টা করিল। ভীত পাংশুমুখে তাহাকে শোয়াইবার চেষ্টা করিয়া রজনী বলিল, "উঠছ কেন? কোথায় যাবে?"

যন্ত্রণাবিকৃত মুখেও হাসির চেষ্টা করিয়া লোকটা বলিল, "থানায় যাব না রে, যাব না, ভয় নেই! পেটটায় বড়ো বেদনা, বেটারা জোর লাথি মেরেছে, একটু সেঁক দিতে পারিস?"

রজনী তাহার আয়োজনেই বাহিরে গেল।

নায়ক-নায়িকার দ্বিতীয় মিলন এমনি করিয়াই হইল।

লোকটা কয়দিন ধরিয়া রজনীর ঘরেই আছে। মার খাইবার দিন হইতে তাহার প্রবল জ্বর। যাইবে সে আর কোথায়? রজনীকে বাধ্য হইয়াই সেবা করিতে হইতেছে। ব্যাপারটার সমস্ত দোষ তাহার ঘাড়ে চাপাইয়া বাড়ির আর সকলে দিব্য নিশ্চিন্ত হইয়া গিয়াছে।

ঘরে বসাইয়া একটা লোকের দিনের পর দিন শুশ্রূষা করা রজনীর সাধ্য নয়। প্রথম দিন লোকটা পকেট হইতে গোটা কয়েক টাকা বাহির করিয়া দিয়াছিল বলিয়াই কোনোমতে চলিতেছে। রজনী এ-দায় হইতে কোনোরকমে নিষ্কৃতি পাইলেই বোধ হয় বাঁচে। পুলিসের ভয়েই সম্ভবত সে এ-পর্যন্ত কোনো উচ্চবাচ্য করিতে পারে নাই।

কিন্তু হপ্তা কাবার হইবার পরও লোকটার যে সরিবার কোনো লক্ষণ নাই! রজনীর ধৈর্য আর কতদিন থাকে! সকালে ঘায়ের পটি খুলিতে-খুলিতে সে মুখঝামটা দিয়া বলিয়াছে, "ভিটকেলমি ক'রে ক'দিন বিছানায় প'ড়ে থাকা হবে শুনি? আমি আর পারব না, তা যা হয় হোক।"

'যা হয় হোক'টা পুলিসের ব্যাপার সম্বন্ধে। রজনীর সে-ভয় এখনও বুঝি একটু আছে!'

লোকটাও সঙ্গে-সঙ্গে উত্তর দেয়, "পারবিনে কি? এতগুলো করকরে টাকা কি মাগনা দিলাম!"

"ঈস্, কত তোড়া-তোড়া টাকাই না দিয়েছিলি! আট দিন ধ'রে ওষুধ পথ্যি সব পাঁচ টাকায় হচ্ছে—কেমন?"

"নাই বা হ'ল। তুই দিবি টাকা। হাতে হাতকড়া থেকে বেঁচে গেছিস জানিস!"

রজনীর সাহস বাড়িয়াছে। রাগের মাথায় সে বলে, "হ্যাঁ হাতে হাতকড়া সবাই দিচ্ছে! যা না তুই পুলিসে। আমিও বলতে জানি, সিঁধকাঠি নিয়ে প্রথম দিনে ঘরে ঢুকেছিলি মনে নেই?"

লোকটা রাগিয়া বলে, "তুই দেখেছিস?"

"দেখিনি আবার, সেদিন পুঁটলির ভিতর কি ছিল? তাড়া খেয়ে আমার ঘরে তো ঢুকেছিলি লুকোতে। বুঝি না আমি কিছু?"

লোকটা তাচ্ছিল্যভরে বলে, "বুঝিছিস তো বুঝিছিস! অঘোর দাস কারুকে ভয় করে না।"

নীরবে খানিকক্ষণ ঘা ধোয়ানো চলে। অঘোর একসময় বলে, "জ্বরে-জ্বরে মুখটা বড়ো খারাপ হয়েছে। আজ একটু অম্বল রাধতে পারিস?"

রজনী ঝংকার দিয়া বলে, "হ্যাঁ, পারি তা, উনুনের ছাই রাঁধতে পারি! শখ কত! ঘায়ে পুঁজ শুকোচ্ছে না, অম্বল খাবে!"

অঘোর সারিয়া উঠিয়াছে। কিন্তু এখনও এ-আশ্রয় পরিত্যাগ করে নাই। দিনে রাত্রে রজনীর সঙ্গে রোজ তাহার ঝগড়া বাধে। রজনী গালাগাল দিয়া বলে, "কাল যদি তুই বাড়ি থেকে দূর না হ'স তো মুড়ো ঝাঁটা মারব।"

অঘোর প্রচণ্ড শপথ করিয়া জানায় যে পরদিন প্রাতঃকাল হইতে সে রজনীর আর মুখদর্শন করিবে না। কিন্তু যাই-যাই করিয়া যাওয়া আর হইয়া উঠিতেছে না। ছন্নছাড়া জীবন, স্থান হইতে স্থানান্তরে ভাগ্যের দ্বারা চিরদিন বুঝি সে বিতাড়িত হইয়াই ফিরিয়াছে। একটুখানি নিশ্চিন্ত বিশ্রামের স্থান তাহার কখনও মিলে নাই। তাই যাইতে তাহার সহজে মন ওঠে না। রজনী অন্য সময়ে গাল পাড়িলেও সকালবেলা ঝাঁটা মারিয়া তাড়াইবার কথাটা কেমন করিয়া বিস্মৃত হইয়া যায়।

অঘোর একেবারে অবুঝ নয়। ইতিমধ্যে একদিন বাহির হইয়া সে কয়েকটা টাকা কোথা হইতে সংগ্রহ করিয়া আনিয়া রজনীর হাতে দিয়াছে। কিন্তু সেই সঙ্গে ফরমাস যাহা করিয়াছে তাহার বহর বড়ো কম নয়।

রজনী টাকা কয়টা রাগের মাথায় মেঝের উপর ফেলিয়া দিয়া বলিয়াছে, "আমার টাকার দরকার নেই, অমন টাকা আমি ঢের দেখেছি। আমি কি তোর কেনা বাঁদি যে যা হুকুম করবি তাই করব!"

টাকা ফেলিয়া দেওয়ায় প্রথমটা মুখ গম্ভীর করিয়া অঘোর বলিয়াছে, "দেখ, লোক আমি বড়ো ভালো নয়, বেশি বাড়াবাড়ি করলে ভালো হবে না।"

কিন্তু খানিক বাদে আসিয়া তাহার পিঠে হাত বুলাইয়া বলিয়াছে, "আহা, রাগ করিস কেন? তুই রাঁধিস ভালো তাই না বলছি। সাধ ক'রে কি এখানে প'ড়ে থাকি? তোর রান্না খাওয়ার পর মুখে আর কিছু রোচে না।"

"থাক, আর আদিখ্যেতায় দরকার নেই।"—বলিয়া রজনী শেষ পর্যন্ত নিজেই টাকাগুলো তুলিয়া লইয়া গিয়াছে।

কিন্তু এমন করিয়াও বেশিদিন চলিল না। একদিন টাকাকড়ির ব্যাপার লইয়াই অত্যন্ত কুৎসিতভাবে ঝগড়া করিবার পর অঘোর সত্যই সকালবেলা চলিয়া গেল।

বাড়িওয়ালী সংবাদ পাইয়া রজনীকে ভর্ৎসনা করিয়া বলিল, "কি ব'লে যেতে দিলি তুই, তবু তো খরচটা চালাচ্ছিল!"

রজনী রুক্ষ কণ্ঠে বলিল, "খরচ চালাচ্ছিল না আর কিছু! খেটে-খেটে আমার হাড় কালি হ'য়ে গেল। আপদ গেছে বেঁচেছি!"

তাহার পর আপন মনেই বলিল, "এবার এলে দরজা থেকেই খ্যাংরা মেরে

বিদায় ক'রে দেব।"

কিন্তু সেইদিন গভীর রাত্রে তাহাদের দরজার কড়া নাড়িয়া ওঠামাত্র ধড়ফড় করিয়া উঠিয়া প্রথম দরজা খুলিতে যে গেল সে রজনী। অত রাত পর্যন্ত অকারণে কেন সে জাগিয়া ছিল কে জানে!

সত্যই অঘোর ফিরিয়া আসিয়াছে। কিন্তু চেহারা কেমন যেন অদ্ভুত। জামায় কাপড়ে ধূলি-কাদা লাগিয়াছে। কপালের উপরে পূর্বের যে-ক্ষতটার দাগ এখনও মিলায় নাই তাহা হইতেই আবার রক্ত বাহির হইতেছে।

রজনী জিজ্ঞাসা করিল, "এ কি হয়েছে?"

"ও কিছু না।"—বলিয়া পকেট হইতে অঘোর যাহা বাহির করিল তাহা দেখিয়া রজনীর বিস্ময়ের আর অবধি রহিল না। এত টাকা একসঙ্গে সে কবেই বা দেখিয়াছে!

অঘোর হাত বাড়াইয়া তাহাকেই সেগুলো দিতে যাইতেছিল। রজনী সভয়ে হাতটাকে সরাইয়া বলিল, "না, না, ও চাই না।"

তাহার মনের সন্দেহ দৃঢ় হইবার সঙ্গে-সঙ্গে ভয় তাহার বাড়িয়াছে। অঘোর হাসিয়া বলিল, "কেন রে, হ'ল কি?"

খানিক চুপ করিয়া থাকিয়া ভীত অস্পষ্ট কণ্ঠে রজনী বলিল, "সত্যি বল দেখি, তুই চুরি করেছিস কি না!"

অঘোর তাহার দিকে তাকাইয়া মুচকিয়া একটু হাসিল মাত্র, উত্তর দিল না। রজনী আবার বলিল, "বল আমার গা ছুঁয়ে।"

"যদি ক'রেই থাকি।"

"যদি ক'রেই থাকি! ধরা পড়লে কি হ'ত?"

"কি আর হ'ত—জেল। আর বেশি কিছু তো নয়। সে আমার অভ্যেস আছে।"

রজনী সভয়ে খানিক চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। তারপর অস্ফুটস্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "পালাতে গিয়েই কপালটা কেটেছে তো?"

কপালের রক্তটা কাপড় দিয়া মুছিয়া অঘোর বলিল, "বেটারা ঢিল ছুঁড়ল যে!"

রজনী হতাশভাবে বলিল, "অমনি ক'রেই তুই কোনদিন ম'রে যাবি!"

"তা গেলেই বা কার কি? অঘোর দাসের জন্যে তিনকুলে কাঁদবার কেউ নেই।"

রজনী তখন কোনো কথা আর বলিল না।

ঘন্টাখানেক বাদে বিছানায় শুইয়া হঠাৎ অঘোরের গলায় হাত রাখিয়া রজনী বলিল, "একটা কথা বলব, রাখবি বল।"

নিদ্রাজড়িত স্বরে অঘোর বলিল, "কি?"

"তুই আর চুরি করতে পাবিনি।"

ঘুমের ঘোরে 'আচ্ছা' বলিয়া অঘোর পাশ ফিরিয়া শুইল।

রজনী কিন্তু তাহাকে নিশ্চিন্তভাবে ঘুমাইতে দিল না, হাত ধরিয়া ঝাঁকানি দিয়া বলিল, "ওরকম 'আচ্ছা' বললে হবে না, তুই দিব্যি ক'রে বল, 'কখনও আর চুরি করব না'।"

কাঁচা ঘুম ভাঙায় অঘোর চটিয়া গিয়াছিল, বলিল, "তবে কি ডাকাতি

ক'রে খাব?"

"না, তুই একটা কাজকর্ম দেখ।"

"কাজকর্ম দেবে কে? তুই বাজে বকিসনি, ঘুমতে দে।"

কিন্তু রজনী ছাড়িল না। আবার তাহার হাত ঝাঁকানি দিয়া একটু কঠিন-স্বরে বলিল, "না তোকে চুরি ছাড়তেই হবে; না হ'লে এখানে আর আসতে পাবি না।"

"ও, তবেই তো আমার গোকুল অন্ধকার হ'য়ে যাবে।"—বলিয়া অঘোর আবার পাশ ফিরিল। কিন্তু এবারে খানিক বাদে প্রথম কথা সেই কহিল, বলিল, "কাজকর্ম পাওয়া কি এতই সোজা রে। আর তা ছাড়া দলের লোকেরা ছাড়বে কেন? যদি-বা একটা ভালো কাজ পাই, পুলিস আর দলের লোকেরা পেছু লেগে অস্থির ক'রে দেবে না?"

"দল তুই ছেড়ে দিবি।"

"এ-দেশে থাকতে আর তার জো নেই।"

রজনী ইহার পর অনেকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, "তবে তুই এ-দেশ ছেড়ে চ'লে যা।"

অন্ধকারের মধ্যে অঘোরের হাস্যধ্বনি শোনা গেল। বলিল, "তুই যাবি সংগে?

রজনী সত্যই দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "আমি যাব কি ক'রে?"

দু-জনেই তাহার পর নীরব। অঘোর একবার খানিক বাদে রজনীকে ঠেলা দিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "ঘুমোলি নাকি?"

"না।"

"তুই যেতে পারবি না কেন?"

রজনী হতাশ স্বরে বলিল, "আমার এখানে কত দেনা, বাড়িওয়ালীর কাছে, কিস্তিদারের কাছে, যেতে চাইলে তারা ছাড়বে কেন?"

হঠাৎ উৎসাহিত হইয়া অঘোর বলিল, "আমি যদি সব দেনা শোধ ক'রে দিই।"

কিন্তু রজনীর এ-কথায় বিশ্বাস নেই। বলিল, "সে অনেক টাকা, তুই পারবি কেন?"

"হুঁ, অঘোর দাস ইচ্ছে করলে কি না পারে, তুই বল তা হ'লে যাবি আমার সংগে? তা হ'লে তোকে সত্যি কথাটা বলি, এ-কাজে মাঝে-মাঝে মাইরি ঘেন্না ধ'রে যায়। খালি সাবধান, খালি সাবধান, শুয়ে ব'সে একটু স্বস্তি নেই। চ, একেবারে দিল্লি আগ্রাই যাব চ'লে।"

রজনী কিন্তু তাহার উৎসাহে বাধা দিয়া বলিল, "তুই কি ক'রে টাকা যোগাড় করবি? এমনি চুরি ক'রে তো? সে আমার দরকার নেই।"

হাত বাড়াইয়া রজনীকে অন্ধকারে কাছে টানিয়া অঘোর বলিল, "এই তোর গা ছুঁয়ে বলছি এই শেষবার। ব্যস, তারপর চুরি বিদ্যের খতম।"

পরদিন বিকালবেলা অঘোর নতুন একটা প্রকাণ্ড তোরংগ ঘাড়ে করিয়া আনিয়া রজনীর ঘরে ঢুকিল।

রজনী বিস্ময়ে আনন্দে হাসিয়া বলিল, "ওমা, বাক্স আনতে বলেছিলাম ব'লে ওই অত বড়ো একটা ঢাউস জিনিস আনতে হয়? ওর ভিতর শুবি

নাক?”

অঘোর মুখ টিপিয়া হাসিতে-হাসিতে তোরঙ্গের তালা খুলিয়া ফেলিল। ভেতরের জিনিসপত্র দেখিয়া রজনী তো অবাক। অঘোর কাপড়-জামা হইতে থালা গেলাস পর্যন্ত কত জিনিসই না কিনিয়া আনিয়াছে! রজনী পরিহাস করিয়া বলিল, “ঈস, করেছিস কি? এত সাজসরঞ্জাম কেন বল তো?”

“বিয়ে করতে যাচ্ছি যে!”

“মরণ আর কি! আধবুড়ো এমন চোয়াড়ের কাছে মেয়ে দেবে কে?”—বলিয়া রজনী হাসিতে লাগিল।

অঘোর গম্ভীর হইয়া বলিল, “না দেয়, চুরি ক'রে নেব।”

রজনীর হাসি তাহার পর আর থামিতে চাহে না।

প্লানির প্রগাঢ় অন্ধকারে যাহাদের অতীত লুপ্ত হইয়া গিয়াছে, বর্তমান যাহাদের ক্লেদপঙ্কিল, তাহারাও ঘর বাঁধিতে চায়, পৃথিবীর ভাগ্যবান নর-নারীদের জীবনলীলার অনুকরণ করিতে তাহাদেরও সাধ যায়।

ভাবী-সংসার সম্বন্ধে দুইজনের ইতিমধ্যে অনেক মধুর আলাপ হইয়া গিয়াছে।

রজনী বলিয়াছে, “যাচ্ছি বটে তোর সঙ্গে, কিন্তু সেখানে যা খুশি করবি আর আমি মুখ বুজে তাই সইব মনে করিসনি যেন। রজনী তেমন মেয়ে নয়। অত নেশাভাং করা তোর চলবে না।”

অঘোর বলিয়াছে, “আচ্ছা, আচ্ছা, সে দেখা যাবে। কিন্তু আমিও লোক বড়ো ভালো নয়, বুঝেছিস। এখানে যা করিস করিস, সেখানে একটু বেচাল দেখলে আর আস্ত রাখব না।”

সেই রাত্রে অঘোর আবার বাহির হইল। আর কুড়িটা টাকা হইলেই রজনীর ঋণ সমস্ত শোধ হইয়া তাহাদের সব খরচ কুলাইয়া যায়। অঘোর তাহাদের বিদেশ যাওয়ার উপকরণস্বরূপ অকারণে অনেকগুলো বাজে জিনিস কিনিয়া পয়সা নষ্ট করিয়া আসিয়াছে। রজনী সেইগুলাই বেচিয়া টাকা যোগাড় করিবার কথা বলিয়াছিল। অঘোরের আর নিজেকে বিপন্ন করিয়া কাজ নাই। কিন্তু অঘোর সে-কথায় হাসিয়াছে মাত্র। বলিয়াছে, “অঘোর দাস জিনিস বিলিয়ে দেয়, বেচে না, বুঝেছিস? তুই বাঁধা-ছাদা ক'রে সব ঠিক হ'য়ে ব'সে থাক দিকি, কাল ভোরের গাড়িতেই কলকাতাকে কলা দেখিয়ে চ'লে যাব।”

... ...

আদালতে কাজের চাপ সেদিন অত্যন্ত বেশি। ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে কোর্ট-ইনস্পেক্টার কোনোমতে পূজার ঠাটটুকু বজায় রাখিয়া বলির পর বলি শেষ করিয়া চলিতেছে। ছোটোখাটো অপরাধের বিচার—রায় দিতে বিলম্ব হইবারও কারণ নাই। অনেকগুলি অপরাধীর বিচার হইয়া যাইবার পর এক-জন আসামী হঠাৎ কাঠগড়ায় উঠিয়া বিষম গোলমাল শুরু করিয়া দিল। বুড়ো মন্দ—ছাড়া পাইবার জন্য তাহার মিনতি ও শিশুর মতো কান্না দেখিয়া আদালতের লোকের পক্ষে হাসি সংবরণ করা কঠিন।

বিচারক নামটা ভালো শুনিতে পান নাই। জিজ্ঞাসা করিতে কোর্ট

ইন্স্পেক্টার গড়গড় করিয়া যাহা বলিয়া গেল তাহার অর্থ এই যে, আসামীর নাম অঘোর দাস, লোকটা দাগী চোর, ইতিপূর্বে বার পাঁচেক জেল খাটিয়াছে এবং সেদিন আবার চুরি করিতে গিয়া ধরা পড়িয়াছে ইত্যাদি।

আসামী তখন কাঠগড়া হইতে দুই হাত জড়ো করিয়া কাতরভাবে কাঁদিতে-কাঁদিতে বলিতেছিল—হুজুর, ধর্মবতার তাহাকে যেন এইবারটি মাফ করেন। সে চুরি করিবার চেষ্টা করিয়াছে কিন্তু কিছুই লইতে পারে নাই। সে হুজুরের পা ছুঁইয়া ও ঈশ্বর সাক্ষী করিয়া শপথ করিতেছে যে সত্যই আর সে এমন কাজ করিবে না। সত্যই সে এ-পথ ছাড়িয়া দিতে চায়। এবার জেল হইলে তাহার সর্বনাশ হইয়া যাইবে।

কোর্ট-ইন্স্পেক্টার তাহাকে ধমক দিলেন, পুলিসপ্রহরী একটা রুলের গুঁতা দিল, কিন্তু লোকটা নাছোড়াবান্দা, চোখের জল মুছিতে-মুছিতে একই কথা সে বারবার বলিতে লাগিল।

লোকটার কান্না একটু অসাধারণ হইলেও এই ধরনের বদমাশির সহিত বিচারকের পূর্বেই পরিচয় হইয়াছে। কোর্ট-ইন্স্পেক্টারের বক্তব্য শেষ হইবার পর তিনি রায় দিলেন। ইন্স্পেক্টার তাহা অনুবাদ করিয়া অঘোর দাসকে জানাইল। পাঁচ বছর তাহার জেল হইয়াছে।

অঘোর দাস খানিকটা স্তম্ভিত ইহয়া দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার পর সে যে-কাণ্ড করিয়া বসিল তাহা একেবারে অদ্ভুত। দেখা গেল, হঠাৎ কাঠগড়া হইতে হুংকার দিয়া লাফ মারিয়া উঠিয়া বিচারককে সে আক্রমণ করিয়াছে।

পুলিসপ্রহরী ও কোর্ট-ইন্স্পেক্টার সেই মুহূর্তে তৎপর হইয়া তাহাকে ধরিয়া না ফেলিলে কি কেলেংকারি যে হইত কে জানে। তারপর তাহারা তাহাকে পিছমোড়া করিয়া ধরিয়া রুলের গুঁতা দিয়া আবার কাঠগড়ায় আনিয়া ফেলিল। সে উন্মত্তের মতো তাহাদের হাত হইতে মুক্ত হইবার বৃথা চেষ্টা করিতে-করিতে তখনও গর্জাইতেছে।

বিচারক বয়সে নবীন এবং সত্যই ভালো লোক। তাঁহার হৃদয় মন এখনও কঠিন হইয়া উঠে নাই। বিচার জিনিসটা এখনও তাঁহার কাছে শুষ্ক আইনের প্রয়োগকৌশল মাত্র নয়। আসামীর পিছনে রক্তমাংসের মানুষ আছে ইহা এখনও তাঁহার স্মরণ থাকে।

লোকটার অস্বাভাবিক কান্নার পর এই প্রকার আকস্মিক উত্তেজনায় তিনি একটু অবাক হইয়া গিয়াছিলেন। মনে হইতেছিল লোকটার এই অদ্ভুত ব্যবহারে গূঢ় কোনো অর্থ থাকিতেও পারে।

বিচারককে আক্রমণের অপরাধে আসামীর নূতন করিয়া বিচার হইল। বিচারক মহাশয় এবারে শাস্তি যথাসম্ভব লঘু করিয়া তো দিলেনই, মনে-মনে সংকল্প করিলেন তাহার সম্বন্ধে কর্মচারীকে দিয়া ভালো করিয়া পরে খোঁজ লইবেন।

... ...

বিচারক মহাশয় অবশ্য নানা কাজের চাপে সে-কথা ভুলিয়া গিয়াছেন। তাঁহারই বা দোষ কি। অঘোর দাস এখনও জেলে পচিতেছে। নিরবচ্ছিন্ন বর্ষার রাতে এখনও নিশ্চল কলিকাতার একটি কর্দমাক্ত নোংরা ও কুৎসিত

পথের ধারে কেরোসিনের ডিবিয়ার ম্লান আলো দেখা যায়। ডিবিয়ার ধূম-শিখাকে শীর্ণ হাতে সযত্নে বৃষ্টির ঝাপটা হইতে আড়াল করিয়া গভীর রাত্রি পর্যন্ত এখনও নিশ্চল বিগতযৌবনা রূপহীনা রজনী এক রাত্রের অতিথির জন্য হতাশনয়নে পথের দিকে চাহিয়া প্রতিক্ষা করে।

পুনর্মিলন

হিরণ্ময়ীর ব্যস্ততার আর সীমা নাই।

"বড়ো ঘরটা অমলার জন্যেই থাক, কি বলো গো? ছেলেপুলে তো তারই বেশি!"

খানিক বাদে আবার ঘুরিয়া আসিয়া বলেন, "কিন্তু বিমলাকে কোন ঘরটা দেওয়া যায় বলো তো, তার আবার কচি ছেলে!"

স্বামীর প্রতি ফরমাশ অনবরতই হইতেছে, "আর একটা স্টোভ আনাও বাপু! কচি ছেলের ঘর, যখন-তখন দরকার হবে তো, ও একটায় হবে না।"

"আজকাল আবার যা মশা, মশারি তুমি দুটো না-হয় কিনেই আনো। ওরা ছেলেমানুষ সব গুছিয়ে কি আনতে পারবে।"

ছোটো মেয়ে ক্ষ্যান্তও সঙ্গে সঙ্গে ব্যস্ত হইয়াছে—"আমি মা ন-দি'র সঙ্গে শোব কিন্তু ব'লে রাখছি!"

"হ্যাঁ মা, স্টেশনে এখনও লোক পাঠানো হ'ল না, ন-দি' আটটার ট্রেনে যে আসবে।"

"ন-দি' বোধ হয় হিন্দুস্থানী হ'য়ে গেছে মা, সেখানে নাকি বাংলা কথা বলবার একটা লোকও নেই।"

ছোটো মেয়ে ও তাহার ন-দিদি পিঠোপিঠি দুই বোন। বিবাহের পূর্বে দুইজনকে ঠিক যমজের মতো দেখাইত, দুইজনে ভাবও ছিল অত্যন্ত বেশি, একদণ্ডের জন্যও ছাড়াছাড়ি হইত না। তাহার পর ন-দি'র বিবাহ হইয়াছে। আজ পাঁচ বৎসর দুই বোনে দেখা নাই। ক্ষ্যান্তর বিবাহের সময় দেখা হইবার কথা, কিন্তু শেষ পর্যন্ত ন-দি'র স্বামী লিখিয়াছিল, সময় বড়ো খারাপ, ছুটি চাহিলে মিলিবে না, কামাই করিলে চাকরি যাইবার সম্ভাবনা। সুতরাং এবার আর এতদূর যাওয়া সম্ভব হইল না। ক্ষ্যান্তর বিবাহের রাত্রি ন-দি'র অনুপস্থিতিতে ম্লান হইয়া গিয়াছিল।

তারপর এতদিন বাদে ন-দি' আসিতেছেন। শুধু ন-দি' নয়, এ-বাড়ির সব ক'টি মেয়েই অনেকদিন বাদে প্রথম এইবার মিলিত হইবে। বাড়িময় উৎসাহ, আনন্দ, ব্যস্ততার তাই আর সীমা নাই।

হিরণ্ময়ীর পুত্রসন্তান হয় নাই, কিন্তু তাহার জন্য তিনি দুঃখিত নন। মেয়েগুলিই তাঁহার প্রাণ।

বড়ো মেয়ে অমলার খুব ঘটা করিয়া কাছেই বিবাহ দিয়াছিলেন। তখন স্বামীর কারবারের অবস্থা ভালো, আঁচলা-আঁচলা টাকা রোজ আসিতেছে বলিলেই হয়। তাহার পর মেজো মেয়ের বিবাহে কিন্তু অত ঘটা আর সম্ভব হইল না। ভাঁটার টান তখনই শুরু হইয়াছে। বড়োলোকের ঘরে না হইলেও মেজো মেয়ের বিবাহ সৎপাত্রেই হইল। পাত্রটি বিদ্বান, ইঞ্জিনিয়ারিং পাস করিয়া সুদূর বর্মা মুলুকে চাকরি পাইয়াছে। অত দূরে মেয়ে পাঠাইতে হিরণ্ময়ীর আপত্তি ছিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত স্বামীর কথায় প্রবোধ মানিলেন। মেয়েছেলের আর দেশবিদেশ কি—স্বামী যেখানে লইয়া যায় সেই তাহার

দেশ বলিয়া নিজেকে বুঝাইলেন। বুঝাইলেন বটে, কিন্তু কমলা প্রথম স্বামীর ঘর করিতে যাইবার সময় কাঁদিয়া-কাটিয়া এমন অস্থির হইলেন যে, পাঁচজনে ধরিয়া রাখিতে পারে না। সব মেয়েরই মায়ের প্রতি টান অত্যন্ত বেশি, কিন্তু তাহারও ভিতর কমলাকে আলাদা করিয়া ধরা যায়। মায়ের চেয়ে সে কম কাঁদিল না।

স্বামী ধমক দিয়া শেষে বলিলেন, "মেয়েকে শ্বশুরবাড়ি পাঠাতে কাঁদলে অকল্যাণ হয় তা জানো?"

অকল্যাণের ভয়ে হিরন্ময়ী কান্না থামাইলেন কিন্তু চোখের জল থামিল না।

অমলা, কমলার পর সেজো মেয়ের বেলা নামের ঠিক মিল আর খুঁজিয়া পাওয়া যায় নাই। তাহার নাম বিমলা। বিমলার বিবাহে একটু নূতনত্ব আছে। সে-ইতিহাস এখনও হিরন্ময়ী সবিস্তারে পাড়ার লোককে বলিয়া বেড়ান। স্বামীর কারবার তখন ফেল পড়ে-পড়ে। কলিকাতার বড়ো রাস্তার প্রাসাদোপম বাড়ি বিক্রি করিয়া ছোটো একটি গলির ভিতর ভাড়াটে বাড়িতে তাঁহাদের দিন কাটিতেছে। স্বামী কারবারের ভাঙন ঠেকাইবার বৃথা চেষ্টা করিতেছেন, সঙ্গে-সঙ্গে কম পণে বিমলার জন্য ভালো পাত্র খুঁজিবার চেষ্টায় হয়রান হইতেছেন।

মেয়েদের মধ্যে বিমলাই সবচেয়ে সুন্দরী ; আর কিছু না হউক সুন্দর দেখিয়া একটি জামাই করিবার তাই হিরন্ময়ীর বড়ো ইচ্ছা ছিল, কিন্তু সে-ইচ্ছা বুঝি আর পূর্ণ হয় না।

হয়রান হইয়া ব্রজগোপালবাবু একজায়গায় কথাবার্তা প্রায় ঠিক করিয়া ফেলিয়াছেন। পাত্রটির অবস্থা ভালো। কিন্তু চেহারা ভালো নয়। তাহার উপর দোজবরে। হিরন্ময়ী এ-পাত্রে বিবাহ দিতে একান্ত নারাজ ছিলেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত স্বামীর কথায় মত দিতে বাধ্য হইলেন। এ-পাত্রকে জবাব দিলে আর ভালো পাত্র মিলিবে কি না সন্দেহ। তবু তো মেয়েটার খাইবার-পরিবার দুঃখ থাকিবে না।

কিন্তু বিমলার ভাগ্যদেবতা অন্যরূপ বিধান করিয়াছিলেন। বিমলার বর হঠাৎ আপনা হইতে আসিয়া ধরা দিল।

মামাতো ভায়ের কাছে পাস পাইয়া হিরন্ময়ী মেয়েদের লইয়া থিয়েটার দেখিতে গিয়াছিলেন। সারাক্ষণ মুগ্ধ হইয়া থিয়েটার দেখিয়াছেন এবং গভীর রাত্রে ছ্যাক্‌রা গাড়ি করিয়া বাড়ি ফিরিবার সময় থিয়েটারের নটীরা সত্যই সুন্দর, না রং মাখিয়া এমন রূপবতী হইয়া থাকে : ঘরপোড়ার দৃশ্যে সত্যই রঙ্গমঞ্চে আগুন লাগিয়াছিল কিনা ইত্যাদি সমস্যার আলোচনায় এমন তন্ময় হইয়াছিলেন যে আর কিছু লক্ষ্য করিবার সময় পান নাই।

বিমলা তবু একবার বলিয়াছিল, "একটা মোটর তখন থেকে আমাদের পেছনে আস্তে-আস্তে আসছে মা!"

হিরন্ময়ী সে-কথায় কান দেওয়া আবশ্যক মনে করেন নাই।

তার পরের দিন নূতন এক ঘটক আসিয়া হাজির। ব্রজগোপালবাবু তো নিজের সৌভাগ্য বিশ্বাস করিতেই পারেন না।

তাঁহার মতো বামনের ভাগ্যে এমন চাঁদ মিলিবে, এ-কথা তিনি কেমন

করিয়া বিশ্বাস করিবেন। ব্যাপারটা অসাধারণ। হাতিবাগানের বিখ্যাত দত্ত-পরিবারের ছোটো ছেলের সঙ্গে তাঁহার মেয়ের বিবাহের প্রস্তাব লইয়া ঘটক আসিয়াছে।

ব্রজগোপালবাবু ঘটককেই কি যে সম্মান করিবেন ভাবিয়া পাইলেন না। আমতা-আমতা করিয়া বলিলেন—"আপনি পরিহাস করছেন না তো? আমার মেয়ে তাঁদের দাসীগিরি করারও যোগ্য নয়। তাঁদের পছন্দই কি হবে!"

ঘটক হাসিয়া জানাইল—"আপনাকে সে সব ভাবতে হবে না মশাই। যার কনে সে নিজেই পছন্দ করেছে। এখন চার হাত এক করলেই হয়।"

সত্যই ব্রজগোপালবাবুকে ভাবিতে হইল না। দত্ত-পরিবারের সকলের আদরের ছোটো ছেলে নিজে যাহাকে পছন্দ করিয়া বিবাহ করিতে চাহিয়াছে, তাহাকে অবহেলা করিতে কেহ সাহস করিল না। একদিন সত্যই বিবাহ হইয়া গেল। হিরণ্ময়ী শুধু সুন্দর জামাই চাহিয়াছিলেন, কিন্তু বাস্তব তাঁহার কল্পনাকেও ছাড়াইয়া গেল। জামাই শুধু কার্তিকের মতো সুপুরুষ নয়, কুবেরের মতো ধনবানও বটে।

বিমলার বুঝি অনেক জন্মের তপস্যা—নহিলে থিয়েটারে একবার চোখের দেখা দেখিয়া তাহার জন্য অমন রূপবান ও ধনবান ছেলে পাগল হইবে কেন!

বিমলার পর নির্মলা। আলোর পর অন্ধকারও বুঝি বলা চলে। হিরণ্ময়ীর মেয়েদের মধ্যে এইটিকে কুৎসিত বলিলে মিথ্যে বলা হয় না! বিবাহ যেমন-তেমন করিয়া হইল। পাত্রটির বয়স হইয়াছে, লেখাপড়া তেমন জানে না, সামান্য আয়ের চাকরি করে বলিয়া এবং তিনকুলে কেহ নাই বলিয়া এতদিন বিবাহ করে নাই। দেখাইবার মতো জামাই নয়, তবু হিরণ্ময়ী বিশেষ দুঃখিত হইলেন না বোধ হয়। অবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে-সঙ্গে আশা তাঁহার সংকীর্ণ হইয়া আসিয়াছে।

ক্ষান্ত কোলের মেয়ে, তবু জানিয়া শুনিয়া তাহাকে একরকম জলেই ফেলিয়া দেওয়া হইয়াছে। নির্মলার স্বামী তবু সামান্য চাকরি করিত। ক্ষান্তের ভাগ্যে যে-স্বামী জুটিল তাহার নিজেরই খাইবার সংস্থান নাই। নেহাতই মেয়ের বিবাহের বয়স পার হইয়া যাইতেছে দেখিয়া, পাড়া-প্রতিবেশীর কাছে মান রাখিবার জন্য ধরিয়া বিবাহ দেওয়া হইল। মার্কামারা বকাটে ছেলে, নেশাভাংও সম্ভবত করিয়া থাকে। আপাতত সে একরকম ঘর-জামাই হইয়াই আছে।

ক্ষান্তর বিবাহের সময়ও হিরণ্ময়ী সব মেয়েদের আনাইতে পারেন নাই। পয়সার অভাব, তা ছাড়া বুঝি মনে-মনে একটু লজ্জাও ছিল।

তাহার পর পাঁচ বৎসর কাটিয়াছে। ব্রজগোপালবাবু পূর্বের অবস্থা আর ফিরিয়া পান নাই সত্য, কিন্তু কারবার ভাঙনের কিনারায় আসিয়া আবার একটু ভালোর দিকে ফিরিয়াছে। হিরণ্ময়ী সচ্ছল অবস্থার দিনে কি ব্রত করিয়াছিলেন, অর্থাভাবে সে-ব্রত এতদিন উদ্‌যাপন হয় নাই। এতদিনে হইবে। কিন্তু ব্রত উদ্‌যাপনটা গৌণ ব্যাপার! সেই উপলক্ষে সমস্ত মেয়েদের একত্র দেখিতে পাওয়াই মুখ্য। মেয়েরা নিজের-নিজের সংসার লইয়া ব্যস্ত। এ-সুযোগ গেলে আর কখনও দেখা হইবে কিনা সন্দেহ। হিরণ্ময়ী স্বামীকে সেইরূপই বুঝাইয়াছেন। ব্রজগোপালবাবু আপত্তি করেন নাই।

সবার আগে আসিল কমলা। সঙ্গে তাহার স্বামী প্রভাসও আসিয়াছে। প্রভাস একেবারে পুরাদস্তর সাহেব। শ্বশুরবাড়িতেও হ্যাট কোট প্যান্ট পরিয়া আসিয়াছে! কমলারও অনেকটা বিবির মতো বেশভূষা। ক্ষ্যান্ত তো দিদির শাড়ি পরিবার ধরন দেখিয়াই অবাক। দিদির সঙ্গে ভালো করিয়া কথা কহিবার সাহসই তার হয় না। হিরণ্ময়ী এবং ব্রজগোপালবাবুরও কেমন একটু বাধো-বাধো ঠেকে। কমলা—মায়ের সেই অত্যন্ত ন্যাওটো মেয়েটি—কেমন যেন পর হইয়া গিয়াছে। মুখে যাহার কথা ফুটিত না, সে আজকাল ফড়ফড় করিয়া কথা বলে—দু-একটা ইংরেজিও সেই সঙ্গে জুড়িয়া দেয়। একটু রোগা হইয়াছে। কিন্তু তাহাতে আরও যেন ছেলেমানুষ দেখায়। ছেলেপুলে হয় নাই—বোধ হয় আর হইবেও না। মা সেজন্য একবার বুঝি দুঃখ প্রকাশ করেন। কমলা হাসে, বলে, "ছেলেপুলে হ'লে যেন ভারি সুখ—উনি তো বলেন—ওসব nuisance আমাদের দরকার নেই।" মার কাছে কথাগুলো যেন একটু নির্লজ্জের মতো শোনায়। কমলা যেন একটু বেহায়াই হইয়াছে। বাপ-মার সামনে স্বামীকে দেখিয়া ঘোমটা তো দেয়ই না, স্বচ্ছন্দে কথা বলে। ব্রজ-গোপালবাবু কাছে থাকিলে তাড়াতাড়ি সরিয়া পড়েন। হিরণ্ময়ী অস্বস্তি বোধ করিয়া মাথা নিচু করিয়া থাকেন। মনকে বোঝাইতে চেষ্টা করেন—আজকালকার ওই রকমই ফ্যাশান, তা ছাড়া থাকে সেই কোন মগের মুলুকে, ওর আর দোষ কি?

অমলা প্রকাণ্ড একটা মোটরে করিয়া একরাশ ছেলেপুলে লইয়া আসিল। তাহার স্বামীও সঙ্গে আসিয়াছে, গোলগাল ছোট্টখাট্টো ভালোমানুষটি। অত বড়োঘরের ছেলে বলিয়া বুঝিবার জো নাই। অমলাকে তাহার চেয়ে অনেক ভারিক্কি দেখায়। অমলা ছেলেবেলা হইতেই একটু গম্ভীর, এখন তাহাকে অত্যন্ত রাশভারি মনে হয়। তাহাদের সরকার সঙ্গে আসিয়াছে। দেখা যায় যে বাবুর চেয়ে অমলাকে সে মান্য করে বেশি। আদেশপত্র অমলাই সব দেয়। ছেলেপুলেরা বাপকে তো মানেই না, ভয় করে যা মাকে।

অমলা আসিয়াই কাজকর্মের ভার নিজের স্কন্ধে তুলিয়া লয়। ব্যাপারটা অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবে ঘটিয়া যায়। খানিক বাদে বরং মনে হয় যে অমলা না আসা পর্যন্ত কাজকর্ম যেন মোটেই সুশৃংখলার সহিত চলিতেছিল না। সে না থাকিলে সব যেন গোলমাল হইয়া যাইত—এমন সন্দেহও হয়।

হাঁকডাক করিয়া ফাইফরমাশ দিয়া অমলা সকলকে ব্যস্ত করিয়া তুলিল।

"—এ ছেঁড়া মান্ধাতার আমলের শামিয়ানা কে এনেছে? বিনোদ বুঝি! যাও ফিরিয়ে দিয়ে এসো।"

বিনোদ ক্ষ্যান্তর স্বামী। কাপড় অভাবে চওড়া-পাড় একটা শাড়ি পরিয়া সে কাছ দিয়া যাইতেছিল। যাইতেছিল বোধ হয় রান্নার জায়গায়। রসুই-বামুনদের সঙ্গে ইতিমধ্যে সে বেশ ভাব জমাইয়া লইয়াছে। গোপনে-গোপনে দুই-এক ছিলিম চলিয়াছে বলিয়াও বোধ হয়।

বিনোদ দাঁড়াইয়া পড়িয়া একটু রসিকতা করিবার চেষ্টা করিল—"ও ছেঁড়া নয় বড়দি, ওসব হল শামিয়ানার জানলা, আজকালকার ফ্যাশান জানো না?"

অমলা গম্ভীরভাবে বলিল, "তুমি এখনই ফেরত দিয়ে এসো। ভালো শামিয়ানা যদি না পাও সেখানে, তা হ'লে অন্য জায়গায় দেখতে হবে।"

অমলার কণ্ঠস্বরে কিছু-একটা আছে। বিনোদের রসিকতার উৎসাহ একেবারে নিবিয়া গেল। ঘাড়-কামানো মাথাটা বার কয়েক চুলকাইয়া রান্নাঘরের লোভ ত্যাগ করিয়া সে শামিয়ানা বদলাইতেই শেষ পর্যন্ত বাহির হইল।

অমলার হাতে তাহার মা-বাপেরও নিস্তার নাই।

"কই মা, তোমার পুরুতঠাকুর কই? আর তুমি ওই কাপড় প'রে আছ যে বড়ো! সে-গরদ খানা কি হ'ল?"

মা একটু হাসিয়া বলেন—"এও তো বেশ শুদ্ধ কাপড় বাপু। আর সে-গরদ পরে না।"

"কেন পরে না শুনি? কে বলেছে তোমায় ও-কাপড় শুদ্ধ? ওসব বিদেশী সস্তা কাপড়—কি থেকে তৈরি কে জানে! না না, তুমি গরদ বার ক'রে আনো। না হ'লে আমার ট্রাঙ্কে একটা আছে, দেব এনে?"

মাকে কাপড় বদলাইতে যাইতে হয়।

অমলার কর্তৃত্ব সকলেই সহজে সানন্দে মানিয়া লয়। তাহার আদেশে জবরদস্তি আছে, কিন্তু অহংকার নাই।

কিন্তু একজনের একটু খারাপ লাগে। এ-বাড়ির ভিতর সামান্য একটু অশান্তির বীজও বুঝি অঙ্কুরিত হইবার উপক্রম হয়।

অমলা মাঝের ঘরে ঢুকিয়া বলে—"হ্যাঁ রে কমলি, তোদের সঙ্গে ওই যে বেয়ারা এসেছে, ও কি জাত?"

কমলা হাসিয়া বলে—"কি জাত কে জানে? ও মাদ্রাজি।"

"মাদ্রাজিদের কি জাত নেই?"

"থাকবে না কেন—সে-খোঁজ করিনি।"

"ওমা, জাত জানিস না, অথচ ঘরদোর জিনিসপত্র সব ছুঁয়ে-টুয়ে বেড়াচ্ছে, কিছু বলিসনি!"

"তাতে কি হয়?"

"হয়, হয় রে পাগলী। হিন্দুর বাড়িতে দোষ হয়: আমরা তো তোর মতো খ্রীস্টান হইনি। তবে আজকের মতো বাইরের ঘরে থাকতে ব'লে দিস, পুজো-আচ্চার দিন। বুঝেছিস?"

কমলা হাসিয়া বলে—"আচ্ছা মুশকিল, বাপু। ও তো সেখানে আমাদের বেঁধে পর্যন্ত দিয়েছে, কি হয়েছে তাতে!"

অমলাও হাসিয়া বলে—"হয়েছে এই যে, তোর হাতে আর আমরা খাব না।"

"তা খেয়ো না।"—কথাটা হাসিয়া বলিলেও কমলা মনে-মনে বুঝি একটু অসন্তুষ্ট হয়।

অমলা বাহির হইয়া গিয়াছিল। খানিক পরে ফিরিয়া আসিয়া বলে—"হ্যাঁ রে, প্রভাসকে দেখছি না কেন?"

"উনি একটু বেরিয়েছেন।"

"বেরুতে দিলি কেন? থাকলে একটু দেখাশুনা করতে তো পারত!"

কমলা অপ্রসন্নভাবে বলে—"সে তোমরাই করছ, আমরা ওসব বুঝি-টুঝি না।"

'আমরা' কথাটার উপর একটু জোরই দেওয়া হইয়াছে। অমলা বুঝিতে

পারিয়া একটু গম্ভীর হইয়া যায়।

মায়ের সর্বাপেক্ষা রূপসী মেয়ে, দত্ত-পরিবারের আদরের বধূ বিমলা আসিয়াছে অনেক দেরিতে, অত্যন্ত সাধারণ বেশে একটি ছ্যাকরা গাড়ি করিয়া। ছয় মাসের ছেলেকে সে নিজেই কোলে করিয়া আনিয়াছে, দূর-সম্পর্কের এক দেওর পোঁছাইয়া দিতে আসিয়াছে মাত্র, সংগে একজন ঝিও আসে নাই।

বিমলা কাছেই থাকে বলিয়া মা ইতিপূর্বে দু-একবার তাহাকে আনাইবার চেষ্টা করিয়াছেন কিন্তু সফল হন নাই। আজ গাড়ি হইতে তাহাকে নামাইতে গিয়া তিনি অবাক হইয়া যান।

বিমলার হাত হইতে ছেলেটাকে কোলে তুলিয়া তিনি প্রথম আদর করেন। রাজপুত্রের মতো ছেলে হইয়াছে।

কিন্তু বিমলার দিকে চোখ তুলিয়া চাহিয়া তিনি সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করেন—"এ কি ছিরি হয়েছে মা তোর? অসুখবিসুখ করেছিল নাকি! কই, খবর দিসনি তো!

বিমলা ম্লান হাসিয়া মৃদুস্বরে বলে—"অসুখ করবে কেন! এমনি তো শরীর।"

"এমনি শরীর কি রে!—গলায় কণ্ঠা বেরিয়েছে, মুখটা শুকিয়ে এতটুকু হ'য়ে গেছে—ময়লা হ'য়ে গেছিস ; কি হয়েছিল মা?"

বিমলা মায়ের সংগে যাইতে-যাইতে মাথা নিচু করিয়া বলে, "সত্যি, কিছু হয়নি তো মা!"

মায়ের মন সে-কথা বিশ্বাস করিতে চায় না। বিমলার গলার স্বর পর্যন্ত যেন পরিবর্তিত হইয়া গিয়াছে। কেমন যেন সংকুচিত ভাব। মা মনে-মনে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়া ওঠেন। কিন্তু সকল কথা জিজ্ঞাসা করিবার সময় এখন নাই। মনের অশান্ত উদ্বেগ চাপিয়াই তাঁহাকে রাখিতে হয়।

বাড়িতে ঢুকিতেই অমলা জিজ্ঞাসা করে—"বিমলা একা এল! অপূর্ব আসেনি মা?"

মা বিমলার কথা ভাবিতেই এত তন্ময় ছিলেন যে, এ-ব্যাপারটা লক্ষ্যই করেন নাই। বলেন—"তাই তো!"

তাহার পর বিমলাকে জিজ্ঞাসা করেন—"অপূর্ব এল না কেন রে?"

বিমলা মৃদুস্বরে বলে, "তিনি বোধ হয় আসতে পারবেন না, অনেক কাজ!"

অমলা একটু হাসিয়া বলে—"হুঁ, কাজ তো ব্যাঙ্কের চেক সই করা। তুই যেমন বোকা মেয়ে, জোর ক'রে ধ'রে আনতে পারলিনে?"

বিমলা মৃদু একটু হাসে, উত্তর দেয় না।

বাড়িময় গোলমাল, ব্যস্ততা। কোথা দিয়া কি হইতেছে কে জানে! সকল কাজের খেই একা অমলা ছাড়া বুঝি আর কেহই রাখিতে পারে না। কাহারও সে-উৎসাহ নাই। ক্ষ্যান্ত বিমর্ষ মনে ঘুরিয়া বেড়ায় বড়দির দৃষ্টি এড়াইয়া। বড়দিদি দেখিতে পাইলেই একটা কাজে লাগাইয়া দিবেন। কিন্তু তাহার কিছুই ভালো লাগিতেছে না। ন-দিদি এখনও আসে নাই—বোধ হয় আসিবেই না। ন-দিদি কি করিয়া এমন নিষ্ঠুর হইল কে জানে। তাহার ন-দিদিকে দেখিবার জন্য সমস্ত মন ব্যাকুল হইয়া আছে। ন-দিদির কি একবারও মনে

পড়ে না। কত কথাই না সে মনে-মনে ভাবিয়া রাখিয়াছিল। ন-দিদি না আসিলে তাহার কিছুই তো হইবে না। আর এবার যদি ন-দিদি না আসে তাহা হইলে আর কখনও দুইজনের দেখা হইবে কিনা সন্দেহ। না, ক্ষ্যান্তর জীবনে কোনো সুখ নাই। অকর্মণ্য স্বামীর জন্যে একেই তো তাহার দুঃখ ও গ্লানির অন্ত নাই—মনের কথা বলিবার মতো একজন সঙ্গীরও তাহার অভাব। নিজের দুঃখের কথা কাহাকেও বলিতে পারিলে বুঝি সে অনেকটা হালকা বোধ করিত। দিদিরা সব যেন কেমন হইয়া গিয়াছে। বড়দিদিকে অবশ্য সে চিরকাল মায়ের চেয়ে বেশি ভয় করিয়া থাকে। কিন্তু মেজদিদি ও সেজদিদির কাছে লজ্জা সংকোচ করিবার তো তাহার কিছু ছিল না। কিন্তু তাহারাও কেমন দূরে সরিয়া গিয়াছে। সেজদিদি বাড়িতে আসিয়া অবধি কোন কোণে যে নিজেকে গোপন করিয়া রাখিয়াছে খুঁজিয়া বাহির করাই শক্ত। যে-সেজদিদির হাসিতে বাড়ি সারাক্ষণ মুখর হইয়া থাকিত, গলার আওয়াজের জন্য যে মার কাছে অহরহ বকুনি খাইয়াছে, আজকাল তাহার মুখ দিয়া একটা কথা বাহির করাই কঠিন। সারাক্ষণ অন্যমনস্ক হইয়া আছে। পাচটা কথার উত্তরে একটা হুঁ দেয় মাত্র। আর মেজদিদির যা দেমাক, কাছে ঘেঁষিবার জো নাই। আজ সে তো মেজদি'র উপর রীতিমতো চটিয়াই গিয়াছে। মেজদি' কি সব নূতন ফ্যাশানের কাপড়-জামা আনিয়াছে, তাহাই দেখিতে গিয়াছিল। কাপড় দেখাইতে দেখাইতে হঠাৎ মেজদি' বলিয়া বসিল—"হ্যাঁ রে, বিনোদ আজকাল কাজকর্ম কিছু করছে?" স্বামীর কাজকর্মের কথায় লজ্জা পাইয়া ক্ষ্যান্ত চুপ করিয়া ছিল।

কমলা তাহার পর বলিয়াছিল—"ব'সে-ব'সে খাচ্ছে তো? কি বেহায়া বাপু। বাবার যেমন কাণ্ড, দেশে আর পাত্র ছিল না।"

কথাগুলো হয়তো ক্ষ্যান্তর প্রতি সহানুভূতি দেখাইবার জন্যই বলা হইয়াছিল কিন্তু ক্ষ্যান্ত প্রসন্ন হইতে পারে নাই।

মেজদি' আবার বলিয়াছিল—"একটু মান-অপমান জ্ঞান নেই। কি ব'লে একটা শাড়ি প'রে চাকর-বাকরের মতো ঘুরে বেড়াচ্ছে বলো তো! আমি তখন ডেকে খুব ধমকে দিয়েছি। আমাদের বেয়ারা রামেশ্বরের কাছ থেকে দেখি না একটা বিড়ি চাইছে। তা ধমকালে কি লজ্জা আছে! দাঁত বার ক'রে হাসতে-হাসতে চলে গেল।"

ক্ষ্যান্তর কিন্তু অত্যন্ত একটা দরকারী কাজের কথা মনে পড়িয়া যাওয়ায় কাপড় দেখা তখন আর হয় নাই। কমলা ডাকিয়া বলিয়াছিল—"এই সিল্কের-খানা দেখে গেলি না।"

ক্ষ্যান্ত যাইতে-যাইতে বলিয়াছিল, "এখন থাক!"

—না, মেজদি'র অহংকার বড়ো বেশি। বাপের বাড়ি আসিয়া অত সাজ-গোজই বা কেন? তাহারা কখনও কাপড়-জামা দেখে নাই কি? না, ন-দি'র উপর তাহার অত্যন্ত অভিমান হইতেছে। সে আসিলে তাহার তো কাহাকেও দরকার হইত না। তাহারা দুইজন এতক্ষণ চিল-কোঠার ঘরে গিয়া গল্প করিতে পারিত। চিল-কোঠার অবশ্য আগেকার সে-আকর্ষণ আর নাই। পাশে একটা মস্ত বাড়ি উঠিয়া তাহাদের চিল-কোঠার সামনেটা আড়াল করিয়াছে। দূরের সেই পুকুরঘাট আর সুপারিগাছের বন আর দেখা যায় না। দু-জনে মিলিয়া

তখন কি উৎসাহের সঙ্গেই না ছাদ হইতে পরস্পরের সহিত প্রতিযোগিতা করিয়া সেই পুকুরে ঢিল ছুঁড়িয়াছে। আজকাল ইচ্ছা থাকিলেও তাহারা ঢিল ছুঁড়িতে পারে না। তাহাদের সে-বয়স আর নাই। কেন যে নাই তাহা ক্ষ্যান্ত ভালো করিয়া বোঝে না। ঢিল ছুঁড়িবার লোভ তো এখনও তাহার প্রচুর। তবে লোকে কি বলিবে এই যা। আর ন-দি'ও সেরকম নিশ্চয়ই নাই। এই পরিবর্তনের কথা ভাবিয়া ক্ষ্যান্তর দুঃখ হয়। সত্যই বিবাহের পূর্বে তাহারা বেশ ছিল। কতদিন তাহারা দুই বোনে পরামর্শ করিয়াছে যে, তাহারা কিছু-তেই বিবাহ করিবে না। দুইজনে দুই জায়গায় ছাড়াছাড়ি হইয়া যাইতে তাহা-দের অত্যন্ত আপত্তি ছিল। সত্যই সেসব কল্পনা আকাশ-কুসুম হইয়া দাঁড়াইল।

ঘুরিতে-ঘুরিতে ক্ষ্যান্ত বাবার সামনে গিয়া পড়ে। ব্রজগোপালবাবু ভাঁড়ার-ঘরের এক পাশে বসিয়া তামাক খাইতেছেন। ক্ষ্যান্তকে দেখিয়া বলেন, "হ্যাঁ রে, বিনোদকে দেখছি না যে।"

ক্ষ্যান্ত অপ্রস্তুত হইয়া পড়ে, হাসিও পায় একটু। বাবার অদ্ভুত সব কথা। স্বামীকে তাহার যেন চোখে-চোখে রাখিবার কথা! না দেখিতে পাওয়ার কারণ যেন সে জানে।

ক্ষ্যান্ত চুপ করিয়া থাকে। ব্রজগোপালবাবু বলেন, "যা সব গোলমাল, খেয়াল ক'রে তাকে কেউ খাওয়াল কি না কে জানে!"

তাহার স্বামী যে কচি খোকা নয়, খাইবার ইচ্ছা হইলে সে যে নিজে চেষ্টা করিয়া খাইতে পারে এ-কথা সে কেমন করিয়া বাবাকে বুঝাইবে। এই উচ্ছৃঙ্খল অকর্মণ্য জামাইটির প্রতি বাবার যে অতিরিক্ত একটু স্নেহ আছে তাহা ক্ষ্যান্ত জানে। মুখে ইহাকে বাড়াবাড়ি বলিলেও কেন যে সে ইহাতে খুশী হয় বলিতে পারে না।

ক্ষ্যান্ত স্বামীর কথা এড়াইবার জন্য জিজ্ঞাসা করে—"বাবা, ন-দি' যে এল না?" কথাটা এমনি সে জিজ্ঞাসা করে , বাবা যে কোনো-কিছুর খবর রাখে না, ইহা সে জানে।

কিন্তু ব্রজগোপালবাবু হঠাৎ ব্যস্ত হইয়া বলেন, "তাই তো, তাই তো, তোর মাকে বলতে ভুলে গেছি। নির্মলা যে চিঠি দিয়েছে।"

এক-এক করিয়া তিনটি পকেট হাতড়াইয়া অবশেষে ব্রজগোপালবাবু এক পকেট হইতে খামটা বাহির করেন।

ক্ষ্যান্ত রাগ করিয়া বলে—"তুমি তো বেশ বাবা, আমরা সবাই ভেবে মরছি আর তুমি চিঠি পকেটে রেখে ভুলে গেছ।"

ব্রজগোপালবাবু অপ্রস্তুত হইয়া বলেন, "সকালে পিওন দিয়ে গেছে—তোর মাকে দেব-দেব ক'রে ভুলে গেছি।"

ক্ষ্যান্ত সে-কথা তখন শুনিতেছে না। সে চিঠি পড়ায় ব্যস্ত। চিঠি পড়িতে-পড়িতে তাহার সত্যই কান্না পায়। ন-দি' কত কথাই লিখিয়াছে। কেন আসিতে পারিবে না, তাহাদের সেখানে এখন কিরকম গরম ইত্যাদি। শুধু তাহার বেলাই, 'ক্ষ্যান্তকে আমার আশীর্বাদ দিও' ছাড়া আর কিছু নয়। এতটুকু তো না লিখিলেই চলিত। ক্ষ্যান্তকে আর মনে রাখিবারই বা কি দরকার ছিল? চিঠিটা ফিরাইয়া দিয়া সে হনহন করিয়া চলিয়া যায়।

ব্রজগোপালবাবু পিছন হইতে বলেন—"চিঠিটা নিয়ে যা ক্ষান্ত, তোর মাকে দিবি।"

কিন্তু ক্ষ্যান্ত আর ফিরিয়াও চাহে না।

অনেক রাত হইয়াছে। নিমন্ত্রিতদের খাওয়া-দাওয়া, বাড়ির কাজ সব চুকিয়াছে। হিরণ্ময়ী সমস্ত মেয়েদের লইয়া খানিকক্ষণের জন্য একটি ঘরে বসিয়াছেন।

অমলা মেজো বোনকে বকিতেছিল, "বিকেলবেলা শান্তির জল নেবার জন্য তোকে ডেকে হয়রান। শেষকালে কে বললে, তোরা সেজেগুজে ছবি দেখতে গেছিস। আজকের দিনে তোর বায়স্কোপ না গেলে চলত না?"

কমলা গম্ভীরমুখে বলিল—"আমরা থেকেই বা কি করতাম?"

অমলা এবার একটু রাগিয়াই বলিল, "তবু থাকতে হয়। বায়স্কোপ তো আর পালিয়ে যাচ্ছিল না?"

"আহা আজ হ'ল এ-ছবির শেষ দিন, আমরা ব'লে সেই রেঙ্গুন থেকে অ্যাড্‌ভার্টিজমেন্ট্ দেখে দিন গুনছি!"

"তা ও-ছবি না-হয় অন্য ছবি দেখতিস—সেই বায়স্কোপ তো। এই কলকেতা শহরেই আছি ; পাঁচ বছর তো একটা থিয়েটারে পর্যন্ত যাইনি।"

কমলা উষ্ণস্বরে জবাব দেয়—"যার যেমন রুচি।"

মা ব্যাপারটা খারাপ দাঁড়াইতেছে দেখিয়া অন্য কথা পাড়েন, তাহার পর বলেন—"বিমলা আবার উঠে গেল কোথায়?"

ক্ষ্যান্ত বলিল—"ছেলে কাঁদছে বোধ হয়।"

"না, ছেলে তো ঘুমচ্ছে দেখে এলাম,"—বলিয়া অমলা আবার জিজ্ঞাসা করে—"ওর কি হয়েছে বলো তো মা?"

হিরণ্ময়ীর মুখে গভীর বেদনার ছায়া পড়ে। কিছুই তিনি জানেন না, তবু মায়ের প্রাণ কি যেন অজ্ঞাত আশঙ্কায় কাঁপিয়া ওঠে। হিরণ্ময়ী কিছু না বলিয়া সেজো মেয়ের খোঁজে উঠিয়া যান।

বিমলা সত্যই তাহার ঘরে গিয়া ছেলেকে দোল দিতেছে। হিরণ্ময়ী তাহার কাছে গিয়া বসিয়া বলেন—"উঠে এলি যে মা?"

বিমলা মৃদু হাসিয়া বলে—"এমনি।"

তাহার পিঠে হাত রাখিয়া হিরণ্ময়ী সস্নেহে বলেন—"অনেকদিন বাদে এসেছিস, এবার কিন্তু তোকে তাড়াতাড়ি ছেড়ে দিচ্ছিনে। তা তারা যা বলে বলুক।"

বিমলা খানিক চুপ করিয়া থাকে। তাহার পর আস্তে-আস্তে বলে—"অনেকদিন কেন মা, চিরকালের জন্য রাখতে পারো না?"

হিরণ্ময়ী হাসিয়া বলেন, "দূর পাগলী, আমি রাখলেই কি তুই থাকতে চাইবি! দু-দিন বাদেই যাবার জন্যে পাগল হবি। বিয়ের পর কি আর মেয়েদের বাপের বাড়ির ওপর টান থাকে।"

বিমলা অদ্ভুতভাবে হাসিয়া বলে, "তা বটে।"

হিরণ্ময়ী খানিক চুপ করিয়া বসিয়া থাকেন, বলিবার কোনো কথা নাই। তাহার পর বিমলাকে শুইতে বলিয়া উঠিয়া যান।

কিন্তু তাঁহার নিজের চোখে ঘুম নাই। অন্ধকার বারান্দায় দাঁড়াইয়া তিনি তাঁহার গভীর সুখ উপলব্ধি করিবার চেষ্টা করেন। অনেক সাধ করিয়া তিনি মেয়েদের আনাইয়াছেন, একটি বাদে তাঁহাদের সমস্ত মেয়েই আজ একত্র হইয়াছে, তাঁহার তো অত্যন্ত সুখী হইবার কথা, কিন্তু সত্যই কি তিনি সুখী হইয়াছেন? মেয়েদের ঠিক যেমনটি তিনি দেখিতে চাহিয়াছিলেন, তেমনটি কি তাহারা আর আছে? ইহারা তাঁহারই কন্যা, অথচ ঠিক যেন তেমনটি আর নাই।

নিস্তব্ধ অন্ধকার আকাশের তলায়, এই চুয়াল্লিশ বৎসর বয়সে প্রথম যেন তিনি সৃষ্টি, সংসার ও জীবনের দুর্জ্ঞেয় অতল রহস্যের সম্মুখীন হইয়া দাঁড়াইয়াছেন।

পরমুহূর্তেই তাঁহার চমক ভাঙে। ভাঁড়ার-ঘরে বোধ হয় তালা দেওয়া হয় নাই। কাল সকাল হইতে আবার অনেক কাজ।

কোনোরকমে পা গুটাইয়া বসিয়া থাকা যায় ; কিন্তু ঘাড়টা পর্যন্ত সোজা করিবার উপায় নাই, মাথা তুলিলেই নৌকার ছইয়ে ঠেকিয়া যায়।

দাক্ষায়ণী মোটা মানুষ, পায়ে একটু বাতও আছে। পা না ছড়াইয়া বেশি-ক্ষণ একভাবে তিনি বসিয়া থাকিতেই পারেন না, কিন্তু সে-অসুবিধার কথা তাঁহার এখন মনেই নাই। সংকীর্ণ নৌকার ছই-ঢাকা স্থানটিতে বসিয়া, তিনি 'সেথো' লক্ষ্মণকে উদ্দেশ করিয়া যেসব গাল পাড়েন তাহার কারণ অন্য।

'সেথো'র কাজটা যে অত্যন্ত অন্যায় হইয়াছে এ-বিষয়ে কাহারও সন্দেহ নাই। কিন্তু বিদেশে, অপরিচিত তীর্থস্থানে যাহার ভরসা করিয়া রওনা হইতে হইয়াছে, মনে-মনে যত রাগই থাকুক, তাহার বিরুদ্ধে কিছু বলিতে কেহ সাহস করে না। গোরু-ভেড়ার মতো তাল পাকাইয়া নৌকার সংকীর্ণ ছই-এর নিচে অশেষ দুর্ভোগ সহ্য করিতে হইলেও তাহারা নীরব হইয়াই থাকে।

কিন্তু দাক্ষায়ণী চুপ করিয়া থাকিবার পাত্রী নহেন। পাড়ার ডাকসাইটে তেজী মেয়েমানুষ ; বালিকাবয়সে বিধবা হইবার পর লোকে তাঁহার অননু-করণীয় নিষ্ঠা ও ধর্মাচরণের জন্য শ্রদ্ধা যতখানি করে, তাঁহার প্রচণ্ড মুখের ধারকে ভয় করে তাহার চেয়ে অনেক বেশি।

বিদেশে বিভুঁয়ে অপরিচিত তীর্থপথের একমাত্র সহায় হইয়াও লক্ষ্মণ সে-মুখের কাছে রেহাই পায় না। দাক্ষায়ণী কাহাকেও ছাড়িয়া কথা কহিবার মেয়ে নন ; বিশেষত এ-ক্ষেত্রে তাঁহার রাগের যথেষ্ট কারণ বর্তমান।

"হতচ্ছাড়া মুখপোড়া বাঁদর। দেশে তোকে ফিরতে হবে না? তখন পাই-খানার খ্যাংরায় তোর মুখ ভেঙে না দিই তো আমি মুখুজ্যেদের বউ নই!"

লক্ষ্মণ উত্তর দেয় না ; উত্তর দিবে কি, তাহাকে এই ক'দিন দেখিতেই পাওয়া যায় নাই। হালের মাচানের উপর সভয়ে দাক্ষায়ণীর নাগালের বাহিরে সে দিন কাটায়। দাক্ষায়ণীর সামনে আসিবার সাহস তাহার নাই।

ছই-এর ভিতর হইতে দাক্ষায়ণীর কণ্ঠ শোনা যায়—"জোচ্চোর, পাজী, হারামজাদা, আমি যদি ব্রাহ্মণের মেয়ে হই তো তোকে সাগর পর্যন্ত পেঁছিতে হবে না—তার আগে তুই ওলাউঠায় মরবি।"

লক্ষ্মণ এ-অভিশাপে শিহরিয়া ওঠে, কিন্তু প্রতিবাদ করিবার তাহার কিছুই নাই। নৌকার অপর ধারে খোলা পাটার উপর বসিয়া যাহারা কলরব করিতেছে তাহাদের সম্পর্কেই দাক্ষায়ণীর এই রাগ। লক্ষ্মণেরও এখন মনে হয় পয়সার লোভে এমন কাজটা না করিলেই হইত। কিন্তু এখন আর উপায় নাই।

ছই-এর ভিতর হইতে আবার কলরব শোনা যায়। বছর আস্টেকের একটি ছোটো ফুটফুটে মেয়ে ছই-এর অপর প্রান্তে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহাকে লইয়াই গোল।

দেখিতে সুশ্রী হইলে কি হইবে, ওইটুকু একরত্তি মেয়ের চাল-চলন কথায়-বার্তায় অসহ্য পাকামি দেখিলে গা জ্বলিয়া যায়। ছই-এর ভিতরকার মেয়েরা একবাক্যে প্রতিবাদ করিয়া বলে—"মানুষের বসবার জায়গা নেই, এখান দিয়ে

যাবি কি লা?"

ছোটো মেয়েটি তাহার ফুলের মতো কাচ মুখটি অপরূপ ভঙ্গিতে বিকৃত করিয়া হাত নাড়িয়া বলে—"যাব না কেন লা! তোমাদের তো কেনা জায়গা নয়।"

অবাক হইয়া গালে হাত দিয়া মেয়েরা বলে, "ওমা, কোথায় যাব মা! এক ফোঁটা মেয়ের কথার ঢং দেখেছ!"

একজন বলে, "হবে না, কি রক্তে জন্ম!"

মেয়েটা ছোটো মুখখানি বাঁকাইয়া বলে, "মুখ নাড়তে আর হবে না, ভালোয়-ভালোয় পথ দাও বলছি, নইলে গায়ের ওপর দিয়ে যাব।"

দাক্ষায়ণী এতক্ষণ কথা বলেন নাই। এবার অগ্নিমূর্তি হইয়া চোখ রাঙাইয়া বলেন, "তবে রে ইল্লুতে মেয়ে—যত বড়ো মুখ নয় তত বড়ো কথা। যা না দেখি গায়ের ওপর দিয়ে; গলা টিপে পুঁতে ফেলব না!"

কিন্তু দাক্ষায়ণীর চোখ-রাঙানিতে ভয় পাইবার মেয়ে সে নয়; চোখ ঘুরাইয়া ঠোঁট বাঁকাইয়া বলে, "ঈস্, পুঁতে অমনি সবাই ফেলে!"

ওদিক হইতে একটি স্ত্রীলোক ডাকিযা বলে, "ওদের সাথে আবার লাগতে গেলি কেন লা বাতাসি!"

বাতাসি চক্ষের নিমেষে একেবারে কাঁদিয়া ভাসাইয়া দিয়া বলে, "দেখ না মা, লক্ষ্মণদাদার কাছে যেতে চাইলুম তা মাগী গলা টিপে দিলে।"

ছই-এর তলায় স্ত্রীলোকের দল বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইয়া যায়—"ওমা কি ঘেন্না! তোর গলা টিপলে কে লা ছুঁড়ি? আবার বলে কি না মাগী!"

বাতাসি ফুঁপাইতে-ফুঁপাইতে অসংকোচে বলে—"না বলবে না! গলা টিপে দিলে চুপ ক'রে থাকবে!"

"হ্যাঁ গা, ওই কচি মেয়ের গলা টেপা কিসের জন্যে।"—বলিয়া যে-স্ত্রীলোকটি উঠিয়া আসে—শীর্ণ অসুস্থ কুৎসিত মুখে, কোটরপ্রবিষ্ট দুই চোখে, দেহের সমস্ত ভঙ্গিতে তাহার জীবনের কদর্য ইতিহাস অতি স্পষ্টভাবেই লেখা—দেখিলে চিনিতে বিলম্ব হয় না। কাছে আসিয়া বাতাসিকে কোলের কাছে টানিয়া নিয়া সে বলে—"কে, গলা টিপলে কে শুনি।"

বাতাসি অম্লানবদনে দাক্ষায়ণীর দিকে দেখাইয়া দিয়া বলে—"ওই ধুম্সি মাগীটা!"

দাক্ষায়ণীর মুখে পর্যন্ত এই নির্লজ্জ মিথ্যা অভিযোগে খানিকক্ষণ কথা সরে না। তাহার পর নিজেকে অনেক কষ্টে সামলাইয়া লইয়া তিনি কটুকণ্ঠে বলেন—"আমি গলা টিপলে আজ যে ম'রে স্বর্গে যেতিস ছুঁড়ি; সে-ভাগ্যি তোর হবে!"

ঝগড়াটা ইহার পর আরও কত প্রচণ্ড হইয়া উঠিত বলা যায় না, কিন্তু মাঝিরা ইতিমধ্যে আসিয়া মাঝে পড়িয়া বাতাসি ও তাহার মাকে একরকম জোর করিয়াই সরাইয়া লইয়া যায়। দূর হইতে পরস্পরের প্রতি বাক্যবাণ নিক্ষেপ ইহার পর চলিতে থাকে, কিন্তু বিশেষ কিছু কেলেঙ্কারি আর হইতে পারে না।

ডায়মণ্ডহারবার হইতে নৌকা ছাড়িবার পর এমনিতর গোলযোগ কয়দিন ধরিয়াই চলিতেছে। নৌকা ছাড়িবার পর তাহাদের সঙ্গে বেশ্যার দলকে সহ-

যাত্রী করা হইয়াছে জানিতে পারা অবধি দাক্ষায়ণী নৌকায় আর জলগ্রহণ করেন নাই। এখন আর উপায় নাই, নহিলে তিনি বোধ হয় নৌকাও ত্যাগ করিয়া যাইতেন।

এই কয়দিনের ভিতর মাত্র দুইবার চরে নৌকা লাগানো হইলে তিনি ভালো করিয়া স্নান করিয়া সামান্য একটু আহার করিয়াছেন। অধিকাংশ সময়ই তাঁহার নৌকায় নিরম্বু উপবাসে কাটিয়াছে। অন্যান্য ভদ্র যাত্রীরা সকলেই স্ত্রীলোক এবং তাহাদের অধিকাংশই তাঁহার মতো বিধবা। তাহারা তাঁহার মতো অতখানি আত্মসংযম কিন্তু করিতে পারে নাই। গঙ্গাজল ও বৃহৎ কাষ্ঠে দোষ নাই ইত্যাদি বলিয়া নিজের মনকে প্রবোধ দিয়াছে, তাঁহাকেও বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছে ; কিন্তু দাক্ষায়ণীর সংকল্প অটল।

উপবাস তাঁহার একরকম গা-সওয়া হইয়া গিয়াছে, বিশেষ কিছু কাবু তিনি তাহাতে হইয়াছেন এমন মনে হয় না। কষ্ট যেটুকু হইয়াছে 'সেথো' লক্ষ্মণকে গাল পাড়িয়া তিনি সেটুকু একরকম লাঘব করিয়া লইয়াছেন। আজ কিন্তু এত দিন বাদে তাঁহাকে যেন ক্লান্ত দেখায়—ছোটো ওই এক ফোঁটা মেয়ের হাতে অপমানটা তাঁহার বেশি বাজিয়াছে মনে হয়। আর সকলে উত্তেজিত হইয়া ওই কচি মেয়ের শয়তানী বুদ্ধি, তাহার কলঙ্কিত ভবিষ্যৎ ইত্যাদি অনেক কথা লইয়াই আলোচনা করে।

"আঁতুরের গন্ধ গা থেকে যায়নি, মেয়েটার কথা শুনলে গা।!"

"কচি দাঁতে এত বিষ, বড়ো হ'লে ও কত সংসারে আগুন দেবে মা কে জানে!"

"ওই একরত্তি, আমাদের নাতনীর বয়সী মেয়ে—দিনকে একেবারে রাত ক'রে দিলে গা!"

"কে জানে মা, মা-গঙ্গার কি মহিমে! নইলে এত পাপও তিনি সন।"

কিন্তু দাক্ষায়ণী এ-সমস্ত আলোচনায় যোগ দেন না ; এমনকি 'সেথো' লক্ষ্মণকে গাল দিতেও আজ তিনি ভুলিয়া যান।

দুই দিন পরের কথা। শতমুখী পিছনে ফেলিয়া নৌকা ধবলাটের কাছাকাছি আসিয়া নোঙর করিয়াছে। কুয়াশাচ্ছন্ন তিমিরলিপ্ত রাত্রে তীরতট কিছু দেখা যায় না, শুধু নৌকার গায়ে গাঙের স্রোতের মৃদু আঘাতের শব্দ শোনা যায়। আকাশ ও জল অন্ধকারে একাকার হইয়া গিয়াছে ; তাহারই মাঝে শুধু দূরে-দূরে সাগরমুখী চলমান কয়েকটি নৌকার ক্ষীণ আলো দেখিয়া গাঙের সীমা নির্ণয় করা চলে। সংকীর্ণ জায়গায় আর সকলের মতো আড়ষ্ট হইয়া ঘুমাইতে দাক্ষায়ণী পারেন না। একাকী জাগিয়া তিনি ছই-এর ছিদ্রপথে গাঙের কালো জলের দিকে চাহিয়া ছিলেন। হঠাৎ তাঁহার মনে হইল জলের শব্দ যেন ক্রমশ প্রবল হইয়া উঠিতেছে। সন্ধ্যায় নোঙর ফেলিবার সময় মাঝিদের কথাবার্তা তাঁহার কিছু কানে গিয়াছিল—তাহাদের কথাতেই শুনিয়াছিলেন—এখানকার জোয়ার বড়ো প্রবল, তখন নৌকা না সামলাইলে বিপদের সম্ভাবনা।

সহসা তিনি ভীত হইয়া উঠিলেন—এই জোয়ার নয় তো? কিন্তু মাঝিরা সবাই তো ঘুমাইতেছে। যদি কোনো বিপদ ঘটে!

জলের শব্দ ক্রমশ আরও বাড়িয়া উঠিতেছিল।

মাঝিদের ডাকা ডাচত াক না ভাবিতেছেন, এমন সময় ভীষণ শব্দ করিয়া ছোটো নৌকাটি উন্মত্তভাবে দুলিয়া ডাঠল।

জোয়ারের টানে বেহাল হহয়া প্রকাণ্ড এক মহাজনা ভড় ছোটো নৌকাটির উপর আসিয়া পাড়য়াছে।

পলকের মধ্যে ভীত সদ্যসুপ্তোত্থিত মাঝি ও যাত্রীদের চিৎকারে, নৌকার তক্তাগুলির প্রচণ্ড বিদারণ-শব্দে অন্ধকার নদাবক্ষ মুখর হইয়া উঠিল। কোথা দিয়া সেই নিদারুণ মুহূর্তে কি যে হইয়া গেল—দাক্ষায়ণী কিছুক্ষণের জন্য একপ্রকার জ্ঞান হারাইয়া কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। খানিক বাদে জ্ঞান ফিরিয়া আসিলে দেখিতে পাইলেন নদীর হিমশীতল জলে তিনি কেমন করিয়া ভাসিতেছেন। সামনে অস্পষ্টভাবে দেখিতে পাওয়া যাইতেছিল দৈত্যের মতো বৃহদাকার ভড়ের কালো ছায়ামূর্তির সঙ্গে তাঁহাদের নিষ্পেষিত নৌকাটি যেন জড়াইয়া গিয়াছে।

হাল ভাঙিয়া পানিতরাস চৌচির হইয়া সে-নৌকা ডুবিতেছিল।

ছেলেবেলা সাঁতারের অভ্যাস ছিল। দাক্ষায়ণী দেখিলেন এখনও ভাসিয়া থাকিতে তাঁহার কষ্ট হয় না। ভড়ের মাঝিমল্লারা এই বিপদে ছুটাছুটি করিয়া হল্লা করিতেছিল, চিৎকার করিয়া একবার তাহাদের ডাকিলেন, কিন্তু কেহ শুনিতে পাইল বলিয়া মনে হয় না।

প্রৌঢ়বয়সে এই হিমশীতল জলে বেশিক্ষণ ভাসিয়া থাকিতে পারিবেন এমন আশা দাক্ষায়ণীর ছিল না। শুধু তাই নয়, সুন্দরবনের গাঙের কুমিরের কথাও তিনি জানিতেন—ভাসিয়া থাকিলেও কতক্ষণ আর রেহাই পাইবেন!

এমন সময় দৈব খানিকটা কৃপা করিল। ভাঙা নৌকার হালটা সামনে দিয়া ভাসিয়া যাইতেছিল। অন্ধকারে প্রথমটা তাহার কালো মূর্তি দেখিয়া দাক্ষায়ণী ভয়ে চিৎকার করিয়া উঠিলেন ; কিন্তু পরমুহূর্তে বুঝিতে পারিলেন সেটা কাঠ। সবলে সেটিকে আঁকড়াইয়া ধরিলেন।

কিন্তু এটা কি? পুঁটুলির মতো কী একটা জিনিস হাতে ঠেকিতেই তিনি শিহরিয়া উঠিলেন।

পুঁটুলি হইতে অস্ফুট একটা ভীত শব্দও যেন বাহির হইল।

মুখটা একটু কাছে লইয়া গিয়া ভালো করিয়া নজর করিয়া চাহিতেই সব পরিষ্কার হইয়া গেল। ভীত কাতর দুটি চক্ষু মেলিয়া বেশ্যাদের সেই মেয়েটা প্রাণপণে হালের একদিক আঁকড়াইয়া ধরিয়া আছে। এই নিদারুণ মুহূর্তেও তাহাকে স্পর্শ করিয়া ঘৃণায় দাক্ষায়ণীর শরীর কণ্টকিত হইয়া উঠিল। ভড়ের উপরকার মাঝিরা তখন কয়েকটা মশাল জ্বালিয়া বোধ হয় নিমজ্জমান যাত্রীদেরই অনুসন্ধান করিতেছে। তাহার অস্পষ্ট আলোয় সেই অসহায় মেয়েটার মুখ দেখিয়াও বিন্দুমাত্র অনুকম্পা তাঁহার হইল না। বিষাক্ত সরীসৃপশিশুর মতো এ একদিন বড়ো হইয়া সংসারকে পাপের বিষে জর্জর করিয়া তুলিবে এমনি একটা অস্পষ্ট চিন্তায় তাঁহার মন বিজাতীয় ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিল। তাহার অসহায় কান্না, দুর্বল দুটি হাতে প্রাণপণে হালটিকে জড়াইয়া থাকিবার চেষ্টা, এ-সমস্ত কিছুমাত্র গ্রাহ্য না করিয়া সবলে তিনি তাহাকে জলে ঠেলিয়া দিলেন।

মেয়েটা 'মাগো' বলিয়া আর্তনাদ করিয়া উঠিল, খানিকটা ডুবিয়া জল

খাইয়া নাকাল হইয়া ক্ষীণ দুটি বাহু তুলিয়া তাঁহার হাতটা ধরিবার একবার নিষ্ফল চেষ্টা করিল, তাহার পর আবার ডুবিল—মশালের আলোয় ঈষৎ রক্তাভ নদীর কালো জল তাহার শেষ চিৎকারের মাঝখানে যেন সহসা নিস্তব্ধতার যবনিকা টানিয়া দিয়াছে।

কিন্তু মেয়েটার সেই শেষ অর্ধস্ফুট চিৎকারে দাক্ষায়ণীর মনে কি যেন সব ওলটপালট হইয়া গেল। ডুবিবার আগে তাহার সে ভীত সকাতর মুখের মিনতি ভুলিবার নয়। কলঙ্কিত একটা বেশ্যার মেয়ে—শিরায়-শিরায় তাহার পাপের পঙ্কিল রক্ত ; বাঁচিয়া সে শুধু সংসারের পাপের ভারই বাড়াইত না, নিজেরও তাহার দুর্গতির সীমা থাকিত না, এসব ভাবিয়া আর তাঁহার মন প্রবোধ মানিতে চাহিল না। তখনও যেন অস্পষ্টভাবে তাহার কাপড়ের একাংশ জলের উপর ভাসিতে দেখা যাইতেছিল। এখনও হয়তো তোলা যায়। কিন্তু অবশ দেহমনে এই অপেক্ষাকৃত নিরাপদ আশ্রয় ত্যাগ করিয়া যাওয়াও যে সহজ নহে। দারুণ দ্বিধাদ্বন্দ্বের দোলায় দাক্ষায়ণী উন্মত্তের মতো হইয়া উঠিলেন।

হঠাৎ অনতিদূরে মেয়েটার মাথাটা ভাসিয়া উঠিল।

দাক্ষায়ণী ঝাঁপ দিয়া পড়িলেন। কিন্তু জলের ভিতর হাতড়াইয়া কিছু খুঁজিয়া পাইলেন না। এই কয়দিনের উপবাসে দুর্বল বাতগ্রস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ এতক্ষণ শীতল জলে থাকার দরুন ক্রমশ অবশ হইয়া আসিতেছে বুঝিতে পারিতেছিলেন। তবু আর একবার শেষ চেষ্টা করিয়া তিনি চারিদিকে খুঁজিয়া দেখিলেন—হাতের মুঠায় কি যেন একটা ধরিয়াছেনও মনে হইল, কিন্তু তখন তাঁহার সমস্ত শক্তি নিঃশেষ হইয়া গিয়াছে। নাগালের অত্যন্ত কাছে কালো হালের কাঠটা তখনও ভাসিতেছিল, দাক্ষায়ণী হাত বাড়াইয়া সেটা ধরিবার চেষ্ট করিলেন—হাত তাঁহার উঠিল না। মুঠায় যাহা ধরিয়াছিলেন, সেইটাই তাঁহার আড়ষ্ট হাতে জড়াইয়া রহিল।

কিন্তু অপঘাতে মৃত্যু দাক্ষায়ণীর কপালে নাই।

জ্ঞান হইবার সঙ্গে-সঙ্গে তিনি শুনিতে পান নিকটে কাহারা বলিতেছে—"তাইতেই না বলে মায়ের প্রাণ!"

দুর্বল দেহে অবসন্ন মনে কথাটার কোনো তাৎপর্য তিনি বুঝিতে পারেন না, বুঝিবার উৎসাহও তাঁহার থাকে না। সারা দেহে অসীম ক্লান্তি অনুভব করিয়া দাক্ষায়ণী আবার ঝিমাইয়া পড়েন।

কিন্তু সকালবেলা তিনি প্রায় সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়া ওঠেন। সামান্য যেটুকু দুর্বলতা থাকে তাহা এমন কিছু মারাত্মক নয়।

তিনি যেখানে শুইয়া আছেন, সেটা যে কোনো নৌকারই একটা ঘর তাহা বুঝিতে তাঁহার বিলম্ব হয় না। ডান পাশের খুদরি জানালা দিয়া দিগন্তপ্রসারিত জলরাশির উপর প্রভাতসূর্যের আরক্ত জাগরণ প্রথমেই চোখে পড়ে। নৌকার এ-ঘর তাঁহার অপরিচিত। জলে ডুবিয়া মরিতে-মরিতে কোনোরকমে তিনি উদ্ধার পাইয়াছেন, এইটুকুই শুধু বুঝিতে পারেন, কেমন করিয়া এই অপরিচিত নৌকায় স্থান পাইয়াছেন, কে তাঁহাকে উদ্ধার করিয়াছে, কিছুই তাঁহার স্মরণ হয় না।

অপরিচিত এক বৃদ্ধ মাঝি আসিয়া একগাল হাসিয়া বলে—"মা-গঙ্গার খুব

কিরূপা বলতে হবে মাঠাকরুন, নিতে-নিতে ফিরিয়ে দেছেন। আর একটু দেরি হ'লে দু-জনের কাউকে তুলতে পারা যেতনি।"

দেখিতে-দেখিতে আরও কয়েকজন মাঝিমাল্লা দরজার কাছে আসিয়া ভিড় করিয়া দাড়ায়।

একজন বলে, "মেয়েটা যা জল খেয়েছেল, বাঁচবে বলে আর আশা ছেলনি। মাঠাকরুনের খুব পুণ্যি ছেল তাই!"

বৃদ্ধ মাঝি বলে—"যা জম্পেস ক'রে তেনার কাপড়টা ধরেছিলেন মাঠাকরুন, আমি তো পেরথেমে ছাড়াতেই নারলুম।"

আর একজন বলে—"তা জম্পেস ক'রে ধরবেনি? মায়ের প্রাণ তো বটে।"

কে একজন ইতিমধ্যে মেয়েটাকে কোলে করিয়া তুলিয়া আনিয়া একেবারে দাক্ষায়ণীর কোলের কাছে বসাইয়া দিয়া বলে, "নেন মাঠাকরুন, মেয়েকে আপনার একদম চাংগা করে দিচ্ছি।"

দাক্ষায়ণী এতক্ষণ নির্বাক হইয়া ইহাদের কথাবার্তা শুনিতেছিলেন, এই-বার কিন্তু বিস্ময়ের তাঁহার সীমা থাকে না। বেশ্যাদের সেই মেয়েটাকেই তাঁহার কন্যা ভাবিয়া ইহারা তাঁহার কোলের কাছে বসাইয়া দিয়াছে!

মেয়েটা সভয়ে মাথা নিচু করিয়া বসিয়া থাকে। দাক্ষায়ণী শশব্যস্তে উঠিয়া বসিয়া মাঝিদের এই ভ্রান্ত ধারণা দূর করিবার জন্য বলেন—"ও তো আমার মেয়ে নয়।"

মাঝিরা সবাই হাসিয়া ওঠে। বুড়া মাঝিরা হাসিয়া বলে—"ঠিক বলেছেন মাঠাকরুন, ওটা কুড়োনি মেয়ে, গংগার জলে ওটাকে আমরা কুড়িয়ে পেয়েছি —কি, বলিস খুকী!"

খুকী মাথা নোয়াইয়া একেবারে বিছানার সংগে যেন মিশাইয়া যাইতে চায়। দাক্ষায়ণী মাঝিদের কথার ধরনে সহসা ভীত হইয়া ওঠেন. তাড়াতাড়ি উদ্বিগ্ন কণ্ঠে বলেন—"ও যে সত্যি আমার মেয়ে নয়।"

কিন্তু কে সে-কথা শুনিতেছে! তাঁহার মুখের ভাবই বা কে লক্ষ্য করে। বাতাসি তখন বিছানায় মুখ গুঁজিয়া ফুঁপাইয়া-ফুঁপাইয়া কাঁদিতে শুরু করিয়াছে। বুড়া মাঝি তাহাকে হাত ধরিয়া তুলিয়া লইয়া বলে—"আরে এটা কি পাগলী মেয়ে. তামাশা বোঝে না! তুইও বল না কেন, তুমি আমার মা নও!"

দাক্ষায়ণী বিহ্বলভাবে সকলের মুখের দিকে তাকান। ইহাদের এ অদ্ভুত ধারণা কোথা হইতে জন্মিল, কেমন করিয়াই বা এ-ধারণা তিনি দূর করিবেন, কিছুই ভাবিয়া ঠিক করিতে পারেন না।

বাতাসি কাঁদিতে-কাঁদিতে বৃদ্ধ মাঝির হাত ধরিয়া বাহির হইয়া যায়। দাক্ষায়ণী ক্লান্ত মনে আগাগোড়া সমস্ত ব্যাপারটা ভালো করিয়া বুঝিবার চেষ্টায় চোখ বুজিয়া শুইয়া পড়েন।

ধবলাট বেশী দূরে নয়। দুপুর নাগাদ মহাজনী ভড় হইতে মাঝিরা সেখানে তাঁহাদের নামাইয়া দেয়। ইহার পর তাহাদের অন্যদিকে যাইতে হইবে। সুতরাং আর বেশি তাহারা তাঁহাদের লইয়া যাইতে পারিবে না।

বৃদ্ধ মাঝি অত্যন্ত বিনীতভাবে বিদায় লইয়া বলে, "হুকুম নেই মা-ঠাকরুন, নইলে আপনাদের গঙ্গাসাগর অবধি পেঁৗছে দিতুম। তবে ধবলাট

হ'য়ে হামেশা গঙ্গাসাগরে নৌকা যাবে মা—তার একটায় চেপে বসবেন।"

দাক্ষায়ণী অত্যন্ত বিমূঢ়ভাবে ভড়ের উপর হইতে নদীর পাড়ে ফেলা তক্তার উপর দিয়া নামিয়া যান।

বৃদ্ধ মাঝি ডাকিয়া বলে—"মেয়েটার হাতটা ধ'রে নেন মাঠাকরুন, বড়ো পেছল।"

যন্ত্রচালিতের মতো দাক্ষায়ণী বাতাসির হাতটা ধরিয়া তীরে ওঠেন।

এই কয়েক ঘণ্টা সময়ের মধ্যে তাঁহার মনের ভিতর দিয়া যে-ঝড় গিয়াছে তাহাতে বিমূঢ় হওয়া কিছু আশ্চর্যও নয়, মাঝিদের কাছেই খবর পাইয়াছেন যে, তাঁহাদের নৌকার দু-একজন মাল্লা ছাড়া আর কেহই বোধ হয় রক্ষা পায় নাই। তাঁহার একই গ্রাম হইতে তাঁহার যেসব সঙ্গী-সাথী আসিয়াছিল তাহারা সবাই নৌকার মাঝে বন্দী হইয়া অতি শোচনীয়ভাবে ডুবিয়া মরিয়াছে। অনেক চেষ্টা করিয়াও তাঁহাদের দুজনকে ছাড়া আর কাহাকেও তাহারা রক্ষা করিতে পারে নাই। তাঁহাদের দু-জনের যে মা ও মেয়ের সম্বন্ধ, এই ভুল তাহাদের আরও কয়েকবার চেষ্টা করিয়াও ভাঙা সম্ভব হয় নাই, তাহারা তাঁহাকে ভাঙা হালের উপর হইতে মেয়েকে তুলিবার জন্য জলে ঝাঁপাইয়া পড়িতে দেখিয়াছে, এবং সন্তানের জন্য ছাড়া মানুষ এমন কাজ করিতে পারে, এ-কথা তাহারা বিশ্বাস করে কেমন করিয়া! বৃদ্ধ মাঝি হাসিয়া বলিয়াছে—"নাড়ীর টান বড়ো টান মাঠাকরুন, ও কি আর লুকোবার জো আছে।"

মহাজনী ভড়-এর মাঝিরা পাটা তুলিয়া ধীরে-ধীরে আবার নৌকা ছাড়িয়া দেয়। সে-নৌকা দূরে অদৃশ্য হওয়ার পরেও অনেকক্ষণ পর্যন্ত দাক্ষায়ণী বিমনা হইয়া বাতাসির হাত ধরিয়া তীরে দাঁড়াইয়া থাকেন। তারপর সহসা সচেতন হইয়া সজোরে মেয়েটার হাত তিনি দূরে ছুঁড়িয়া দেন। তাঁহার গঙ্গা-সাগর যাত্রার পথের সমস্ত দুর্ঘটনার দরুন ক্ষোভ ও রাগ এই মেয়েটার উপর গিয়া পড়ে। তাহার মুখের দিকে চাহিতে পর্যন্ত তিনি পারেন না।

বাতাসিকে সম্পূর্ণরূপে অবহেলা করিয়া নিজের দুশ্চিন্তায় তন্ময় হইয়াই তিনি আগাইয়া চলিতে থাকেন। দুশ্চিন্তা তাঁহার বড়ো কম নয়। কোমরের থলেতে বাঁধা পাথেয়র টাকা তাঁহার জলে ডুবিয়াও খোয়া যায় নাই সত্য, কিন্তু হাজার শক্ত হইলেও অপরিচিত স্থানে একা মেয়েমানুষ হইয়া, গঙ্গাসাগর দূরের কথা, দেশে ফিরিবার ব্যবস্থাই কেমন করিয়া করিবেন তাহা ভাবিয়া দাক্ষায়ণী আর কূল পান না।

সামনে কতকগুলি বড়ো-বড়ো আটচালার চারিপাশে অনেকগুলি লোক জড়ো হইয়াছে দেখিতে পাওয়া যায়। তাহাদেরই অনুনয়-বিনয় করিয়া একটা কিছু ব্যবস্থা করিতে হইবে ভাবিয়া দাক্ষায়ণী চলিতে থাকেন। হঠাৎ করিয়া একটা শব্দ শুনিয়া তাঁহাকে দাঁড়াইয়া পড়িতে হয়। মেয়েটা এতক্ষণ বুঝি তাঁহার পিছু-পিছুই আসিতেছিল, মাঝে একটা মাটির ঢিপিতে হোঁচট খাইয়া পড়িয়া গিয়াছে।

অত্যন্ত কটুকণ্ঠে তাহাকে ভর্ৎসনা করিতে গিয়া দাক্ষায়ণী সহসা চুপ করিয়া যান। পড়িবার সঙ্গে-সঙ্গে ধারালো একটা খোলামকুচিতে লাগিয়া মেয়েটার পা কাটিয়া একেবারে ফুঁজিয়া রক্ত বাহির হইতেছে। ইহার পর তাহাকে ধরিয়া তুলিতেই হয়। মেয়েটা অশ্রুসিক্ত ভীত মুখটা নিচু করিয়া

অতিকষ্টে উঠিয়া দাঁড়ায়। মাত্র দু-দিন আগে সে ডুবিয়া মরিতে-মরিতে রক্ষা পাইয়াছে। ছোটো মেয়ে, শরীর তাহার এখনও অত্যন্ত দুর্বল। হাত ধরিয়া তুলিয়া দাক্ষায়ণী দেখিতে পান পা দুটি তাহার ঠকঠক করিয়া কাঁপিতেছে!

উদ্বিগ্নভাবে জিজ্ঞাসা করেন—"হাঁটতে পারবে না?"

যতই দোষই থাক, মেয়েটি নির্বোধ নয়। এই অল্প সময়ের মধ্যে তাহার একান্ত নিঃসহায় অবস্থাটা তাহার সামান্য বুদ্ধিতে যতখানি সম্ভব সে ভালো করিয়াই বুঝিয়াছে। ভদ্রঘরের স্ত্রীলোকদের সহিত তাহার পরিচিত মেয়েদের তফাত যে কত তাহাও সে কিছু-কিছু জানে। দুই দিন আগে যাঁহাকে সে অপমান করিয়াছে, আজ তাঁহারই অনুকম্পা তাহার একমাত্র সম্বল, এইটুকু যত অস্পষ্টভাবেই হউক বুঝিয়া সে তাঁহাকে বিব্রত করিতে ভয় পায়।

ধরা-গলায় মাথা নিচু করিয়া সে জানায় যে হাঁটিতে পারিবে, কিন্তু খোঁড়াইয়া-খোঁড়াইয়া দুই পা যাইতে না যাইতেই দুর্বলতায় মাথা ঘুরিয়া টলিয়া পড়ে। দাক্ষায়ণী তাড়াতাড়ি তাহাকে ধরিয়া ফেলেন।

এইবার তাহাকে কোলে করিয়া লইয়া যাওয়া ছাড়া আর উপায় নাই, কিন্তু দাক্ষায়ণীর চিরজীবনের সংস্কারে এই অশুচি মেয়েটাকে অমন করিয়া বহিয়া লইয়া যাইতে অত্যন্ত বাধে। মেয়েটার পা কাটিয়া রক্ত পড়িতে দেখিয়া যেটুকু মায়া তাঁহার হইয়াছিল, তাহাকে কোলে করিয়া লইয়া যাইতে হওয়ার সম্ভাবনায় সেটুকু একেবারে উবিয়া গিয়া শুধু বিতৃষ্ণাতেই তাহার মন তিক্ত হইয়া ওঠে। মনে হয়, মেয়েটা ছেনালি করিয়া অজ্ঞান হইবার ভান যে করে নাই, তাই বা কে বলিতে পারে। অত্যন্ত রূঢ়ভাবে তাহাকে নাড়া দিয়া তিনি সচেতন করিবার চেষ্টা করেন। কিন্তু বাতাসির সত্যিই তখন জ্ঞান নাই। সে তাঁহার গায়ে লতাইয়া পড়ে। অগত্যা দাক্ষায়ণীকে কোলে লইতেই হয : এবং প্রত্যেক পদবিক্ষেপে জীবনের কোন অজ্ঞাত অপরাধে এই শাস্তি তাঁহাকে ভোগ করিতে হইতেছে, তাহাই বোধ হয় বিধাতার কাছে তিনি প্রশ্ন করেন। দূর হইতে তাঁহাদের বিপদ দেখিয়া দুই-একটা লোক আপনা হইতেই আগাইয়া আসে। দাক্ষায়ণী সংক্ষেপে তাহাদের কাছে নৌকাডুবির কথা জানাইয়া সহায়তা প্রার্থনা করেন। বাতাসি সম্বন্ধে কোনো উচ্চবাচ্যই করেন না, করা যে নিষ্ফল এটুকু তিনি এতক্ষণে বুঝিয়াছেন। হাতে-হাতে প্রমাণও পাওয়া যায়।

মেয়েটাকে তাঁহার কোল হইতে তুলিয়া লইয়া একজন বলে—"তবু ভগবানের দয়া বলতে হবে বাপু, মা-মেয়ের একজনকে রেখে আরেকজনকে নেননি। কি সর্বনাশই তা হ'লে হ'ত!"

সে-রাত্রের মতো গঞ্জের এক ব্যাপারীর ঘরে তাঁহাদের আশ্রয় মিলিল। ঠিক হইল, পরদিন সাগরগামী কোনো নৌকায় তাঁহাদের তুলিয়া দেওয়া হইবে।

পৌষ মাসের শীত। গরম কাপড় যাহা ছিল, নৌকার সঙ্গেই সমস্ত ডুবিয়াছে। ব্যাপারীরা দয়া করিয়া একটা পাতিবার কাঁথা ও একটা কম্বল যোগাড় করিয়া দিয়াছে—মায়ে-ঝিয়ে কোনোরকমে তাহাতে রাত কাটাইতে পারিবে ইহাই তাহাদের ধারণা।

হোগলায় ছাওয়া নাতিবৃহৎ মাটির ঘর এক কোণের মৃদু একটি কেরোসিনের বাতির শিখায় ভালো করিয়া আলোকিত হয় নাই। তাহারই একধারে জড়সড় হইয়া বসিয়া বাতাসি শীতে কাঁপিতেছিল। দুর্বল শরীরে ঘুম তাহার

অনেকক্ষণ হইতেই পাইয়াছে ; কিন্তু হোঁচট খাইয়া অজ্ঞান হইবার পর প্রথম চোখ খুলিয়া দাক্ষায়ণীর মুখের যে-চেহারা সে দেখিয়াছে, তাহার পর তাঁহার সামনে এতটুকু নড়িয়া বসিবার সাহসও তাহার নাই। লোলুপ দৃষ্টিতে উষ্ণ কম্বলটার দিকে তাকাইয়া সে তাই সভয়ে চুপ করিয়াই বসিয়াই ছিল।

শীত দাক্ষায়ণীরও করিতেছিল ; কিন্তু কম্বল গায়ে দিতে গেলে মেয়েটাকেও ডাকিতে হয় ; এবং সমস্ত রাত ওই অপবিত্র মেয়েটার সঙ্গে শুইবার কল্পনায় তাঁহার মন কিছুতেই সায় দিতে পারিতেছিল না। অবশেষে নিরুপায় হইয়া অত্যন্ত শুষ্ককণ্ঠে তিনি বাতাসিকে ডাকিয়া বলিলেন—"ব'সে-ব'সে কাঁপবাব কি দরকার! এসে শোও না!"

এ-আদেশের ভিতর মমতার লেশমাত্র নাই, এটুকু বাতাসির পক্ষে বোঝা বিশেষ কঠিন নয় ; তবু সসংকোচে সরিয়া আসিয়া বিছানার একপ্রান্তে কম্বলের এক অংশ মাত্র গায়ে দিয়া সে শুইয়া পড়িল।

দাক্ষায়ণী তাহার গায়ের উপর কম্বলের অন্য দিকটা ছুঁড়িয়া দিয়া তিক্তকণ্ঠে বলিলেন—"আবার অত ঢং কেন? ও-কম্বল আমি ছোঁব না। ভালো ক'রে গায়ে দাও।"

বাতাসি কম্বলটা আর একটু টানিয়া লইল, কিন্তু ভালো করিয়া গায়ে দিতে পারিল না।

বাহিরের শীত ও নিজের মনের সহিত সংগ্রাম করিয়া দাক্ষায়ণী আরও অনেকক্ষণ জাগিয়া কাটাইলেন—বাতাসি ততক্ষণে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত বিছানার এক পাশে বাতাসির কাছ হইতে সযত্নে যথাসম্ভব দূরত্ব রক্ষা করিয়া তাঁহাকে শুইতে হইল। কম্বলের একপ্রান্ত গায়ে দিয়া মনে-মনে গঙ্গাসাগরে গিয়া স্নান করিয়া এই অশুচিতা দূর করিবেন ইহাই তিনি স্থির করিলেন।

তারপর কখন তিনি ঘুমাইয়া পড়িয়াছেন—মনে নাই। ভোর-রাত্রে হঠাৎ জাগিয়া উঠিয়া তাঁহার বিস্ময়ের আর সীমা রহিল না।

বাতাসি কখন ঘুমের ঘোরে সরিয়া একেবারে তাঁহার বুকের কাছটিতে ঘেঁষিয়া আসিয়া শুইয়াছে—তাহার একটি হাত তাঁহার কণ্ঠে শিথিলভাবে লগ্ন।

কেরাসিনের ডিবিয়াটা তখনও তেমনি জ্বলিতেছে। তাহার রক্তিম আলোয় মেয়েটার দিকে চাহিয়া, ওই কোমল মুখ হইতে সেদিন কি করিয়া অমন কুৎসিত কথা বাহির হইয়াছিল, কিছুতেই তিনি ভাবিয়া পাইলেন না। সে-মুখে সংসারের ভাবী সর্বনাশিনীর কোনো আভাসই নাই।

তবু বহুদিনের সংস্কারে শরীরটা তাঁহার কেমন যেন সংকুচিত হইয়া উঠিতেছিল ; কিন্তু কণ্ঠলগ্ন শীর্ণ শুভ্র হাতখানা সরাইতে গিয়াও সরাইতে কেন জানি না পারিলেন না।

সকালে ঘুম ভাঙার পর দাক্ষায়ণীর ব্যবহারে বাতাসি একেবারে আশ্চর্য হইয়া গেল। ঘুমন্ত চোখ খুলিয়া প্রথমেই তাহার নজরে পড়িল কম্বলটি তাহার গায়ে বেশ ভালো করিয়া জড়ানো। দাক্ষায়ণী ঘরের দরজার কাছে দাঁড়াইয়া কি যেন করিতেছেন।

হয়তো সারারাত্রিই সে কম্বল ও বিছানা দখল করিয়া ছিল—দাক্ষায়ণীকে হয়তো সারারাত্রিই এই শীতে জাগিয়া কাটাইতে হইয়াছে ভাবিয়া সে ভয়ে-ভয়ে ধড়মড় করিয়া উঠিতে যাইতেছিল। দাক্ষায়ণী হাত নাড়িয়া তাহাকে উঠিতে নিষেধ করিয়া বলিলেন—"থাক, থাক! সকালের এই হিমে উঠে কাজ নেই। হাড় একেবারে কালিয়ে দিচ্ছে।"

তাহার পর খানিক চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন, "তুমি শুয়ে থাকো, আমি এক্ষুনি আসছি, কিছু ভয় নেই।"

বাতাসি সবিস্ময়ে আবার শুইয়া পড়িল। দাক্ষায়ণীর স্বরে অপ্রত্যাশিত যে-স্নেহের আভাসটুকু ছিল, তাহাতেই অকারণে বাতাসির কান্না যেন নূতন করিয়া উছলিয়া উঠিল। বালিশের ভিতর মুখ গুঁজিয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া চেষ্টা করিয়াও সে অশ্রুরোধ করিতে পারিল না।

দাক্ষায়ণী খানিক বাদেই ফিরিয়া আসিলেন। দেখা গেল কোথা হইতে ইহারই মধ্যে কোঁচড়ে ভরিয়া মুড়ি ও গোটাকয়েক মোয়া তিনি সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছেন।

হাসিয়া বলিলেন, "খুব ক্ষিদে পেয়েছে—না? নে—তাড়াতাড়ি এবার মুখটা ধুয়ে আয় দিকি!"

তারপর দরজার কাছে গিয়া সামনের উঁচু পাড়-দেওয়া পুকুরটা দেখাইয়া বলিলেন,—"ওই যে সামনের পুকুর! একলা যেতে পারবি তো! না—আমি যাব সঙ্গে?"

মৃদুস্বরে "পারব" বলিয়া বাতাসি চলিয়া গেল।

দাক্ষায়ণী পিছন হইতে আর একবার সাবধান করিয়া বলিলেন—"খুব সাবধানে নামিস—ভারি পেছল কিন্তু!"

দুপুরবেলা সাগর যাইবার নৌকা পাওয়া গেল। দাক্ষায়ণী ইতিমধ্যে গাঙের জলে ভালো করিয়া স্নান করিয়া মেটে হাঁড়িতে সামান্য ভাত ডাল ফুটাইয়া বাতাসিকে খাওয়াইয়া নিজেও কিছু খাইয়া লইয়াছেন। রান্নার ব্যাপারে বাতাসির সাহায্য তিনি কিছু গ্রহণ করেন নাই; কিন্তু আগাগোড়া দুইজনের মধ্যে অত্যন্ত সহজে অনেক আলাপ-আলোচনা হইয়া গিয়াছে।

তাঁহার ব্যবহারে সাহস পাইয়া বাতাসি মুখ খুলিতে দ্বিধা করে নাই। রান্নার জায়গা হইতে একটু দূরে বসিয়া আগাগোড়া সে নিজে হইতে অনেক কথাই কহিয়াছে—ঝাল সে মোটে খাইতে পারে না, যে-লঙ্কাগুলি ছোটো হয় সেগুলির ঝাল বেশি ইত্যাদি—

দাক্ষায়ণী একটু ঠাট্টা করিয়া বলিয়াছেন, "যেমন তুই!"

ইঙ্গিতটা বুঝিতে পারিয়া সলজ্জভাবে হাসিয়া বাতাসি মুখ নিচু করিয়াছে।

তারপর একটু দূরে-দূরে কলাপাতা করিয়া খাইতে বসিযাও তাহাদের কম কথা হয় নাই।

দাক্ষায়ণী স্নান করার পর ভিজা কাপড়েই রান্না করিয়া খাইতে বসিয়াছিলেন।

বাতাসি জিজ্ঞাসা করিয়াছে, "ভিজে কাপড়ে শীত করছে না?"

দাক্ষায়ণী একটু হাসিয়া বলিয়াছেন, "শীত করলে আর কি করছি বল!

তুই তো একটা কাপড় দিবি না।"

বাতাসি বলিল, "আমার কাপড় যে সব ডুবে গেছে।"

"তা না হ'লে দিতিস—কেমন?"

বাতাসি লজ্জায় আর কিছু বলিতে পারে নাই। খানিক বাদে কিন্তু, তাহার ভালো ডুরে কাপড়টা পরিয়া থাকিলে যে তাহা হারাইত না, ঘরে তাহার যে সত্যকার সিল্কের একটা কাপড় আছে, ইত্যাদি অনেক কথাই সে গল্প করিয়াছে।

এই গল্পের সম্পর্কে বাতাসির জীবনের আবেষ্টনের কথা বারে-বারে স্মরণ হওয়ায় দাক্ষায়ণী একটু অস্বস্তি অনুভব করিয়াছেন সত্য, কিন্তু বাতাসির উপর আগেকার বিরাগ তাঁহার কখন দূর হইয়া গিয়াছে তিনি জানিতেও পারেন নাই।

কিন্তু এত মসৃণভাবে এই দুটি কক্ষভ্রষ্ট প্রাণীর সম্বন্ধ বেশিক্ষণ গড়িয়া উঠিতে পারে না।

দাক্ষায়ণীর ব্যবহারে ভরসা পাইয়া বাতাসির ভয় ও আড়ষ্টতা ক্রমশ দূর হইয়া আসিতেছিল।

সাগরে যাইবার নৌকায় উঠিবার সময় হঠাৎ সে মুখ বাঁকাইয়া ঘাড় দোলাইয়া তাহার বয়সের পক্ষে অত্যন্ত বিসদৃশ এক অদ্ভুত ভঙ্গি করিয়া বলিয়া উঠিল—"আর নৌকোয় উঠতে পারিনে বাবা! জল যেন আমার দুচক্ষের বিষ! বলে, আর জলে যাব না সই..."

কিন্তু ওই পর্যন্ত বলিয়াই দাক্ষায়ণীর মুখের পানে চাহিয়া তাহার মুখের কথা আটকাইয়া গেল—ভয়ে তাহার মুখ শুকাইয়া উঠিল।

দেখা গেল দাক্ষায়ণীর মুখ এক মুহূর্তে অত্যন্ত কঠিন হইয়া উঠিয়াছে। বারেক ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া হনহন করিয়া তিনি সোজা নৌকার উপর উঠিয়া গেলেন—বাতাসি উঠিতেছে কি না একবার ফিরিয়াও দেখিলেন না।

নিজেকেই তিনি বোধ হয় মনে-মনে ধিক্কার দিতেছিলেন। কেউটের ছানার আসল রূপ সমস্ত আবরণের তলা হইতে সহসা প্রকাশ হইয়া থাকে, আশ্চর্য হইবার কিছু নাই। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, তিনি সব জানিয়া শুনিয়া এ-মেয়েটির শুধু মুখখানি দেখিয়া খানিকক্ষণ এমন আত্মবিস্মৃত হইয়াছিলেন কেমন করিয়া!

দাক্ষায়ণীর সমস্ত শরীর মেয়েটার কদর্যভঙ্গি স্মরণ করিয়া রিরি করিতেছিল। দেহে ও মনে তাহার কত দিনের কত মানুষের পাপের ক্লেদ যে সঞ্চিত হইয়া আছে, কে জানে! আর তিনি খানিকটা আগে ইহারই সঙ্গে কিনা হাসিয়া কথা কহিয়াছেন। সত্য কথা বলিতে কি, একটু মায়াই তাঁহার মেয়েটার উপর পড়িতে শুরু হইয়াছিল।

তাঁহার পবিত্র পিতৃ ও শ্বশুরকুল স্মরণ করিয়া দাক্ষায়ণী মনে-মনে সকলের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। গঙ্গাসাগরে নামিয়াই এই মেয়েটির সঙ্গে সম্পর্ক ছেদনের একটা ব্যবস্থা করিবেন, ইহাও তিনি মনে-মনে প্রতিজ্ঞা করিতে ভুলিলেন না।

অত্যন্ত হতাশ মনমরাভাবে বাতাসি তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য আশে-পাশে ঘুরিয়া ফিরিতেছিল—চোখ দুইটা তাহার জলে ছলছল করিতেছে।

কিন্তু দাক্ষায়ণী দেখিয়াও তাহাকে দেখিলেন না।

বাতাসি তাহার সামান্য বুদ্ধিতে চেষ্টার ত্রুটি করিল না। বড়ো মহাজনী নৌকো—মাঝিমাল্লা ও তাঁহারা দুইজন ছাড়া যাত্রী একটাও নাই—গঙ্গাসাগরে দোকান খুলিবার জন্য তাহারা নৌকা-বোঝাই মাটির খেলনা পুতুল ইত্যাদি লইয়া চলিয়াছে।

শুধু দাক্ষায়ণীকে কথা কহাইবার জন্যই অত্যন্ত সংকুচিতভাবে সে একবার সেই পুতুলগুলির দিকে চাহিয়া বলিল—"আমার ওইরকম একটা টিয়াপাখি আছে—ওর চেয়েও বড়ো!"

কিন্তু দাক্ষায়ণী যেমন চোখ বুজিয়া শুইয়া ছিলেন, তেমনিই রহিলেন—ঘুমাইতেছেন কি জাগিয়া আছেন বোঝা গেল না।

বাতাসি আর একবার সভয়ে বলিল, "এ-নৌকোটা খুব বড়ো! বড়ো নৌকো ডোবে না—না?"

দাক্ষায়ণী তেমনি নিরুত্তর।

বাতাসি আর একবার হতাশভাবে শেষ চেষ্টা করিয়া বলিল—"আমি খুব ভালো পা টিপতে পারি!"

কিন্তু পায়ে হাত দিতেই পা-টা সরাইয়া লইয়া দাক্ষায়ণী গম্ভীরভাবে বলিলেন—"থাক!"

অপরাধীর মতো সসংকোচে হাতটা সরাইয়া লইয়া বাতাসি বিষণ্ণমুখে চুপ করিয়া বসিয়া রহিল—দাক্ষায়ণীর প্রসন্নতা ফিরাইয়া আনিবার জন্য আর কি করা যায় কিছুই সে ভাবিয়া পাইল না।

চাপা-কান্নায় গলার কাছটায় কি একটা জমাট বাঁধিয়া তাহার নিশ্বাস যেন রোধ হইয়া আসিতেছিল। ভালো করিয়া কাঁদিতে পারিলে বুঝি তাহার খানিকটা তৃপ্তি হইত, কিন্তু সে-সাহস তাহার হইল না। শুধু দুটি গাল বাহিয়া নীরবে অজস্রধারে যে-অশ্রু গড়াইয়া পড়িতেছিল, তাহা সে কোনোমতেই নিবারণ করিতে পারিল না।

ধবলাট হইতে গঙ্গাসাগর বেশি দূরে নয়। পালে ভালো হাওয়া পাইয়া তাহাদের নৌকা খুব তাড়াতাড়িই চলিয়া আসিয়াছে। এখন বারদরিয়ার সামান্য একটু অংশ পার হইলেই হয়। কিন্তু এত দূর এমন নির্ঝঞ্ঝাটে আসিবার পর এইখানেই এমন বিপদ ছিল তাহা দাক্ষায়ণী জানিতেন না।

নৌকায় উঠিবার পর অনেকক্ষণ তিনি চুপ করিয়া শুইয়া ছিলেন। তাহার পর বাধ্য হইয়াই তাঁহাকে উঠিয়া মাঝিদের কাছে গঙ্গাসাগরে থাকার ব্যবস্থা ইত্যাদি সম্বন্ধে জিজ্ঞাসাবাদ করিতে হইয়াছে। সঙ্গের সাথী কেহ নাই—একাই তাঁহাকে সব-কিছু করিতে হইবে। নিজে একলা হইলেও যা হোক ভাবনা ছিল না; সঙ্গে আবার এই মেয়েটা জুটিয়াছে—দাক্ষায়ণীর একটু দুর্ভাবনা হওয়া স্বাভাবিক।

মেয়েটা এতক্ষণ ধরিয়া বরাবর তাঁহার পিছু-পিছু ঘুরিয়াছে: কিন্তু ইচ্ছা করিয়াই তিনি তাহার দিকে দৃষ্টি দেন নাই।

কিছুক্ষণ হইতে নৌকা একটু দুলিতেছিল। আপাতত নৌকার কামরার বাহিরে আসিয়া তাহারই কারণ তিনি মাঝিদের জিজ্ঞাসা করিতে যাইতেছিলেন, হঠাৎ তাঁহার পায়ের তলা হইতে নৌকাটা যেন মনে হইল সবেগে

সারিয়া যাইতেছে। বাতাসি "মাগো" বলিয়া চিৎকার করিয়া পিছন হইতে তাঁহাকে জড়াইয়া ধরিল। তাহাকে সামনে টানিয়া বুকের কাছে তুলিয়া ভীত পাংশু মুখে তিনি চিৎকার করিয়া উঠিলেন। তাঁহার নিশ্চিন্ত ধারণা হইল —নৌকা আবার ডুবিতেছে।

মাঝিরা আসিয়া ধরিয়া না ফেলিলে আতঙ্কে তিনি কি যে করিয়া ফেলিতেন বলা যায় না। তাহারা একরকম জোর করিয়াই তাঁহাদের নৌকার কামরায় প্রবেশ করাইয়া দিয়া জানাইল যে, ভয় করিবার ইহাতে কিছুই নাই —সাগরের ঢেউ লাগিয়া নৌকা খানিকটা এইরূপ করিবেই।

কিন্তু দাক্ষায়ণী আশ্বস্ত হইতে পারিলেন না। মেয়েটাকে বুকে চাপিয়া ধরিয়া শঙ্কিত কণ্ঠে অত্যন্ত অবোধের মতো বলিলেন—"আমাদের না-হয় কোথাও নামিয়ে দাও বাবা! আমরা না-হয় হেঁটেই যাব।"

এখানে যে চারিধারে জল ছাড়া নামিবার কোথাও স্থান নাই, এবং থাকলেও সেই জনহীন শ্বাপদসংকুল জঙ্গলে নামার অর্থ যে নিশ্চিত মৃত্যু, এ-কথা মাঝিরা তাঁহাকে কিছুতেই বুঝাইয়া উঠিতে পারিল না। প্রত্যেক ঢেউ-এর দোলার সঙ্গে নিতান্ত নির্বোধের মতোই তিনি জেদ করিতে লাগিলেন—"আমার কাছে যা আছে সব নাও বাবা, আমাদের নামিয়ে দাও। জঙ্গল হোক যা হোক, শক্ত মাটি তো বটে—আমরা যা হোক ক'রে হেঁটে পেরিয়ে যাব!"

অবশেষে কোনোমতে বুঝাইতে না পারিয়া মাঝিরা বিরক্ত হইয়া তাহাদের কাজে চলিয়া গেল।

প্রতি মুহূর্তে মৃত্যু আশংকা করিয়া দাক্ষায়ণী পাংশুমুখে সেই ঘরে কাঠ হইয়া বসিয়া রহিলেন। শুধু বাতাসিকে বুক হইতে নামাইবার কথা বুঝি তাঁহার মনেই ছিল না।

গঙ্গাসাগরে শেষ পর্যন্ত তাঁহারা নিরাপদেই পৌঁছিয়াছেন। যাত্রীদের থাকিবার উপযোগী বালির উপরে হোগলার একটা ঘরও ভাড়া মিলিয়াছে। স্বেচ্ছাসেবক ও পুলিসের ব্যবস্থা ভালো ; দাক্ষায়ণীকে কোনো ব্যাপার লইয়া একলা হইলেও বিশেষ বিপদে পড়িতে হয় নাই। কিন্তু প্রত্যেক দিন শেষ হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে দাক্ষায়ণীর দুশ্চিন্তা বাড়িয়াই চলিয়াছে।

বাতাসিকে লইয়া কি করিবেন ভাবিয়া তিনি আর কূল-কিনারা পান না। মেয়েটা কয়েকদিনে যেন একেবারে নবজন্ম লাভ করিয়াছে। কে জানে আগেকার জীবনের সঙ্গে সম্বন্ধ তাহার গভীর হয়তো ছিল না! যেরকম সহজে সে সমস্ত বিস্মৃত হইয়া নূতন অবস্থার সঙ্গে নিজেকে মানাইয়া লইয়াছে, তাহাতে সেই কথাই মনে হওয়া স্বাভাবিক।

কে বলিবে দাক্ষায়ণীর সঙ্গে চিরদিনের সম্পর্ক তাহার নয়!

কখন হইতে যে বাতাসি তাঁহাকে মা বলিয়া ডাকিতে শুরু করিয়াছে তাহা দাক্ষায়ণীর স্মরণ হয় না ; কিন্তু কেন বলা যায় না—এ-ডাক তাঁহার কোথাও আর বেঁধে না।

তাঁহার আগেই ভোর-রাত্রে বাতাসি জাগিয়া উঠিয়া তাঁহাকে ডাকে— "বাঃ—এখনো ঘুমচ্ছ! আজ সেই যে সূর্যি ওঠবার আগে কি করতে হয় বলে-

ছিলে না?" তাহার পর দাক্ষায়ণীর সাড়া না পাইয়া আর একবার নাড়া দিয়া বলে—"ও মা, শুনছ?"

দাক্ষায়ণী পাশ ফিরিয়া শুইয়া বলেন—"তুই কি পাগল!—এখনো সূর্য ওঠবার অনেক দেরি— নে শো!"

তাহার পর একসময়ে তাহার গায়ে হাত দিয়া চমকাইয়া উঠিয়া বলেন—"ওমা, শিশিরে যে একেবারে ভিজে গেছে কম্বলটা। দেখি—গা ভেজেনি তো।"

"না গো না, গা ভিজবে কেন, নিচে আবার একটা চট দিয়ে দিলে না শোবার আগে।"

দাক্ষায়ণী আশ্বস্ত হইয়া বলেন—"নে তা হ'লে শুয়ে পড়।"

বাতাসির কিন্তু আর শুইবার ইচ্ছা নাই। ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বলে—"বাবা, ওই বিশমুনি কম্বল আর চট গায়ে দিয়ে শুতে পারি না! ওই তো সবাই উঠে পড়েছে, ওঠো না তুমি।"

শীতের ভিতর সহজে কম্বল ত্যাগ করিতে দাক্ষায়ণীর ইচ্ছা হয় না—চোখ বুঁজিয়াই বলেন—"বৃষ্টি পড়ছে শুনতে পাচ্ছিস না। ধরুক বৃষ্টি একটু।"

বাতাসি বলে—"আহা, ও বুঝি বৃষ্টি, চাল থেকে শিশিরের জল পড়ছে তো!"

ব্যাপারটা সত্যই তাই ; হোগলার বেড়া-দেওয়া যাত্রীঘরগুলির চালও হোগলা দিয়া যেমন-তেমন করিয়া ছাওয়া। শীতের সারারাত্রির শিশিরে তাহা একেবারে ভিজিয়া গিয়াছে। সেই চাল ভেদ করিয়াই শিশিরের জল চারিধারে বালির উপর টপটপ করিয়া পড়িতে থাকে! অগত্যা দাক্ষায়ণীকে উঠিতেই হয়। বলেন—"গঙ্গাসাগরের সব পুণ্যি তুই একাই ক'রে নিয়ে যাবি দেখছি!"

বাতাসি সলজ্জ হাসিয়া বলে—"আহা।"

গঙ্গাসাগরের থাকিবার দিন ক্রমশঃ ফুরাইয়া আসিতেছে—দুই-একদিন দেরি করিলেও দেশে শীঘ্রই ফিরিতে হইবে। বাতাসিকে লইয়া তখন কি করিবেন, দাক্ষায়ণী কিছুই ঠিক করিয়া উঠিতে পারেন না।

যত আপনারই সে হইয়া উঠুক—তাহার প্রতি মায়া যে বেশ খানিকটা পড়িয়াছে ইহা অসংকোচে নিজের মনে স্বীকার করিতে বাধা না থাকুক—তাহাকে যে সঙ্গে করিয়া দেশে লইয়া যাওয়া যায় না, এ-কথা দাক্ষায়ণী ভালো করিয়াই জানেন।

মিথ্যা তিনি বলিতে পারিবেন না। পরিচয় গোপন করিয়া ইহাকে সঙ্গে লইয়া গিয়া তাঁহার শ্বশুরকুলের অপমান করা তাঁহার পক্ষে অসম্ভব। লোকে যদি কিছু সন্দেহ নাও করে, তবু জানিয়া শুনিয়া তাঁহাদের পবিত্র পরিবারে এই কলঙ্কিত-জন্মা মেয়েটিকে তিনি কেমন করিয়া স্থান দিবেন!

বাতাসিকে ছাড়িতেই হইবে ; কিন্তু কেমন করিয়া? এরকম অনাথ ছেলে-মেয়ের ভার কাহারা লয় কিছুই তাঁহার জানা নাই। জানা থাকিলেও, সেখানে বাতাসির অনিষ্ট হইবে না, এ-কথা তাঁহার বোধ হয় বিশ্বাস হইত না।

দুর্ভাবনায় দাক্ষায়ণীর সময়-সময় মাথার ঠিক থাকে না।

বাতাসি কথা কহিয়া জবাব পায় না।

দাক্ষায়ণী হঠাৎ হয়তো রুক্ষ স্বরে বলেন—"জ্বালাতন করিসনি, ভালো

লাগে না বাপু! দু-দণ্ড সোয়াস্তি পাবার উপায় নেই, আচ্ছা ফ্যাসাদে পড়েছি তোকে নিয়ে।”

বাতাসি নীরব হইয়া যায়, শুধু চোখ দুইটা তাহার অল্পেই সজল হইয়া আসে।

খানিক বাদে কি ভাবিয়া তাহার হাতটা ধরিয়া দাক্ষায়ণী আবার বাহির হইয়া পড়েন। এটা-সেটা দেখাইয়া নানান গল্প করিয়া আবার বাতাসির মুখে হাসি ফুটাইতে তাহার দেরি লাগে না।

এক-এক সময় তাঁহার মনে হয়, বাতাসির জন্য এত ভাবিবার দায়ই বা তাঁহার কিসের? কোথাকার কলুষিত সমাজের একটা মেয়ে, দৈবাৎ কয়েকদিনের জন্য তাহার জীবন তাঁহার সহিত জড়াইয়া গেছে মাত্র। এ-বন্ধনকে স্বীকার করিবার কোনো দায়িত্বই তো তাঁহার নাই। তাঁহার সঙ্গ না পাইলেও বিধাতার সংসারে তাহার একটা কোনো কিনারা হইতই—আজ তিনি তাহাকে ছাড়িয়া গেলেও তাহার যেমন হোক একটা আশ্রয়ের অভাব হইবে না! আর পাপের পঙ্কের মধ্যে যে আশৈশব লালিত, তাহার পক্ষে আর আশ্রয়ের ভালো-মন্দ কি?

স্নানের যাত্রীদের ভিড় ঠেলিয়া চলিতে-চলিতে দাক্ষায়ণীর মনে হঠাৎ অদ্ভুত এক খেয়ালের উদয় হয়।

এই গঙ্গাসাগরেই তাহাকে ফেলিয়া কোনরকমে লুকাইয়া তিনি তো বেশ চলিয়া যাইতে পারেন। যাহার সহিত অতীতে কোনো সম্বন্ধ ছিল না, ভবিষ্যতে যাহার সহিত কোনো সম্বন্ধই থাকিবে না, তাহাকে এভাবে পরিত্যাগ কবার ভিতর অন্যায়ও তো কিছু নাই। সব সমস্যার অতি সহজেই তাহা হইলে মীমাংসা হইয়া যায়, দুর্ভাবনার গুরুভার নামাইয়া তিনি নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিতে পারেন।

ভিড় ঠেলিয়া অপেক্ষাকৃত ফাঁকা জায়গায় আসিয়া হঠাৎ দাক্ষায়ণীর নজরে পড়ে বাতাসি তাঁহার পিছনে নাই! এই খানিক আগেও তাহাকে যে পিছু-পিছু আসিতে তিনি দেখিয়াছেন। না, এ নির্বোধ মেয়েটাকে লইয়া আর পারা গেল না—পথ চলিতে-চলিতে চারিদিকে অবাক হইয়া চাহিয়া থাকা তাহার বদস্বভাব। একটু অসাবধান হইলেই সে পিছাইয়া পড়ে।

দাক্ষায়ণী খানিক দাঁড়াইয়া অপেক্ষা করেন। কিন্তু তবু বাতাসির দেখা নাই। এবার তাঁহার রাগ হয়। পইপই করিয়া এ-কয়দিন তিনি তাহাকে রাস্তায় সঙ্গ-ছাড়া হইতে বারণ করিয়াছেন! অজানা অচেনা জায়গায় বয়স্ক লোকেরাই পথ চিনিতে হয়রান হয়। চারিদিকে একই ধরনের হোগলার কুঁড়ের সার—একটার সঙ্গে আর একটার কোনো তফাত নাই। ইহার ভিতর একবার হারাইলে খুঁজিয়া বাহির করা কি কম কষ্টকর!

দাক্ষায়ণী একটু আগাইয়া যান। তবু বাতাসির পাত্তা নাই।

এবার তাঁহার ভয় হয়। হাবা মেয়েটা এই ভিড়ের ভিতর কোন দিকে যাইতে কোন দিক গিয়াছে কে জানে! একলা তো সে পথ চিনিয়া আসিতে পারিবেই না, কাহাকে জিজ্ঞাসাও যে করিবে সে-উপায়ও নাই। মাঝির নামেই এখানকার বসতির পরিচয়—সে নাম তো সে জানে না।

দাক্ষায়ণী চিৎকার করিয়া ডাকেন—“বাতাসি।”

সাড়া না পাইয়া তিনি আরও অগ্রসর হইতে থাকেন। স্নান হইতে যাহারা

ফিরিতেছে তাহাদের অনেককে জিজ্ঞাসা করিয়াও কোনো সুবিধা হয় না। দাক্ষায়ণী অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়া ওঠেন।

শেষ পর্যন্ত বাতাসিকে সেদিন পাওয়া যায়।

অনেকক্ষণ ঘোরার পর হঠাৎ তাঁহার নজরে পড়ে একটা দোকানের ধারে কয়েকটা লোক ভিড় করিয়া দাঁড়াইয়া উচ্চৈঃস্বরে চেঁচামেচি করিতেছে। ভিড় সরাইয়া মুখ বাড়াইতেই রোরুদ্যমানা বাতাসি একেবারে ঝাঁপাইয়া আসিয়া তাঁহাকে জড়াইয়া ধরে।

এতক্ষণের উদ্বেগ ও আশংকা এবার দাক্ষায়ণীর রাগে পরিণত হয়। ঠাস করিয়া তাহার গালে একটা চড় বসাইয়া তিনি বলেন—"বলেছিলুম না, আমার হাত ছাড়িয়ে যাসনি! আর যাবি একলা!"

আশেপাশের লোকেরা তাড়াতাড়ি নিষেধ করিয়া বলে—"আহা মেরো না, মেরো না, মেয়েটা এতক্ষণ কেঁদে একেবারে সারা হয়েছে!"

একজন বলে—"কিন্তু কি হাবা মেয়ে তোমার মা! অত বড়ো মেয়ে তা জিজ্ঞেস করলে কারু পরিচয় বলতে পারে না! শুধু বলে মার সঙ্গে এসেছি।"

বাতাসি কিন্তু এ-চড় বিন্দুমাত্র গ্রাহ্য না করিয়া দাক্ষায়ণীর কোলের কাছে মুখ লুকাইয়া একসঙ্গে অশ্রু ও হাসিমাখা মুখে বলে—"তুমি এগিয়ে গেলে কেন?"

একটু নির্জনে আসিয়া দাক্ষায়ণী জিজ্ঞাসা করেন—"আচ্ছা, আজ যদি তোকে ফেলে পালিয়ে যেতুম?"

বাতাসি হাসিয়া বড়ো-বড়ো চোখ দুইটা তাঁহার মুখের পানে পরম নির্ভর-তায় তুলিয়া ধরিয়া বলে—"ঈস।"

সেদিন রাত্রে বাতাসি আর কিছু খাইতে চাহিল না। একটু সর্দির সঙ্গে চোখ দুইটা তাহার লাল হইয়াছে। দাক্ষায়ণী গায়ে হাত দিয়া দেখিলেন—একটু উত্তাপ আছে। খাওয়ার জন্য আর পীড়াপীড়ি তিনি করিলেন না।

রাত্রে হোগলার ছাউনিতে হিম আটকায় না। ভালো করিয়া তাহাকে গরম রাখিবার জন্য দাক্ষায়ণী একটা বাড়তি কম্বল কিনিয়াই আনিলেন। কিন্তু দেখা গেল জ্বর তাহার বাড়িয়াছে।

সকালে তাহার অবস্থা দেখিয়া ভয়ে দাক্ষায়ণী একেবারে দিশাহারা হইয়া পড়িলেন। দেহে অসহ্য উত্তাপ, মুখ চোখ ফুলিয়া রাঙা হইয়া উঠিয়াছে। জ্বরের ঘোরে বেহুঁশ হইয়া বাতাসি তখন ভুল বকিতেছে।

স্বেচ্ছাসেবকদের স্থাপিত সেবাশ্রম হইতে একজন প্রতিবেশী দয়া করিয়া একজন ডাক্তার ডাকিয়া দিল। তিনি আসিয়া পরীক্ষা করিয়া যাহা বলিলেন তাহাতে দাক্ষায়ণীর মুখ একেবারে শুকাইয়া গেল।

কঠিন নিউমোনিয়া! বাতাসিকে হাসপাতালে লইয়া যাওয়া ছাড়া উপায় নাই।

হাসপাতালের প্রতি দাক্ষায়ণীর আজন্ম অবিশ্বাস। তিনি কিছুতেই রাজী হইতে চাহেন না!

ডাক্তার বুঝাইল যে এ-রোগের জন্য ঘণ্টায়-ঘণ্টায় যেরূপ সতর্ক শুশ্রূষা

ও ঔষধ প্রয়োগ প্রয়োজন তাহা দাক্ষায়ণীর অস্থায়ী আবাসে হওয়া অসম্ভব। মেয়েকে বাঁচাইবার ইচ্ছা থাকিলে হাসপাতালে দেওয়াই উচিত।

শেষ পর্যন্ত দাক্ষায়ণীকে বাতাসির কথা ভাবিয়াই রাজী হইতে হইল। স্বেচ্ছাসেবকেরা আশ্বাস দিয়া গেল যে ভয়ের কোনো কারণ নাই। থাকিতে না পারিলেও যখন খুশি তিনি সেখানে গিয়া দেখিয়া আসিতে পারিবেন। তাঁহার মেয়ের শুশ্রূষার ত্রুটি হইবে না।

হাসপাতাল পর্যন্ত বাতাসিকে পেঁছাইয়া আসিয়া দাক্ষায়ণী যখন পথে বাহির হন, তখন তাঁহার মনে হয়, তাঁহারও দেহ মন যেন অসাড় হইয়া গিয়াছে।

আজ স্নানের দিন। অসংখ্য যাত্রী ঠেলাঠেলি করিয়া সাগর সংগমে চলিয়াছে। ভিড়ের ভিতর যন্ত্রচালিতের মতো তিনিও সেই দিকে চলেন ; কিন্তু মনে হয়, এসব কিছুরই যেন তাঁহার আর প্রয়োজন নাই। সামান্য একটা অপরিচিত মেয়ে কয়দিনের পরিচয়ে তাঁহার সমস্ত জীবনের ধারা যেন বদলাইয়া দিয়াছে। নিষ্ঠা, ধর্ম, পুণ্য কিছুরই যেন আর সে-অর্থ নাই।

পদে-পদে আজ ফিরিয়া বাতাসি আসিতেছে কি না দেখিবার প্রয়োজন নাই। দণ্ডে-দণ্ডে কাহারও অনর্গল প্রশ্নের জবাব দিতে আজ বিব্রত হইতে হয় না। স্নান করিতে গিয়া বেশি ডুব দিয়া ফেলিল কি না, তাঁহার হাত ছাড়াইয়া বেশি দূরে গিয়া পড়িল কিনা, সাঁতার কাটিবার নিষ্ফল চেষ্টায় পাশের কাহারও গায়ে জল ছিটাইয়া স্নানের বিঘ্ন ঘটাইল কি না, এসব সতর্ক দৃষ্টিতে পাহারা দিবার দায় হইতে তিনি মুক্ত. নির্বিঘ্নে পুণ্য কাজ সারিবার কোনো বাধাই আজ নাই ; কিন্তু সেই সংগে তাঁহার মনে হয়, বুঝি পুণ্যের সব আকর্ষণও তাঁহার চলিয়া গিয়াছে।

স্নান করিয়া উঠিবার পর তাঁহার মন কিন্তু কতকটা শান্ত হয়। মনে হয়, মাযা তাঁহার যত বেশিই হোক, বাতাসির জীবন-দীপ যদি এমনি করিয়াই নিবিয়া যায়, তাহা হইলেও দুঃখ করিবার বিশেষ কিছু তাঁহার নাই। কিছুদিন বাদেই তো তাঁহাকে যেমন করিয়া হোক ওই হতভাগিনী মেয়েটির সংগে সকল সম্পর্ক ছিন্ন করিতে হইত, তাহার পর এই নিষ্ঠুর উদাসীন সংসারে, ওই অনাথ অসহায় মেয়েটির জীবন পাপ ও গ্লানির কোন অন্ধকার অতলে তলাইয়া যাইত কে বলিতে পারে! কলুষের মধ্যে যাহার জন্ম, পাপের বীজ যাহার মধ্যে হয়তো সুপ্ত হইয়া আছে, সংসারের বিষতরুরূপে পল্লবিত হইয়া উঠিবার পূর্বে এই নিষ্কলুষ শৈশবে বিধাতা যদি তাহাকে ডাকিয়া লন—তাহা হইলে দুঃখ করিবার সত্যই যে কিছুই নাই।

বাঁচিলে যখন অশেষ দুর্গতি, তখন বাতাসির মরাই ভালো।

কিন্তু স্নানের পর মেলার বাজার হইতে ফিরিবার সময় দেখা যায় দাক্ষায়ণীর দুই হাত খেলনায় ও পুতুলে বোঝাই।

বেলা যত বেশি বাড়িতে থাকে দাক্ষায়ণী তত বেশি অস্থির হইয়া ওঠেন। এবং সমস্তক্ষণ ধরিয়া তাঁহার মনের ভিতর যে-আলোড়ন চলে, তাহার খবর অন্তর্যামী ছাড়া আর কেহই বুঝিতে পারে না।

বাতাসির মরাই ভালো। কিন্তু সে মরিতেছে ভাবিয়া তাঁহার সারা গায়ে কাঁটা দিয়া ওঠে। তাঁহার বিশ্বসংসার ওই মেয়েটিকে কেন্দ্র করিয়া কখন হইতে ঘুরিতে শুরু করিয়াছে, তিনি জানিতেও পারেন নাই।

বিকাল হইতে না হইতেই তিনি বাহির হইয়া পড়িলেন।

সমস্ত সংস্কারের চেয়ে যাহা পুরাতন—সমস্ত ধর্মের অপেক্ষা যাহা প্রবল, সেই মাতৃত্বের বিপুল আকাঙ্ক্ষার প্লাবনে তাঁহার মনের সমস্ত সংকীর্ণ সীমার বেড়া তখন ভাঙিয়া ভাসিয়া গিয়াছে। বিধাতার কাছে বারবার আকুলভাবে বাতাসির জীবন-ভিক্ষা চাহিয়া তিনি মনে-মনে বলিয়াছেন—বাতাসি তাঁহার বাঁচুক, তাহাকে লইয়া সমস্ত সংসারের নিন্দা, অপবাদের বোঝা তিনি নির্ভয়ে মাথা পাতিয়া লইবেন। শ্বশুরবাড়িতে স্থান না হয় তিনি তাহাকে লইয়া তাঁহার বাপের বাড়ি বা যেখানে খুশি চলিয়া যাইবেন।

কিন্তু আগে সে বাঁচুক।

কিছুক্ষণ আগে বাতাসির মৃত্যুই শ্রেয় ভাবিয়াছিলেন বলিয়া নিজের প্রতি তাঁহার ঘৃণার আর সীমা থাকে না। পথে যাইতে-যাইতে অনেক কথাই তাঁহার মনে হয়। বাতাসির যে কলুষের মধ্যে জন্ম তাহারই বা প্রমাণ কি? গণিকারা নিজেদের স্বার্থসাধনের জন্য ভদ্র-পরিবারের ছোটো মেয়ে চুরি করিয়া লইয়া আসে, এ-কথা তিনি শুনিয়াছেন। বাতাসি যে তেমনি কোনো সদ্বংশের মেয়ে নয়—তাহাই বা কে বলিতে পারে? সদ্বংশে জন্ম না হইলে এত শীঘ্র তাহার এমন পরিবর্তন হইত না, এই কথাটাই বিশেষ করিয়া তাঁহার মনে হয়। যে-অপরাধ তাহার নয়, ভাগ্যের দোষে তাহারই শাস্তি তাহাকে সারাজীবন বহন করিতে হইবে, এ-কথায় এখন দাক্ষায়ণীর মন আর কিছুতেই সায় দিতে পারে না। যত লাঞ্ছনা গঞ্জনা সহ্য করিতে হয়, হোক, বাতাসিকে ভাগ্যের হাতে সমর্পণ করিয়া একাকী তিনি দেশে ফিরিবেন না, তাহাকে সঙ্গেই লইয়া যাইবেন এই তিনি সংকল্প করেন।

প্রকাণ্ড তাঁবু ফেলিয়া সাগরের যাত্রীদের হাসপাতাল বসানো হইয়াছে। দাক্ষায়ণী তাহার আশেপাশে কয়েকবার ঘোরাঘুরি করিয়াও কাহাকেও কিছু জিজ্ঞাসা করিতে ভরসা পান না।

কি যে শুনিতে হইবে কে জানে! আশঙ্কায় তাঁহার বুক কাঁপিতে থাকে। অবশেষে অনেক কষ্টে একজন স্বেচ্ছাসেবককে তিনি ভয়ে-ভয়ে বাতাসির খবর জিজ্ঞাসা করেন।

ছেলেটি সমস্ত পরিচয় জিজ্ঞাসা করিয়া লয়।

"আপনি দেখতে চান তো তাকে? একটু দাঁড়ান, আমি খোঁজ নিয়ে আসি" —বলিয়া ছেলেটি চলিয়া যায়।

দাক্ষায়ণী কম্পিত বক্ষে অপেক্ষা করেন। কিন্তু অনেকক্ষণ চলিয়া যায়, ছেলেটির আর দেখা মেলে না। দাক্ষায়ণী ভিতরে-ভিতরে অত্যন্ত অস্থির হইয়া ওঠেন। কেন তিনি ইহাদের কথা শুনিয়া হাসপাতালে পাঠাইতে রাজী হইয়াছিলেন ভাবিয়া তাঁহার আফসোসের আর সীমা থাকে না। ডাক্তার বলিয়া-ছিল—দেখা করিবার কোনো অসুবিধাই হইবে না। এখন এই দেরি দেখিয়া ইহাদের সমস্ত ব্যাপারের উপর তাঁহার গভীর অবিশ্বাস জন্মিয়া যায়। কে জানে হয়তো ইহারা কোনো শুশ্রূষাই বাতাসির করে নাই। হয়তো রুগ্ণ

মেয়েটাকে অবহেলায় ইহারা ফেলিয়া রাখিয়াছে, তৃষ্ণায় এক ফোঁটা জল দিবারও সেখানে লোক নাই। দাক্ষায়ণীর মন রাগে দুঃখে দুর্ভাবনায় কেমন যেন করিতে থাকে। ইচ্ছা হয়, এই কাপড়ের পর্দা ছিঁড়িয়া-খুঁড়িয়া তিনি জোর করিয়া বাতাসিকে ছিনাইয়া লইয়া আসেন। বাতাসি ইহাদের ঔষধ না খাইয়াও বাঁচিবে। দীর্ঘ প্রতীক্ষায় ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছেন, এমন সময় দেখিতে পান, ডাক্তারকে সঙ্গে লইয়া সেই ছেলেটি তাঁহারই দিকে আসিতেছে।

নিকটে আসিয়া পেঁাছিবার আগেই তাহাদের মুখ দেখিয়া তাঁহার আর কিছু বুঝিতে বাকি থাকে না, কাঠ হইয়া তিনি কোনোমতে দাঁড়াইয়া থাকেন। পাথরের মতো নিস্পন্দ, সে-মুখ দেখিয়া তাঁহার বেদনার কোনো পরিমাণই করা যায় না।

ডাক্তার আমতা-আমতা করিয়া যাহা বলে তাহার সব কথা তাঁহার কানে যায় না, প্রয়োজনও নাই।

ডাক্তারের কথা শেষ হইবার পূর্বেই তিনি পিছন ফিরিয়া চলিয়া যাইবার উপক্রম করেন। বাতাসিকে শেষ দেখা দেখিতে পর্যন্ত তিনি চাহেন না। ডাক্তার তাঁহার সঙ্গে একটু আগাইয়া আসিয়া অত্যন্ত সংকুচিতভাবে বলে—“আর একটু দরকার আছে আপনাকে। আপনার মেয়ের দাহ আমরাই করব। একটু পরিচয় তাই দিয়ে যেতে হবে।”

দাক্ষায়ণী ফিরিয়া শুষ্ককণ্ঠে জিজ্ঞাসা করেন—“পরিচয়?”

“হ্যাঁ, এই বয়েস, বাপের নাম—এইসব।”

দাক্ষায়ণী খানিক চুপ করিয়া থাকেন, তারপর সুপবিত্র মুখুজ্যে পরিবারের বড়ো বউ, জীবনের সমস্ত সংস্কার ও শিক্ষা ভুলিয়া যাহা করিয়া বসেন তাহাতে তাঁহার শ্বশুরকুলের চতুর্দশ পুরুষ সুদূর স্বর্গের সুখাবাসে শিহরিয়া ওঠেন কি না জানি না, কিন্তু সবার অলক্ষ্যে জীবন-দেবতার মুখ বুঝি প্রসন্নই হইয়া ওঠে।

বলেন—“সব তো মুখে বলতে নেই। দিন লিখে দিচ্ছি।”

ম হা ন গ র

আমার সঙ্গে চলো মহানগরে—যে-মহানগর ছড়িয়ে আছে আকাশের তলায় পৃথিবীর ক্ষতের মতো, আবার যে-মহানগর উঠেছে মিনারে মন্দিরচূড়ায়, আর অভ্রভেদী প্রাসাদ-শিখরে তারাদের দিকে, প্রার্থনার মতো মানবাত্মার।

আমার সঙ্গে এসো মহানগরের পথে, যে-পথ জটিল, দুর্বল মানুষের জীবনধারার মতো, যে-পথ অন্ধকার, মানুষের মনের অরণ্যের মতো, আর যে-পথ প্রশস্ত, আলোকোজ্জ্বল, মানুষের বুদ্ধি, মানুষের উৎসাহের মতো।

এ-মহানগরের সংগীত রচনা করা উচিত—ভয়াবহ, বিস্ময়কর সংগীত।

তার পটভূমিতে যন্ত্রের নির্ঘোষ, ঊর্ধ্বমুখ কলের শঙ্খনাদ, সমস্ত পথের সমস্ত চাকার ঘর্ঘর, শিকলের ঝনৎকার—ধাতুর সঙ্গে ধাতুর সংঘর্ষের আর্ত-নাদ। শব্দের এই পটভূমির ওপর দিয়ে চলেছে বিসর্পিল সুরের পথ ; প্রিয়ার মতো যে-নদী শুয়ে আছে মহানগরের কোলে, তার জলের ঢেউ-এর সুর, আর নগরের ছায়াবীথির ওপর দিয়ে যে-হাওয়া বয় তার, নির্জন ঘরে প্রেমিকেরা অর্ধস্ফুট যে-কথা বলে তারও। সে-সংগীতের মাঝে থাকবে উত্তেজিত জনতার সম্মিলিত পদধ্বনি—শব্দের বন্যার মতো ; আর থাকবে ক্লান্ত পথিকের পথের ওপর দিয়ে পা টেনে নিয়ে যাওয়ার আওয়াজ, মধ্যরাত্রে যে-পথিক চলেছে অনির্দিষ্ট আশ্রয়ের খোঁজে।

কঠিন ধাতু ও ইটের ফ্রেমে লক্ষ জীবনের সূত্র নিয়ে মহানগর বুনছে যে বিশাল সূচিচিত্র, যেখানে খেই যাচ্ছে নিশ্চিহ্ন হ'য়ে হারিয়ে, উঠছে জড়িয়ে নতুন সুতোর সঙ্গে অকস্মাৎ—সহসা যাচ্ছে ছিঁড়ে—সেই বিশাল দুর্বোধ চিত্রের অনুবাদ থাকবে সে-সংগীতে।

এ-সংগীত রচনা করার শক্তি আমার নেই। আমি শুধু মহানগরের একটু-খানি গল্প বলতে পারি—মহানগরের মহাকাব্যের একটুখানি ভগ্নাংশ, তার কাহিনী-সমুদ্রের দু-একটি ঢেউ। মহাসংগীতের স্বাদ তাতে মিলবে না, তৃষ্ণা তাতে মেটাবার নয়,—জানি।

সংকুচিত আড়ষ্টভাবে নদীর যে-শাখাটি ঢুকেছে নগরের ভেতর, তারই অগভীর জলের মন্থর স্রোতে ভেসে আমরা গিয়ে উঠব নড়ালের পোলের তলায় ফুটন্ত কদমগাছের নিশান-দেওয়া সেই পুরনো পোনাঘাটে। আমরা পেরিয়ে যাব পুরনো সব ভাঙাঘাট, পেরিয়ে যাব ন্যাড়াশিবের মন্দির, পেরিয়ে যাব ইটখোলা আর চালের আড়ত, কেঠোপটি আর পাঁজা-করা টালি ও ইট আর সুরকি বালির গোলা। আমরা চলেছি পোনার নৌকায়। আমাদের নৌকার খোলে টইটম্বুর জল, আর তাতে কিলবিল করছে মাছের ছানা। সেই পোনার চারা বিক্রি হবে কুনকে হিসাবে পোনাঘাটে।

আষাঢ় মাসের ভোরবেলা। বৃষ্টি নেই, কিন্তু আকাশ মেঘে ঢাকা। সূর্য হয়তো উঠছে পুবের বাঁকা নগরশিখর-রেখার পেছনে, আমরা পেয়েছি মাত্র মেঘ থেকে চোয়ানো স্তিমিত একটু আলো। সে-আলোয় এদিকের দরিদ্র শহরতলিকে আরও যেন জীর্ণ দেখাচ্ছে। ভাঙাঘাটে এখনও স্নানে বড়ো কেউ

আসেনি, গোলাগুলি ফাঁকা, ধানের আড়তের ধারে শূন্য সব শালতি বাঁধা। সব খাঁখাঁ করছে।

জোয়ারের টানে ভেসে চলেছে নৌকা। মাঝিরা বড়ো নদীতে বরাবর এসেছিল দাঁড় টেনে। এখন তারা ছই-এর ভেতর একটু ঘুমিয়ে নিচ্ছে। শুধু হালে ব'সে আছে মুকুন্দ, আর তার কাছে কখন থেকে চুপটি ক'রে গিয়ে বসেছে যে রতন তা কেউ জানে না—সেই বুঝি রাত না পোহাতেই। নৌকা তখন মাঝ-নদীতে।

বাদলা রাতে আকাশে ছিল না তারা। রতনের মনে হয়েছে সব তারা যেন নেমেছে জলের ওপর। নদী তখন মহানগরের নাগাল পেয়েছে ; দু-ধারে জাহাজ আর স্টীমার, গাধাবোট আর বড়ো-বড়ো কারখানার সব জেটি। অন্ধকারে তাদের রূপ দেখা যায় না, দেখা যায় শুধু গায়ে আলোর ফোঁটা, অগুন্তি ফোঁটা, কালো জলের এপার থেকে ওপারে। মেঘলা আকাশ ছেড়ে তারাগুলিই তো নেমেছে নদীর ওপর।

রতন ভয়ে-ভয়ে এসে বসেছে নিঃসাড়ে হালের কাছে। কে জানে বাবা বকবে কিনা? হয়তো ধমকে আবার দেবে পাঠিয়ে ছই-এর ভেতরে! কিন্তু সে কি থাকতে পারে এমন সময় ছই-এর ভেতর—নৌকা যখন পেয়েছে মহানগরের নাগাল, আকাশের তারা যখন জলের ওপরে নেমেছে! তার যে কত দিনের সাধ, কত দিনের স্বপ্ন! রতন দু-চোখ দিয়ে পান করেছে আলো-ছিটানো এই নগরের অন্ধকার আর নিশ্বাস পর্যন্ত ফেলেছে সাবধানে, পাছে বাবা টের পায়, পাছে দেয় তাকে ধমকে ভেতরে পাঠিয়ে। কিছুই তো বিশ্বাস নেই। বাবা তো তাকে আনতেই চায়নি বাড়ি থেকে। ছেলেমানুষ আবার শহরে যায় নাকি! আর নৌকায় এতখানি পথ যাওয়া কি সোজা কথা! কি করবে সে সেখানে গিয়ে? কত কাকুতি-মিনতি ক'রে, কেঁদেকেটে না রতন শেষ পর্যন্ত বাবাকে নিমরাজী করিয়েছে। তবু নৌকায় তুলে বাবা তাকে শাসিয়ে দিয়েছে—খবরদার, পথে দুষ্টুমি করলে আর রক্ষা থাকবে না। না, দুষ্টুমি সে করবে না, কাউকে বিরক্তও না। তাকে যা বলা হবে তাই করতে সে রাজী। সে শুধু একবার শহর দেখতে চায়—রূপকথার গল্পের চেয়ে অদ্ভুত সেই শহর। কিন্তু শুধু তাই জন্যে কি শহরে আসবার এই ব্যাকুলতা রতনের? আচ্ছা, সে-কথা এখন থাক।

কিন্তু রতনকে কেউ লক্ষ্য করে না, কিংবা লক্ষ্য ক'রেও গ্রাহ্য করে না। রতন ব'সে আছে নিঃসাড়ে, শুধু সমস্ত দেহের রেখায় ফুটে উঠেছে তার ব্যগ্রতার প্রখরতা।

ধীরে-ধীরে অন্ধকার এল ফিকে হ'য়ে। এবার নদী রেখায় স্পষ্ট হ'য়ে উঠেছে। প্রথম ছিল চারিধারে আবছা কুয়াশা। প্রকৃতির পটের ওপর যেন রঙের এলোমেলো ছোপ, কোথাও একটু ঘন, কোথাও হালকা, সে-রঙের ছোপ তখনও নির্দিষ্ট রূপ নেয়নি। নীহারিকার মতো আকারহীন সেই অস্পষ্ট ধোঁয়াটে তরলতা থেকে রতনের চোখের ওপরেই কে যেন এইমাত্র নতুন পৃথিবী সৃষ্টি ক'রে তুলেছে। আকাশের গায়ে কালো খানিকটা তুলির পোঁচ দেখতে-দেখতে হ'য়ে উঠল প্রকাণ্ড একটা জাহাজ, তাহার জটিল মাস্তুলগুলি উঠেছে ছোটো-খাটো অরণ্যের মতো মেঘলা আকাশে, তার নোঙরের শেকল নেমেছে

অতিকায় অজগরের মতো জলের ভেতর। রতনদের নৌকা সে-দানবের ভ্রূকুটির তলা দিয়ে ভয়ে-ভয়ে পার হ'য়ে যায় ছোটো শোলার খেলনার মতো। জলের আরেক ধারে বিছানো ছিল খানিকটা তরল গাঢ় রঙের কুয়াশা। সে-কুয়াশা জমাট বেঁধে হ'য়ে গেল অনেকগুলো গাধা-বোটের জটলা—একটি জেটির চারিধারে তারা ভিড় ক'রে আছে। দূর থেকে মনে হয়, ওরা যেন কোনো বিশাল জলচরের শাবক—মায়ের কোল ঘেঁষে তাল পাকিয়ে আছে ঘুমিয়ে। নদীর ওপরকার পর্দা আরো গেল স'রে। কল-কারখানার বিশাল সব দেহ উঠল জেগে নদীর দু-পারে। জলের ওপর তাদের লোহ-বাহু তারা বাড়িয়ে দিয়েছে। বাঁধানো পাড় থেকে বড়ো-বড়ো ক্রেন উঠেছে গলা বাড়িয়ে ; দুই তীরে সদাগরী জাহাজের আশেপাশে জেলে-ডিঙি আর খেয়া-নৌকা, স্টীমার আর লঞ্চ ভিড় ক'রে আছে। এই মহানগর! ভয়ে বিস্ময় ব্যাকুলতায় অভিভূত হ'য়ে রতন প্রথম তার রূপ দেখলে।

তারপর তাদের নৌকা বাঁক নিয়ে ঢুকেছে এই শাখার ভেতর, চলেছে পুরনো শহরতলির ভেতর দিয়ে। বড়ো নদীতে মহানগরের রূপ দেখে রতন সত্যি ভয় পেয়েছিল, হতাশ হয়েছিল আরো বেশি। কিন্তু এই পুরনো জীর্ণ শহরতলি দেখে তার যেন একটু আশা হয়। কেন আশা হয়? আচ্ছা সে-কথা এখন থাক।

নদীর আরেকটা বাঁক ঘুরেই দেখা যায় নড়ালের পোল। আগে থাকতে পোনার সব নৌকা এসে জুটেছে পোনাঘাটে। মুকুন্দ হাঁক দিয়ে এবার সবাইকে তোলে। লক্ষ্মণ উঠে তারকুনকে ঠিক করে। মাঝিরা গা মোড়া দিয়ে ওঠে। আর রতন ব'সে থাকে উত্তেজনায় উদ্‌গ্রীব হ'য়ে। তার চাপা দুটি পাতলা ছোটো ঠোটের নীচে কি সংকল্প আছে, জানে কি কেউ? বড়োবড়ো দুটি চোখে তার কিসের ব্যগ্রতা? শুধু শহর দেখার কৌতূহল তো এ নয়! কিন্তু সে-কথাও এখন থাক।

পোনাঘাটে এসে নৌকা লাগে। পোনাঘাটে আর জায়গা কই দাঁড়াবার! এরই মধ্যে মাটির হাঁড়ি দু-ধারে ঝুলিয়ে ভারীরা এসেছে দূর-দূরান্তর থেকে পোনার চারা নিয়ে যেতে। তাদের ভিড়ের ভেতর পাড়ের কাদার ওপর কারা দোকান পেতে বসেছে পান বিড়ি আর তেলেভাজা খাবারের। সরকারী লোকেরা ঘুরে বেড়াচ্ছে পাওনা আদায় করতে। দালালেরা ঘুরছে হাঁকডাক ক'রে।

পাড়ে আর জায়গা নেই, তবু মুকুন্দদাসের খাস নৌকার একটু নোঙর ফেলবার ঠাঁই মেলে। মুকুন্দ তো আর যে-সে লোক নয়। বর্ষার ক'টা মাসে তার গোটা ছয়েক পোনার নৌকা আনাগোনা করে এই পথে।

মাঝিরা এর মধ্যেই নৌকার খোল থেকে জল ছেঁচে ফেলতে শুরু করেছে একটু-আধটু। লক্ষ্মণ কুনকে পরখ করছে—মাছ মেপে দেবার সময় খানিকটা জল রেখে হাত সাফাই করতে সে ওস্তাদ। মুকুন্দদাস নৌকা থেকে জলে নেমে ডাঙায় ওঠে। পেছন দিকে হঠাৎ চোখ পড়ায় ধমক দিয়ে বলে—"তুই নামলি যে বড়ো।"

রতন বাবার দিকে কাতরভাবে তাকায়। মুকুন্দ একটু নরম হ'য়ে বলে—"আচ্ছা, কোথাও যাসনি যেন, ওই কদমগাছের তলায় দাঁড়াগে যা!"

রতন তাই করে। কদমগাছ থেকে অসংখ্য ফোটা ফুল ঝ'রে পড়েছে মাটিতে। কাদায় মানুষের পায়ের চাপে রেণুগুলো থেঁতলে নোংরা হ'য়ে গেছে। পোনা-চারার হাটে কদমফুলের কদর নেই।

রতনের চারিধারে হট্টগোল।

"চাপড়াও না হে, নইলে বাড়ি গিয়ে মাছচচ্চাড় খেতে হবে যে।"

"একটা নতুন হাঁড়িও জোটেনি! ভাতের তিজেলটাই এনেছ বুঝি টেনে। তারপর মাছ যখন ঘেমে উঠবে তখন হবে দালাল বেটার দোষ।"

ভারীরা কেউ এসেছে খালি হাঁড়ি নিয়ে, কারুর কেনা প্রায় সাঙ্গ হ'ল। ব'সে-ব'সে তারা হাঁড়ির জল চাপড়ায়, মরা মাছ ছেঁকে ফেলে। নদীর ধারের কাদায় মরা মাছ আর কদম-রেণু মিশে গেছে।

রতন কিন্তু কদমতলায় বেশিক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে নি। এখানে থাকবার জন্যে কাকুতি-মিনতি ক'রে সে তো শহরে আসেনি। সারা পথ সে মনের কথা মনেই চেপে এসেছে। মুখ ফুটে একরাব বুঝি লক্ষ্মণকে গোপনে চুপি-চুপি জিজ্ঞাসা করেছিল—"হ্যাঁ কাকা, পোনাঘাটের কাছেই উল্টোডিঙি, না?"

লক্ষ্মণকাকা হেসে বলেছে—"দূর পাগলা উল্টোডিঙি কি সেথা! সে হল কতদূর।" তারপর অবাক হ'য়ে জিজ্ঞাসা করেছে—"কেন রে, উল্টোডিঙির খোঁজ কেন? উল্টোডিঙির নাম তুই শুনলি কোথা?"

কিন্তু রতন তারপর একেবারে চুপ। তার পেটের কথা বার করে কার সাধ্য।

কদমতলায় দাঁড়িয়ে উৎসুকভাবে রতন চারিদিকে তাকায়। তার বাবা কাজে ব্যস্ত, রতন একসময়ে বেরিয়ে পড়ে রাস্তায়। কাউকে কিছু জিজ্ঞাসা করতে এখানে তার সাহস হয় না। একটা দিক খেয়ালমতো ধ'রে সে এগিয়ে যায়।

মহানগরের বিশাল অরণ্যে কত মানুষ আসে কত কিছুর খোঁজে,—কেউ অর্থ, কেউ যশ, কেউ উত্তেজনা, কেউ বা বিস্মৃতি। মৃত্তিকার স্নেহের মতো শ্যামল একটি অসহায় ছেলে সেখানে এসেছে কিসের খোঁজে? এই অরণ্যে নিজের আকাঙ্ক্ষিতকে সে খুঁজে পাবার আশা রাখে—তার দুঃসাহস তো কম নয়।

অনেক দূর গিয়ে রতন সাহস ক'রে একজনকে পথ জিজ্ঞাসা করে। লোকটি অবাক হ'য়ে তার দিকে তাকায়, বলে—"এ তো অন্য দিকে এসেছ ভাই, উল্টোডিঙি ওইদিকে, আর সে তো অনেক দূর!"

—অনেক দূর! তা হোক, অনেক দূরকে রতন ভয় করে না। রতন অন্য দিকে ফেরে।

লোকটি কি ভেবে তাকে জিজ্ঞাসা করে—"তুমি একলা যাচ্ছ অত দূর! তোমার সঙ্গে কেউ নেই?"

রতন সংকুচিতভাবে বলে—"না।"

লোকটির কি মনে হয়, একটু শক্ত হ'য়েই জিজ্ঞাসা করে—"বাড়ি থেকে পালিয়ে যাচ্ছ না তো? উল্টোডিঙিতে কার কাছে যাচ্ছ?"

রতন ভয়ে-ভয়ে ব'লে ফেলে—"সেখানে আমার দিদি থাকে।" তারপর তাড়াতাড়ি সেখান থেকে চ'লে যায়। লোকটা যদি আরও কিছু জিজ্ঞাসা

করে, যদি ধ'রে নিয়ে যায় আবার তার বাবার কাছে!

এবার তা হ'লে বলি। রতন এসেছে দিদিকে খুঁজতে। সেখানে মানুষ নিজের আত্মাকে হারিয়ে খুঁজে পায় না, সেই মহানগর থেকে তার দিদিকে সে খুঁজে বার করবে। শহর মানে তার দিদি। বাড়িতে থাকতে সে ভেবেছে শহরে গেলেই বুঝি দিদিকে পাওয়া যায়। মহানগরের বিরাট রূপ তার সে-ধারণাকে উপহাস করেছে; কিন্তু তবু সে হতাশ হয়নি। দিদিকে খুঁজে সে পাবেই। শিশু-হৃদয়ের বিশ্বাসের কি সীমা আছে!

কিন্তু দিদিকে খোঁজার কথা তো কাউকে বলতে নেই। দিদির নাম করাও যে বাড়িতে মানা, তা কি সে জানে না। অনুচ্চারিত কোনো নিষেধ তার শিশু-মনের ব্যাকুলতাকে মূক ক'রে রেখে দেয়।

তাই সে সারা পথ এসেছে মনের কথা মনে চেপে। তাই সে একা বেরিয়েছে দিদির সন্ধানে।

দিদিকে যে তার খুঁজে বার করতেই হবে। দিদি না হ'লে তার যে কিছু ভালো লাগে না। ছেলেবেলা থেকে সে তো মাকে দেখেনি, জেনেছে শুধু দিদিকে। দিদি তার মা, দিদিই তার খেলার সাথী। বিয়ে হ'য়ে দিদি গেছল শ্বশুরবাড়ি। তবুও তাদের ছাড়াছাড়ি হয়নি। কাছাকাছি দুটি গাঁ, রতন নিজেই যখন-তখন পালিয়ে গিয়ে হাজির হয়েছে দিদির কাছে। তারপর দিদির কাছ থেকে তাকে নিয়ে আসা সোজা ব্যাপার নয়। দিদি যেখানে থাকতে পারে দিনের পর দিন, সেখানে তার বেশি দিন থাকা কেন যে দোষের তা সে কেমন ক'রে বুঝবে!

তারপর কি হ'ল কে জানে। একদিন তাদের বাড়িতে বিষম গণ্ডগোল। দিদির শ্বশুরবাড়ি থেকে লোক এসেছে ভিড় ক'রে, ভিড় ক'রে এসেছে গাঁয়ের লোক। থানা থেকে চৌকিদার পর্যন্ত এসেছে। ছেলেমানুষ ব'লে তাকে কেউ কাছে ঘেঁষতে দেয় না। তবু সে শুনেছে—দিদিকে কারা ধ'রে নিয়ে গেছে। তাকে আবার কেড়ে আনলেই তো হয়! কেন যে কেউ যাচ্ছে না তাই ভেবে তার রাগ হয়েছে। তারপর সে আরো কিছু শুনেছে; শিশুর মন অনেক বেশি সজাগ। দিদিকে কোথায় ধ'রে নিয়ে গেছে কেউ নাকি জানে না।

এইবার সে কেঁদেছে। কে জানে কারা নিয়ে গেছে দিদিকে ধ'রে! তারা হয়তো দিদিকে মারছে, হয়তো দিচ্ছে না খেতে। দিদি হয়তো রতনকে দেখবার জন্য কাঁদছে। এ-কথা ভেবে তার যেন আরও কান্না পায়।

বাবা তাকে আদর করেছেন কান্না দেখে। মাথায় হাত বুলিয়ে বলেছেন—"কান্না কেন বাবা?"

চুপিচুপি রতন বলেছে, "দিদি যে আসছে না বাবা।"

মুকুন্দ শিশুর সজাগ মনের রহস্য না জেনে বলেছে—"আসবে বৈকি বাবা, শ্বশুরবাড়ি থেকে কি রোজ-রোজ আসতে আছে।"

রতন আর কিছু বলেনি। কিন্তু বাবা তার কাছে কেন লুকোতে চান বুঝতে না পেরে তার বড়ো ভয় হয়েছে!

তারপর একদিন সে শুনেছে যে দিদিকে নাকি পাওয়া গেছে। দারোগা-সাহেব পুলিস নিয়ে গিয়ে তাকে নাকি কোন দূর দেশ থেকে খুঁজে বার করেছেন। দিদিকে খুঁজে পাওয়া গেছে! রতনের আনন্দ আর ধরে না। দিদি

এতদিন বাদে তা হ'লে আসছে।

কিন্তু কোথায় দিদি! একদিন, দু-দিন, ব্যাকুলভাবে রতন অপেক্ষা করে, কিন্তু দিদি আসে না। দিদিকে ফিরে পাওয়া গেছে, তবু দিদি কেন আসে না রতন বুঝতে পারে না। দিদির ওপরই তার রাগ হয়। কতদিন রতন তাকে দেখেনি তা কি তার মনে নেই। দিদি নিজে চ'লে আসতে পারে না? আর বাবাই বা কেমন, দিদিকে নিয়ে আসছে না কেন? রতনের সকলের ওপর অভিমান হয়েছে।

হয়তো দিদি চুপিচুপি শ্বশুরবাড়ি গেছে ভেবে একদিন সকালে রতন সেখানে গিয়ে হাজির হয়। কিন্তু সেখানে তো দিদি নাই! সেখানে কেউ তার সঙ্গে ভালো ক'রে কথাবার্তা পর্যন্ত কয় না; দাদাবাবু তাকে দেখতে পেয়েও দূর থেকে না ডেকে চ'লে যান। মুখখানি কাঁদো-কাঁদো ক'রে রতন সেদিন বাড়ি ফিরে এসেছে।

ফিরে এসে বাবার কাছে কেঁদে সে আবদার করেছে—"দিদিকে আনছ না কেন বাবা?"

সেইদিন মুকুন্দ তাকে ধমক দিয়েছে।

তারপর থেকে দিদি আর আসেনি। দিদি নাকি আর আসবে না।

কিন্তু রতন মনে-মনে জানে, তাকে কেউ ডাকতে যায়নি ব'লেই অভিমান ক'রে দিদি আসেনি।

রতন যে জানে না দিদি কোথায় থাকে, না-হ'লে সে নিজেই গিয়ে দিদিকে ডেকে আনতো।

কিন্তু কেমন ক'রে সে জানবে দিদি কোথায় আছে! কেউ যে তাকে দিদির কথা বলে না। দিদির কথাই যে বলতে নেই। রাত্রে সে চুপিচুপি শুধু দিদির জন্যে কাঁদে; দিদি কেমন ক'রে তাকে ভুলে আছে ভেবে মনে-মনে তার সঙ্গে ঝগড়া করে। দিদি কোথায় থাকে সে জানে না।

কিন্তু শিশুর মন আমরা যা মনে করি তার চেয়ে অনেক বেশি সজাগ।

শিশু অনেক কিছু শুনতে পায়, অনেক কিছু বোঝে। কোথা থেকে সে শুনেছে কে জানে যে, দিদি থাকে শহরে—রূপকথার চেয়ে অদ্ভুত সেই শহর। কোথা থেকে কার মুখে শুনেছে—উল্টোডিঙির নাম। বাতাসে কথা ভেসে আসে, বিনিদ্র ভালোবাসা কান পেতে থাকে, শুনতে পায়।

তাই সে কাকুতি-মিনতি ক'রে এসেছে মহানগরে, তাই সে চলেছে সন্ধানে।

দিদিকে সে খুঁজে বার করবে, সে জানে দিদির সামনে একবার গিয়ে দাঁড়ালে সে আর না এসে থাকতে কিছুতেই পারবে না। এমনি গভীর তার বিশ্বাস।

রতনকে আমরা এখানে ছেড়ে দিতে পারি। মহানগরে অনেকেই আসে অনেক-কিছুর খোঁজে, কেউ অর্থ, কেউ যশ, কেউ উত্তেজনা, কেউ বিস্মৃতি, কেউ আরও বড়ো কিছু। সবাই কি পায়? পথের অরণ্যে তারা হারিয়ে যায়। মহানগর তাদের চিহ্ন দেয় মুছে। রতনও তেমনি হারিয়ে যাবে ভেবে আমরা তাকে ছেড়ে দিতে পারি।

কিন্তু তা যাবে না। পৃথিবীতে কি সম্ভব, কি অসম্ভব কে বলতে পারে? রতন সত্যি দিদির খোঁজ পায়। দুপুর তখন গড়িয়ে গেছে বিকেলের দিকে।

আষাঢ় মাসের আকাশ, মেঘে ঢাকা ব'লে বেলা বোঝা যায় না। ক্লান্তপদে শ্নুকনো কাতরমন্থে একটি ছেলে গিয়ে দাঁড়ায় খোলায়-ছাওয়া একটি মেটে-বাড়ির দরজায়। একটি মেয়ে তাকে রাস্তা থেকে এনেছে সংগে ক'রে।

রতন অনেক পথ ঘ্নরেছে, অনেককে জিজ্ঞাসা করেছে পথ, শেষে সে সন্ধান পেয়েছে। ভালোবাসা কি না পারে!

খানিক আগে হয়রান হ'য়ে খোঁজ করতে-করতে রতন দ্নরে একটি মেয়েকে দেখতে পায়। উৎসাহভরে সে চিৎকার ক'রে ডাকে—"দিদি!"

মেয়েটি ফিরে দাঁড়াতেই রতন হতাশ হ'য়ে যায়। আর দিদি তো অমন নয়। কুণ্ঠিতভাবে সে অন্যদিকে চ'লে যাবার চেষ্টা করে। মেয়েটি তাকে ডেকে বলে—"শোনো।"

কাছে গেলে তার ক্লান্ত শ্নুকনো মনুখের দিকে চেয়ে জিজ্ঞাসা করে—"কাকে খ্ংনুজছ ভাই?"

রতন লজ্জিতভাবে তার দিদির নাম বলে। মেয়েটি হেসে বলে—"তোমার দিদির বাড়ি বন্ঝি চেনো না, চলো আমি দেখিয়ে দিচ্ছি।"

মেটে-বাড়ির দরজায় দাঁড়িয়ে এখন মেয়েটি ডাকে—"ও চপলা, তোকে খ্ংনুজতে কে এসেছে দেখে যা।"

ভেতর থেকে চপলাই বন্ঝি রন্ক্ষ স্বরে বলে—"কে আবার এল এখন?"

"দেখেই যা না একবার।"

চপলা দরজার কাছে এসে থমকে দাঁড়ায়। রতনের মনুখেও কথা ফোটে না। দিদিকে চিনতেই তার কণ্ঠ হয়। দিদি যেন কেমন হ'য়ে গেছে।

দন্ইজনেই খানিকক্ষণ থাকে নিস্পন্দ হ'য়ে দাঁড়িয়ে। যে-মেয়েটি রতনকে সংগে ক'রে এনেছে সে একটন্ সন্দিগ্ধ হ'য়ে বলে—"তোর নাম ক'রে খ্ংনুজছিল, তাই তোর ভাই ভেবে বাড়ি দেখাতে নিয়ে এলাম! তোর ভাই নয়?"

উত্তর না দিয়ে চপলা হঠাৎ ছনুটে এসে রতনকে বনুকে চেপে ধরে, তারপর এদিক-ওদিক চেয়ে অবাক হ'য়ে ধরা-গলায় বলে—"তুই একা এসেছিস!"

রতন দিদির বনুকে মনুখ লনুকিয়ে থাকে, কিছন্ বলে না।

মহানগরের পথে ধনুলো, আকাশে ধোঁয়া, বাতাসে বন্ঝি বিষ। আমাদের আশা এখানে কখনও-কখনও পন্র্ণ হয়। যা খ্ংনুজি তা মেলে। তবন্ বহন্দিনের কামনার ফলও কেমন একটন্ বিস্বাদ লাগে। মহানগর সব-কিছনুকে দাগী ক'রে দেয়, সার্থকতাকেও দেয় একটন্ বিষিয়ে।

চপলা রতনকে ঘরে নিয়ে যায়। সে-ঘর দেখে রতন অবাক। মাটির ঘর এমন ক'রে সাজানো হ'তে পারে, এত সন্নদর জিনিস সেখানে থাকতে পারে রতন তা কেমন করে জানবে? এত জিনিস দেখে সে অবাক হ'য়ে জিজ্ঞাসা করে প্রথম—"এসব তোমার দিদি?"

চপলার অকারণ চোখের জল তখনও শনুকোয়নি, একটন্ হেসে সে বলে—"হ্যাঁ ভাই!"

কিন্তু দিদির ঘর যেমনই হোক তা নিয়ে মেতে থাকলে চলবে না তো। আসল কথা রতন ভোলেনি। সে হঠাৎ বলে—"তোমায় কিন্তু বাড়ি যেতে হবে দিদি।"

চপলা বন্ঝি একটন্ বেশি চমকে ওঠে, তারপর ম্লানভাবে বলে—"আচ্ছা

যাব ভাই, এখন তো তুই একটু জিরিয়ে নে!"

"কিন্তু জিরিয়ে নিয়েই যেতে হবে। আমাদের নৌকো কাল সকালেই ছাড়বে কিনা! এসব জিনিস কেমন ক'রে নেব দিদি?"

এবার চপলা চুপ ক'রে থাকে।

হঠাৎ কেন বলা যায় না, একটু ভীত হ'য়ে রতন জিজ্ঞাসা করে—"একটু জিরিয়ে নিয়েই যাবে তো দিদি?"

দিদির মুখে তবু কথা নেই। দিদি জিনিসপত্র নিয়ে যাবার ভাবনাতেই হয়তো রাজী হচ্ছে না ভেবে রতন তাড়াতাড়ি বলে—"এসব জিনিস একটা গোরুর গাড়ি ডেকে তুলে নেব, কেমন দিদি?"

চপলা কাতরমুখে ব'লে ফেলে—"আমার যে যাবার উপায় নেই ভাই!"

যাবার উপায় নেই! রতনের মুখের সব দীপ্তি হঠাৎ নিবে যায়। সঙ্গে-সঙ্গে তার মনে পড়ে যায় বাবার রাগ, মনে পড়ে বাড়িতে দিদির নাম পর্যন্ত উচ্চারণ নিষেধ। সত্যিই বুঝি দিদির সেখানে যাবার উপায় নেই! বৃথাই এসেছে সে দিদিকে খুঁজতে, দিদিকে খুঁজে পেয়েও তার লাভ নেই।

তারপর হঠাৎ আবার তার মুখ উজ্জ্বল হ'য়ে ওঠে। বলে—"আমিও তা হ'লে যাব না দিদি!"

"কোথায় থাকবি?"

"বাঃ, তোমার কাছে তো!"—ব'লে রতন হাসে; কিন্তু চপলার মুখ যে আরও ম্লান হ'য়ে আসছে তা সে দেখতে পায় না।

তারপর খেয়ে-দেয়ে সারা বিকাল দুই ভাই-বোনের গল্প হয়। কত কথাই তাদের আছে বলবার, জিজ্ঞাসা করবার। কিন্তু সন্ধ্যা যত এগিয়ে আসে তত চপলা কেমন অস্থির হ'য়ে ওঠে। একবার সে বলে—"তুই যে চ'লে এলি একলা, বাবা হয়তো খুব ভাবছে!"

দিদির প্রতি অবিচারের জন্য বাবার ওপর রতনের একটু রাগই হয়েছে, সে তাচ্ছিল্যভরে বলে—"ভাবুক গে!"

খানিক বাদে চপলা আবার বলে—"এখান থেকে নড়ালের পোল অনেক-খানি পথ, না রতন?"

রতন এ-পথ পার হ'য়েই তো এসেছে। গর্বভরে সে বলে—"ওরে বাবা, সে ব'লে কোথায়!"

"পয়সা নিয়ে তুই ট্রামে ক'রে, না-হয় বাসে, যেতে পারিস না?"

"বাঃ আমি কি যাচ্ছি নাকি?"

দিদির মুখের দিকে চেয়ে সে কিন্তু থমকে যায়! দিদির চোখে জল।

মাথা নিচু ক'রে চপলা ধরা-গলায় বলে—"এখানে যে তোমার থাকতে নেই ভাই!"

রতন কিছু বুঝতে পারে না, কিন্তু এবার তার অত্যন্ত অভিমান হয়। দিদি সেখানেও যেতে পারবে না, আবার এখানেও বলবে তাকে থাকতে নেই! আচ্ছা, সে চ'লেই যাবে। কখ্খনো, কখ্খনো আর দিদির নাম করবে না বাবার মতো। ধীরে-ধীরে সে বলে—"আচ্ছা, আমি যাব।"

মেঘলা আকাশে একটু আগে থাকতেই আলো এসেছে ম্লান হ'য়ে। চপলা উঠে তার আলমারি থেকে চারটে টাকা বার ক'রে রতনের হাতে গুঁজে

দিয়ে বলে—তুই খাবার খাস।”

চার টাকায় অনেক পয়সা, তবু আপত্তি করবার কথাও আর রতনের মনে নেই। দিদি যে এক্ষুনি তাকে চ'লে যেতে বলেছে তা বুঝে সে যেন বিমূঢ় হ'য়ে গেছে। তার সমস্ত বুক গেছে ভেঙে।

রতন আর ঘরে দাঁড়ায় না, আস্তে-আস্তে বাইরে বেরিয়ে আসে।

দিদির মুখের দিকেও আর না চেয়ে গলি দিয়ে সে সোজা বড়ো রাস্তার দিকে এগিয়ে যায়। মুখের দিকে চাইলেও হয়তো দিদির অবিশ্রান্ত চোখের জলের মানে সে বুঝতে পারত না।

চপলা পেছন থেকে ধরা-গলায় বলে—“বাসে ক'রে যাস রতন, হেঁটে যাসনি!”

রতন সে-কথা শুনতে পায় কিনা কে জানে, কিন্তু বড়ো রাস্তার কাছ থেকে হঠাৎ আবার সে ফিরে আসে। তার মুখ আবার গেছে বদলে। এইটুকু পথ যেতে কি সে ভাবছে কে জানে।

চপলা তখনও দরজায় দাঁড়িয়ে আছে। রতন তার কাছে এসে হঠাৎ বলে —“বড়ো হ'য়ে আমি তোমায় নিয়ে যাব দিদি! কারুর কথা শুনব না!”

ব'লেই সে এবার সোজা এগিয়ে যায়। তার মুখে আর নেই বেদনার ছায়া, তার চলার ভঙ্গি পর্যন্ত সবল ; এতটুকু ক্লান্তি যেন তার আর নেই। দেখতে-দেখতে গলির মোড়ে সে অদৃশ্য হ'য়ে যায়।

মহানগরের ওপর সন্ধ্যা নামে বিস্মৃতির মতো গাঢ়।

স্টোভটা আর না বাতিল করলে নয়। পাম্প করতে-করতে হাতে ব্যাথা ধ'রে যায়। কোনোরকমে যদি বা তারপর ধরে তবু থেকে-থেকে একটা অদ্ভুত শব্দ ক'রে এমন দপদপ ক'রে ওঠে যে ভয় করে।

সত্যি ভয় করে? বাসন্তীর মনে প্রশ্নটা ঝিলিক দিয়ে উঠতে না উঠতেই স্বামী শশিভূষণ মাঝখানের দরজাটা একটু ফাঁক ক'রে ব্যস্তভাবে জিজ্ঞাসা ক'রে—"কি গো, এখনো চা হ'ল না? তোমার চা খাওয়াতে ওদের ট্রেন ফেল করিয়ে ছাড়বে নাকি?"

"তা হ'লই বা ট্রেন ফেল। জলে তো আর পড়েনি। একটা রাত আমরা জায়গা দিতে পারব।"

শশিভূষণ এবার আরো একটু ব্যস্তভাবে ঘরেই এসে দাঁড়ায়। "না না, তুমি বুঝতে পারছ না..."

শশিভূষণকে কথাটা শেষ করতে না দিয়ে বাসন্তী একটু ঝংকার দিয়েই বলে, "বুঝতে খুব পারছি কিন্তু কি করব বলো। দুটো বৈ দশটা হাত তো আর নেই!"

শশিভূষণের এতক্ষণে স্টোভটার দিকে দৃষ্টি পড়ে। অত্যন্ত উদ্বিগ্নভাবে সে বলে, "তুমি আবার এই স্টোভ বার করেছ?"

"বার করব না তো কি করব? একটা উনুনে এত তাড়াতাড়ি সব-কিছু হয়?"—শশিভূষণের দিকে চেয়ে তারপর একটু হেসে সে বলে—"তোমার অতিথিকে শুধু চা দিয়ে তো আর বিদেয় করতে পারি না।"

কথাটায় প্রচ্ছন্ন একটু খোঁচা ছিল কি না কে জানে!

শশিভূষণের দৃষ্টি কিন্তু তখনও স্টোভটার দিকে। চিন্তিতভাবে বলে, "স্টোভটা কিন্তু না জ্বাললেই পারতে।"

"আচ্ছা আচ্ছা, তোমাকে অত ভাবতে হবে না। এদিকে তাড়াতাড়িও চাই, আবার স্টোভ ধরালেও ভাবনা। যাও, তুমি ততক্ষণ গল্প করগে যাও দেখি! আমি এখুনি চা নিয়ে যাচ্ছি।"

"কিন্তু তার আগে আমিই না এসে পারলাম না। আচ্ছা, এসব হচ্ছে কি বলুন তো বউদি?" মল্লিকা এসে বোধ হয় জুতো পায়ে থাকার দরুন চৌকাঠের ওপারেই দাঁড়ায়।

মল্লিকার সঙ্গে আলাপ-পরিচয় অনেকক্ষণ হয়েছে, তবু বউদি ডাকটা একেবারে নতুন। বাসন্তীর উত্তর দিতে তাই বোধ হয় একটু দেরি হয়। মল্লিকার দিকে খানিক চেয়ে থেকে সে বলে—"কি আর হচ্ছে ভাই। কিছুই তো পারলাম না।"

মল্লিকা জুতোটা খুলে এবার ঘরেই এসে বাসন্তীর পাশে ব'সে পড়ে।

"আহা শুধু মাটিতে বসলে কেন,"—ব'লে বাসন্তী একটা আসন তাড়াতাড়ি এগিয়ে দেয়।

আসনটা সরিয়ে রেখে মল্লিকা বলে—"থাক, শুধু মাটিতে বসলে আমার

মান যাবে না। কিন্তু আপনি যে রীতিমতো কুটুম্বিতে শুরু ক'রে দিলেন! তবু যদি নিজে থেকে খোঁজ ক'রে না আসতে হ'ত।"

বাসন্তী স্বামীর দিকে একবার চকিত কটাক্ষ নিক্ষেপ ক'রে বলে—"সে-দোষ তো ভাই আমার নয়।"

এতক্ষণ নাগাড়ে পাম্প দেওয়ার পর স্টোভটা ধ'রে উঠেছে। চায়ের কেট-লিটা তার ওপর চাপিয়ে দিয়ে বাসন্তী উঠে পড়ে, বলে—"আমায় একটু রান্না-ঘরে যেতে হচ্ছে ভাই। আপনারা ব'সে ততক্ষণ গল্প করুন।"

বাসন্তী উঠে চ'লে যায়। মল্লিকা মাথা নিচু ক'রে ব'সে থাকে। শশিভূষণ আড়ষ্টভাবে দাঁড়িয়ে থেকে ঠিক কি করা উচিত বুঝতে পারে না। স্টোভের সাইলেন্সারটাও খারাপ। তার একঘেয়ে কর্কশ শব্দ বেশ একটু অস্বস্তিকর।

মল্লিকা মাথা নিচু ক'রেই হঠাৎ ঈষৎ চাপা-গলায় বলে—"এভাবে এসে বোধ হয় ভালো করিনি।"

কথাগুলো আরো মৃদুস্বরেই মল্লিকা বুঝি বলতে চেয়েছিল। স্টোভের আওয়াজের দরুন গলাটাকে একটু বেশি চড়াতে হয়। মনে হয়, কথাগুলো যেন উঁচু পর্দায় ওঠার দরুনই মর্যাদা হারায়, কেমন যেন একটু সুলভ হ'য়ে পড়ে।

"না, না, খারাপ আবার কিসের?" শশিভূষণ কেমন একটু আড়ষ্টভাবেই জবাব দেয়। কিন্তু জবাবটা ঠিক এভাবে মল্লিকা আশা করেনি। এবার শশি-ভূষণের মুখের দিকে চোখ তুলে সে বলে, "কেন যে এতদিন বাদে এ-খেয়াল হ'ল নিজেই জানি না, অথচ এই লাইনে আরো দু-তিনবার গেছি। গাড়ি বদলাবার জন্যে স্টেশনে অপেক্ষাও করেছি চার-পাঁচ ঘণ্টা। তখনও জানতাম তোমরা এখানেই আছ।"

শশিভূষণ কোনো জবাব দেয় না।

স্টোভটা হঠাৎ দপদপ ক'রে ওঠে, তারপর আঁচটা কেমন নিবে যায়। বোধ হয় নিজের অজ্ঞাতেই মল্লিকা একটু স'রে ব'সে পাম্প দিতে আরম্ভ করে। স্টোভের শিখাটা বেড়ে ওঠার সঙ্গে-সঙ্গে কর্কশ আওয়াজটায় সমস্ত ঘর ভ'রে যায়।

হঠাৎ শশিভূষণ অত্যন্ত ব্যস্ত হ'য়ে বলে, "আরে আরে করছ কি? অত পাম্প দিয়ো না।"

পাম্পটা থামিয়ে মল্লিকা শশিভূষণের দিকে চেয়ে একটু অবাক হ'য়েই জিজ্ঞাসা করে—"কেন?"

"মানে, স্টোভটা অনেক দিনের পুরনো, খারাপ হ'য়ে গেছে। হঠাৎ ফেটে যেতে পাবে।"

শশিভূষণের চোখে পরিপূর্ণ স্থির দৃষ্টি রেখে মল্লিকা বলে, "তা হ'লে ভয়ানক একটা কেলেঙ্কারি হয়—না?"

শশিভূষণ কেমন একটু সংকুচিতভাবে চোখটা সরিয়ে নেয়।

মল্লিকা কিন্তু চোখ না নামিয়েই আবার বলে, "তোমার স্ত্রী মানে বউদি তো এই স্টোভেই জ্বলেন?"

শশিভূষণ অন্যদিকে চেয়েই বলে—"না খারাপ হ'য়ে গেছে ব'লে এটা ব্যবহারই হয় না। আজ কেন যে বার করেছে কে জানে।"

"ও" ব'লে মল্লিকা এবার মাথা নিচু ক'রে খানিকক্ষণ চুপ ক'রে থাকে।

হঠাৎ শশিভূষণ চমকে উঠে বলে—"ও কি, হচ্ছে কি? বলছি পাম্প দিয়ো না, বিপদ হ'তে পারে।"

স্টোভের আওয়াজের দরুন শশিভূষণকে কথাগুলো বেশ চেঁচিয়েই বলতে হয়। বাসন্তী তখন রান্নাঘর থেকে বড়ো একটা থালা হাতে নিয়ে দরজায় এসে দাঁড়িয়েছে, একটু হেসে জিজ্ঞাসা করে—"বিপদ আবার কি হ'ল?"

মুখ ফিরিয়ে বাসন্তীর দিকে চেয়ে মল্লিকা সকৌতুক হাসির সঙ্গে বলে—"দেখুন তো বউদি! আপনার স্টোভে একটু বেশি পাম্প দিলেই নাকি বিপদ হবে! স্টোভটা কি অতই খারাপ নাকি?"

বাসন্তী স্বামীর দিকে একবার তাকায়, তারপর রান্নাঘর থেকে আনা গরম খাবারের থালাটা ছোটো টেবিলটার উপর রেখে বলে—"খারাপ হ'তে যাবে কেন? ও'র ওইরকম অদ্ভুত ধারণা। একটু পুরনো হ'লেই বুঝি স্টোভ অচল হ'য়ে যায়!"

"আমিও তাই বলি।" মল্লিকা সমানে স্টোভটায় পাম্প দিতে থাকে। কেটলির তলা থেকে নীল আগুনের শিখা হিংস্র গর্জন ক'রে চারিধারে যেন ফণা তোলে।

শশিভূষণ কি বলতে গিয়ে যেন বলতে পারে না। কেমন একটু ভীত অসহায়ভাবে বাসন্তীর দিকে তাকায়। বাসন্তী তবু চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে।

হঠাৎ শশিভূষণ ঘর থেকে বেরিয়ে যায়। বাসন্তী একটু হেসে মল্লিকার পাশে ব'সে পড়ে, স্টোভটা একটু সরিয়ে নিয়ে বলে—"থাক ভাই থাক, আর দরকার নেই। দু-দণ্ডের জন্যে দেখা করতে এসে অত খাটলে আমাদের যে লজ্জা রাখবার জায়গা থাকবে না। আপনি ও-ঘরে গিয়ে বসুন, আমি এখুনি চা নিয়ে যাচ্ছি। আপনার ভাই বোধ হয় এতক্ষণ একা-একা অতিষ্ঠ হ'য়ে উঠেছেন।"

মল্লিকা সব কথা শুনতে পায় কিনা কে জানে। হঠাৎ যেন অত্যন্ত লজ্জিত হ'য়ে সে বলে—"আপনি বোধ হয় ভয় পাচ্ছিলেন যে স্টোভটা আমি ফাটিয়েই দিলাম।"

"না, ভয় পাব কেন? ফাটবার হ'লে ও-স্টোভ অনেক আগেই ফাটত!" বাসন্তী গলার সুরটা তারপর পাল্টে বলে—"আপনাকে কিন্তু সত্যিই এবার উঠে ও-ঘরে যেতে হবে। এমনিতেই অতিথি-সৎকারের যথেষ্ট ত্রুটি হ'য়ে গেছে।"

"না, আপনি লৌকিকতার চরম ক'রে ছাড়লেন।" —ব'লে মল্লিকা এবার পাশের ঘরে চ'লে যায়।

স্টোভের আওয়াজটা পাশের ঘরেও বেশ প্রচণ্ড। তবে একেবারে অত দুঃসহ নয়। মল্লিকার পায়ের শব্দ তাই বোধ হয় শশিভূষণ শুনতে পায় না। একেবারে কাছে গিয়ে দাঁড়াবার পর চমকে মুখ তুলে তাকায়। তারপর কেমন যেন একটু সংকুচিতভাবে বলে—"তোমায় ভাই আবার একটু ঘুরে বেড়াতে গেল। ট্রেনের সময় হ'য়ে যাবে ব'লে ভয় দেখালাম—তবু শুনল না।"

"তা থাকগে। তোমার ভয় নেই। ট্রেন আমরা কিছুতেই ফেল করব না।" কথাটা কোনোরকম ঝাঁজ না দিয়েই মল্লিকা বলে। তারপর শশিভূষণের

দিকে তীক্ষ্ম দৃষ্টিতে না তাকিয়েও পারে না। শশিভূষণ কি এ-কথারও একটা উত্তর দিতে পারে না?

শশিভূষণ কিন্তু নীরবে অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে থাকে। মল্লিকার ইচ্ছে হয়, হঠাৎ চিৎকার ক'রে বলে—'তোমার ভয় নেই, ভয় নেই। পাঁচ বছর বাদে আজ হঠাৎ তোমার সংসারে ভাঙন ধরাব ব'লে আমি আসিনি। তবে আগুন অনেক দিন নিবে গেলেও একটা দুটো স্ফুলিঙ্গ হয়তো এখনো আছে, নির্লজ্জের মতো এই আশাই করেছিলাম।'

এসব কিছুই সে বলে না অবশ্য। নিতান্ত সহজভাবেই সাধারণ আলাপ করবার চেষ্টা করে—"তোমার এখানকার চাকরি তো প্রায় চার বছর হ'ল—না?"

"হ্যাঁ, প্রায় তাই।"

"ভালো লাগে এইরকম মফস্বল শহরে প'ড়ে থাকতে?"

"না লাগলে উপায় কি? কলকাতায় কোনো কলেজে চাকরি পাওয়া তো সোজা নয়।"

উপায় কি? ঠিক শশিভূষণেরই যোগ্য উত্তর। এই শশিভূষণের সত্যকার চরিত্র। চিরকাল ভাগ্যের কাছে আগে থাকতে হার মেনে সে ব'সে আছে। স্রোতের বিরুদ্ধে একটিবার রুখে দাঁড়াবার সাহসও তার নেই। পাঁচ বৎসর আগেও এমনি ক'রেই সে দুর্বলভাবে নিজেকে ভাগ্যের হাতে ছেড়ে দিয়েছিল। সেদিন এতটুকু দৃঢ়তা তার মধ্যে থাকলে হয়তো তাদের জীবনের ইতিহাস আর এরকম হ'তে পারত।

সেদিনটা এখনো তার ভালো ক'রেই মনে আছে। অনেক ভেবে-চিন্তে মিউজিয়মের একটা ঘর তখন তারা পরস্পরের সঙ্গে দেখা করবার জন্যে ঠিক ক'রে নিয়েছিল। কলেজে দেখা হ'লেও কথা বলা সমীচীন নয়। তাই সময় ও সুবিধা হ'লেই একজন আরেকজনের জন্যে এই ঘরটিতে এসে অপেক্ষা করত। মিউজিয়মের সেটা পাথুরে নমুনার ঘর। তাদের জীবনের অনেক উদ্বেল মুহূর্তের সাক্ষী এই ঘর। বারবার পৃথিবীর নিদারুণ চাপে, বারবার সর্বনাশা প্রলয়ের আগুনে যত মাটি নিষ্পেষিত দগ্ধ হ'য়ে আশ্চর্য পাথর হ'য়ে গেছে, গ্রহলোক থেকে যত জলন্ত উল্কাপিণ্ড তার কঙ্কালাবশেষ পৃথিবীতে ফেলে গেছে, সে-ঘরে তারই নিদর্শন সঞ্চিত।

সেদিন মল্লিকাকে অপেক্ষা করতে হয়েছে অনেকক্ষণ। বিশাল ঘরের সব ক'টা নিদর্শন দু-তিনবার ঘুরে দেখেও আর সময় ফুরোতে চায়নি। নির্দিষ্ট সময়ের অনেক পরে শশিভূষণ ঘরে ঢুকেছিল। তার মুখ দেখেই মল্লিকার যেন কিছু বুঝতে আর বাকি থাকেনি। তবু সে এ-হতাশাকে আমল দিতে চায়নি।

খানিকক্ষণ কেউই কোনো কথা বলেনি। নিঃশব্দে একটু ঘোরবার পর মল্লিকাই আর থাকতে পারেনি। সমস্ত সংকোচ জয় ক'রে নিজেই জিজ্ঞাসা করেছে—"কি বললেন?"

"মা?" শশিভূষণ যেন চমকে গেছে একটু। তারপর চুপ ক'রে থেকে মুখ ফিরিয়ে বলেছে—"মাকে কিছু বলিনি এখনো।"

মল্লিকা স্তব্ধ হ'য়ে গেছে একেবারে। শশিভূষণই আবার ক্লান্ত হতাশ স্বরে বলেছে—"মার শরীর খুব খারাপ। আজই দেওঘরে যাচ্ছেন কিছুদিন

চেক্কের জন্য।”

অনেকক্ষণ, প্রায় যেন এক যুগ স্তব্ধ হ'য়ে থাকবার পর মল্লিকা অর্ধস্ফুট স্বরে জিজ্ঞাসা করেছে, “তুমি,—তুমিও যাচ্ছ নাকি?”

একটু ইতস্তত ক'রে শশিভূষণ বলেছে, “মা যেতে বলেছেন। তা ছাড়া —তা ছাড়া ভাবছি যা-কিছু বলার সেখানে বললেই সুবিধে হবে।”

মল্লিকা আর কোনো কথা বলেনি। সে যেন বুঝতে পেরেছে সমস্ত প্রশ্নের প্রয়োজন তখনই শেষ হ'য়ে গেছে।

শশিভূষণই খানিক বাদে বলেছে—“আমি না বললেও বাড়ির সবাই জানে —মাও জানেন।”

এ-কথারও কোনো উত্তর দেওয়ার প্রবৃত্তি মল্লিকার হয়নি। একান্তভাবে ছোটো একটা উল্কাপিণ্ডের নমুনার দিকে মনোনিবেশ ক'রে সে নিজেকে সংযত করবার চেষ্টা করেছে।

শশিভূষণ আবার বলেছে, অত্যন্ত অপরাধীর মতো—“শরীর খারাপের ওপর মা হয়তো বড়ো বেশি বিচলিত হ'য়ে উঠবেন, এই ভয়েই এখনো কিছু বলিনি। আমি জানি, মাকে আমি শেষ পর্যন্ত বোঝাতে পারব।”

একটা জ্বালাময় উত্তর মল্লিকার বুক থেকে কণ্ঠ পর্যন্ত উথলে উঠেছে। শুধু তোমার মাকে বোঝানোটাই কি এত বড়ো! আমার কি বাড়ি-ঘর আত্মীয়-সমাজ কিছু নেই? তোমার মার অনুগ্রহের ভিক্ষার ওপরই কি আমার জীবন নির্ভর করছে?

মল্লিকা কিন্তু নিজেকে সংযত করেছে আবার। এবং সেখানেই বোধ হয় জীবনের চরম ভুল করেছে। শশিভূষণ সেই জাতের মানুষ, নিজের মনকে নিজেই যারা সাহস ক'রে চিনতে চায় না। তাদের পেতে হ'লে জোর ক'রে আঘাত দিয়ে টেনে নিতে হয়। কি ক্ষতি ছিল সেদিন আর একটু নির্লজ্জ হ'য়ে শশিভূষণের এই জড়তা ভেঙে চুরমার ক'রে দিলে? সে জানে, সেদিন চেষ্টা করলে শশিভূষণকে সে আর ফিরে না যেতে দিতে পারত। শশিভূষণের নিজের মধ্যে কোনো প্রেরণা নেই? কিন্তু ইচ্ছে করলে সমস্ত বাধা, সমস্ত সংস্কারের বিরুদ্ধে দাঁড়াবার শক্তি মল্লিকাই তার মধ্যে সঞ্চারিত ক'রে দিতে পারত। দেয়নি শুধু নারীসুলভ সংকোচ আর লজ্জায়, আর বুঝি একটু আহত অভিমানে। কী ভুলই সেদিন করেছে!

কিন্তু সত্যি ভুল করেছে কি? চকিতে এ-প্রশ্ন তার মনের সমস্ত দিগন্ত যেন একটা নতুন আলোয় উদ্ভাসিত ক'রে দেয়। এই আত্মবিশ্বাসহীন অসহায় দুর্বল মানুষটির জন্যে গত পাঁচ বছর ধ'রে প্রতিটি মুহূর্তে সে নিঃশব্দে পুড়ে-পুড়ে খাক হয়েছে, কিন্তু সত্যি একে জয় ক'রে নিলে সে কি সুখী হ'ত? ভিজে সলতেয় সারা জীবন ধ'রে আগুন ধরিয়ে রাখার ব্রত ক্রমশ একদিন দুর্বহ হ'য়ে উঠত না কি?

“স্টোভটার আওয়াজটা বড়ো বিশ্রী শোনাচ্ছে না?”—শশিভূষণের কথায় মল্লিকার চমক ভাঙে।

অদ্ভুতভাবে হেসে বলে—“ভয় হচ্ছে নাকি! কিন্তু বউদি তো বললেন স্টোভ মোটেই খারাপ নয়।”

কেটলির জল ফুটে উঠে স্টোভের উপর উথলে পড়তেই বাসন্তীর যেন

হুঁশ হয়। কেটলিটা নামিয়ে চায়ের পটে জল ঢেলে স্টোভটা নিবিয়ে দেবার জন্যে সে চাবিটার দিকে হাত বাড়ায়। কিন্তু হঠাৎ একটা কথা মনে প'ড়ে যাওয়ায় চাবি ঘোরানো আর হয় না।

সত্যিই কি স্টোভটা আজ হঠাৎ এই মুহূর্তে ফেটে যেতে পারে? ভাগ্যের সঙ্গে এ-বাজি খেলবার সাহস তার আছে কি? একদিন ছিল। সেদিন সত্যিই এই স্টোভটাই সে শেষ-মুক্তির পথ ব'লে ঠিক ক'রে রেখেছিল। কেউ কিছু জানবে না, কিছু বুঝবে না, কোনো অপবাদ কারুর গায়ে লাগবে না। সবাই জানবে শুধু একটা দুর্ঘটনা হ'ল।

সেদিন অত বড়ো নিদারুণ সংকল্প তাকে করতে হয়েছিল শুধু এই মল্লিকার জন্যে, ভাবতে এখন তার আশ্চর্য লাগে। মল্লিকাকে সে চোখে দেখেনি, তার একটা ছবি পর্যন্ত নয়। কিন্তু এ-বাড়িতে প্রথম পদার্পণের সঙ্গে-সঙ্গে শুভানুধ্যায়ীদের কল্যাণে ওই একটি নাম তার দিনরাত্রি বিষাক্ত ক'রে তুলেছে।

মল্লিকাকে সে কিভাবেই না কল্পনা করেছে! সে-কল্পনার সঙ্গে আজকের এই চাক্ষুষ পরিচয়ের এত তফাত হবে সে ভাবতেও পারেনি। মল্লিকাকে কুশ্রী বলা চলে না। কিন্তু সে-রূপও তার নেই যাতে পুরুষের মনে অনির্বাণ আগুন জ্বালিয়ে রাখতে পারে। লেখাপড়া শেখা আধুনিক মেয়ে ব'লে সাজসজ্জার একটা পরিচ্ছন্নতা আছে, কিন্তু সেই সঙ্গে বয়সের ছাপটাও একেবারে আর লুকোনো নেই। স্বামীর সঙ্গে একসঙ্গে কলেজে পড়ত, সুতরাং বয়স নেহাত কম তো হ'ল না।

স্বামীর কাছে মল্লিকার নাম সে বিয়ের পর কোনোদিন শোনেনি, কিন্তু আর পাঁচজন হিতৈষী তো আছে, সাবধান করবার, পরামর্শ দেবার।

ফুলশয্যার রাত্রেই তাকে সাজিয়ে, গুজিয়ে ঘরে পাঠাবার আগে আর সব মেয়েদের উদ্দেশ ক'রে এক ঠানদি সম্পর্কীয়া প্রৌঢ়া সেকেলে অভদ্র রসিকতা ক'রে বলছিলেন—"ওরে সাজিয়ে তো দিলি, সঙ্গে একটা শিকলি দিয়েছিস তো? নইলে ও উড়ো পাখিকে বাঁধবে কি দিয়ে?"

প্রথমটা কিছু বুঝতে না পেরে শুধু রসিকতার ধরনে বাসন্তী লজ্জায় লাল হ'য়ে উঠেছিল। কিন্তু বোঝানোই যাদের আনন্দ তারা না বুঝিয়ে ছাড়বে কেন? একটু-একটু ক'রে কিছুই তার প্রায় শুনতে বাকি থাকেনি।

স্বামীর মুখে একবার-আধবার মল্লিকার নাম শুনলে সে বোধ হয় অতটা আহত হ'ত না যতটা হয়েছে তাঁর আপাতনির্বিকার নীরবতায়। কতদিন বিছানায় স্বামীকে চুপ ক'রে শুয়ে থাকতে দেখে তার বুকের ভেতরটা জ্বালা ক'রে উঠেছে। হয়তো—হয়তো কেন, নিশ্চয়ই স্বামী এখন মল্লিকার কথাই ভাবছেন।

মল্লিকাই যদি তোমার দিবারাত্রির ধ্যান তো আমায় বিয়ে করতে গেছলে কেন?—ইতরের মতো ঝগড়া ক'রে এ-কথা বলতে পারলে বুঝি খানিকটা বুকের জ্বালা কমত। কিন্তু তার বদলে সে বিছানা ছেড়ে উঠে দরজা খুলে বাইরে চলে গেছে।

শশিভূষণ খিল খোলার শব্দে একটু চমকে জিজ্ঞাসা করেছে—"যাচ্ছ কোথায়?"

"বাইরে বারান্দায় যাচ্ছি।"

ব্যস, আর কিছু বলবার দরকার হয়নি। হঠাৎ বারান্দায় যাবার কোনো কারণই স্বামী জানতে চান না। তাঁর কোনো কৌতূহল নেই। বাসন্তীর মনে হয়েছে যে, সে যদি বলত, "গঙ্গায় ডুবে মরতে যাচ্ছি" তা হ'লেও স্বামী বোধ হয় শুধু একটু 'ও' বলে নিশ্চিত মনে চুপ ক'রে থাকতেন। অসহ্য, অসহ্য এই নির্বিকার ঔদাসীন্য, এর চেয়ে সুস্পষ্ট অপমানও ঢের ভালো ছিল।

একদিন এই স্টোভের সামনে ব'সেই তাই তার মনে হয়েছে, কি ক্ষতি হয় সব একেবারে শেষ ক'রে দিলে। শাশুড়ী তখনও বেঁচে। তাকে স্টোভ জ্বালিয়ে চা করতে দেখে খানিক আগেই তিনি সাবধান ক'রে গেছেন—'ও-স্টোভটা তুমি কেন আবার জ্বালতে গেলে বউমা? ওটা খারাপ হ'য়ে গেছে ব'লে আমি কাউকে ছুঁতেই দিই না। দেখো বাপু ফেটে-টেটে আবার একটা কেলেঙ্কারি না হয়।'

ফেটে গিয়ে কেলেঙ্কারি! হ্যাঁ, এরকম দুর্ঘটনা খুব নতুন নয়। বাসন্তী প্রাণপণে স্টোভটায় পাম্প দিয়েছে। কোনো দুর্ঘটনাই কিন্তু ঘটেনি।

তারপর ধীরে-ধীরে কবে থেকে যে সব বদলে গেছে, বাসন্তী ঠিক স্মরণ করতেই পারে না। কিন্তু ক্রমশই তার মনে হয়েছে, এই একান্ত অসহায় পরনির্ভর মানুষটি, এক-পা যে তার সাহায্য বিনা চলতে পারে না, নিজের অসুখটা পর্যন্ত যার বাসন্তীর কাছে জেনে নিতে হয়, গভীর কোনো ভালো-বাসা তার মনে চিরন্তন হ'য়ে আছে এ কি বিশ্বাস করবার যোগ্য? যার মনের, হৃদয়ের সমস্ত ব্যাপার আজ বাসন্তীর কাছে জলের মতো স্বচ্ছ, এমন কোন আশ্চর্য গোপন স্থান তার কোথাও কি থাকতে পারে যেখানে অত বড়ো ভালোবাসা নিঃশব্দে গোপন ক'রে রাখা যায়? কোনোদিন কোনো রং যদি শশিভূষণের মনে লেগে থাকে, বাসন্তী স্থির বিশ্বাসে জানে যে, সে-রং অনেক আগেই ধুয়ে-মুছে নিশ্চিহ্ন হ'য়ে গেছে।

একদিন সে নিজেই তাই মল্লিকার কথা তুলেছে স্বামীর কাছে।

"ওগো এখানে গোকুলপুরের মেয়েদের স্কুলে নতুন কে হেড মিস্ট্রেস হয়েছেন জানো? তোমাদের সেই মল্লিকা রায়।"

মল্লিকা সম্বন্ধে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে আলাপ এই প্রথম। তবু বাসন্তীর কথায় বা কথার ধরনে শশিভূষণের কোনো ভাবান্তরই চোখে পড়ে না। নিতান্ত স্বাভাবিকভাবেই সে বলে—"হ্যাঁ, শুনেছি।"

এতটা নির্লিপ্ততা বুঝি বাসন্তীও আশা করেনি। সে আবার একটু খোঁচা দেবার জন্যেই বলে—"আমাদের এই জংশন স্টেশনেই তো গাড়ি বদল ক'রে যেতে হয়। একবার আসতে বলো না কেন?"

"কি জন্যে?" শশিভূষণ যেন একটু অবাক হ'য়েই জিজ্ঞাসা করেছে।

"কি জন্যে আবার! একবার একটু দেখতাম।"—ব'লে বাসন্তী সেখান থেকে চ'লে গেছে।

শশিভূষণ আসতে অবশ্য বলেনি। মল্লিকা আজ এতদিন বাদে নিজে থেকেই এসেছে। না, সত্যিই কোনো জ্বালা, কোনো সংশয় বাসন্তীর মনে আর নেই। সে বরং খুশী হয়েছে মনে-মনে। তার এই পরিপূর্ণ সৌভাগ্যের দিন

মল্লিকাকে সে এনে দেখাতে চেয়েছিল। যত জ্বালা সে এতদিন পেয়েছে এ যেন তারই ঋণশোধ।

ও-ঘরে ব'সে এখনও ওরা গল্প করছে। কি গল্প করছে কে জানে? যাই করুক কিছু আসে যায় না। বাসন্তী জানে তার কোনো ভয় আর নেই।

ঠিক এই মুহূর্তে স্টোভটা কি ফেটে যেতে পারে?

হঠাৎ একটা কথা মনে প'ড়ে যাওয়ায় বাসন্তী চমকে ওঠে। কি ভাববে তা হ'লে মল্লিকা? কি ভুল ধারণাই না সে করতে পারে! অনায়াসেই ভাবতে পারে এই নিদারুণ নাটকীয় পরিণামের সেই বুঝি মূল। বুঝি সে আসাতেই বহুদিনের নিরুদ্ধ বেদনার এই আত্মঘাতী বিস্ফোরণ!

না, না, এ মিথ্যে গৌরবের সুযোগ কিছুতেই মল্লিকাকে দেওয়া যায় না। স্টোভটা নেবাবার জন্যে বাসন্তী চাবিটাকে ঘোরাতে যায়। হঠাৎ চাবিটা এত এ'টে গেলই বা কি ক'রে? বাসন্তী সমস্ত শক্তি দিয়েও সেটা ঘোরাতে পারে না। হঠাৎ ভয় পেয়ে তার মনে হয় শশিভূষণকে ডাকবে কিনা! কিন্তু না, সে বড়ো লজ্জার ব্যাপার। তা হ'লে মল্লিকার কাছে মান থাকে না।

স্টোভটা কিন্তু সত্যি যেন উন্মাদের মতো হিংস্র গর্জন করছে। উঠে কোথাও স'রে যাবার কথাও বাসন্তী ভাবতে পারে না। প্রাণপণ শক্তিতে সে চাবিটা খোলবার চেষ্টা করে। কিছুতেই—কিছুতেই আজ কোনো দুর্ঘটনা যে ঘটতে দেওয়া যায় না।

স্বর্ণময়ীর রাত্রে অমন অনেকবার ঘুম ভাঙে। ঘুম তাঁর অত্যন্ত পাতলা। ঘুম পাতলা না হ'য়ে উপায় কি? গত চার বছর তাঁকে সারারাত অনেকরকমে হুঁশিয়ার থাকতে হয়েছে। বেণুর শোয়া ভালো নয়। মাথায় তার বালিশ থাকে না। শীতের রাতে লেপ স'রে যায় গা থেকে। কুণ্ডলি পাকিয়ে খাটের এক কোণে হয়তো দেখা যায় সে অকাতরে ঘুমচ্ছে। আর মিলির রাতে জল চাই অনেকবার। ঘুম ভাঙবামাত্র আবার তার আলো না দেখতে পেলে ভয় করে। অথচ ঘরে আলো জেবলে রেখে ঘুমবার উপায় নেই। বেণুর চোখের পাতা তা হ'লে আর বুজবে না। তা ছাড়া ঘরে বাতি জেবলে রাখা নাকি খারাপ। বিশেষত—শীতের রাত্রে দরজা-জানালা-বন্ধ ঘরে। স্বর্ণময়ীকে বালিশের তলায় দেশলাই ঠিক রাখতে হয়। আলো, জলের কুঁজো, গেলাস রাখতে হয় মজুত মাথার কাছে। রাত্রে ক্ষণে-ক্ষণে উঠতে হয়। মিলি হয়তো লেপে মাথা পর্যন্ত ঢাকা দিয়ে হাঁফিয়ে উঠেছে। বেণুর মাথাটা হয়তো খাট থেকে ঝুলে পড়েছে। অনেক কিছু অনেকবার রাত্রে জেগে স্বর্ণময়ীকে খোঁজ করতে হয়। ঘুম তাঁর তো পাতলা হবেই। গত চার বছর ধ'রে তিনি ভালো ক'রে আর কবে ঘুমিয়েছেন!

আর গত চার বছরই বা কেন? সারাজীবনই তো তাঁকে সজাগ থাকতে হয়েছে। সমস্ত সংসারের ওপর সজাগ। স্বামী ছিলেন আপন-ভোলা লোক। পয়সা রোজগার ক'রে এনে দিয়েই খালাস। তারপর আর তাঁর দায় নেই। দায় নেবার ক্ষমতাও ছিল না। চাকরির বাইরে তিনি একেবারে অসহায় শিশু। স্বর্ণময়ীর তিন ছেলে দুই মেয়ে। তার ওপর এই আরেকটি শিশুর ভার তাঁকে নিতে হয়েছিল। সকলের চেয়ে অসহায় এই শিশুটি।

"হ্যাঁ গা, নবীন ময়রা যে কিসের দাম চাইতে এসেছিল!"

"তা, দাম দিয়েছ তো?"

স্বামী একটু গর্বভরেই বুঝি বলেছেন—"আমি অত আলগা নাকি? না জেনে শুনেই দাম দিয়ে দেব! কিসের দাম আগে খোঁজ করতে হবে না!"

স্বর্ণময়ী খানিক অবাক হ'য়ে তাকিয়ে থেকে বলেছেন—"বাঃ, কিসের দাম তুমি জানো না? উমার শ্বশুরবাড়িতে পুজোর তত্ত্বের খাবার কোথা থেকে গিয়েছিল?"

"ওঃ তাই! তা, এই দেখো না হিসেবটা।"

স্বর্ণময়ী বিরক্ত হয়েছেন একটু—"কেন, হিসেবটা তুমি দেখতে পারো না বেটাছেলে হ'য়ে! আমি ওসব পারব না।"

স্বামী একটু কুণ্ঠিত হ'য়ে প'ড়ে বলেছেন—"আচ্ছা, আচ্ছা, আমিই দেখব'খন। এখন থাক তোমার কাছে।"

স্বামী যে কত দেখবেন স্বর্ণময়ীর তা জানা। তিনি অপ্রসন্ন মুখে হিসেবটা নিয়েছেন। তারপর ব্যবস্থাও করেছেন নিশ্চয়।

ব্যবস্থা এমন সব-কিছুর তাঁকে করতে হয়েছে। সারাজীবন ধ'রে করতে

হয়েছে।

"হ্যাঁ গো, জামা-কাপড়ের দোকানে খবর দিতে বলেছিলাম, দিয়েছিলে তো? তোমার কোট সব ক'টা ছিঁড়ে এসেছে, খোকার ক'টা নিকারবোকার দরকার! বিনয়ের আর দুটো পাঞ্জাবি না হ'লে চলবে না! এখনো মাপ নিতে এল না কেন?"

"বলেছিলাম তো।"—ব'লে স্বামী সেখান থেকে স'রে পড়েছেন। স্বর্ণময়ীকে অবশ্য তারপর নিজে থেকেই ব্যবস্থা করতে হয়েছে।

বিরক্ত হ'য়ে এক-একসময় তিনি অবশ্য বলেছেন—"পুরুষমানুষ হয়েছিলে কি করতে বলো তো? ঘরে বাইরে এত আমি তদারক করতে পারব না! দোতলার ঘর তোলবার কি দরকার ছিল, যদি চুন-সুরকিটা পর্যন্ত আনাবার ব্যবস্থা না করতে পারো? কোথায় জানালা ফোটানো হবে, কোথায় দরজা বসবে তাও কি আমি ব'লে দেব রাজ-মজুরকে?"

কিন্তু এ-বিরক্তি ক্ষণিক, এ-বিরক্তি বাহ্যিক। সত্যি সংসারের এত ভার বহন ক'রেও স্বর্ণময়ী ক্লান্ত হননি। ক্লান্ত হওয়া দূরে থাক, এই ভার বহনেই তাঁর বুঝি আনন্দ। এই তাঁর জীবন। এই ষাট বছর বয়স পর্যন্ত জীবন বলতে তিনি এই বুঝে এসেছেন। সমস্ত ভার নিজের স্কন্ধে তুলে নিয়ে এই সংসারটিকে গ'ড়ে তোলার কাজেই সম্পূর্ণরূপে তিনি নিজেকে নিয়োগ করেছেন। এবং সেজন্যে দুঃখ করবারও কিছু নেই। সংসার তাঁর আজ সকল দিক দিয়ে পরিপূর্ণ। ধনে জনে দিন-দিন তাঁরই সতর্ক দৃষ্টির ওপর এই পরিবারটি সমৃদ্ধ হ'য়ে উঠেছে। সব দিকে তার ঐশ্বর্য না হোক, সচ্ছলতা, সব দিকে সুশৃঙ্খলা। দুঃখ, শোক, ক্ষতির সঙ্গে একেবারে যে পরিচয় ঘটেনি তা নয়। কিন্তু তা বুঝি সামান্য, তা জীবনের অপরিহার্য অংশ হিসেবে সহ্য করতেই হয়। গভীরভাবে সেসব ক্ষতি তাঁকে স্পর্শ করেনি বোধ হয়।

স্বামী পরিণত বয়সে মারা গেলেন। স্বর্ণময়ী মাটিতে লুটিয়ে প'ড়ে কেঁদেছেন, পাকা মাথার সিঁদুর মুছেছেন শিরে করাঘাত করতে-করতে। তারপর আবার উঠেছেন বিনয়ের ছেলেকে দুধ খাওয়াতে। বড়ো বউকে ধমকে বলেছেন—"ছেলেটাকে বাঁচতে দেবে না তুমি বউমা। বাছার পেট একেবারে ভুঁয়ে প'ড়ে গেছে! কোন যুগে খাইয়েছিলে বলো তো?"

আরো একটু কঠিন আঘাত বুঝি পেয়েছিলেন ছোটো মেয়ের বেলা। একটিমাত্র ছেলে রেখে অত্যন্ত অল্প বয়সে সে তাঁকে কাঁদিয়ে গেছে।

একদিন স্বর্ণময়ী বিছানা থেকে ওঠেননি। তার পরদিন বড়ো ছেলেকে বলেছিলেন, "এখানে আমি থাকব না, আমায় কোনো তীর্থে পাঠিয়ে দে।"

তীর্থে যাওয়া আর হ'য়ে ওঠেনি। কেমন করে আর হবে? পাঁচ বছরের মা-মরা ছেলে বেণুকে তা হ'লে মানুষ করে কে? ছেলেটা বাঁচলে তবু মায়ের নাম থাকবে। বেণুর বিছানা সেই থেকে তাঁর খাটের ওপর হয়েছে। শুধু বেণুর জন্যেই তাঁর সংসারে থাকা নয়। তিনি না দেখলে এতবড়ো সংসার সামলাবেই বা কে? কারুর ওপর তাঁর বিশ্বাস নেই। নিজে না দেখলে কোনো বিষয়েই তাঁর স্বস্তি নেই। এ-সংসারের সমস্ত দায় ঘাড়ে করা কারো সাধ্য নয়।

ছেলেদেরও বিশ্বাস বুঝি তাই। তাঁর তীর্থযাত্রার কথায় বিনয় তো

তখনই মুখ ভার ক'রে বলেছিল—"বেশ যাও! কিন্তু এখানে কিছু গোলমাল হ'লে আমি জানিনে।"

"গোলমালই বা হবে কেন রে? এখনো তোরা নিজেরা দেখে শুনে সংসার করতে পারবিনে?"

মুখে বললেও স্বর্ণময়ী জানতেন তারা পারবে না। এবং সেইজন্যই তাঁর কোথাও যাওয়া ঘ'টে ওঠেনি।

সংসার তাঁর সকল দিক দিয়ে পরিপূর্ণ। ছেলেরা মানুষ হয়েছে। বিয়ে থা' ক'রে সংসারীও হয়েছে সবাই। পয়সার অনটনও নেই। আর সবচেয়ে যা আনন্দের কথা এ-সংসারে নেই অশান্তি। এমনি ভরা-সুখের সংসার রেখেই নাকি লোকে অবসর গ্রহণ করতে চায়। লোকে সে-কথা বলছেও—"এইবার কাশীবাস করলেই পারো বিনয়ের মা! সংসার তো গুছিয়ে দিয়েছ ছেলে-দের! আর কেন?

স্বর্ণময়ী মুখে হেসে বলেছেন—"যাব বৈকি মা! এমন ক'রে আর সংসারের জঞ্জাল ঘাঁটব কতদিন? আর কি ভালো লাগে!"

কিন্তু ভালো তাঁর সত্যিই লাগে। শুধু ভালো লাগে কেন, এ-সংসার তাঁর নেশা। এ-ভার বহনে তাঁর ক্লান্তি নেই। দীর্ঘ ষাট বছর বয়সেও তাঁর ক্লান্তি আসেনি।

আর এখনো তো তিনি সবল সুস্থ সক্ষম। বউ-এরা এ-বয়সেও তাঁর সঙ্গে খেটে পারে না। এ-কালের মেয়েদের চেয়ে তিনি অনেক শক্ত। সংসার থেকে কি জন্যে তিনি অবসর গ্রহণ করবেন? আর করলে কি চলবে?

স্বর্ণময়ীর সেইখানেই ভয়। তাঁর অবর্তমানে এ-সংসারকে সমস্ত ক্ষতি থেকে কে বাঁচাবে এই ভাবনাতেই তিনি কাতর। তাঁর মনে হয়, তিনি দু-দিন স'রে দাঁড়ালেই এ-সংসারের সমস্ত বাঁধন যাবে আলগা হ'য়ে; সমস্ত দুর্বল স্থান হবে অনাবৃত; যে-সৌভাগ্য যে-সম্পদ তিনি তাঁর সদাসতর্ক দৃষ্টিতে পাহারা দিয়ে এসেছেন, অক্লান্ত পরিশ্রমে তিল-তিল ক'রে যা সঞ্চয় করেছেন, নানা ছিদ্রপথে তা যাবে অচিরে নিঃশেষ হ'য়ে।

না, তাঁর কোথাও যাওয়া হ'তে পারে না। সংসার ছেড়ে তীর্থধর্ম ক'রে যে সুখ পায় পাক। তাঁর তাতে সুখ নেই। তীর্থধর্মের কোনো মানেই তিনি খুঁজে পান না, সত্যি কথা বলতে গেলে। আর তা ছাড়া কোথাও গিয়ে তিনি স্থির হ'য়েই যে থাকতে পারবেন না। সকাল হ'লেই তাঁর মনে হবে —হয়তো রাত্রে বাছুর বাঁধা হয়নি। সকালে গোয়ালা এসে এক ফোঁটা দুধ পাবে না। ছোটো বউমা নিজেও রুগ্ন, তার ছেলেটিও হয়েছে তাই। ছেলেটা দুধ অভাবে টা-টা করবে। হয়তো বাজারের দুধ আনিয়ে খাওয়ানো হবে। তাতে কি অসুখ করবে কে জানে?

শুধু এই একটা ভাবনাই নয়, সমস্ত দিন তাঁর মনে হবে তাঁর তত্ত্বা-বধানের অভাবে সংসারের সমস্ত কাজে হয়তো অসংখ্য ত্রুটি ঘটেছে। বেণুর সর্দিকাসির ধাত। সেইজন্যে জলের প্রতি টানটাও বেশি। হয়তো সে পরমানন্দে বিনা বাধায় চৌবাচ্চার জল নিয়ে মাতছে। বিনয়ের মেয়ে মিলি মার চেয়ে ঠাকুরমার ন্যাওটা বেশি। মেয়েটা আবার অত্যন্ত অভিমানী। তার মর্জি-মেজাজে বুঝে কেউ হয়তো চলেনি। মেয়েটা কেঁদে সারা হচ্ছে। বাজার

ঠিকমতো করতে পাঠানো হয়েছে কিনা, ছেলেদেন স্কুলের ভাত ঠিক সময়ে দেওয়া হয়েছে কিনা, অসুখ শরীরেও ছোটো বউ-এর ওষুধ খাওয়ায় গাফিল—হয়তো সে ঠিকমতো ওষুধ খাচ্ছে না, হয়তো ঝি এ'টো শুধুই বাসন মেজে তুলেছে, হয়তো তেলওয়ালা দুটো দাগ বেশি দিয়ে গেল—ইত্যাদি নানান দুশ্চিন্তা তাঁকে একমুহূর্ত শান্তিতে থাকতে দেবে না, যেখানেই তিনি থাকুন না কেন।

স্বর্ণময়ী তাই ভরা-সুখের সংসার রেখে তীর্থধর্ম করবার সমস্ত সুযোগ পেয়েও গ্রহণ করতে পারেননি। সমস্ত বুক দিয়ে এই সংসার আঁকড়েই প'ড়ে আছেন। নিশ্চিন্ত হ'য়ে দু-দণ্ড তিনি চোখ বুজতে পারেন না। চোখ বুজ-বার তাঁর উপায় কি? সমস্ত সংসার যে তাঁর ওপর নির্ভর ক'রে আছে। তাঁকে যে সজাগ থাকতেই হবে।

কিন্তু,—হ্যাঁ, একটু কিন্তুও আছে—এ-সন্দেহ স্বর্ণময়ীর মনে উদয় হয়েছে মাত্র কিছু দিন। কিন্তু কিছু দিনেই তাঁর সমস্ত জগৎ যেন ওলটপালট হবার উপক্রম হয়েছে।

আজ রাত্রেও ঘুম ভাঙবা মাত্র স্বর্ণময়ী পাশের বিছানায় অভ্যাসমতো হাত বুলিয়ে দেখেন। বেণু, কোথায় গেল বেণু! হয়তো খাটের ধারে গিয়ে পড়েছে একেবারে। এখনই যাবে প'ড়ে। ধড়মড় ক'রে স্বর্ণময়ী বিছানায় উঠে বসেন। তারপরই তাঁর মনে প'ড়ে যায়।

বেণু আর তাঁর কাছে শোয় না। ক'দিন ধ'রে শুচ্ছে না। বেণু বড়ো হয়েছে। বড়ো হওয়ার পৌরুষ-গর্বে সে দিদিমার তত্ত্বাবধানে একান্তভাবে থাকাটা লজ্জাকর মনে করে। কেন তার ভয় কিসের? সেও অনায়াসে একটা বিছানায় একা শুতে পারে। সে তো আর মিলি নয়!

স্বর্ণময়ী হেসে বলেছেন প্রথম দিন—"বউ হ'লে একলা শুবি'খন। তখন বউ তোকে আগলাবে!"

বেণু গম্ভীরভাবে বলেছে—"আমাকে কাউকে আগলাতে হবে না। আমি একলাই শোব। কেন, ছোড়দা তো শোয়।"

ছোড়দা বেণুর মামাতো ভাই—বিনয়ের বড়ো ছেলে। বেণুর চেয়ে সে বছর তিনেকের বড়ো। কিন্তু এরই মধ্যে সে নিজের ঘরে আলাদা শোয়। তার স্বাধীনতা ও সাহসের দৃষ্টান্তই বেণুকে যে উদ্দীপ্ত করেছে এ-বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

বেণু শেষ পর্যন্ত নিজের জেদই বজায় রেখেছে। বাড়িতে অতিরিক্ত ঘর আর বেশি নেই। বাইরের ঘরটা ব্যবহার করা যেতে পারে বটে, কিন্তু সেটা সত্যই বড়ো দূর। বেণুকে তাই আদর্শকে একটু খাটো ক'রে আনতে হয়েছে। ছোড়-দার ঘরেই তার আলাদা বিছানা পড়েছে। এও একরকম একলা শোয়া বৈকি! আলাদা বিছানা তো বটে। মিলির মতো ভয়কাতুরে মেয়ের সমপর্যায়ে আর তো তাকে ফেলা চলবে না। বেণু তাতেই উল্লসিত।

দুদণ্ডের খেয়াল ভেবে স্বর্ণময়ী আর সেদিন কিছু বলেননি। ভেবেছেন—ভয় পেয়ে পরের দিনই আবার বেণুর মত বদলাবে। কিন্তু সেই থেকে বেণুর মত এখনও বদলায়নি। সত্যি সে বড়ো হয়েছে। এরকমভাবে একলা শোয়ার

ভেতর স্বাধীনতার যে-স্বাদ পেয়েছে তা আর সে হারাতে রাজি নয়। বেণু সেই ঘরেই শুচ্ছে এখনও।

হয়তো রাত্রে খাট থেকে প'ড়ে যাবে, হয়তো ভয় পাবে ভেবে স্বর্ণময়ী বৃথাই অস্থির হয়েছেন, মাঝ-রাত্রে এক-একদিন তিনি ঘুমন্ত বেণুকে তুলে এনে নিজের বিছানায় শুইয়েছেন। কিন্তু বেণু তাতে আরও ক্ষেপে উঠেছে। ঘুম ভাঙতেই নিঃশব্দে গেছে পালিয়ে। তার বড়ো হওয়ার গৌরব সে সহজে হারাতে প্রস্তুত নয়। তা ছাড়া দিদিমার আর বোকা মিলির সংগে গল্প করার চেয়ে ছোড়দার কাছে গল্প শোনার মজা অনেক বেশি।

স্বর্ণময়ী বেণুকে আর বাধা দেননি। বাধা দেওয়া তাঁর স্বভাব নয়। কিন্তু তাঁর কোথায় যেন লেগেছে। জীবনের বড়ো-বড়ো শোকতাপ যাঁকে তেমন ক'রে স্পর্শ করতে পারেনি, সামান্য এই শিশুটির খেয়াল তাঁকে যেন গভীর-ভাবে নাড়া দিয়েছে। হঠাৎ যেন তিনি এতদিন বাদে নিজের চারিধারে দেখতে পেয়েছেন। বেণু তাঁর কাছ থেকে স'রে যাচ্ছে, শুধু বেণু নয়। সবাই যেন তাঁর কাছ থেকে স'রে যাচ্ছে অমনি। সবাই যাচ্ছে তাঁকে ছাড়িয়ে;—আশ্রয় করবার মতো কোথাও কিছুই তাঁর নেই। তা সত্ত্বেও তাঁর সবকিছু ধ'রে রাখ-বার এই চেষ্টাই যেন অত্যন্ত হাস্যকর, অত্যন্ত করুণ। এ-চেষ্টা হয়তো সকলকেই পীড়া দিচ্ছে।

স্বর্ণময়ী বেণুর শূন্য বিছানায় হাত রেখে অনেকক্ষণ ব'সে থাকেন। নিজেকে তাঁর সহসা অত্যন্ত অনাবশ্যক ব'লে মনে হয়। মনে হয়, তিনি যেন অকারণে পথ জুড়ে ব'সে আছেন, নিজের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণা নিয়ে। বেণুর আর তাঁকে দরকার নেই। সে বড়ো হয়েছে। তাঁর স্নেহের আতিশয্যই তাকে পীড়িত করে। সে এখন স্বাধীন হ'তে চায়, আত্মনির্ভরশীল হ'তে চায়। এই তো স্বাভাবিক, এই তো ভালো। হয়তো এই সংসারেরও আর তাঁকে এমনি দরকার নেই। এ-সংসারও স্বাধীন হ'তে চায়। তিনি জোর ক'রে তার ওপর নিজের শাসন ও শৃঙ্খলার ভার চাপিয়ে রেখেছেন মাত্র।

না, বিদ্রোহ কেউ অবশ্য করেনি। আঘাত ইচ্ছা ক'রে কেউ তাঁকে দেয়নি। তা যে দেবে না কেউ, তা তিনি জানেন। তাঁর সংসারে অশান্তি নেই, ছেলেরা তাঁকে ভালোবাসে, বউ-এরা তাঁর বাধ্য, তাঁর শাসনের ভেতর স্নেহের ফল্গুর সন্ধান তারা রাখে। তবু কোথায় যেন আছে অস্বস্তির একটু আভাস। তাঁর প্রয়োজনীয়তা যেন কেমন ক'রে শেষ হ'য়ে গেছে।

ছেলেরা হয়তো বলে—"এত সকালে তুমি আবার উঠেছ কেন মা? এই ঠাণ্ডা লেগে আবার একটা অসুখে পড়বে। ওরা তো রয়েছে।"

ছেলেরা এমন কথা আগেও বলেছে মা-র স্বাস্থ্য সম্বন্ধে উদ্বিগ্ন হ'য়ে। কিন্তু এখন সুরটা বুঝি একটু আলাদা। মা-র স্বাস্থ্যের জন্যে উদ্বেগ তার ভেতর আছে, আছে ভালোবাসার পরিচয়। কিন্তু আরও কিছু তার ভেতর আছে। একটু অধৈর্য বুঝি! মার শক্তি সম্বন্ধে একটু যেন অবিশ্বাস।

স্বর্ণময়ী প্রথমে বুঝতে পারেননি, গ্রাহ্য করেননি। তিনি না দেখলে যে চলে না। ছেলেরা যে তাঁরই ওপর নির্ভর ক'রে আছে।

কিন্ত সেখানেও ধীরে-ধীরে তাঁর সন্দেহ জেগেছে। জেগেছে মাত্র কিছু দিন। বিনয়কে ডেকে তিনি জিজ্ঞাসা করেছেন—"হ্যাঁ রে, এখনও প্ল্যান দিয়ে

গেল না, কবে স্যাংশন হবে, কবে বার-বাড়ির কাজ আরম্ভ হবে?"

বিনয় বলেছে—"প্ল্যান তো দিয়ে গেছে মা! স্যাংশনের দরখাস্তও ক'রে দিয়েছি। প্ল্যান ভালোই হয়েছে।"

স্বর্ণময়ী মুখে বলেছেন—"বেশ!" কিন্তু অন্তরে বুঝি একটু আঘাত পেয়েছেন। তাঁকে না জানিয়েই, তাঁর ওপর নির্ভর না ক'রেই এ-বাড়ির কাজ আজকাল একটু-আধটু চলতে আরম্ভ হয়েছে। আরও একদিন বহুকাল আগে এমনি ঘর তৈরি হয়েছিল। তখন স্বামী কিছু দেখতে পারতেন না। তাঁকেই সব দেখতে হয়েছে ব'লে স্বর্ণময়ী মুখে বিরক্তি জানিয়েছেন। কিন্তু আজ তাঁর মনে শুধু একটু ক্ষোভ, তাঁকে কিছু দেখতে হবে না ব'লে!

ছেলেরা তাঁকে অবহেলা যে করতে চায় না এ-কথা তিনি জানেন। তাদের শ্রদ্ধা ভক্তি ভালোবাসা সমানই আছে। তারা শুধু তাঁকে কষ্ট দিতে চায় না। তিনি বৃদ্ধ হয়েছেন। তাঁর বিশ্রাম করা দরকার, এই বুঝি তাদের ধারণা। আর বুঝি আছে একটু অবিশ্বাস তাদের মনে। তাঁর বার্ধক্যের শক্তিতে অবিশ্বাস।

এই অবিশ্বাসই সবচেয়ে পীড়িত করে স্বর্ণময়ীকে। তিনি যে বার্ধক্যে সত্যি অকর্মণ্য হননি। এখনও তাঁর যে সমস্ত শক্তি অটুট আছে, অটুট আছে আগ্রহ। তিনি অনায়াসে এখনও সমস্ত সংসারের ভার যে বহন করতে পারেন।

শুধু তাই নয়, এ-ভার বহন করতে না পেলে জীবনে যে তাঁর আর কিছু থাকবে না। জীবন বলতে ষাট বছর বয়স পর্যন্ত তিনি যে শুধু এই জেনে এসেছেন। এ-সংসার তাঁরই হাতে গড়া, তিল-তিল ক'রে জীবন-শোণিতবিন্দু দিয়ে নির্মিত। সে-সংসারে কোনোদিন তিনি যে অনাবশ্যক হ'তে পারেন এ-কথা তিনি কল্পনাও করতে পারেননি। আজ হঠাৎ যদি সে-সংসার তাঁর কাছ থেকে স'রে যায়, শূন্য হাতে, অর্থহীন অবসর নিয়ে কি করবেন তিনি! স্বর্ণময়ীর যেন হাঁফ ধ'রে আসে। শূন্য বিছানায় মধ্যরাত্রে জেগে ব'সে হঠাৎ গভীর বেদনায় তাঁর মন আচ্ছন্ন হ'য়ে যায়। কর্মবহুল জীবনে এ-হতাশা এ-বেদনা প্রবেশ করবার ছিদ্র কোনোদিন ছিল না। জীবনে কোনো বেদনার ছিদ্র তিনি রাখেননি, কিন্তু তাই বুঝি ভাগ্যের এই বিলম্বিত প্রতিশোধ!

স্বর্ণময়ী তার পরেও চেষ্টা করেন। এ-সংসারের কর্ণধার তিনি না হ'তে পারেন আর, হয়তো তাঁর ওপর কারুর নির্ভর করবার আর দরকার নেই, তবু তিনি সাহায্য করতে পারেন, তবু নিজেকে তিনি ব্যাপৃত রাখতে পারেন।

কিন্তু সেখানেও ধীরে-ধীরে বাধা দেখা দেয়। বাধা দেখা দেয় অপ্রত্যাশিত দিক থেকে। ধীরে-ধীরে নিজের প্রয়োজনহীনতার অনুভূতিই স্বর্ণময়ীকে যেন সহসা সত্যকারের বার্ধক্যে টেনে আনে। এইবার প্রথম স্বর্ণময়ীর মনে হয় তিনি যেন ক্লান্ত। কর্মহীনতার অবসাদে ক্লান্ত।

ছেলেরা তাঁর সম্বন্ধে চিন্তিত হ'য়ে ওঠে! বধূদের সেবা বেড়ে যায়।

"ঠাকুর-ঘরের ব্যবস্থা আমি করছি মা, তুমি একটু জিরোও দেখি। আবার নইলে কালকের মতো বুক ধড়ফড় করবে হয়তো।" মেজো বউ শাশুড়িকে বিশ্রাম করতে ব'লে চ'লে যায়।

স্বর্ণময়ী বিশ্রামই করেন। তাঁর সত্যি শরীর ভেঙে পড়েছে।

বিনয় একদিন ডাক্তার ডেকে আনে—"না মা, তোমার ওসব ওজর-আপত্তি শুনব না। তোমার শরীর কি হয়েছে তুমি জানো না।"

স্বর্ণময়ী আর আপত্তি করেন না। নিজেকে তিনি ছেড়ে দিয়েছেন, কারণ সংসার তাঁকে ছেড়ে গেছে ; তাঁর সমস্ত শক্তি সমস্ত দৃঢ়তা হরণ ক'রে নিয়ে গেছে সেই সঙ্গে। একদিন তিনি বুঝি বলেছিলেন—"এবার আমায় কাশী পাঠিয়ে দে বাবা। দিন তো ফুরিয়ে এল। আর কেন?"

কিন্তু সেখানেও তাঁর ইচ্ছার আর কোনো মূল্য নেই। ছেলেরা বউ-এরা সমস্বরে বলেছে—"পাগল হয়েছ মা! তোমার এই শরীর। সেখানে তোমায় দেখবে কে? কে তোমার সেবা করবে? সে হয় না।"

সবাই মিলে তাই স্বর্ণময়ীকে এখন দেখছে, সকলে মিলে নিয়েছে তাঁর সেবার ভার। সমস্ত ভার তিনি নিজের স্কন্ধে রেখে এসেছেন এতদিন, তার প্রতিদানও তো দেওয়া দরকার!

পাছে স্বর্ণময়ীর শান্তির আর বিশ্রামের ব্যাঘাত ঘটে সেই ভাবনায় সমস্ত সংসার আজ উদ্বিগ্ন।

শনি ও মঙ্গলের—মঙ্গলই হবে বোধ হয়—যোগাযোগ হ'লে তেলেনাপোতা আপনারাও একদিন আবিষ্কার করতে পারেন। অর্থাৎ কাজে কর্মে মানুষের ভিড়ে হাঁফিয়ে ওঠার পর যদি হঠাৎ দু-দিনের জন্যে ছুটি পাওয়া যায়—আর যদি কেউ এসে ফুসলানি দেয় যে কোনো এক আশ্চর্য সরোবরে—পৃথিবীর সবচেয়ে সরলতম মাছেরা এখনো তাদের জল-জীবনের প্রথম বঁড়শিতে হৃদয়-বিদ্ধ করবার জন্যে উদ্‌গ্রীব হ'য়ে আছে, আর জীবনে কখনো কয়েকটা পুঁটি ছাড়া অন্য কিছু জল থেকে টেনে তোলার সৌভাগ্য যদি আপনার না হ'য়ে থাকে, তা হ'লে হঠাৎ একদিন তেলেনাপোতা আপনিও আবিষ্কার করতে পারেন।

তেলেনাপোতা আবিষ্কার করতে হ'লে একদিন বিকেলবেলার পড়ন্ত রোদে জিনিসে মানুষে ঠাসাঠাসি একটা বাসে গিয়ে আপনাকে উঠতে হবে. তারপর রাস্তার ঝাঁকানির সঙ্গে মানুষের গুঁতো খেতে খেতে ভাদ্রের গরমে ঘামে. ধুলোয় চটচটে শরীর নিয়ে ঘন্টা দুয়েক বাদে রাস্তার মাঝখানে নেমে পড়তে হবে আচমকা। সামনে দেখবেন নিচু একটা জলার মতো জায়গার ওপর দিয়ে রাস্তার লম্বা সাঁকো চ'লে গেছে। তারই ওপর দিয়ে বিচিত্র ঘর্ঘর শব্দ বাসটি চ'লে গিয়ে ওধারে পথের বাঁকে অদৃশ্য হবার পর দেখবেন সূর্য এখনো না ডুবলেও চারিদিক ঘন জংগলে অন্ধকার হ'য়ে এসেছে। কোনোদিকে চেয়ে জনমানব দেখতে পাবেন না। মনে হবে পাখিরাও যেন সভয়ে সে-জায়গা পরিত্যাগ ক'রে চ'লে গেছে। একটা স্যাঁৎসেতে ভিজে ভ্যাপসা আবহাওয়া টের পাবেন। মনে হবে নীচের জলা থেকে একটা ক্রূর কুণ্ডলিত জলীয় অভি-শাপ ধীরে-ধীরে অদৃশ্য ফণা তু'লে উঠে আসছে।

বড়ো রাস্তা থেকে নেমে সেই ভিজে জলার কাছেই গিয়ে দাঁড়াতে হবে আপনাকে। সামনে ঘন জঙ্গলের ভেতর দিয়ে মনে হবে একটা কাদা-জলের নালা কে যেন কেটে রেখেছে। সে-নালার মতো রেখাও কিছু দূরে গিয়ে দু-ধারে বাঁশ-ঝাড় আর বড়ো-বড়ো ঝাঁকড়া গাছের মধ্যে হারিয়ে গেছে।

তেলেনাপোতা আবিষ্কারের জন্যে আরো দু-জন বন্ধু ও সঙ্গী আপনার সঙ্গে থাকা উচিত। তারা হয়তো আপনার মতো ঠিক মৎস্যলুব্ধ নয়. তবু এ-অভিযানে তারা এসেছে—কে জানে আর কোন অভিসন্ধিতে!

তিনজনে মিলে তারপর সামনের নালার দিকে উৎসুকভাবে চেয়ে থাকবেন মাঝে-মাঝে পা ঠুকে মশাদের ঘনিষ্ঠতায় বাধা দেবার চেষ্টা করবেন এবং সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে এ ওর মুখের দিকে চাইবেন।

খানিক বাদে পরস্পরের মুখও আর ঘনায়মান অন্ধকারে ভালো ক'রে দেখা যাবে না। মশাদের ঐকতান আরও তীক্ষ্ন হ'য়ে উঠবে। আবার বড়ো রাস্তায় উঠে ফিরতি কোনো বাসের চেষ্টা করবেন কি না যখন ভাবছেন তখন হঠাৎ সেই কাদা-জলের নালা যেখানে জঙ্গলের মধ্যে হারিয়ে গেছে. সেখান থেকে অপরূপ একটি শ্রুতিবিস্ময়কর আওয়াজ পাবেন। মনে হবে জঙ্গল থেকে কে

যেন অমানুষিক এক কান্না নিংড়ে-নিংড়ে বার করছে।

সে-শব্দে আপনারা কিন্তু প্রতীক্ষায় চঞ্চল হ'য়ে উঠবেন। প্রতীক্ষাও আপনাদের ব্যর্থ হবে না। আবছা অন্ধকারে প্রথমে একটি ক্ষীণ আলো দুলতে দেখা যাবে ও তারপর একটি গোরুর গাড়ি জংগলের ভেতর থেকে নালা দিয়ে ধীর মন্থর দোদুল্যমান গতিতে বেরিয়ে আসবে।

যেমন গাড়িটি তেমনি গোরুগুলি—মনে হবে পাতালের কোনো বামনের দেশ থেকে গোরুর গাড়ির এই সংক্ষিপ্ত সংস্করণটি বেরিয়ে এসেছে।

বৃথা বাক্য ব্যয় না ক'রে সেই গোরুর গাড়ির ছই-এর ভেতর তিনজনে কোনোরকমে প্রবেশ করবেন ও তিন জোড়া হাত ও পা এবং তিনটি মাথা নিয়ে স্বল্পতম স্থানে সর্বাধিক বস্তু কিভাবে সংস্থাপিত করা যায় সে-সমস্যার মীমাংসা করবেন।

গোরুর গাড়িটি তারপর যে-পথে এসেছিল, সেই পথে অথবা নালায় ফিরে চলতে শুরু করবে। বিস্মিত হ'য়ে দেখবেন, ঘন অন্ধকার অরণ্য যেন সংকীর্ণ একটু সুড়ংগের মতো পথ সামনে একটু-একটু ক'রে উন্মোচন ক'রে দিচ্ছে। প্রতি মুহূর্তে মনে হবে কালো অন্ধকারের দেয়াল বুঝি অভেদ্য কিন্তু তবু গোরুর গাড়িটি অবিচলিতভাবে ধীর মন্থর গতিতে এগিয়ে যাবে, পায়ে-পায়ে পথ যেন ছড়িয়ে-ছড়িয়ে।

কিছুক্ষণ হাত, পা ও মাথার যথোচিত সংস্থান বিপর্যস্ত হবার সম্ভাবনায় বেশ একটু অস্বস্তি বোধ করবেন। বন্ধুদের সংগে ক্ষণে-ক্ষণে অনিচ্ছাকৃত সংঘর্ষ বাধবে, তারপর ধীরে-ধীর বুঝতে পারবেন চারিধারের গাঢ় অন্ধকারে চেতনার শেষ অন্তরীপটিও নিমজ্জিত হ'য়ে গেছে। মনে হবে পরিচিত পৃথিবীকে দূরে কোথায় ফেলে এসেছেন। অনুভূতিহীন কুয়াশাময় এক জগৎ শুধু আপনার চারিধারে। সময় সেখানে স্তব্ধ, স্রোতহীন।

সময় স্তব্ধ, সুতরাং এ-আচ্ছন্নতা কতক্ষণ ধ'রে যে থাকবে বুঝতে পারবেন না। হঠাৎ একসময় উৎকট এক বাদ্য-ঝঞ্ঝনায় জেগে উঠে দেখবেন, ছই-এর ভেতর দিয়ে আকাশের তারা দেখা যাচ্ছে এবং গাড়ির গাড়োয়ান থেকে-থেকে সোৎসাহে একটি ক্যানেস্তারা বাজাচ্ছে।

কৌতূহলী হ'য়ে কারণ জিজ্ঞাসা করলে গাড়োয়ান নিতান্ত নির্বিকার-ভাবে আপনাকে জানাবে—"এজ্ঞে, ওই শালার বাঘ খেদাতে।"

ব্যাপারটা ভালো ক'রে হৃদয়ংগম করার পর, মাত্র ক্যানেস্তারা-নিনাদে ব্যাঘ্র-বিতাড়ন সম্ভব কিনা কম্পিত কণ্ঠে এ-প্রশ্ন আপনি উত্থাপন করবার আগেই গাড়োয়ান আপনাকে আশ্বস্ত করবার জন্যে জানাবে যে, বাঘ মানে চিতাবাঘ মাত্র এবং নিতান্ত ক্ষুধার্ত না হ'লে এই ক্যানেস্তারা-নিনাদই তাকে তফাত রাখবার পক্ষে যথেষ্ট।

মহানগরী থেকে মাত্র ত্রিশ মাইল দূরে ব্যাঘ্রসংকুল এরকম স্থানের অস্তিত্ব কি ক'রে সম্ভব আপনি যতক্ষণ চিন্তা করবেন ততক্ষণে গোরুর গাড়ি বিশাল একটি মাঠ পার হ'য়ে যাবে। আকাশে তখন কৃষ্ণপক্ষের বিলম্বিত ক্ষয়িত চাঁদ বোধ হয় উঠে এসেছে। তারই স্তিমিত আলোয় আবছা বিশাল মৌন সব প্রহরী যেন গাড়ির দু-পাশ দিয়ে ধীরে-ধীরে স'রে যাবে। প্রাচীন অট্টালিকার সেসব ধ্বংসাবশেষ—কোথাও একটা থাম, কোথাও একটা দেউড়ির খিলান,

কোথাও কোনো মন্দিরের ভগ্নাংশ, মহাকালের কাছে সাক্ষ্য দেবার ব্যর্থ আশায় দাঁড়িয়ে আছে।

ওই অবস্থায় যতখানি সম্ভব মাথা তুলে ব'সে কেমন একটা শিহরন সারা শরীরে অনুভব করবেন। জীবন্ত পৃথিবী ছাড়িয়ে অতীতের কোনো কুজ্ঝটিকাচ্ছন্ন স্মৃতিলোকে এসে পড়েছেন ব'লে ধারণা হবে।

রাত তখন কত আপনি জানেন না, কিন্তু মনে হবে এখানে রাত যেন কখনও ফুরোয় না। নিবিড় অনাদি অনন্ত স্তব্ধতায় সব-কিছু নিমগ্ন হ'য়ে আছে;—জাদুঘরের নানা প্রাণিদেহ আরকের মধ্যে যেমন থাকে।

দু-তিনবার মোড় ঘুরে গোরুর গাড়ি এবার এক জায়গায় এসে থামবে। হাত-পাগুলো নানাস্থান থেকে কোনোরকমে কুড়িয়ে সংগ্রহ ক'রে কাঠের পুতুলের মতো আড়ষ্টভাবে আপনারা একে-একে নামবেন। একটা কটু গন্ধ অনেকক্ষণ ধ'রেই আপনাদের অভ্যর্থনা করছে। বুঝতে পারবেন সেটা পুকুরের পানা-পচা গন্ধ। অর্ধস্ফুট চাঁদের আলোয় তেমন একটি নাতিক্ষুদ্র পুকুর সামনেই চোখে পড়বে। তারই পাশে বেশ বিশালায়তন একটি জীর্ণ অট্টালিকা, ভাঙা ছাদ, ধসে-পড়া দেয়াল ও চক্ষুহীন কোটরের মতো পাল্লাহীন জানালা নিয়ে চাঁদের বিরুদ্ধে দুর্গ-প্রাকারের মতো দাঁড়িয়ে আছে।

এই ধ্বংসাবশেষেরই একটি অপেক্ষাকৃত বাসযোগ্য ঘরে আপনাদের থাকার ব্যবস্থা ক'রে নিতে হবে। কোথা থেকে গাড়োয়ান একটি ভাঙা লণ্ঠন নিয়ে এসে ঘরে বসিয়ে দেবে। সেই সঙ্গে এক কলসি জল। ঘরে ঢুকে বুঝতে পারবেন বহু যুগ পরে মনুষ্যজাতির প্রতিনিধি হিসাবে আপনারাই সেখানে প্রথম পদার্পণ করেছেন। ঘরের ঝুল, জঞ্জাল ও ধুলো হয়তো কেউ আগে কখনও পরিষ্কার করার ব্যর্থ চেষ্টা ক'রে গেছে। ঘরের অধিষ্ঠাত্রী আত্মা যে তাতে ক্ষুব্ধ, একটি অস্পষ্ট ভ্যাপসা গন্ধে তার প্রমাণ পাবেন। সামান্য চলাফেরায় ছাদ ও দেয়াল থেকে জীর্ণ পলস্তারা সেই রুষ্ট আত্মার অভিশাপের মতো থেকে-থেকে আপনাদের ওপর বর্ষিত হবে। দু-তিনটি চামচিকা ঘরের অধিকার নিয়ে আপনাদের সঙ্গে সমস্ত রাত বিবাদ করবে।

তেলেনাপোতা আবিষ্কারের জন্যে আপনার দুটি বন্ধুর একজন পানরসিক ও অপরজনের নিদ্রাবিলাসী কুম্ভকর্ণের দোসর হওয়া দরকার। ঘরে পেঁছেই, মেঝের ওপর কোনোরকমে শতরঞ্জির আবরণ পড়তে না পড়তে একজন তার উপর নিজেকে বিস্তৃত ক'রে নাসিকাধ্বনি করতে শুরু করবেন, অপরজন পানপাত্রে নিজেকে নিমজ্জিত ক'রে দেবেন।

রাত বাড়বে। ভাঙা লণ্ঠনের কাঁচের চিমনে ক্রমশ গাঢ়ভাবে কালিমালিপ্ত হ'য়ে ধীরে-ধীরে অন্ধ হ'য়ে যাবে। কোনো রহস্যময় বেতার-সংকেতে খবর পেয়ে সে-অঞ্চলের সমস্ত সমর্থ সাবালক মশা নবাগতদের অভিনন্দন জানাতে ও তাদের সঙ্গে শোণিত-সম্বন্ধ স্থাপন করতে আসবে। আপনি বিচক্ষণ হ'লে দেয়ালে ও গায়ে বসবার বিশিষ্ট ভঙ্গি দেখে বুঝবেন, তারা মশাদের মধ্যে সবচেয়ে বড়ো কুলীন—ম্যালেরিয়া দেবীর অদ্বিতীয় বাহন অ্যানোফিলিস। আপনার দুই বন্ধু তখন দুই কারণে অচেতন। ধীরে ধীরে তাই শয্যা পরিত্যাগ ক'রে উঠে দাঁড়াবেন, তারপর গুমোট গরম থেকে একটু পরিত্রাণ পাওয়ার জন্যে টর্চটি হাতে নিয়ে ভগ্নপ্রায় সিঁড়ি দিয়ে ছাদে ওঠবার চেষ্টা করবেন।

প্রতিমুহূর্তে কোথাও ইট বা টালি খ'সে প'ড়ে ভূপাতিত হওয়ার বিপদ আপনাকে নিরস্ত করবার চেষ্টা করবে, তবু কোনো দুর্বার আকর্ষণে সমস্ত অগ্রাহ্য ক'রে আপনি ওপরে না উঠে পারবেন না।

ছাদে গিয়ে দেখবেন, অধিকাংশ জায়গাতে আলিসা ভেঙে ধূলিসাৎ হয়েছে, ফাটলে-ফাটলে অরণ্যের পঞ্চম বাহিনী ষড়যন্ত্রের শিকড় চালিয়ে ভেতর থেকে এ-অট্টালিকার ধ্বংসের কাজ অনেকখানি এগিয়ে রেখেছে ; তবু কৃষ্ণপক্ষের ক্ষীণ চাঁদের আলোয় সমস্ত কেমন অপরূপ মোহময় মনে হবে। মনে হবে খানিকক্ষণ চেয়ে থাকলে, এই মৃত্যু-সুষুপ্তিমগ্ন মায়াপুরীর কোনো গোপন প্রকোষ্ঠে বন্দিনী রাজকুমারী সোনার কাঠি রূপার কাঠি পাশে নিয়ে যুগান্তের গাঢ় তন্দ্রায় অচেতন, তা যেন আপনি টের পাবেন। সেই মুহূর্তে অদূরে সংকীর্ণ রাস্তার ওপারে একটি ভগ্নস্তূপ ব'লে যা মনে হয়েছিল তারই একটি জানালার একটি আলোর ক্ষীণ রেখা আপনি হয়তো দেখতে পাবেন। সেই আলোর রেখা আড়াল ক'রে একটি রহস্যময় ছায়ামূর্তি সেখানে এসে দাঁড়াবে। গভীর নিশীথরাত্রে কে যে এই বাতায়নবর্তিনী, কেন যে তার চোখে ঘুম নেই আপনি ভাববার চেষ্টা করবেন, কিন্তু কিছুই বুঝতে পারবেন না। খানিক বাদে মনে হবে সবই বুঝি আপনার চোখের ভ্রম। বাতায়ন থেকে সে-ছায়া স'রে গেছে, আলোর ক্ষীণ রেখা গেছে মুছে। মনে হবে এই ধ্বংসপুরীর অতল নিদ্রা থেকে একটি স্বপ্নের বুদবুদ ক্ষণিকের জন্য জীবনের জগতে ভেসে উঠে আবার মিলিয়ে গেছে।

আপনি আবার সন্তর্পণে নিচে নেমে আসবেন এবং কখন একসময়ে দুই বন্ধুর পাশে একটু জায়গা ক'রে ঘুমিয়ে পড়বেন জানতে পারবেন না।

যখন জেগে উঠবেন তখন অবাক হ'য়ে দেখবেন এই রাত্রির দেশেও সকাল হয়, পাখির কলরবে চারিদিক ভ'রে যায়।

আপনার আসল উদ্দেশ্য আপনি নিশ্চয় বিস্মৃত হবেন না। একসময়ে ষোড়শোপচার আয়োজন নিয়ে মৎস্য-আরাধনার জন্য শ্যাওলা-ঢাকা ভাঙা ঘাটের একটি ধারে ব'সে গুঁড়িপানায় সবুজ জলের মধ্যে যথোচিত নৈবেদ্য সমেত বঁড়শি নামিয়ে দেবেন।

বেলা বাড়বে। ওপারের ঝুঁকে-পড়া একটা বাঁশের ডগা থেকে একটা মাছ-রাঙা পাখি ক্ষণে-ক্ষণে আপনাকে যেন উপহাস করবার জন্যেই বাতাসে রঙের ঝিলিক বুলিয়ে পুকুরের জলে ঝাঁপিয়ে পড়বে ও সার্থক শিকারের উল্লাসে আবার বাঁশের ডগায় ফিরে গিয়ে দুর্বোধ ভাষায় আপনাকে বিদ্রূপ করবে। আপনাকে সন্ত্রস্ত ক'রে একটা মোটা লম্বা সাপ ভাঙা ঘাটের কোনো ফাটল থেকে বেরিয়ে ধীর অচঞ্চল গতিতে পুকুরটা সাঁতরে পার হ'য়ে ওধারে গিয়ে উঠবে, দুটো ফড়িং পাল্লা দিয়ে পাতলা কাঁচের মতো পাখা নেড়ে আপনার ফাতনাটার ওপর বসবার চেষ্টা করবে ও থেকে-থেকে উদাস ঘুঘুর ডাকে আপনি আনমনা হ'য়ে যাবেন।

তারপর হঠাৎ জলের শব্দে আপনার চমক ভাঙবে। নিথর জলে ঢেউ উঠেছে, আপনার ছিপের ফাতনা মৃদুমন্দভাবে তাতে দুলছে। ঘাড় ফিরিয়ে দেখবেন একটি মেয়ে পেতলের একটি ঝকঝকে ঘড়ায় পুকুরের পানা ঢেউ দিয়ে সরিয়ে জল ভরছে। মেয়েটির চোখে কৌতূহল আছে কিন্তু গতিবিধিতে

সলজ্জ আড়ষ্টতা নেই। সোজাসুজি সে আপনার দিকে তাকাবে, আপনার ফাতনা লক্ষ্য করবে, তারপর আবার মুখ ফিরিয়ে ঘড়াটা কোমরে তুলে নেবে।

মেয়েটি কোন বয়সের আপনি বুঝতে পারবেন না। তার মুখের শান্ত করুণ গাম্ভীর্য দেখে মনে হবে জীবনের সুদীর্ঘ নির্মম পথ সে পার হয়ে এসেছে, তার ক্ষীণ দীর্ঘ অপুষ্ট শরীর দেখলে মনে হবে কৈশোর অতিক্রম ক'রে যৌবনে উত্তীর্ণ হওয়া তার যেন স্থাগত হ'য়ে আছে।

কলসি নিয়ে চলে যেতে-যেতে ফিরে তাকিয়ে মেয়েটি হঠাৎ বলবে, "ব'সে আছেন কেন? টান দিন।"

সে-কণ্ঠ এমন শান্ত মধুর ও গম্ভীর যে এভাবে আপনা থেকে অপরিচিতের সঙ্গে কথা বলা আপনার মোটেই অস্বাভাবিক ঠেকবে না। শুধু আকস্মিক চমকের দরুন বিহ্বল হ'য়ে ছিপে টান দিতে আপনি ভুলে যাবেন। তারপর ডুবে-যাওয়া ফাতনা আবার ভেসে ওঠবার পর ছিপ তুলে দেখবেন বঁড়শিতে টোপ আর নেই। একটু অপ্রস্তুতভাবে মেয়েটির দিকে আপনাকে একবার তাকাতেই হবে। সেও মুখ ফিরিয়ে শান্ত ধীর পদে ঘাট ছেড়ে চ'লে যাবে, কিন্তু মনে হবে মুখ ফেরাবার চকিত মুহূর্তে একটু যেন দীপ্ত হাসির আভাস সেই শান্ত করুণ মুখে খেলে গেছে।

পুকুরের ঘাটের নির্জনতা আর ভঙ্গ হবে না তারপর। ওপারের মাছরাঙাটা আপনাকে লজ্জা দেবার নিষ্ফল চেষ্টা ত্যাগ ক'রে অনেক আগেই উড়ে গেছে। মাছেরা আপনার শক্তি-সামর্থ্য সম্বন্ধে গভীর অবজ্ঞা নিয়েই বোধ হয় আর দ্বিতীয়বার প্রতিযোগিতায় নামতে চাইবে না। খানিক আগের ঘটনাটা আপনার কাছে অবাস্তব ব'লে মনে হবে। এই জনহীন ঘুমের দেশে সত্যি ওরকম মেয়ে কোথাও আছে আপনি বিশ্বাস করতে পারবেন না।

একসময়ে হতাশ হ'য়ে আপনাকে সাজসরঞ্জাম নিয়ে উঠে পড়তে হবে। ফিরে গিয়ে হয়তো দেখবেন আপনার মৎস্যশিকার-নৈপুণ্যের বৃত্তান্ত ইতিমধ্যে কেমন ক'রে আপনার বন্ধুদের কর্ণগোচর হয়েছে। তাদের পরিহাসে ক্ষুণ্ণ হ'য়ে এ-কাহিনী কোথায় তারা শুনল, জিজ্ঞাসা ক'রে হয়তো আপনার পান-রসিক বন্ধুর কাছে শুনবেন—"কে আবার বলবে! এইমাত্র যামিনী নিজের চোখে দেখে এল যে!"

আপনাকে কৌতূহলী হ'য়ে যামিনীর পরিচয় জিজ্ঞাসা করতেই হবে। তখন হয়তো জানতে পারবেন যে, পুকুরঘাটের সেই অবাস্তব করুণনয়না মেয়েটি আপনার পান-রসিক বন্ধুটিরই জ্ঞাতিস্থানীয়া। সেই সঙ্গে আরো শুনবেন যে, দ্বিপ্রাহরিক আহারের ব্যবস্থাটা সেদিনকার মতো তাদের ওখানেই হয়েছে!

যে-ভগ্নস্তূপে গত রাত্রে ক্ষণিকের জন্যে একটি ছায়ামূর্তি আপনার বিস্ময় উৎপাদন করেছিল, দিনের রূঢ় আলোয় তার শ্রীহীন জীর্ণতা আপনাকে অত্যন্ত পীড়িত করবে। রাত্রির মায়াবরণ স'রে গিয়ে তার নগ্ন ধ্বংসমূর্তি এত কুৎসিত হ'য়ে উঠতে পারে আপনি ভাবতে পারেননি।

এইটিই যামিনীদের বাড়ি জেনে আপনি অবাক হবেন। এই বাড়িরই একটি ঘরে আপনাদের হয়তো আহারের ব্যবস্থা হয়েছে। আয়োজন যৎ-সামান্য, হয়তো যামিনী নিজেই পরিবেশন করেছে। মেয়েটির অনাবশ্যক লজ্জা বা

আড়ম্বতা যে নেই আপনি আগেই লক্ষ্য করেছেন, শুধু কাছে থেকে তার মুখের করুণ গাম্ভীর্য আরো বেশি ক'রে আপনার চোখে পড়বে। এই পরিত্যক্ত বিস্মৃত জনহীন লোকালয়ের সমস্ত মৌন বেদনা যেন তার মুখে ছায়া ফেলেছে। সব-কিছু দেখেও তার দৃষ্টি যেন গভীর এক ক্লান্তির অতলতায় নিমগ্ন! একদিন যেন সে এই ধ্বংসস্তূপেই ধীরে-ধীরে বিলীন হ'য়ে যাবে।

আপনাদের পরিবেশন করতে-করতে দু-চারবার তাকে তবু চঞ্চল ও উদ্বিগ্ন হয়ে উঠতে আপনি দেখবেন। ওপরতলার কোনো ঘর থেকে ক্ষীণ একটা কণ্ঠ যেন কাকে ডাকছে। যামিনী ব্যস্ত হ'য়ে বাইরে চ'লে যাবে। প্রত্যেকবার ফিরে আসবার সঙ্গে তার মুখে বেদনার ছায়া যেন আরো গভীর হ'য়ে উঠেছে মনে হবে—সেই সঙ্গে কেমন একটা অসহায় অস্থিরতা তার চোখে।

খাওয়া শেষ ক'রে আপনারা তখন একটু বিশ্রাম করতে পারেন। অত্যন্ত দ্বিধাভরে কয়েকবার ইতস্তত ক'রে সে যেন শেষে মরিয়া হ'য়ে দরজা থেকে ডাকবে, "একটু শুনে যাও মণিদা।"

মণিদা আপনার সেই পান-রসিক বন্ধু। তিনি দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়াবার পর যে-আলাপটুকু হবে তা এমন নিম্নস্বরে নয় যে, আপানারা শুনতে পাবেন না।

শুনবেন, যামিনী অত্যন্ত কাতরস্বরে বিপন্নভাবে বলছে, "মা তো কিছু-তেই শুনছেন না। তোমাদের আসার খবর পাওয়া অবধি কি যে অস্থির হ'য়ে উঠেছেন কি বলব।"

মণি একটু বিরক্তির স্বরে বলবে, "ওঃ, সেই খেয়াল এখনো! নিরঞ্জন এসেছে, ভাবছেন বুঝি?"

"হ্যাঁ, কেবলই বলছেন—'সে নিশ্চয় এসেছে। শুধু লজ্জায় আমার সঙ্গে দেখা করতে পারছে না, আমি জানি। তাকে ডেকে দে। কেন তুই আমার কাছে লুকোচ্ছিস!' কি যে আমি করব ভেবে পাচ্ছি না। অন্ধ হ'য়ে যাবার পর থেকে আজকাল এত অধৈর্য বেড়েছে যে, কোনো কথা বুঝোলে বোঝেন না, রেগে মাথা খুঁড়ে এমন কান্ড করেন যে তখন ও'র প্রাণ বাঁচানো দায় হ'য়ে ওঠে!"

"হুঁ, এ তো বড়ো মুশকিল দেখছি। চোখ থাকলেও না-হয় দেখিয়ে দিতাম যে যারা এসেছে তাদের কেউ নিরঞ্জন নয়।"

ওপর থেকে দুর্বল অথচ তীক্ষ্ম ক্রুদ্ধ কণ্ঠের ডাকটা এবার আপনারও শুনতে পাবেন। যামিনী এবার কাতরকণ্ঠে অনুনয় করবে, "তুমি একবারটি চলো মণিদা, যদি একটু বুঝিয়ে-সুঝিয়ে ঠান্ডা করতে পারো।"

"আচ্ছা তুই যা, আমি আসছি।"—মণি এবার ঘরে ঢুকে নিজের মনেই বলবে, "এ এক আচ্ছা জ্বালা হয়েছে যা হোক। বুড়ীর হাত পা প'ড়ে গেছে, চোখ নেই, তবু বুড়ী পণ ক'রে ব'সে আছে কিছুতেই মরবে না।"

ব্যাপারটা কি এবার হয়তো জানতে চাইবেন। মণি বিরক্তির স্বরে বলবে, "ব্যাপার আর কি! নিরঞ্জন ব'লে ও'র দূরসম্পর্কের এক বোনপোর সঙ্গে ছেলেবেলায় যামিনীর সম্বন্ধ উনি ঠিক করেছিলেন। বছর চারেক আগেও সে-ছোকরা এসে ও'কে ব'লে গেছল বিদেশের চাকরি থেকে ফিরে এসে ও'র মেয়েকে সে বিয়ে করবে। সেই থেকে বুড়ী এই অজগর পুরীর ভেতর ব'সে সেই আশায় দিন গুনছে।"

আপনি নিজে থেকে এবার জিজ্ঞাসা না ক'রে পারবেন না, "নিরঞ্জন কি এখনো বিদেশ থেকে ফেরেনি?

"আরে সে বিদেশে গেছল কবে, যে ফিরবে। নেহাত বুড়ি নাছোড়বান্দা ব'লে তাঁকে এই ধাপ্পা দিয়ে গেছল। অমন ঘুঁটেকুড়ুনির মেয়েকে উদ্ধার করতে তার দায় পড়েছে। সে কবে বিয়ে থা' ক'রে দিব্য সংসার করছে। কিন্তু সে-কথা ওঁকে বলে কে? বললে বিশ্বাসই করবেন না, আর বিশ্বাস যদি করেন তা হ'লে এখুনি তো দম ছুটে অক্কা! কে মিছিমিছি পাতকের ভাগী হবে?"

"যামিনী নিরঞ্জনের কথা জানে?"

"তা আর জানে না! কিন্তু মা-র কাছে বলবার উপায় তো নেই! যাই, কর্মভোগ সেরে আসি!"—ব'লে মণি সিঁড়ির দিকে পা বাড়াবে।

সেই মুহূর্তে নিজের অজ্ঞাতসারেই আপনাকে হয়তো উঠে দাঁড়াতে হবে। হঠাৎ হয়তো ব'লে ফেলবেন, "চলো, আমিও যাব।"

"তুমি যাবে!" মণি ফিরে দাঁড়িয়ে সবিস্ময়ে নিশ্চয় আপনার দিকে তাকাবে।

"হ্যাঁ, কোনো আপত্তি আছে গেলে?"

"না, আপত্তি কিসের!"—ব'লে বেশ বিমূঢ়ভাবেই মণি আপনাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে।

সংকীর্ণ অন্ধকার ভাঙা সিঁড়ি দিয়ে যে-ঘরটিতে আপনি পৌঁছবেন, মনে হবে, ওপরে নয়, মাটির তলার সুড়ঙ্গেই বুঝি তার স্থান। একটিমাত্র জানলা, তাও বন্ধ, বাইরের আলো থেকে এসে প্রথমে আপনার চোখে সবই ঝাপসা ঠেকবে, তারপর টের পাবেন, প্রায় ঘরজোড়া একটি ভাঙা তক্তাপোশে ছিন্ন কন্থাজড়িত একটি শীর্ণ কংকালসার মূর্তি শুয়ে আছে। তক্তাপোশের এক-পাশে যামিনী পাথরের মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে।

আপনাদের পদশব্দ শুনে সেই কংকালের মধ্যেও যেন চাঞ্চল্য দেখা দেবে: "কে, নিরঞ্জন এলি? অভাগী মাসিকে এতদিনে মনে পড়ল, বাবা তুই আসবি ব'লে প্রাণটা যে আমার কণ্ঠায় এসে আটকে আছে। কিছুতেই যে নিশ্চিন্ত হ'য়ে মরতে পারছিলাম না। এবার তো আর অমন ক'রে পালাবি না?"

মণি কি যেন বলতে যাবে, তাকে বাধা দিয়ে আপনি অকস্মাৎ বলবেন, "না মাসিমা, আর পালাব না।"

মুখ না তুলেও মণির বিমূঢ়তা ও আর একটি স্থাণুর মতো মেয়ের মুখে স্তম্ভিত বিস্ময় আপনি যেন অনুভব করতে পারবেন। কিন্তু কোনোদিকে তাকাবার অবসর আপনার থাকবে না। দৃষ্টিহীন দুটি চোখের কোটরের দিকে আপনি তখন নিস্পন্দ হ'য়ে রুদ্ধ নিশ্বাসে চেয়ে আছেন। মনে হবে সেই শূন্য কোটরের ভেতর থেকে অন্ধকারের দুটি কালো শিখা বেরিয়ে এসে যেন আপনার সর্বাঙ্গ লেহন ক'রে পরীক্ষা করছে। ক'টি স্তব্ধ মুহূর্ত ধীরে-ধীরে সময়ের সাগরে শিশির-বিন্দুর মতো ঝ'রে পড়েছে আপনি অনুভব করবেন। তারপর শুনতে পাবেন, "আমি জানতাম তুই না এসে পারবি না বাবা। তাই তো এমন ক'রে এই প্রেতপুরী পাহারা দিয়ে দিন গুনছি।"

বৃদ্ধা এতগুলি কথা ব'লে হাঁফাবেন: চকিতে একবার যামিনীর ওপর দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে আপনার মনে হবে বাইরের কঠিন মুখোশের অন্তরালে

তার মধ্যেও কোথায় যেন কি ধীরে-ধীরে গলে যাচ্ছে—ভাগ্য ও জীবনের বিরুদ্ধে, গভীর হতাশার উপাদানে তৈরি এক সুদৃঢ় শপথের ভিত্তি আলগা হ'য়ে যেতে আর বুঝি দেরি নেই।

বৃদ্ধা আবার বলবেন, "যামিনীকে নিয়ে তুই সুখী হবি বাবা। আমার পেটে হয়েছে ব'লে বলছি না, এমন মেয়ে হয় না। শোকে-তাপে বুড়ো হ'য়ে মাথার ঠিক নেই, রাতদিন খিটখিট ক'রে মেয়েটাকে যে কত যন্ত্রণা দিই—তা কি আমি জানি না। তবু মুখে ওর রা নেই। এই শ্মশানের দেশ—দশটা বাড়ি খুঁজলে একটা পুরুষ মেলে না। আমার মতো ঘাটের মড়ারা শুধু ভাঙা ইট আঁকড়ে এখানে-সেখানে ধুঁকছে, এরই মধ্যে একাধারে মেয়ে পুরুষ হ'য়ে ও কি না করছে!"

একান্ত ইচ্ছা সত্ত্বেও চোখ তুলে একটিবার তাকাতে আপনার সাহস হবে না। আপনার নিজের চোখের জল বুঝি আর গোপন রাখা যাবে না।

বৃদ্ধা ছোটো একটি নিশ্বাস ফেলে বলবেন, "যামিনীকে তুই নিবি তো বাবা! তোর শেষ কথা না পেলে আমি ম'রেও শান্তি পাব না।"

ধরা-গলায় আপনি তখন শুধু বলতে পারবেন, "আমি তোমায় কথা দিচ্ছি মাসিমা। আমার কথার নড়চড় হবে না।"

তারপর বিকালে আবার গোরুর গাড়ি দরজায় এসে দাঁড়াবে! আপনারা তিনজনে একে-একে তাতে উঠবেন। যাবার মুহূর্তে গাড়ির কাছে এসে দাঁড়িয়ে আপনার দিকে সেই করুণ দুটি চোখ খুলে যামিনী শুধু বলবে—"আপনার ছিপটিপ যে প'ড়ে রইল!"

আপনি হেসে বলবেন, "থাক না। এবারে পারিনি ব'লে তেলেনাপোতার মাছ কি বারবার ফাঁকি দিতে পারবে!"

যামিনী মুখ ফিরিয়ে নেবে না। ঠোঁট থেকে নয়, মনে হবে, তার চোখের ভেতর থেকে মধুর একটি সকৃতজ্ঞ হাসি শরতের শুভ্র মেঘের মতো আপনার হৃদয়ের দিগন্ত স্নিগ্ধ ক'রে ভেসে যাচ্ছে।

গাড়ি চলবে। কবে এক শো না দেড় শো বছর আগে, প্রথম ম্যালেরিয়ার মড়কের এক দুর্বার বন্যা তেলেনাপোতাকে চলমান জীবন্ত জগতের এই বিস্মৃতিবিলীন প্রান্তে ভাসিয়ে এনে ফেলে রেখে গিয়েছিল—আপনার বন্ধুরা হয়তো সেই আলোচনা করবেন। সেসব কথা ভালো ক'রে আপনার কানে যাবে না। গাড়ির সংকীর্ণতা আর আপনাকে পীড়িত করবে না, তার চাকার একঘেয়ে কাঁদুনি আর আপনার কাছে কর্কশ লাগবে না। আপনি শুধু নিজের হৃদ্স্পন্দনে একটি কথাই বারবার ধ্বনিত হচ্ছে, শুনবেন—"ফিরে আসব, ফিরে আসব।"

মহানগরের জনাকীর্ণ আলোকোজ্জ্বল রাজপথে যখন এসে পৌঁছবেন তখনও আপনার মনে তেলেনাপোতার স্মৃতি সুদূর অথচ অতি অন্তরঙ্গ একটি তারার মতো উজ্জ্বল হ'য়ে আছে। ছোটোখাটো বাধা-বিড়ম্বিত ক'টি দিন কেটে যাবে। মনের আকাশে একটু ক'রে কুয়াশা জমছে কিনা আপনি টের পাবেন না। তারপর যেদিন সমস্ত বাধা অপসারিত ক'রে তেলেনাপোতায় ফিরে যাবার জন্যে আপনি প্রস্তুত হবেন সেদিন হঠাৎ মাথার যন্ত্রণায় ও কম্প দেওয়া শীতে, লেপ তোশক মুড়ি দিয়ে আপনাকে শুতে হবে। থার্মোমিটারের

পারা জানাবে এক শত পাঁচ ডিগ্রি, ডাক্তার এসে বলবে, "ম্যালেরিয়াটি কোথা থেকে বাগালেন?" আপনি শুনতে-শুনতে জ্বরের ঘোরে আচ্ছন্ন হ'য়ে যাবেন।

বহুদিন বাদে অত্যন্ত দুর্বল শরীর নিয়ে যখন বাইরের আলো-হাওয়ায় কম্পিত পদে এসে বসবেন, তখন দেখবেন নিজের অজ্ঞাতসারে দেহ ও মনের অনেক ধোয়া-মোছা ইতিমধ্যে হ'য়ে গেছে। অস্ত-যাওয়া তারার মতো তেলেনাপোতার স্মৃতি আপনার কাছে ঝাপসা একটা স্বপ্ন ব'লে মনে হবে। মনে হবে তেলেনাপোতা ব'লে কোথাও কিছু সত্যি নেই। গম্ভীর কঠিন যার মুখ আর দৃষ্টি যার সুদূর ও করুণ, ধ্বংসপুরীর ছায়ার মতো সেই মেয়েটি হয়তো আপনার কোনো দুর্বল মুহূর্তের অবাস্তব কুয়াশাময় কল্পনা মাত্র।

একবার ক্ষণিকের জন্যে আবিষ্কৃত হ'য়ে তেলেনাপোতা আবার চিরন্তন রাত্রির অতলতায় নিমগ্ন হ'য়ে যাবে।

কলকাতার আরব্য রজনী

পয়লা চোরের কেচ্ছা

ঠিকানাটা বলে দিতে পারি।

একদিন সেখানে যেতে পারেন মনমর্জি হলে।

দল বেঁধে অবশ্যই নয়। একা। আর যখন তখনও নয়।

ইস্পাহানী গির্জের ঘড়িতে ঠিক যখন সাড়ে এগারটার ঘন্টা বাজছে, তখন।

ইস্পাহানী গির্জের ঘড়িটা একটু ক্লান্ত হয়ে পড়েছে একশো পোনেরো বছরের অবিরাম চলায়। সময়ের সঙ্গে আর ঠিক পাল্লা দিতে পারে না। একটু পিছিয়ে পড়ে।

তার সাড়ে এগারটার ঘন্টা মানে তাই এগারটা পঁইত্রিশ।

কিন্তু তখনই এসে ঢুকবেন ওই ছোট্ট তেকোণা পার্কটায়, পার্ক বললে যাকে ঠাট্টাই করা হয়, শহরের ঘূর্ণিবেগ নিজেকে সামলাতে কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে যে নগণ্য দ্বীপাভাসটি সৃষ্টি করেছে নগরপালদের অনুগ্রহে।

রাত এগারটা পঁইত্রিশের সময়, শহরের ঘূর্ণিবেগের কোন চিহ্নই পাবেন না অবশ্য এখানে। সকাল ও বিকালের দুটি প্লাবনে তা নিঃশেষ হয়ে গেছে। বড় জোর একটা রিকসার ঠুং ঠাং কানে আসতে পারে কদাচিৎ। আর মাঝে-মাঝে দ্রুত ধাবমান একটা-আধটা মোটরের শব্দ।

ছোট পার্কটির পূব দিকের কোণটাই বেছে নিতে হবে। সেখানে বেশ তরল একটু অন্ধকার। মুখোমুখি পাতা দুটি লোহার বেঞ্চির একটিতে গিয়ে বসতে পারেন।

আর একটিতে অবছায়া একটি মূর্তি আগে থাকতেই সেখানে বসে আছে দেখা যাবে।

আপনার আগে থাকতে মূর্তিটি যদি বেঞ্চির পিঠে হেলান দিয়ে দুদিকে দুহাত ছড়িয়ে বসে না থাকে, তাহলে সেখানে যাওয়া বৃথা। একলা প্রথম যেদিন সেখানে গিয়ে উপস্থিত হবেন, সেদিন সামনের বেঞ্চিতে কেউ আর বসতে আসবে না। তা যতই আপনি অপেক্ষা করুন।

ইস্পাহানী গির্জেয় বারোটার ঘন্টা বাজবে যেন হাঁফানি রোগীর শ্বাস-কষ্টের মত টেনে টেনে।

তার কিছুক্ষণ বাদেই পশ্চিম দিকে বড় রাস্তা থেকে একটা কানা গলি যেখানে ছিটকে পালাতে গিয়ে বাধা পেয়েছে, তার কোণের পানের দোকানটির আলোও হঠাৎ নিভে গিয়ে একটা ছমছমে অস্বস্তি ছড়িয়ে দেবে আপনার চারিদিকে। দৈত্যপুরীর মত বিরাট অন্ধ বাড়িগুলো যেন গায়ের ওপর হেলে পড়ছে মনে হবে। রাস্তায় তখনও আলো জ্বলছে, কিন্তু মনে হবে সে আলো যেন রহস্যকটাক্ষে কি অশুভ ইঙ্গিত জানাতে চাইছে।

তারপর বসে থাকা দায় হবে। কখন নিজের অগোচরেই উঠে পড়ে দ্রুত-পদে পার্ক থেকে বেরিয়ে বড় রাস্তায় নিজের পদধ্বনিতেই সচকিত হয়ে

দূরের একটি সংকীর্ণ গলিপথে নগরের ঘিঞ্জি জনবহুল একটি অঞ্চলের নোংরা বাস্তবতার নাগাল পেয়ে হাঁফ ছেড়ে বাঁচবেন।

আমি যেমন বেঁচেছিলাম।

আগ্রহের আতিশয্যে নীলাম্বর অধিকারীর কথা ঠিক অক্ষরে অক্ষরে পালন না করে একটু সময় হাতে রেখে যাওয়ার মূর্খতার ওই শাস্তি।

এ কাহিনী তাই নীলাম্বরের কাছে আমার শোনা। স্থান কালের নির্দেশও তারই।

নীলাম্বরকে অবিশ্বাস করবার কোন কারণ নেই। কারণ, সে কবি বা ভাবুক কিছুই নয়। নেহাত স্থির ধীর সুস্থমস্তিষ্ক কাগজের ব্যাপারী। বড়-বাজারে তার কাগজের আড়ত। আড়তের সামনে তার ছোট্ট ঘুপচি দোকান-ঘরটিতে সারাদিন সে প্রায় টেলিফোন কানে নিয়ে রীম রীম টন টন কাগজের দর জানায়, অর্ডার নেয়, লরি ঠেলাগাড়ি রিকশাতে মাল পাঠাবার ব্যবস্থা করে। সে কাগজ কে কোথায় কি ভাবে রং লাগিয়ে কি কালির আঁচর কেটে নষ্ট করে তা নিয়ে তার মাথাব্যাথা নেই।

রাত আটটায় দোকান বন্ধ করে, রাত নটা-দশটা পর্যন্ত হিসেবপত্র দেখে, দোকানঘরের ইস্পাতের খড়খড়ি-ঝাঁপ টেনে দিয়ে জবরদস্ত দুটো তালা লাগিয়ে দুবার তা টেনে পরীক্ষা করে ছাতাটি বগলে নিয়ে সে বরাদ্দ করা রিকশাটিতে চড়ে ধীরে-সুস্থে পোল পার হয়ে স্টেশনে যাবার জন্যে রওনা হয়।

তার শেষ ট্রেন রাত এগারটা কুড়িতে। ট্রেন না পেলে তাকে নিরুপায় হয়ে ট্যাক্সি নিতে হয়। ট্যাক্সি খরচটা গায়ে বড় লাগে। জীবনে একবার কি দুবারের বেশী ট্যাক্সি নেয়নি। নীলাম্বর অধিকারী কৃপণ। মুখের সামনে তাকে সে কথা বলা যায়। বললে সে রাগ করে না, বরং সেটা তার গর্ব।

নীলাম্বর ট্রেন ফেল বড় একটা করে না।

একদিন করেছিল। শুধু ট্রেন ফেলই নয়, সেদিন ট্যাক্সি করেও মফস্বলের বাড়িতে যাওয়া তার হয় নি। স্টেশনের প্ল্যাটফর্মেই শুয়ে রাত কাটিয়েছিল।

সেদিন বিকেল থেকে রাত নটা-দশটা পর্যন্ত মুষলধারে বৃষ্টি পড়েছে। শহর ভেসে গেছে জলে। যান-বাহন সব অচল। তার মাস-বরাদ্দ রিকশাও সেদিন আসেনি।

নীলাম্বর কোন রকমে একটা রিকশা ডাকিয়ে জলময় রাস্তায় যখন বেরুতে পেরেছিল, তখন এগারটা বেজে গেছে। বৃষ্টি থেমে গেছে কিন্তু আকাশ ঘন মেঘে ঢাকা। শুক্লপক্ষের চাঁদ সেই মেঘলা অন্ধকারকে নেপথ্য থেকে আরো রহস্য-তরল করে তুলেছে।

শেষ ট্রেন যে ধরতে পারবে না, নীলাম্বর তা বুঝেই নিয়েছিল। কোন রকমে পোল পেরিয়ে স্টেশনে পৌঁছলে যদি একটা ট্যাক্সি পাওয়া যায় এই আশা।

কিন্তু স্টেশনে পৌঁছোনও হয় নি। জলে ভাসা রাস্তায় মৃদুমন্দ গতিতে ছপ ছপ করে হেঁটে হেঁটে খানিকদূর যাবার পর রিকশাওয়ালা থেমে পড়েছিল। রিকশার একটা চাকা কি করে আলগা হয়ে নড়বড় করছে। ঠুকে ঠুকে মেরামত করে না নিলে আর এগুনো যাবে না।

নিলাম্বর রিকশা থেকে নেমেছিল।

ইস্পাহানী গির্জার ঘড়িতে তখন সাড়ে এগারটার ঘন্টা বাজছে। নীলাম্বর নিজের হাতঘাড়টা তখনই মিলিয়েছিল, আর নিজের নিভুল ঘড়ির হিসেবে বুঝেছিল ইস্পাহানী গির্জের ঘড়িটা পাঁচ মিনিট পিছিয়ে আছে।

নীলাম্বর টাকা-আনা-পাই-এর নির্ভুল হিসেবের জগতের মানুষ। এমনিতে রস-কষ-হীন। কিন্তু সেই চোরা জ্যোৎস্নার আবছা অন্ধকারে জলে ভাসা রাতের শহরের এক স্তব্ধ নির্জন আকাশ-ছোঁয়া সব ভ্রূকুটি-ভয়াল ইমারতের পাহারা দেওয়া ও পৃথিবীর মানুষের যেন ভুলে যাওয়া অঞ্চলটিতে দাঁড়িয়ে তার মনেও যেন কিসের একটা স্বপ্নগাঢ় আচ্ছন্নতা নেমেছিল।

ছোট পার্কটা চোখে পড়েছিল, আর রিকশা না মেরামত হলে কোথাও রওনা হবার আশা নেই বুঝে, কখন সেই পার্কের কব্জা দেওয়া লোহার গেট ঘুরিয়ে ভেতরে ঢুকে পড়েছিল।

পায়ে পায়ে এক কোণের বেঞ্চি দুটোর কাছে পেঁছে একটায় বসবার পরও সামনের বেঞ্চির লোকটিকে ভালো করে খেয়াল করেনি। লোকটা এ-দিকের গাঢ়তর অন্ধকার থেকেই যেন আচমকা অস্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছিল বেঞ্চির গায়ে।

ফুটে উঠেছিল সশব্দেই।

বিড়ি-টিড়ি একটা ছাড়ুন না স্যার।

খাস আদি কলকাতার মার্কামারা উচ্চারণ।

নীলাম্বর চমকে উঠে সে দিকে চেয়েছিল। পোশাকটা অন্ধকারে তখনও বোঝা যায় নি। শুধু দেখা গেছল, রোগাটে একটা মানুষ বেঞ্চিতে হেলান দিয়ে বেঞ্চির পিঠের দুদিকে হাত দুটো ছড়িয়ে গা এলিয়ে দেবার ভঙ্গিতে বসে আছে।

বিড়ি-টিড়ি নেই। একটু অপ্রসন্ন স্বরেই বলেছিল নীলাম্বর। মনে হয়েছিল এই নির্জন পার্কটুকুর ভেতর ও উপদ্রবটুকু না থাকলেই ভালো ছিল।

লোকটা অনেকক্ষণ তারপর কিন্তু আর বিরক্ত করে নি। নীলাম্বরের জবাবটুকু শুনেই একেবারে চুপ করে গিয়েছিল।

চারিদিক স্তব্ধ। রিকশাওয়ালার চাকা মেরামতের ঠুকঠাক শব্দ সে স্তব্ধতাকে আরো গাঢ় করে তুলছে।

দূরে হঠাৎ একটা একটানা শব্দের স্রোত ক্রমশঃ প্রখর হয়ে উঠেছিল। নদীর আর রাস্তার শব্দ যেন মেলানো। বেগবান একটা মোটর রাস্তার জল কেটে যতদূর সাধ্য দ্রুত এগিয়ে আসছে।

শব্দটা এগিয়ে এসে তীব্র আলোর হিংস্র রসনায় একবার স্তব্ধ অন্ধকারকে লেহন করে বড় রাস্তা থেকে পাশের একটা গলিতে মিলিয়ে গেছল।

বুঝতে পারলেন স্যার!—বেঞ্চির ছায়ামূর্তিটা আবার সরব হয়ে উঠেছিল —শিউপরসাদজির আজও কামাই নেই। জল ঝড় পেরলয় হোক, শিউপরসাদ-জির মোটর রাত বারোটার আগে এসে ওই গলিটায় ঢুকবেই। ওখানে গিয়ে ঘাপটি মেরে যদি দাঁড়ান দেখতে পাবেন শিউপরসাদজি মোটর থেকে নেমে চোদ্দ নম্বর বাড়িটার সেকেলে দরজায় চারবার টোকা দেবে। একটা আস্তে যেন ভয়ে ভয়ে, পরেরটা আরেকটু সাহস করে, আর শেষের দুটো যেন বে-পরোয়া হয়ে দরজা ভাঙার মত করে। টোকা দিয়ে একটু পেছিয়ে সে দাঁড়াবে,

আর দোতালার খুপরি জানালার খড়খড়ি খোলার সংগে ধমক আসবে, নিকাল যাও! ব্যস্‌। শিউপরসাদাজ এইটুকু শুনেই সুশীল সুবোধ ছেলোট হয়ে আবার তার পেল্লয় মোটরে চেপে গলি থেকে যেন কুর্নিশ করতে করতে পিছু হেঁটে বেরিয়ে যাবে।

এই বকবকানিতে নীলাম্বরের বিরক্তির বদলে একটু মজাই লেগেছিল এবার।

কতকটা ভর্ৎসনার ভঙ্গিতে বলেছিল,—তুমি সব জানো, না? একেবারে সব হাঁড়ির খবর!

চোখটা অন্ধকারে সয়ে আসায় লোকটার পোশাক-পরিচ্ছদ চেহারা আরেকটু স্পষ্ট দেখতে পেয়েই তুমি বলে সম্বোধন করতে পেরেছিল নীলাম্বর। চেহারা পোশাক আখ্‌খুটে ইতর গোছেরই। মুখটা ভালো দেখা না যাওয়ায় বয়সটা অবশ্য বোঝা যায় নি।

লোকটা নীলাম্বরের ভর্ৎসনায় একটু শুধু হেসেছিল। সহিষ্ণুতার হাসি যেন। বলেছিল,—আমি জানব না তো জানবে কে স্যার! এই শহরের হাঁড়ির খবর নাড়ির খবর কি আমি না জানি!

নীলাম্বরের এবার স্থির বিশ্বাস হয়েছিল লোকটা পাগল-টাগল হবে। তবে ভয় করবার কিছু নেই। নীলাম্বর গায়ে দস্তুরমত ক্ষমতা রাখে, টেরা-বাঁকা হলে অমন একটা ফড়িংকে টুসকি মেরে উড়িয়ে দিতে পারে। আপাতত রিকশা না মেরামত হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করার সময়টা পাগলের সংগে কাটাতে মন্দ লাগছিল না।

নীলাম্বর একটু বিদ্রূপ করেই বলেছিল,—নাড়ির খবর হাঁড়ির খবর কি করে এত জানলে?

এই আপনি যেমন করে কাগজের বাজারের হাঁড়ির নাড়ির খবর জানেন স্যার! নীলাম্বরকে চমকে দিয়ে লোকটা নিজে থেকেই এবার বলে গেছল,—খবর কি একটা স্যার! আর, যেমন তেমনও নয়। সক্কালবেলা এই পার্কের দক্ষিণমুখো গিয়ে মশলাপটির মুখটায় গিয়ে দাঁড়িয়ে দেখবেন না স্যার। বাবুলালের পানের দোকান ওপরে আর তার নিচে ছাগলের খোঁয়াড়ের মত ঘুপচি একখানা গভর। বড়-সড় একটা সিন্দুক বললেই হয়। সেই সিন্দুক থেকে বেরিয়ে রাধু দাস তখন ছাতার বাঁট-শিক তেল-কাপড় ছুঁচ-সুতো সরঞ্জাম ঝোলায় পুরে টহলে বেরুবার জন্যে তৈরি হচ্ছে। শিউপরসাদজির মত অমন বাদশাই মোটর না হলেও ঝকঝকে তকতকে একটা নতুন গাড়ি ওখানে এসে থামবে। তা থেকে যে নামবে, তাকে দেখে আপনার চোখ যদি টেরা না হয়ে না যায় তাহলে চোখের ডাক্তারের কাছে গিয়ে চোখ দেখাবেন। যেমন গয়নার ঝিলিক, তেমনি রূপের জৌলুসে রাস্তা ঝকমকিয়ে এক সুন্দরী এসে ওই রাধু দাসের সামনে দাঁড়াবে। আর, রাধু দাস করবে কি জানেন? ছেঁড়া কুর্তার পাকিট থেকে সওয়া পাঁচ আনা—ঠিক গোনাগুনতি সওয়া পাঁচ আনা বার করে দেবে সেই সুন্দরীর হাতে। বাবুলাল কোনদিন সকাল সকাল দোকান খুলতে এসে পড়ে থাকলে মুচকে মুচকে বাঁকা হাসি হাসবে। টিটকিরিও দেবে। কিন্তু সুন্দরী গোরাহ্যিও না করে সেই সওয়া পাঁচ আনা চাঁদ মুখ করে নিয়ে আবার গাড়িতে গিয়ে উঠবে।

নীলাম্বরের মনে হয়েছিল, লোকটা পাগল হলেও যেমন তেমন নয়, বেশ সেয়ানা পাগল। একবার ইচ্ছে হয়েছিল, গল্প ঝাড়বার আর জায়গা পাওনি বলে ধমক দেয়। কিন্তু মজাটা মাটি করতে ইচ্ছে হয় নি। তার বদলে আরো একটু উসকানি দেবার জন্য বলেছিল,—হুঁ, তোমার তো সত্যি অনেক মজার খবর জানা দেখছি। এ সব কথা ক'জনই বা আর জানে!

জানবে কি করে স্যার।—লোকটা গালাগাল দিয়ে বলেছিল,—ইস্তিরীর ভাইরা সব আরবী-ফারসী খোয়াব-খেয়ালের নবেল-নাটক পড়ে। আরে এই কলকাতা শহরের কল্‌কে ধরবার মুরোদ যে বোগদাদ-সোগদাদের নেই তা জানে কোন বেটা!

তা, শুনি না তোমার একটা বোগদাদী কলকাতার কিস্‌সা। শিউপরসাদ কি রাধু দাসের হেঁয়ালিই শোনাও না হয়।—বলেছিল নীলাম্বর।

লোকটা খানিকক্ষণ চুপ করে গেছল, ইস্পাহানী গির্জার বারোটার ঘন্টা-গুলো বাজতে দেবার জন্যেই বুঝি। হাঁপ-ধরা ঘড়-ঘড়ে গলায় আওয়াজের মত ঘন্টাধ্বনিগুলো দৈত্যাকার ইমারতগুলোর গায়ে ধাক্কা খেয়ে চোরা জোৎস্নার থমথমে আকাশকে ব্যঙ্গ করতে যেন ঊর্ধ্বে ছড়িয়ে গেছল।

সে সব হেঁয়ালির গাঁট আজ খোলবার ফুরসত হবে না স্যার।—গির্জার ঘড়ি থামবার পর লোকটা নিজে থেকেই বলেছিল,—আজ বরং শিউপরসাদের দামী হাত-ঘড়িটা এখনো যার কব্জিতে বাঁধা, আর বাবুলালের দোকানের বিড়ির যে সেরা জহুরী, সেই বেচারামের ভগবান হওয়ার বিত্তান্তটা শুনুন।

বেচারাম আবার কে?—জিজ্ঞাসা করেছিল নীলাম্বর একটু হেসে।

আজ্ঞে, দাগী চোর স্যার। তবে চোরের মধ্যে বেজাত। যেমন ওস্তাদ তেমনি ওঁচা।—শুরু করেছিল লোকটা,—পাকা সিঁদেল বটে, কিন্তু ছিঁচকেমিতেও ঘেন্না নেই। কিছু না জুটলে পকেট পর্যন্ত কাটে। খানদানি চোরেদের মজলিশে তাই তার ঠাঁই নেই। নিজের স্বভাবের দোষে সে একঘরে। শুধু হাতের কসরত আর বুদ্ধির জোরে টিঁকে আছে। বেচারাম মুখ্যু নয় স্যার। দুধে-দাঁত সব কটা পড়তে না পড়তে বিড়ি ফুঁকতে শিখে, আর গোঁফের রেখা দিতে না দিতেই নেশা ভাঙ কিছু আর বাদ না রেখে ইস্কুলের বেড়াটা আর বেরুতে পারে নি, কিন্তু বেচারাম বাংলা খবরের কাগজ এপিঠ-ওপিঠ পড়ে ফেলতে পারে স্যার, ইংরিজিও ফড়ফড় করে দু-চারটে বলে তাক লাগিয়ে দিতে পারে, যেমন দিয়েছিল পয়লা ধরা পড়ে আদালতে মামলা হবার সময় জজ-সাহেবকে। জজ-সাহেব তাই না শুনে ভাল ভাল মিষ্টি মিষ্টি সব উপদেশ দিয়ে বেকসুর খালাস করে দিয়েছিলেন। বেচারামের মুখটা তখনও কচি কচি ছিল কিনা। কিন্তু সব জজ তো আর সমান হয় না স্যার। পরের বার তার মুখে ইংরিজি বুলির ফড়ফড়ানি শুনে আরেক জজ-সাহেব উল্টে ক্ষেপেই গেছলেন। একেবারে দুটি মাস ঠাণ্ডা গারদের হুকুম ঠুকে দিয়েছিলেন। পুলিসের উকিল বেটা চুকলি খেয়ে আগের বারের কথা লাগিয়েছিল যে!

বেচারামের এ বৃত্তান্তে বোগদাদী খোশবু তো কিছু পাচ্ছি না।—বিদ্রূপ করে বলেছিল নীলাম্বর।

একটু সবুর করুন স্যার। বেচারামকে একটু চিনিয়ে না দিলে তার

বিভ্রান্ত বুঝবেন কি করে?—আবার বলতে শুরু করেছিল লোকটা,—বয়স-কালে এই বেচারাম ঝানু চোর হয়ে উঠেছিল স্যার, যেমন সেয়ানা তেমনি হুঁশিয়ার। সিঁদ-কাঠি চালাত যেন মাখমে ছুরি চালাচ্ছে, জলের পাইপ বেয়ে পাঁচতলার ছাদে উঠত যেন কাঠবেড়ালী, আর বেগতিক দেখলে আলসে থেকে আলসেতে লাফ দিয়ে পগার পার হত যেন বুনো খটাশ। এই বেচারাম এক-দিন অমন সত্যিকার চোরদায়ে ধরা পড়বে তা কে জানত!

লোকটা দম নেবার জন্যে একটু থেমে বললে,—একটা বিড়ি-টিড়ি হলে ভাল হত স্যার। গল্পের এবার চড়াই ভাঙতে হবে কিনা।

বিড়ি-টিড়ি নেই।—একটু করুণাপরবশ হয়ে বলেছিল নীলাম্বর,—তবে পান-জর্দা আছে আমার কৌটায়। চাও তো দিতে পারি।

তাই দিন স্যার, খাটিয়া না জুটলে চ্যাটাই সই।—নীলাম্বরের জর্দা-দেওয়া পান মুখে দিয়ে বার কতক চিবিয়ে পিক ফেলে লোকটা বলেছিল,—এমন মেঘলা-টেঘলা নয় স্যার, ফুটফুটে জ্যোছনার রাত ছিল সেদিন। সিঁদেলদের পাঁজিতে জ্যোছনা মানেই অযাত্রা, আর পুন্নিমে তো তেরস্পর্শ। কিন্তু বেচারাম ও সব শাস্তর-টাস্তরের পরোয়া করত না স্যার। দিন দুপুরেই সে অমন কত বাড়ির সিন্দুক ভেঙেছে। এই কিছু দূরের কানা গলিটা দেখেছেন কিনা জানি না, সেই গলিটা ছাড়িয়ে আরেকটা গলি আছে স্যার, মেয়ে মানুষের চরিত্তিরের চেয়ে পেঁচালো। এখান থেকে শুরু করে হোই উত্তরের খলসের খাল পর্যন্ত ইনিয়ে-বিনিয়ে পাক খেতে খেতে গলিটা গড়িয়ে গেছে চুপিসাড়ে। সেই গলিরই একটা বাড়িতে কাজ হাসিল করে সে সেদিন খোস মেজাজে ফিরছিল। কাম যখন ফতে হয়ে গেছে সেই শেষের দিকটায় একটু বাখড়া পড়েছিল। যে ঘরে কাজ সেরেছে। তার পাশের ঘরেই একটা বাচ্চা মেয়ে কেঁদে উঠেছিল ঘুমের ঘোরে। তার মা-ই বোধ হয় জেগে উঠেছিল। ফ্যাসাদ বাধতে কতক্ষণ। বেচারাম তাই হাওয়া হয়ে গিয়েছিল তখুনি। গলিতে গলিতে নয়, ছাদ থেকে ছাদে, আলসে থেকে আলসেতে। হিম্মত থাকলে অমন তোফা নির্ভর রাস্তা আর নেই।

ছাদ টপকে যেতে যেতে বেচারামকে এক জায়গায় এসে থমকে দাঁড়াতে হয়েছিল স্যার!—পানের ছিবড়েগুলো ফেলে দিয়ে লোকটা আবার শুরু করেছিল,—পুরোনো কোম্পানির আমলের বাড়ি, বুঝেছেন কিনা, বেচারামের হাল্কা পায়ের লাফেই যেন ভেঙে পড়ে। ঘেয়ো শ্যাওলাজমা আলসে আর ছাদ। একদিকটা খোলা আর একদিকে দুখানা টালিতে ছাওয়া খুপরিগোছের চিলকোঠার ঘর। একটা ঘরের দরজা হাট করে খোলা। ভেতরে একটা মিট-মিটে লণ্ঠনের আলো জ্বলছে দেখা যায়।

বেচারামের বেড়াল-পায়ের লাফেও নোনাধরা আলসে থেকে কিছু পলস্তারা আর ইঁটের কুচো বুঝি খসে পড়েছিল। ভেতর থেকে একটি মেয়ের গলায় শোনা গেছল,—কি একটা শব্দ হল না?

যাই হোক না আমাদের কি আসে যায়।—পুরুষের গলা এবার, কিন্ত যেন ফাঁসির আসামী গলায় দড়িটা পরিয়ে দিয়ে বলছে দুনিয়াকে সেলাম দিগে।

বেচারাম নট নড়ন-চড়ন হয়ে গেছল স্যার। ধরা পড়বার ভয়ে নয়, ওই

দুটো গলার আওয়াজের কি জাদুতে।

পা টিপে টিপে খোলা দরজার পাশে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল। শুনেছিল দুনিয়ার দরিয়ায় দুটো বানচাল নৌকোর কাতরানি। সোয়ামী আর তার ইস্তরী, বয়সও বেশী নয় বুঝেছিল গলার আওয়াজে। চৌকাঠ পেরিয়ে ক'দিনই বা সংসারে ঢুকেছে, কিন্তু এর মধ্যেই হালে পানি না পেয়ে ফেঁসে গেছে পাথুরে ডুবো ডাঙায়। তাই নিভিয়ে দিতে চাইছে নিজেদের হাতেই ভাঙা ডিবিয়ার তেল ফুরান সলতে। যা কিছু রেস্ত ছিল, তাই দিয়ে শেষ বাসর সাজিয়েছে, ফুল কিনে এসেন্স-অতর ছাড়িয়ে।

সেই মামুলী গল্প স্যার। ছোকরা বলেছে,—আসুক কাল বাড়িওয়ালা আর পাওনাদার, করুক আমাদের সব কিছু নিলেম। বলে হেসেছে, ওসব কথা বলে যেমন করে হাসতে হয়।

বেচারামের, ঝানু সেয়ানা দাগী সিঁদেল বেচারামের মতিচ্ছন্ন হয়েছে হঠাৎ। সে ভগবান হতে চেয়েছে।

গয়নায় নগদে বেশ কিছু তখন তার কোমরে বাঁধা ঝুলিতে। গয়নাগুলো নিজের কাছে রেখে নগদ যা কিছু একেবারে ঝুলি ঝেড়ে দরজার ওপাশে রেখে দিয়েছে চুপি চুপি। গয়নাগুলো দেয়নি সামলাতে পারবে না জেনে। শুধু নগদ টাকা-পয়সা রেখেই চলে যায়নি। দরজার একটা পাল্লায় জোরে একটা ধাক্কা দিয়ে দাঁড়িয়ে থেকেছে কি হয় দেখবার জন্যে।

ভেতরে দুজনেই চমকে উঠেছে। তবু গোড়ায় কেউ উঠতে চায় নি। তবে মরতে বসেও মানুষের মনের চুলবুলুনি যায় না। শেষ পর্যন্ত মেয়েটাই উঠে এসেছে হ্যারিকেনটা নিয়ে। এসে থ হয়ে গেছে, মুখে তখন আর রা নেই। তারপর চিৎকার করে উঠেছে,—ওগো, দেখে যাও এ কি কাণ্ড!

ছোকরাও উঠে এসেছে তখন। বেচারাম আড়ালে দাঁড়িয়ে দেখতে না পেলেও বুঝেছে, ছোকরা চোখ রগড়াচ্ছে নিশ্চয় জেগে আছে না খোয়াব দেখেছ পরখ করতে।

মেয়েটা তখন চেঁচাচ্ছে,—এ যে অনেক টাকা গো। একশ, দুশ, পাঁচশ!

ছোকরা চাপা গলায় ধমক দিয়েছে,—চুপ! চুপ!

বেচারাম আর দাঁড়ায়নি। নিঃসাড়ে সরে পড়েছে।

লোকটা একটু থামায় নীলাম্বরের মনে হয়েছিল গল্প বুঝি এখানেই শেষ। কিন্তু তা নয়। লোকটা আবার বলেছে,—ভগবান হওয়ার বড় ঝামেলা স্যার। মাসখানেক বাদে বেচারামকে আবার যেতে হয়েছে স্যার ছাদ টপকে সেই চিলকোঠায়। ছাদের দরজা সেদিন বন্ধ। একটা জানালা শুধু খোলা। উঁকি দিয়ে বেচারাম বেশী কিছু দেখতে পায়নি, শুধু নতুন নেটের মশারি আর ঝকঝকে একটা টেবিল-ল্যাম্প। তাই দেখেই বুঝেছে হাওয়া ঘুরেছে। জানালা দিয়ে হাত গলিয়ে সেদিনকার রোজগার প্রায় সবই রেখে দিয়েছে ওদিকে।

বেচারামের সেই এক নেশা লাগল স্যার। ভগবান হওয়ার নেশা, পঞ্চরং-এর চেয়ে কড়া। কিছুদিন অন্তর অন্তর বেশ কিছু লুকিয়ে সেখানে ঢেলে আসে। রেখে আসতে হয় বড় হুঁশিয়ার হয়ে। আহম্মক দুটো কল্পতরু গাছটাই চায় ওপড়াতে। তক্কে তক্কে থাকে তাকে ধরবার। বেচারামের হয়রানি

ঘাড়ে লুকিয়ে দাতাকর্ণ হয়ে আসতে।

ওদিকে ঘর-দোর-সংসারের চেহারা তখন দিন দিন পাল্টাচ্ছে। ভাঙা তক্তাপোশের বদলে খুরো দেওয়া খাট, তোরঙ্গের বদলে সিসে-বসান আলমারি দেরাজ। আলনায় মেয়েটার ঝলমলে শাড়ি, ছোকরার নতুন নতুন পোশাকের বাহার। টেবিল-লম্পর জায়গায় হ্যাসাক বাতির আলোয় এই সবই দেখেছিল বেচারাম।

ঘর-দোর পাল্টেছিল, শেষে পাল্টাল মানুষ।

বেচারামের ভগবান একদিন মাঝরাতে গিয়ে প্রায় ধরা পড়ে আর কি। রাত একটা বাজে। মেয়েটা তখনও সিঁড়ির কাছে বসে কে জানত।

কি ভাগ্যি, বেচারাম সেদিন পাইপ বেয়ে উঠেছিল। উঠে আলসের ওপর দিয়ে উঁকি দিয়ে মেয়েটাকে ওইভাবে দেখতে পেয়েই ঘাপটি মেরে বসে পড়েছিল আলসের কানাচে।

রাত দেড়টার সময় ছোকরা এল স্যার। বুঝতেই পারছেন মদ খেয়ে এসেছে কোন হুরীর ঘর থেকে কে জানে।

দুজনের তারপর কি চিল্লামিল্লি চুলোচুলি। নেহাত দুপুর রাত বলে কাক চিল ওড়ে নি।

মেয়েটা বলে—মানতাসার জন্যে টাকা রেখেছিলাম, তুমি তাই চুরি করে গিয়ে ফুর্তি করেছ।

ছেলেটা বলে,—বেশ করেছি। মানতাসা গড়াবে! গয়নার লালচ আর মেটে না!

সে কোঁদল থামতে রাত আড়াইটে বাজল। বেচারাম তখনও ঠায় বসে আলসের কানাচে। সব ঠাণ্ডা হবার পর পা টিপে টিপে গিয়ে জানলা গলিয়ে সেদিনের যা কিছু লুট সব রেখে এল তাদের ঘরে. টাকা-কড়ি গয়নাপত্র সব একেবারে ঝুলি উজোর করে।

ওই ব্যাপার দেখেও রেখে এল! -সবিস্ময়ে প্রশ্ন করেছিল নীলাম্বর।

হ্যাঁ স্যার, সব দেখে-শুনেই রেখে এল।

তারপর?—জিজ্ঞাসা না করে পারে নি নীলাম্বর।

তারপর আর বেশী কিছু নেই স্যার। ছোকরার জেল হল চোরাই গয়না বেচতে গিয়ে ধরা পড়ে।

ইস্পাহনী গির্জেয় সাড়ে বারোটার ঘন্টা বাজল।

আজ তবে উঠি স্যার। কখনো যদি আসেন বিড়ি আনবেন, ওই বাবুলালের দোকানের লাল সুতোর বিড়ি, একেবারে ফাস্ কেলাস।

লোকটা চলে গেল। নীলাম্বরের মনের ভুল হতে পারে. কিন্তু যাবার সময় তার হাতে যেন একটা ঘড়ির ঝিলিক দেখা গেল। শিউপরসাদের সেই ঘড়ি না কি?

রিকশা সে রাতে আর মেরামত হয় নি। নীলাম্বরকে হেঁটেই যেতে হয়েছিল স্টেশনে। প্ল্যাটফর্মে শুয়েই রাত কাটিয়েছিল।

তারপর রস-কষ-হীন টাকা-আনা-পাই-এর নীলাম্বর আবার গেছল পার্কে। গিযে পড়েছিল ইস্পাহানী গির্জের ঘড়িতে সাড়ে এগারটার ঘন্টা বাজবার একটু আগে। গিয়ে কারুর দেখা আর পায় নি।

পেয়েছিল পরে। ইস্পাহানী গির্জের ঘড়িতে হাঁপানো ঘড়ঘড়ে সাড়ে এগারটার ঘন্টা বাজবার পরে গিয়ে।

আমরাও মর্জি হলে একদিন যেতে পারি তখন বাবুলালের দোকানের লাল সুতোর বিড়ি নিয়ে।

বা ঘ

চিঠিটা কাজিপেট থেকে লেখা। ইংরেজিতে। বাংলা অনুবাদ করলে মোটা-মুটি এই দাঁড়ায়—

মিত্রজি,

আমাকে নিশ্চয় ভুলে যান নি। আমার সংগে একবার পরিচয় হলে কেউ আর ভোলে না। এটাও আমার একটা অহংকার। আপনার সংগে ত একবার নয় দুবার দেখা হয়েছে। দুবার-ই অবশ্য ট্রেনে।

ট্রেনে দূরের রাস্তায় যেতে যেতে একটা অদ্ভুত ঘনিষ্ঠতা অনেক সময়ে দু-একজনের সংগে হয়। চব্বিশ বছরের পরিচয়ে মনের যে সব দরজা বন্ধ-ই থাকে চব্বিশ ঘন্টার আলাপে তা কেমন করে খুলে যায়।

আপনার সংগে সে রকম ঘনিষ্ঠতা না হোক কোথায় যেন একটা মিল হয়েছিল, বিপরীতের মিল। আপনি ও আমি ভেতরে ও বাইরে নানাদিক দিয়ে ভিন্ন জাতের। তাই বোধ হয় পরস্পরকে আকর্ষণ করেছিলাম। আকর্ষণটা প্রীতিকর তা বলছি না। কিন্তু সেটা ঔদাসীন্যের চেয়ে ভালো।

আমার সম্বন্ধে বিরূপ ধারণাই আপনার হয়েছে বলে ধরে নিচ্ছি। কিন্তু তাতে আশ্চর্য হচ্ছি না। বিরূপ না হলেই বরং অবাক হবার কথা, কারণ প্রথম আলাপে আপনাকে একটু ঝাঁকানি দেবার চেষ্টাই করেছি। সেটা আমার স্বভাব। আমার স্বভাবের আরো দু-একটা বিশেষত্বের পরিচয় নিশ্চয় পেয়েছেন এবং মনের খাতায় সেগুলো টুকেও রেখেছেন বোধহয় সুবিধামত কাজে লাগাবার জন্যে।

কিন্তু সে সুবিধা নেওয়ার সম্ভবতঃ আপনার দরকার হবে না।

যাতে না হয় সেই জন্যেই এই পত্রাঘাত।

আপনি বাংলা ভাষার একজন লেখক, দ্বিতীয়বারের ট্রেন যাত্রাতেই তা জেনেছিলাম। আমাকে নিয়ে বানানো গল্প লেখবার কষ্ট করবার কিন্তু প্রয়োজন নেই। আমার সত্যকার কাহিনী-ই আপনাকে পাঠালাম। বাংলা-ভাষায় সাজিয়ে নিয়ে ছাপতে পারেন।

কাট ছাঁট একটু করতে ইচ্ছে হয় করবেন, কিন্তু রং চড়াবার চেষ্টা করবেন না, কারণ এমনিতেই আমার নিজের মতে গল্পের রং বেশ চড়া।

দম্ভ আমার যতই থাক তার জন্যে এ কাহিনী যে আপনার কাছে পাঠাচ্ছি না, একথা বিশ্বাস করতে পারেন। আমি যে রাজ্যে থাকি সেখানে আপনাদের বাংলা সাহিত্যের কোন খবরের কোন দাম-ই নেই। সুতরাং খাঁটি বা মিশেল রূপে আমার এ কাহিনী পড়ে বাংলা ভাষার পাঠক-পাঠিকা কি ভাববে তাতে আমার কিছু আসে যায় না। আমি শুধু নিজেকে খোঁজবার খেয়ালের মাথায় এ কাহিনী কিছুদিন আগে লিখে ফেলি।

লিখে ছিঁড়েই ফেলছিলাম, হঠাৎ আপনার কথা মনে হল। ভাগ্যক্রমে ডায়েরীর পাতায় আপনার ঠিকানাটাও পেয়ে গেলাম। তাই আপনাকে পাঠাচ্ছি।

আপনারা বানিয়ে বানিয়ে অনেক গল্প লেখেন। বানিয়ে লেখেন বলে-ই

সে গল্প মিথ্যে এমন কথা বলছি না। কল্পনার খাদ না মেশালে সোনার মত সত্যকেও রূপ দেওয়া যায় না বলে আমি মনে করি। কিন্তু জীবনের সত্য যেখান থেকে আপনারা গালিয়ে তোলেন তার বাইরে কত এলাকার এখনও জরিপই হয়নি একথা নিশ্চয় মানেন। আমার জীবনের কথায় তেমনি অপরিচিত কোন এলাকার সন্ধান পান কি না জানবার কৌতূহলে এ লেখা আপনাকে পাঠিয়ে দিলাম।

বাংলা সাহিত্যের সঙ্গে সামান্য একটু পরিচয় আমার আছে ইংরাজী ও গুজরাতী ভাষার ভেতর দিয়ে। সে পরিচয়ের জোরে আপনাদের সাহিত্য সম্বন্ধে কোন রায় সরাসরি দেওয়া যায় না। কিন্তু পৃথিবীর সব দেশের সাহিত্যে আজ যে ভাঁটার টান চলছে বাংলা ভাষা তা থেকে মুক্ত বলে মনে হয় না। আমার নিজের ধারণা এই যে এখনকার সাহিত্যিকেরা নিজেদের দম্ভ হারিয়েই নিজেদের কাছেই কেমন খেলো হয়ে গেছেন। ফলিত বিজ্ঞানের চোখ ধাঁধানো ঐশ্বর্য সাহিত্যিকের নিজের দৃষ্টিতেই তার সওদাকে নিষ্প্রভ সস্তা করে দিয়েছে। স্পষ্ট স্বীকার করুন বা না করুন নিজেদের আপনারা খানিকটা অবান্তর ফালতু মনে করেন। তাই হয় মাত্রাহীন আদিরসে ভাসিয়ে, নয় ভুষিমালে ভারী করে আপনারা সাহিত্যের বাজারে খরিদ্দার ভোলাবার চেষ্টায় মত্ত।

ধান ভানতে শিবের গীত গাইছি মনে করছেন? তা কিন্তু নয়। বৈজ্ঞানিক দার্শনিক শিল্পী রাজনীতিক যে যাই করুক জীবনকে বোঝবার বোঝাবার কঠিনতম সাধনা যে একমাত্র সাহিত্যের এ দম্ভ আপনাদের আবার ফিরে পাওয়া দরকার।

আমার এ কাহিনীতে সাহিত্যের সে দম্ভ অবশ্য নেই। আগেই ত বলেছি আমি শুধু নিজেকে বোঝাবার আশায় এ কাহিনীটা লিখে ফেলেছি। লিখে আরও ফাঁপরে পড়েছি। মনের মধ্যে যার ইঙ্গিত ছিল ভাষা দিতে গিয়ে দেখছি তা আরো ঘোলাটে হয়ে গেছে। আপনার কাছে তাই পাঠাচ্ছি। দেখবেন ত একে ওলট পালট করে সাজালে মানেটা কোথাও উঁকি দেয় কিনা।

গল্প আমার বড় নয়! শুধু একটি ঘটনা। সে ঘটনায় পৌঁছবার জন্যে শুধু একটু ভূমিকা দিচ্ছি। যে ভূমিকা আপনি নিজের বুদ্ধিতে কল্পনায় বাড়িয়ে নেবেন।

মানুষটা আমি সংসারের দশজনের বিচারে ভালো নয়। লোকে যাকে গলদ বলে তা আমার যথেষ্ট। মুনি-ঋষির মত জীবন কাটাই নি, মস্ত বড় কোন কাজ করি নি, দান-ধ্যান ত্যাগ-ট্যাগও নয়।

তবু এই আমিই একদিন নিজের জীবনটা শেষ করে দিতে চেয়েছিলাম। চেয়েছিলাম একরকম অহমিকাতেই ভাবতে পারেন। ভাগ্যের সঙ্গে এমন পাশা খেলতে চেয়েছিলাম যাতে হারলেও জিত।

আপনি ত নিরীহ শহুরে মানুষ। শিকার-টিকার কখনো করেছেন বলে মনে হয় না। করলেও বড় জোর পাখি-টাখি করেছেন।

আমার সঙ্গে সামান্য পরিচয়েই নিশ্চয় জেনেছেন যে শিকারের ব্যাপারে ভারতবর্ষের সেরা শিকারীদের সঙ্গে আমি টক্কর দিতে পারি। আমার এ দম্ভ বিশ্বাস করুন বা না করুন এ গল্পের কিছু আসে যায় না।

এই শিকারের একটি ঘটনাই আপনাকে বলছি। মনে করুন মধ্য প্রদেশের

এক অজগর বন। মনে করুন মানুষখেকো এক কেঁদোর দাপটে সেই বনের আশে পাশের সমস্ত গাঁয়ের থরহরি কম্প অবস্থা। মোষ ছাগল ত বটেই বাচ্চা বুড়ো মেয়ে পুরুষ মিলে গোটা বারো মানুষ তার পেটে গেছে। তার মধ্যে একজন সায়েব শিকারী। গাঁয়ের লোক দিনের বেলায় পর্যন্ত বাড়ি ছেড়ে বেরুতে চায় না। চাষ-আবাদ সব বন্ধ হয়ে গেছে।

এমনি একটি গাঁয়ের সদ্য সদ্য একটা মানুষ মারার খবর পেয়ে আমরা গিয়ে জুটেছিলাম। আমি আর আমার বন্ধু যমুনাপ্রসাদ।

শিকারের গল্প আপনি নিশ্চয় পড়েছেন অনেক। তবু খুঁটিনাটি কিছু বোধহয় জানেন না, যেমন দুশ চল্লিশ পয়েন্ট আর দুশ পঁচাত্তর পয়েন্ট রাই-ফেলের তফাত, বাঘ আর চিতার জানোয়ার বা মানুষ মারবার পদ্ধতি কি, কিংবা জংগলে জানোয়ারদের ডাক থেকে কিভাবে শ্বাপদদের চলা-ফেরা বুঝতে হয়।

শিকারের সাঙ্কেতিক বুলি যথাসাধ্য বাদ দিয়েই কাহিনীটা তাই বলব।

আমার বন্ধু যমুনাপ্রসাদ শিকার সম্বন্ধে এমন কিছু অভিজ্ঞ নয়। বিপজ্জনক শিকার সে জীবনে খুব কমই করেছে। রাজা মহারাজাদের দলে দু-একবার হাতীতে চড়ে জংগল তাড়ানো বাঘ মারতে হাওদা শিকারে গেছে মাত্র। মাচান বেঁধে সে কখনও মড়ি পাহারা দিয়ে বসে নি।

সেই যমুনাপ্রসাদই কিন্তু এবার জেদ ধরে আমার সংগে এই মানুষখেকো বাঘ শিকারে এল।

তার আসাটা একেবারে অপ্রত্যাশিত।

যে অঞ্চলে বাঘের উপদ্রব চলছিল সেখানকার একটি ফরেস্ট বাংলোতে সপ্তাহখানেক আগে আমি একাই এসে উঠেছিলাম। কাছাকাছি বাঘের সম্ভাব্য চলাফেরার পথে দু-জায়গায় দুটি বাচ্চা মহিষ বাঁধবাব ব্যবস্থাও করা হয়েছিল। কিন্তু বাঘ সেসব ছোঁয় নি। একবার নরমাংসের স্বাদ পেলে বাঘের সাধারণতঃ অন্য মাংসে বিশেষ রুচি থাকে না!

আমি ফরেস্ট বাংলোতে পৌঁছোবার দিন তিনেক আগে বনের এক কাঠুরে বাঘের হাতে প্রাণ দিয়েছে। সুতরাং এ অঞ্চল ছেড়ে না গিয়ে থাকলে বাঘটা বেশী দিন আর উপবাসে কাটাবে না বলে মনে করছিলাম। মানুষ না পেলে হয়ত পেটের জ্বালায় মোষের বাচ্চাগুলোর ওপর নজর দিতে পারে এই ছিল আশা। কিন্তু সে আশা বৃথা।

পশ্চিমে ও দক্ষিণে ঘন বন যেখানে ক্রমশঃ পাতলা হয়ে পাহাড়ী উপত্যকায় এসে মিশেছে সেখানে প্রায় কুড়ি ক্রোশের মধ্যে ছড়ানো কয়েকটা আধা জংলী গ্রাম। কোন গ্রামেই বিশ-ত্রিশ ঘরের বেশী মানুষ নেই। অনুর্বর পাথুরে জমিতে সামান্য একটু চাষ-আবাদ করে আর দু-চারটে মোষ পুষে কোন রকমে তাদের চলে। এই কটা জংলী গ্রামই গত ছ-মাস ধরে প্রায় শ্মশান হবার উপক্রম হয়েছে। জংগল থেকে বেরিয়ে কোন গাঁয়ে বাঘ যে কখন হানা দেবে তার কোন ঠিক নেই। গাঁ থেকে বেরিয়ে কোথাও যাওয়া দূরে থাক গাঁয়ের ভেতরেই দিন দুপুরে দল বেঁধে ছাড়া গাঁয়ের লোকেরা কিছু করতে সাহস করে না। চাষ-আবাদ সব নষ্ট হতে চলেছে। গাঁয়ের মোষগুলোও উপবাসী। তাদের জংগলে চরতে নিয়ে যাওয়ার বা তাদের জন্যে বনের ঘাস কেটে আনবার

কারুর আর সাহস নেই। বেপরোয়া হয়ে দু-একজন যারা গেছে তারা সাধারণতঃ আর ফেরোন। গাঁয়ের মধ্যে সন্ধ্যে না হতেই তাই এখন নিত্য খিল পড়ে ঘরে ঘরে। সে খিল খুলে বেশ বেলা না হওয়া পর্যন্ত কেউ বার হতে সাহস করে না।

গাঁয়ের লোকের এই আতঙ্কিত সতর্কতায় গত সাত দিন ধরে বাঘের কবলে কোন মানুষ পড়ে নি। কিন্তু তা সত্ত্বেও নধর তাগড় দুটি মাহিষ শাবক অক্ষত অবস্থাতেহ আছে।

প্রতিদিন দুপুরের আগে গাঁয়ের দু-একজন অপেক্ষাকৃত সাহসী লোককে সংগে নিয়ে মহিষ শাবকটির খবর নিতে ও জীবিত থাকলে তাদের জন্যে কিছু আহারের ব্যবস্থা করে দিয়ে আসছিলাম এই কয়দিন। গাঁয়ের লোকেরা নেহাত আমার বন্দুকের ভরসাতেই অবশ্য এ কাজে আমায় সাহায্য করতে রাজী হয়েছিল।

সেদিন মোষের বাচ্চা দুটোকে যথাস্থানে বহাল তবিয়তে থাকতে দেখে হতাশ হয়ে মানুষখেকোটাকে প্রলুব্ধ করবার আর কি উপায় আছে ভাবতে ভাবতে ফরেস্ট বাংলোয় ফিরেছিলাম।

বাংলোর কাছাকাছি এসেই অবাক হয়ে থমকে দাঁড়ালাম।

বাংলোটা একটা নিচু পাহাড়ী টিলার ওপর। জংগল থেকে আসতে দূর থেকেই সবটা দেখা যায়। যা দেখে আমি অবাক হয়ে থমকে দাঁড়ালাম তা আজগুবি কোন ব্যাপার নয়। একটা রঙিন শাড়ি মাত্র! বাংলোর বাইরে টাঙানো দড়িতে হাওয়ায় উড়ছে। কিন্তু এই শাড়ি ওড়াটা আমার কাছে তখন আজগুবি ব্যাপারের চেয়েও চাঞ্চল্যকর।

বাংলোয় পৌঁছে যা আশংকা করেছিলাম তাই দেখলাম। যমুনাপ্রসাদ সস্ত্রীক আজ সকালেই আমি যখন মহিষ শাবকদের খবর নিতে বেরিয়েছি তখন একটা জীপ নিয়ে ফরেস্ট বাংলোয় উঠেছে। ইতিমধ্যে তাদের স্নানটান যে সারা হয়েছে বাংলোর উঠোনে হাওয়ায় ওড়া শাড়ি তারই প্রমাণ।

আমি যখন বাংলোয় গিয়ে ঢুকলাম তখন দুজনেই বারান্দায় পাতা দুটি বেতের চেয়ারে বসে আছে।

সুভদ্রা আমায় দেখে শুধু মুখটা ফিরিয়ে নিলে। যমুনাপ্রসাদ একটা লৌকিকতার সম্ভাষণ জানালে মাত্র। কিন্তু সেটা নিতান্ত যান্ত্রিক। কোন উত্তাপ ত তাতে নেই-ই বরং ভদ্রতার বদলে একটু রূঢ়তারই আভাস। এখানে এমন করে হঠাৎ উদয় হওয়ার কোন কৈফিয়ত সেও যেমন দিলে না—আমিও চাইলাম না।

আমাদের ব্যবহার দেখলে যে কেউ মনে করতে পারত যে তাদের এখানে আসাটা নিতান্ত সাধারণ স্বাভাবিক ব্যাপার।

বিকেল পর্যন্ত এই ভাবেই কাটালাম। সুভদ্রা এ পর্যন্ত আমাকে এড়িয়ে থাকবারই চেষ্টা করেছে সারাক্ষণ। এক সংগে কাছাকাছি বসেও চোখে চোখ পড়তে দেয়নি একবারও। যমুনাপ্রসাদ একটু-আধটু আলাপ যা করেছে তাও তুচ্ছ ব্যাপার নিয়ে।

বিকেলে চা খেতে বারান্দায় বসেই আমি এই অস্বস্তিকর আবহাওয়া শেষ করে দিলাম।

কঠিন স্বরে জিজ্ঞাসা করলাম,—তুমি বন্দুক নিয়ে এসেছ দেখছি প্রসাদ! সে কি এখানে শিকার করবার আশায়?

তাছাড়া কি জন্যে?—প্রসাদ বিদ্রুপের স্বরে বললে,—শিকারের জন্যে বন্দুক লাগে বলেই ত জানি।

হ্যাঁ, বন্দুক নিশ্চয় লাগে, কিন্তু সুন্দরী স্ত্রীরও কি দরকার হয়? সুভদ্রা-কে নিয়ে এসেছ কেন?

আমি নিয়ে এসেছি!—যমুনাপ্রসাদ হঠাৎ অস্বাভাবিক উচ্চস্বরে হেসে উঠে বললে, সুভদ্রা যে আমার সংগ ছাড়তে চায় না। ও নিজে জোর করে এসেছে কি না ওকেই জিজ্ঞাসা করো।

সুভদ্রা চকিতে আমার দিকে চেয়ে মুখটা আবার দূরের জংগলের দিকে ঘুরিয়ে নিলে।

সেই এক মুহূর্তে তার চোখে যা দেখলাম তা অশ্রুর আভাস না বিদ্যুৎ-বহ্নির জ্বালা বোঝা গেল না।

যমুনাপ্রসাদকেই রূঢ়ভাবে জিজ্ঞাসা করলাম,—কিন্তু তুমি নিজেই কি বলে এখানে এসেছ? এখানে শিকার করতে আসার মানে কি, তা তুমি জানো?

যমুনাপ্রসাদ আমার দিকে চেয়ে হেসে বললে,—তুমি যখন সাতদিন ধরে এসে নিষ্কর্মা হয়ে বসে আছ, তখন এখানে শিকারের মানেটা কিছু জেনেছি বই কি।

আমি তীব্রস্বরে বললাম—এ হাসি তামাসার ব্যাপার নয় প্রসাদ! মানুষ-খেকো বাঘেদের মধ্যেও তফাত থাকে। হিংস্র শয়তানীতে এই বাঘটার তুলনা মেলা ভার। এ পর্যন্ত দুজন শিকারীকেও সে শেষ করেছে। তার মধ্যে এক-জন ঝানু সাহেব শিকারী।

তাহলে ত এ বাঘের খোরাক হবার লোভ সামলান যায় না।—বলে যমুনা-প্রসাদ সুভদ্রার দিকে হাসতে হাসতে জিজ্ঞাসা করলে—তুমি কি বলো ভদ্রা?

সুভদ্রা নীরবে পাণ্ডুর মুখে উঠে চলে গেল উত্তর না দিয়ে।

পাগলামি কোরো না প্রসাদ। আমি এবার অনুনয় করে বললাম—এখান থেকে স্টেশন পঁচিশ মাইল। রাস্তা খারাপ হওয়া সত্ত্বেও সন্ধ্যের আগেই তোমার গাড়িতে সেখানে পোঁছে যেতে পারবে। আর এক মুহূর্ত দেরি না করে তৈরী হয়ে নাও। সুভদ্রাকে নিয়ে তোমায় যেতেই হবে এখুনি!

যেতেই হবে এখুনি! যমুনাপ্রসাদ তীব্র বিদ্রূপের স্বরে বললে. ফরেস্ট বাংলোটার সংগে আমাদের জীবনের হর্তাকর্তা কি তুমি নাকি?

এ আঘাতটাও গায়ে না মেখে আমার স্বভাববিরুদ্ধ কাতরতার সংগে বললাম,—যাই তুমি আমাকে বলো, আর একবেলাও তোমার এখানে থাকা চলবে না। নিজের কথা না ভাবো, সুভদ্রার কথাটা ভেবে দেখো।

একদৃষ্টে আমার দিকে খানিকক্ষণ চেয়ে একটু তিক্ত হাসির সংগে যমুনা-প্রসাদ বললে—তার কথাই ভাবছি।

তারপর আমার উত্তরের জন্যে অপেক্ষা না করে বারান্দা থেকে নেমে বাইরের দিকে চলে গেল।

যমুনাপ্রসাদকে বোঝাতে না পেরে একবার মনে হল সুভদ্রাকেই গিয়ে এ উন্মত্ত খেয়ালে বাধা দিতে বলি। কিন্তু তাতে কোন ফলই হবে না জেনে

বন্দুকগুলো একবার দেখে নেবার জন্যে নিজের ঘরের দিকে গেলাম। আমার সঙ্গে ৪৫০ পয়েন্ট ভারী ডবল ব্যারেল রাইফল ছাড়া ৪০৫ পয়েন্টের রাইফল একটা আছে। যমুনাপ্রসাদ যে রাইফল সঙ্গে এনেছে সেটা ইতিমধ্যে দেখেছি। সেটা পাখী বা চিতল কি কাকার মারবার ২৪০ পয়েন্ট রাইফল মাত্র। যমুনা-প্রসাদ যখন কিছুতেই জেদ ছাড়বে না তখন তাকেই আমার ৪৫০ রাইফলটা দিয়ে নিজে ৪০৫টা নেব ঠিক করেছি।

নিজের ঘরে যাবার পথে খোলা দরজা দিয়ে পাশের ঘরে সুভদ্রাকে দেখতে পেলাম। দরজার দিকে পিছন ফিরে জানালার ধারে পাথরের মূর্তির মত নিস্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে সে দূরের পাহাড় জংগলের দিকে চেয়ে আছে।

এক মুহূর্ত দরজার কাছে দাঁড়িয়ে তাকে ডাকব কিনা দ্বিধা করে নিজের ঘরে চলে গেলাম।

তার পরদিন সকালেই আশাতীত খবরটা পাওয়া গেল।

বাঘ সত্যিই আর উপবাসী থাকতে না পেরে আমাদের কাছাকাছি বাঁধা একটি মোষের বাচ্চাকে মেরে খানিকটা খেয়ে গেছে।

মোষের বাচ্চা দুটি যেখানে বাঁধা সেখানে সুবিধে-গোছের উঁচু গাছে চলনসই মাচানের ব্যবস্থা আগে থাকতেই ঠিক করা ছিল।

দুপুরের মধ্যেই মরা মোষের বাচ্চার কাছে মাচানটা মজবুত করে বাঁধা হয়ে গেল।

যমুনাপ্রসাদকে তার ওপর বসাব ঠিক করে নিজের জন্যেও কাছাকাছি একটা বসবার জায়গা খুঁজে নিলাম। মড়িটা যেখানে রাখা তার পাশ দিয়ে একটা ঝোপঝাড়ে ঢাকা নালা গেছে। সেই নালার ওপারে কিছুদূরে মাঝারী রকম উঁচু পাথুরে ঢিবি। তার একদিকটা একেবারে মাথা পর্যন্ত প্রায় সোজা খাড়াই। মড়ির মুখোমুখি দিকটাও খানিক দূর খাড়া উঠে একটা পাথুরে খাঁজের মত জায়গায় শেষ হয়েছে। পাথরের একটা তাকের মত সেই জায়গায় পাশের এক দিকের কিছুটা ঢালু এবড়ো খেবড়ো গা বেয়ে ওঠা যায় এবং একটু আড়াআড়ি ভাবে হলেও মড়ির দিকে নজর রাখা যায়। একান্ত নিরাপদ না হলেও কিছু কাঁটা ঝোঁপ দিয়ে ঘিরে নিয়ে সেইখানেই আমি বসব ঠিক করলাম।

সূর্য অস্ত যাবার আগেই যে যার জায়গায় গিয়ে বসতে হবে, সারারাত জেগে বাঘের অর্ধভুক্ত মড়ি খেতে আসার প্রতীক্ষা করতে।

কিন্তু এ ব্যবস্থাতেও যমুনাপ্রসাদ গোল বাঁধাল। প্রথমতঃ আমার ৪৫০ রাইফল সে কিছুতেই নেবে না। তার নিজের ২৪০ এর বদলে আমার ৪০৫ রাইফলটা ব্যবহার করতে যদি বা তাকে রাজী করালাম গাছের ওপরকার মাচানে বসতে সে অটলভাবে আপত্তি জানালে।

তার নির্বোধ একগুঁয়েমিতে রাগ আর সামলাতে না পেরে জ্বলে উঠে বললাম,—আত্মহত্যার জন্য সহজ রাস্তাও ত আছে প্রসাদ!

সে কেমন রহস্যময় ভাবে হেসে বললে—জানি। কিন্তু আত্মহত্যা আমি করতে চাই কে তোমায় বললে! তোমার ওই মানুষখেকো বাঘকে আমি এক রাত্রের জন্যে নিয়তির পদে বসাতে চাই।

দৃঢ় কঠিন স্বরে এবার বললাম,—না, তোমার এসব পাগলামিকে প্রশ্রয়

দিতে আমি পারব না। হয় তুমি মাচানে বসবে, নয় শিকারে যেতে তুমি পাবে না।

যমুনাপ্রসাদ একটু হাসল। তারপর প্রায় সহজ গলায় বললে—বাধা তুমি আমায় দিতে পার না। তবু ওই ঢিবির ওপর যদি আমি নাই বসি তাহলে আমি বাংলোতেই থাকব, আর গভীর রাত্রে হেঁটেই ও জঙ্গলে যাবো জেনো।

সময় তখন আর বেশী নেই। নিরুপায় হয়ে তাই যমুনাপ্রসাদের জেদই রাখতে হল।

ফরেস্ট বাংলো থেকে বন্দুক টর্চ জলের ফ্লাস্ক কম্বল প্রভৃতি সাজসরঞ্জাম নিয়ে বেরুবার সময় দেখলাম সুভদ্রা নীরবে এসে বারান্দার ধারে দাঁড়িয়েছে। তার বেশভূষাটা ওই অবস্থায় সত্যি চমকে দেবার মত। উজ্জ্বল কমলা রঙের শাড়িটা তার সুঠাম দীর্ঘ দেহটাকে যেন আগুনের শিখার মত বেষ্টন করে উঠেছে। ফিকে সবুজ রঙের চোলিটা যেন সেই আগুনেরই রহস্য ছায়ায় ইঙ্গিতময়। চূড়ো করে বাঁধা মাথার খোঁপায় বনফুলের বেড়—বাংলোর আশ-পাশের গাছ থেকেই তোলা।

সবিস্ময়ে তার দিকে তাকাতে একবার দুজনের চোখের দৃষ্টি মিলিত হল কিন্তু মনে হল তার দৃষ্টির পেছনে কোন চেতনা যেন নেই। দেহের ওই শিখার আগুনে তার মন যেন পুড়ে ছাই হয়ে গেছে।

মড়ি পাহারা দিয়ে মানুষখেকো বাঘের জন্যে অপেক্ষা করা কি ধৈর্য ও আত্মসংযমের পরীক্ষা তা আপনাকে বোঝাবার চেষ্টা করব না। প্রত্যক্ষ অভি-জ্ঞতা ছাড়া সে অনুভূতির আভাস পাওয়া অসম্ভব মনে হয়।

যতদূর সম্ভব স্থির নিষ্পন্দ হয়ে মাচানের ওপর বসে আছি। সূর্য অস্ত গিয়ে অন্ধকার নেমে এল সমস্ত অরণ্য পাহাড়ের ওপর কালো যবনিকার মত। পাঁশুটে জংলী মোরগগুলো শেষবারের মত ডেকে উঠে তাদের বাসায় গেল।

তারপর ঝিঁঝিঁর ঝঞ্জনার সঙ্গে থেকে থেকে রাতচরা পাখীদের ডাকের চমক। অন্ধকার যেন আঠার মত গাঢ় হয়ে উঠছে। জায়গাটা জানা আছে তাই, নইলে মাচান থেকে অর্ধভুক্ত মোষের বাচ্চার লাশটা দেখাই যাচ্ছে না ভালো করে।

হাতঘড়িতে সময় দেখলাম রাত প্রায় নটা। বহুদূরে 'আইও' 'আইও' গোছের একটা রব উঠে থেমে গেল। এক পাল চিতল হরিণ কোন কারণে ভয় পেয়েছে। বাঘের গন্ধ কি সাড়া পেয়ে হ'তে পারে। অন্য কারণেও হওয়া সম্ভব।

রাত যখন দশটা বেজে গেছে তখন মাইল খানেক দূরে একটা মদ্দা সম্বরের ডাকে চমকে টান হয়ে বসলাম। অনেকটা ঘণ্টাধ্বনির মত সন্ত্রস্ত ডাক। ডাকটা ক্রমশঃ দূরে মিলিয়ে যেতে বুঝলাম সম্বরটা ভয় পেয়েই পালাচ্ছে। এবার বাঘ না হয়ে যায় না।

বাঘটা মড়ির দিকেই আসছে মনে হল।

কিন্তু কই? আধঘণ্টা চল্লিশ মিনিট কেটে গেল। এতক্ষণে বাঘ এসে পেঁৗছে যাবার কথা।

বাঘটা কি তাহলে কাছে কোথাও ঘাপটি মেরে আছে! গাছে বাঁধা মাচান-টায় যে মানুষ আছে তা কি সে বুঝতে পেরেছে?

কিংবা যমুনাপ্রসাদেরই সে কি সন্ধান পেয়েছে? নিঃশব্দে গুঁড়ি মেরে যাচ্ছে তাকে আক্রমণ করতে!

বুকটা এক মুহূর্তে কি রকম কেঁপে উঠল। পাহাড়ী খাঁজটা যথেষ্ট নিরাপদ নয় আমি জানি। বাঘও সেরকম বেপরোয়া হয়ে লাফ দিলে খাঁজে গিয়ে উঠতে না পারুক থাবার ঘায়ে সেখানে যে আছে তাকে অনায়াসে পেড়ে ফেলতে পারে।

বাঘ কি সেই মতলবেই সেদিকে গেছে?

এবার আমি যা করলাম, তা অতিবড় নির্বোধ বা উন্মাদ ছাড়া কেউ করে না। মাচান থেকে টর্চ লাগান বন্দুক নিয়ে আমি নিচে নামলাম।

কেন এ কাজ করলাম তা আপনাকে বোঝাতে পারব কি না জানি না। আমি নির্বোধ বা উন্মাদ কিছু নই মিত্রজি। পাপ পুণ্য সামাজিক অপরাধ সম্বন্ধে আমার ধারণা সাধারণের থেকে এমন আলাদা যে গভীর অনুশোচনায় কোনরকম প্রায়শ্চিত্ত করতে আমি মরিয়া হয়ে উঠিনি। শুধু এক মুহূর্তে আমার মনের মধ্যে কি যেন একটা ওলট পালট হয়ে গেছল। মনে হয়েছিল মৃত্যুর সঙ্গে জুয়া আমিও খেলতে পারি জটিল দুশ্ছেদ্য আমাদের হৃদয়ের সমস্যার গ্রন্থি মোচনের সুযোগ নিয়তিকে দিতে।

মাচান থেকে নেমে মাঝখানের জংলা নালাটা পার হয়ে কি ভাবে যমুনা-প্রসাদের পাথুরে ঢিবিটার কাছে পৌঁছলাম সে বর্ণনা দেবার প্রয়োজন নেই। বলা বাহুল্য অতি সাবধানে সন্তর্পণে সে দিকে অগ্রসর হয়েছি। কিন্তু সেখানে পৌঁছে অন্ধকারে যতদূর সম্ভব তীক্ষ্ন দৃষ্টি মেলে যেটুকু দেখতে পেলাম তাতে আমি স্তম্ভিত। যমুনাপ্রসাদ সে পাথুরে খাঁজের ওপরই নেই। অস্থির হয়ে এবার টর্চটা জেবলে দেখলাম। না, সেখানে তার জলের ফ্লাস্ক আর কম্বল-টা শুধু পড়ে আছে।

কোথায় গেল যমুনাপ্রসাদ?

বাঘ কি অতর্কিতে তাকে আক্রমণ করে এত নিঃশব্দে নিয়ে চলে গেছে যে এতটুকু আভাসও আমি পাইনি!

ব্যাকুল হয়ে আমি টর্চ ফেলে ঢিবির চারিধারে দেখলাম। না, কোথাও এতটুকু রক্তের দাগ নেই।

বিমূঢ় হয়ে কি করব ভাবছি এমন সময়ে আমার মাচান বাঁধা গাছটার নিচে একটা টর্চের আলো পলকের জন্যে জ্বলে নিভে গেল।

যমুনাপ্রসাদ তাহলে তার আশ্রয় ছেড়ে আমার মাচানের দিকেই গেছে! কিন্তু কেন?

ভয় পেয়ে এভাবে তার পক্ষে যাওয়া অবিশ্বাস্য।

তাহলে এতখানি বিপদ তুচ্ছ করে আমার মাচানের দিকেই যাওয়ার তার উদ্দেশ্য কি?

এবার বুদ্ধি শুদ্ধি আমার যেন গুলিয়ে গেল। প্রসাদ! প্রসাদ! বলে চিৎকার করতে করতে সমস্ত সাবধানতা জলাঞ্জলি দিয়ে আমি তার দিকে ঝোপঝাড় ভেঙে ছুটে গেলাম।

কিন্তু বেশী দূর যেতে হল না।

বেশ কিছু দূরে আমাদের ফরেস্ট বাংলোর দিক থেকেই রাত্রির নিস্তব্ধতা

কাঁপানো একটা হুংকার শোনা গেল। সেই সঙ্গে অস্ফুট একটা আর্তনাদ।

আর বিশেষ কিছু লেখবার নেই মিত্রজি।

নিয়তির সঙ্গে জুয়ায় মৃত্যুর বলি হলাম আমরা নয়, সুভদ্রাই।

বাংলো থেকে কিছু দূরে তার রক্তের দাগ আর জংগলের কাঁটায় আটকানো তার আগুন রঙ শাড়ির ছিন্ন অংশ পাওয়া গেল। আমাদের কাছেই সে আসছিল একলা ওই রাত্রে!

কেন?

কেন যমুনাপ্রসাদ তার আশ্রয় ছেড়ে আমার মাচানের দিকে গিয়ে ওপরে টর্চের আলো ফেলেছিল?

যমুনাপ্রসাদকে সে কথা আমি জিজ্ঞাসা করতে পারতাম। করিনি।

সাক্ষাৎ নিয়তিস্বরূপ সে বাঘ আমি মেরেছিলাম মিত্রজি।

কয়েকটা মুহূর্ত সমস্ত দেহমন যেন অবশ হয়ে গিয়েছিল।

দেশলাই-এর কাঠিটা শেষ পর্যন্ত পুড়ে আঙুলে ছেঁকা লাগতে সাড়া ফিরে পেয়ে চমকে পিছু হটে এসে শিকল তুলে দিয়েছিল দরজায়।

চেঁচামেচি করেনি, ডাকেনি কাউকে।

ডাকবে-ই বা কাকে?

উমেশ বাড়িতে নেই। আজ রাত্তিরের ডিউটি। ফিরবে অন্তত সেই রাত চারটের আগে নয়।

পাশের কোয়ার্টারের রাঙাবৌদিকে ডাকা যায় অবশ্য। হ্যাঁ, তিনিও একা আছেন। জেগেও যে আছেন পাতলা দেওয়ালের ব্যবধানে শোবার ঘর থেকে এই একটু আগেই হামানদিস্তায় কি গুঁড়ো করবার আওয়াজে তা টের পেয়েছে।

কিন্তু রাঙাবৌদিকেও ডাকেনি। ডাকবেও না।

শোবার ঘরে এসেও সমস্ত শরীরের শিরশিরিনিটা যায়নি কিন্তু।

কোণ-কানাচগুলোয় খাটের নীচে, বাসন-কোষনগুলোর মধ্যে, তোরঙ্গ বসানো চৌকিটার নীচে ভালো করে তীক্ষ্ন দৃষ্টিতে সব দেখবার চেষ্টা করেছে।

তেমন তন্নতন্ন করে দেখবে আর কি করে! ছোট ঘরটা সামান্য যা জিনিসপত্র আছে, তাতেই ঠাসা। আলোটারও তেমন জোর নেই। দেখতে গেলে সব কিছু নাড়তে-চাড়তে হয়।

সে সাহস হয়নি।

ঠিক করেছে আলোটা আজ জেবলে রেখেই শোবে। সারা রাত আলো জেবলে রাখার খেসারত দিতে হবে অবশ্য। কোম্পানীর সে দরাজ দিল আর নেই যে, যত খুশি আলো জেবলে রাখো বাঁধা টাকা দিলেই চলবে। এখন মিটার বসেছে তাদের এইসব অখন্দে কোয়ার্টারেও।

তবু আলোটা জেবলে রেখেই উমা দরজায় ছিটকিনি দিয়ে তক্ত পোশটার ওপর উঠে বসেছে। শুতে পারেনি।

বুকের ভেতর যেখানটা হিম হয়ে গেছল সেখানটা যেন সম্পূর্ণ গলেনি তখনও।

দুটো করে ইটের ওপর বসিয়ে তক্তাপোশটা উঁচু করে রাখা বলে কিছুটা যেন নিরাপদ বোধ করেছে।

অথচ এই ইট সাজিয়ে তক্তাপোশ বসানোতে কি আপত্তিই তার ছিল। প্রথম বিয়ের লজ্জা ও সংকোচ কাটিয়ে উমেশকে মৃদু প্রতিবাদ না জানিয়ে পারেনি।

উমেশ হেসে উঠেছিল। বলেছিল, শোনো রাঙা বৌঠান শোনো। ভাঙা তক্তাপোশের জন্যে সোনার খুরো গড়াতে হবে।

রাঙাবৌদিই ঘরদোর সাজানো-গোছানো দেখিয়ে শুনিয়ে দিতে এসে-

ছিলেন।

তিনি উমাকেই সমর্থন করেছিলেন প্রথমে, ঠিকই ত বলেছে উমা। ঘরের মধ্যে থান ইটগুলো বেখাপ্পা লাগে না!

একটা রীতিমত অশ্লীল রসিকতা করে উমেশ বলেছিল, ওঃ কি আমার ঘর, তার আবার বাহার!

সব কিছু মিলিয়ে কেমন একটা স্থূলতা। উমা ঘর থেকে চলে গেছল। কানদুটো তার ঝাঁ ঝাঁ করে উঠেছিল কিরকম একটা বিমূঢ় লজ্জায়। আত্মীয়া-অনাত্মীয়া কোন মেয়েছেলের সামনে এরকম কথা উচ্চারণ করা যায়, এ তখন তার কল্পনার বাইরে।

কথাগুলো ভাবতে ভাবতে দেওয়ালে কি একটা নড়তে দেখে উমা শিউরে উঠেছে এখন।

না, কিছু নয়। দেওয়ালের একটা হুকে বাঁধা পাড়ের ফালিটা হাওয়ায় দুলে উঠে তার ছায়াটা নড়ছে।

তক্তাপোশটা মেঝে থেকে এতটা উঁচু হওয়ায় একটু বুঝি নিশ্চিন্ত।

জানাশোনা নানা সত্যমিথ্যা আজগুবি গল্প মনে এসেছে একসঙ্গে।

কিন্তু এতটা অস্থির হবার বুঝি কিছু নেই। ওঘরে ত শিকল তুলে দিয়েই এসেছে। এঘরের দরজাও বন্ধ। খাটের ওপর তার ভাবনাটা কিসের?

কাসির শব্দ শোনা গেছে পাশের কোয়ার্টারের উঠোনে। কাঠের ভাঙা গেটটা খোলা আর বন্ধ করার কর্কশ আওয়াজের সঙ্গে দমকে ওঠা একঘেয়ে কাসি।

অধরদা তার শিফ্‌ট ডিউটি থেকে ফিরলেন।

রাঙাবৌদি দরজার খিল খুলে নিত্যনৈমিত্তিক সম্ভাষণ জানালেন, ছাই-পাঁশ গিলে আসনি ত?

অধরদার কাসির শব্দ ঘরের ভেতর থেকে অনেকটা চাপা হলেও শোনা গেছে সমানে।

যতক্ষণ ঘুম না আসে ও আওয়াজ শুনতে হবে। রাঙাবৌদির অভ্যাস হয়ে গেছে নিশ্চয়। নইলে ঘুমোন কি করে!

অভ্যাস সবই অবশ্য হয়ে যায়। তারও অনেক কিছু হয়ে গেছে। এমন কি উমেশের মুখের ওই নোংরা কথাগুলো পর্যন্ত।

তক্তাপোশের তলায় কি একটা নড়ছে।

কান খাড়া করে উমা তক্তাপোশের ওপর থেকে ঝুঁকে নিচেটা দেখবার চেষ্টা করেছে।

সেই নেংটি ইঁদুরটা। বিদ্যুতের মত এক ছুটে ঘরের এক কোণ থেকে বেরিয়ে তোরঙ্গের চৌকিটার নীচে সেঁধিয়ে গেছে। নীচে নামতে না নামতেই আবার কোথায় যে ছুটে গিয়ে ঘাপটি মারবে জিনিসপত্র তোলপাড় করেও খুঁজে পাওয়া যাবে না।

কিছুদিন ওটা ধরবার কি চেষ্টাই না হয়েছিল।

রাঙাবৌদি একটা ইঁদুর কল আনতে বলেছিল উমেশকে।

তাই নিয়ে কি কুৎসিত রসিকতাই করেছিল উমেশ।

আঃ উমেশ! রাঙাবৌদি মৃদু ভর্ৎসনা করেছিলেন, কিন্তু মুখ চোখের

চেহারা দেখে বোঝা গেছল উপভোগও করেছেন।

সেদিন উমা ঘর থেকে বেরিয়ে যায়নি। তীক্ষ্ন দৃষ্টিতে স্বামী ও রাঙা-বৌদির মুখের দিকে চেয়েছিল।

দুজনের কেউই সে দৃষ্টি লক্ষ্যও করেনি বোধ হয়, করলেও গ্রাহ্য করেনি।

রাঙাবৌদির আসল রূপটা কি?

এখানে আসার কিছুদিন পরেই প্রশ্নটা জেগেছিল।

তখন রোজ বিকেলে রাঙাবৌদি নিজের হাতে চুল বেঁধে দিতেন। এক-দিন চুল বাঁধতে বাঁধতে বলছিলেন, উমেশকে বলব ওই আজকাল কি সব নকল চুল হয়েছে, তাই এক গুছি কিনে আনতে।

উমার মাথায় চুল বেশ কম।

একটু বুঝি মনে মনে আহত হয়ে উমা বলেছিল, কেন? নকল চুল দিয়ে সাজতে হবে! আমার যা আছে এই টিকটিকির ল্যাজই ভালো।

রাঙাবৌদি হেসেছিলেন, তা তুই বলতে পারিস বটে! জোয়ান বরের জন্যে নকল সাজ দরকার হয় না। ওরা তুবড়ির পলতে, দেশলাই কাঠ ঘুঁটে যা কিছুর হোক আঁচ লাগতে না লাগতেই জ্বলে আছে। আমার মত ভিজে সলতে হ'ত ত বুঝতিস। সেঁকে সেঁকেও হয় না। নিজেকেও আসল নকল মিলিয়ে বারুদ যোগাতে হয়।

অধরদার রাঙাবৌদির তুলনায় সত্যিই বয়স অনেক বেশী। যত না বয়স, তার চেয়েও বুড়িয়ে গেছেন রোগে অভাবে খাটুনিতে অত্যাচারে। হাঁপানি কাসি ত লেগেই আছে।

রাঙাবৌদির কথাগুলোতে মনের চাপা দুঃখই হয়ত একটু ফুটে বেরিয়ে-ছিল, কিন্তু তা সত্ত্বেও সব কিছু মিলিয়ে কি একটা স্থূল ইঙ্গিত উমাকে পীড়া দিয়েছিল বড় বেশী।

রাঙাবৌদির সাজগোজের শখটা যে বেশ আছে, তাতে সন্দেহ নেই।

এককালে হয়ত সত্যিই রাঙা নামের যোগ্য ছিলেন। এখন রঙটা মরা তামাটে হয়ে এলেও চেহারার বাঁধুনিতে আগেকার রূপ-যৌবনের ঝড়তি-পড়তি যা আছে, তাও হেলাফেলার নয়। তার ওপর অভাবের সংসারেও যথাসম্ভব ছিমছাম হয়ে থাকেন সারাক্ষণ। এই বয়সেও চোখে কাজল পায়ে আলতা। নিজে মসলা গুঁড়িয়ে মিশিয়েও গন্ধ তেলটি মাথায় মাখা চাই।

বৃদ্ধ স্বামীর মনোরঞ্জনের জন্যেই এতসব করা শুনেও উমা ঠিক খুশী হতে পারেনি। খুশী হতে পারেনি আরো কয়েকটা ব্যাপারে।

আপনার জন কেউ নয়, কোন কুলের কোন সম্পর্ক নেই, শুধু এক কোম্পানীতে কাজ করার দরুণ পাশাপাশি কোয়ার্টার পাওয়া থেকেই কয়েক বছরের পরিচয়। কিন্তু উমেশের ওপর কর্তৃত্বটা দেখলে তা মনে হয় না। মনে হয়, ওই রুক্ষ ষণ্ডা মানুষটারও নাকে কোন সূক্ষ্ম অদৃশ্য দড়ি বাঁধা যাতে রাঙাবৌদি যখন খুশি টান দিতে পারেন।

টান অবশ্য যখন তখন দেন, তা বলতে পারে না, কিন্তু কর্তৃত্বটা লুকিয়ে রাখেন নি।

নিজেই একদিন কি কথায় বলেছেন, নাম ধরে তোদের রাজযোটক করেছি বুঝেছিস। উমা নাম শুনে দেখার আগেই তোর বরকে বলেছিলাম ওইখানেই

বিয়ে করতে হবে। উমেশকে সামলাতে যদি কেউ পারে ত, উমাই পারবে। তাও রাজী করাতে কি কম বেগ পেতে হয়েছে। একদিন বলে কি জানস? বলে জোর করে বিয়ে দিচ্ছ দাও, ফুলশয্যার রাত্রেই বৌটার গলা টিপে রেখে চলে যাবো। তখন মজা টের পাবে। আমি চুপ করে থেকে হেসেছি, উনি বলেছেন...

নির্বিকার মুখে রাঙাবৌদি অধরদার ইতর রসিকতাটাও শুনিয়ে দিয়েছেন, কিন্তু সেদিন ইতর রসিকতাটার চেয়েও পীড়া দিয়েছে কি একটা অস্ফুট বিক্ষোভ। সেটা যে উমেশের ওপর রাঙাবৌদির অনায়াস অধিকারের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ, তা নিজের কাছে স্বীকার করতেও সময় লেগেছে।

উমেশ অবশ্য ফুলশয্যার রাত্রে বা তারপরে কখনো গলা টিপে মারবার চেষ্টা করেনি। ষণ্ডা গুণ্ডা মানুষটা ব্যবহারে বা কথাবার্তায় পালিশ-টালিশের ধার ধারে না, কিন্তু মারধোর দূরের কথা উমাকে দুটো কড়া কথাও কোন-দিন শোনায়নি।

তবু উমার মন ধীরে ধীরে বিষিয়ে উঠেছে।

কড়া কথা যেমন নয়, তেমনি মিষ্টি কথাও উমেশ বলতে জানে না বা বলে না। তার নোংরা রসিকতাগুলোও সব রাঙাবৌদি সামনে থাকলে তখন।

সেসব রসিকতার অশ্লীল ইতরতা দ্বিগুণ অসহ্য হয়েছে সেই কারণে।

উমার বাপের বাড়িতেও গরীবানির সংসার। কিন্তু তারা পড়তি ঘর। স্বচ্ছলতার যুগে সভ্যতা ভব্যতা রুচির জীর্ণ আচ্ছাদনটা এখনো একেবারে খসে পড়েনি।

উমেশের সংগে বিয়ের কথা হবার সময় বেশ একটু আপত্তি উঠেছিল। তার ভাইদের তুলনায় উমেশ অনেক বেশি রোজগার করে, কিন্তু বংশমর্যাদা বলে কিছু নেই, তার ওপর ইংরেজি একটা নাম থাকলেও আসলে হাতেনাতে কাজ শেখা মিস্ত্রী ছাড়া কিছু নয়।

শেষ পর্যন্ত অভাবের যুক্তিই বড় হয়ে সব দ্বিধা-আপত্তি হটিয়ে দিয়ে-ছিল।

উমার বেশ উপযুক্ত বয়সেই বিয়ে হয়েছে। অনেক কিছুর সংগে নিজেকে মানিয়ে নেবার জন্যে মনকে প্রস্তুত করেই সে এসেছিল।

কিন্তু এই আবহাওয়ার কথাটা ভাবতে পারেনি।

কিছুদিন বাদেই রাঙাবৌদির কাছে চুল বাঁধতে যাওয়া সে বন্ধ করেছে। রাঙাবৌদি ডেকেছেন কোয়ার্টারের মাঝখানের নিচু দেওয়ালের ওপার থেকে। প্রথম দিন কাজের ছুতোনাতা করে এড়িয়ে গেছে। দ্বিতীয় দিন রাঙাবৌদি নিজেই এসেছেন ঠিক সময়। এসে দেখেছেন উমার চুল বাঁধা হয়ে গেছে তার আগেই। রাঙাবৌদি সে কথা আর তোলেননি। পরেও কোনদিন ডাকেননি বা আসেননি।

রাঙাবৌদি ক্ষুণ্ণ হয়েছেন বা কিছু মনে করেছেন এমনও বলা যায় না। তাঁর ব্যবহারে কোন পরিবর্তনই দেখা যায়নি।

সকাল বেলা কোনোদিন এক বাটি তরকারি নিয়ে এসে বলেছেন, উমেশ ত আজ ভোরের ডিউটিতে গেছে। দুপুরে বাড়িতেই খাবে। বড়ির ঝালটা দিস। কদিন ধরে মাথা খেয়ে ফেলেছে। পুরো বাটিটা যেন সামনে আবার

ধরে দিস না। ও রাক্ষস তাহলে তোর জন্যে কিছু রাখবে না।

উমা পুরো বাটিটাই অবশ্য খাবার সময় ধরে দিয়েছে।

পরে আরেক দিন অন্য একটা তরকারি কিন্তু সামনে বারই করেনি। বাইরের বড় নর্দমায় ফেলে দিয়ে এসেছে এক সময়।

একদিন রাত্রে হঠাৎ উমেশকে জিজ্ঞাসা করেছে, আচ্ছা তোমার ত মাইনে বাড়ল। এখন এর চেয়ে ভালো কোয়ার্টার পাবে না?

পাবো না কেন! নিচ্ছে কে?—উমেশ তেলকালি মাখা প্যান্টটা ছাড়তে ছাড়তে বলেছে।

কেন? পেলেও তুমি নেবে না? উত্তরটা কি হবে জেনেও ক্ষুণ্ণ স্বরে উমা জিজ্ঞাসা করেছে।

নেব কি করে শুনি। উমেশ যেন উমার সোজা কথাটা বুঝতে না পারায় অবাক হয়েছে—ডবল কোয়ার্টার ত আর আমায় দেবে না। ওরা থাকবে কোথায়?

উমার ইচ্ছে হয়েছে চীৎকার করে বলে, জাহান্নামে। কিন্তু নিজেকে সংবরণ করেছে বেশ একটু কষ্ট করে।

নিজের দিক থেকে সম্পর্ক এরপর সে একরকম ঘুচিয়েই দিয়েছে।

অতিবড় প্রয়োজনেও সে পাশের কোয়ার্টারের চৌকাঠ মাড়ায় না।

মাঝে দু-চারদিন প্রতিবেশীদের সঙ্গে আলাপের চেষ্টাতেও বেরিয়েছে। সুবিধে হয়নি মোটেই। এদিকে কোয়ার্টারগুলোতে বেশীর ভাগই অন্ধ্র মদ্র বা পাঞ্জাবী। বাঙালীর একটি কোয়ার্টার যা আছে অনেক দূরে, সেখানেও স্ত্রীলোক বলতে একজন অতিবৃদ্ধা মহিলা, কানে কম শোনার দরুন যাঁর সংগে আলাপ চালাতে শেষ পর্যন্ত গলা ধরে যায়।

সেখান থেকেই এক সন্ধ্যায় বাড়ি ফিরে পাতলা দেওয়াল ভেদ করে আসা আওয়াজ আর গলার স্বর শুনে পাথর হয়ে গেছে এক নিমেষে।

একটা চাপড়ের সঙ্গে হাসির শব্দ। তারপরই শোনা গেছে, জ্বালাতন করিসনি। যা, তোর বউ এসে গেছে এতক্ষণে বোধহয়।

আসুক। বিয়ে তুই দিলি কেন?—উমেশের গলা।

না, তুই ধম্মের ষাঁড় হয়ে থাকবি—আমার বুঝি কলংকের ভয় নেই?

হ্যাঁ, বুড়ো বাহাত্তুরের বৌ-এর আবার কলংকের ভয়। কলঙ্ক হলে বর্তে যায়।

উমা আর শুনতে চায়নি। ইচ্ছে করেই দরজার একটা পাল্লা সশব্দে ঠেলে দিয়ে রান্নাঘরে চলে গেছে। সমস্ত কথার মধ্যে একটা শব্দ তার কানের ভেতর বিঁধেছে বিষাক্ত ছুঁচের মত। উমেশের সঙ্গে রাঙাবৌদির সম্পর্কটা কোন পর্যায়ের, গোপনে ব্যবহার করা ওই একটা শব্দেই তা দিবালোকের মত সুস্পষ্ট।

খানিক বাদেই উমেশ বাড়ি ঢুকেছে।

কি? ঘরে তালা দিয়ে গেছলে কোথায়? আমি ত ভাবলাম, পালিয়েই গেছ বুঝি!

গেলে লুকিয়ে পালাব না। জানিয়েই যাবো!—উনুনটা সিক দিয়ে অযথা খোঁচাতে খোঁচাতে উমা বলেছে।

ও বাবা! এও যে ফোঁস করতে শিখেছে! উমেশ হেসে উঠে দু কোয়ার্টারের

মাঝখানের দেওয়ালের ধারে দাঁড়িয়ে চীৎকার করেছে,— ও রাঙাবৌঠান, শোনো শোনো, দেখে যাও।

কি হ'ল আবার! কি দেখব?—রাঙাবৌদি দেওয়ালের ওধারে এসে দাঁড়িয়েছেন। তাঁর গলায় কৌতুকের স্বর উমার সারা গায়ে যেন বিষ ছিটিয়েছে।

কেঁচো বলে যা গছালে তা যে কেউটে হয়ে দাঁড়াল গো!—যথারীতি কথাটার সংগে নোংরা একটা রসিকতা করে উমেশ শেষে বলেছে, এখন সামলাবে কে?

কেঁচো খঁুচিয়ে কেউটে করে থাকলে সামলাবে তুমি! পাড়ার লোকের ত দায় নয়!

হ্যাঁ পাড়ার লোক শুধু আছে তামাশা দেখতে!—উমেশ আরেকটা বিশ্রী কথাও তার সংগে জুড়ে দিয়ে হেসে উঠেছে। ওদিক থেকে রাঙাবৌদির হাসিও শোনা গেছে।

দাঁতে দাঁত চেপে রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এসে উমা বলেছে,—হাসি তামাশা দেওয়াল ডিঙিয়ে করার দরকার কি! ও বাড়ি গেলেই ত পারো?

গলার স্বরে ও কথার মধ্যে তীব্র শ্লেষের হুল যা ছিল তা কিন্তু উমেশের ওপর সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে।

ঠিক বলেছ। তুমি হেঁসেল ঠেলো, আমরা হাসি তামাশা করি গিয়ে।—বলে অম্লান বদনে সে বেরিয়ে গেছে।

উমেশ হয়ত কিছুই বোঝেনি, কিন্তু সেই দিন থেকে একটিবার বাদে রাঙাবৌদি আর এ বাড়িতে পা দেন নি।

উমেশের সেটা নজরে পড়েনি এইটেই আশ্চর্য তবে কোন কিছু লক্ষ্য করবার মানুষ সে নয়।

রাঙাবৌদি এসেছিলেন এই কদিন আগে হঠাৎ দুপুর বেলা। অধরদা উমেশ দুজনেই তখন ডিউটিতে গেছে।

রান্নাঘরের বাইরের সরু রোয়াকটায় বসে উমা তোলা উনুনটায় মাটি লেপছিল। রাঙাবৌদিকে এভাবে ঢুকতে দেখে ভুরু কুঁচকে মুখ তুলে তাকিয়েছে।

রাঙাবৌদি তার দিকে নীরবে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে ঈষৎ হেসেছেন। হাসিটা কিন্তু স্বাভাবিক প্রসন্নতার নয়, বেশ একটু বাঁকা।

সে হাসির সংগে মেলানো গলার স্বরেই তিনি বলেছেন—সম্পর্ক তুই রাখতে না চাস রাখিস নে। কিন্তু একটা কথা ভুলে যাসনি, যা পেয়েছিস আমি হাত উবুড় করেছি বলেই পেয়েছিস। দিয়েও আবার ভাগ রাখতে চাই নি। তবে ইচ্ছে থাকলে এখনো শুধু কড়ে আঙুল নেড়ে নিয়ে যেতে পারতাম।

কথাগুলো বলেই রাঙাবৌদি চলে গেছলেন।

উপযুক্ত জবাব দিতে না পেরে উমার ভেতরটা আরও বেশী জ্বলেছে।

অধরদার কাসিটা আজ যেন আরো বেড়েছে। মনে হচ্ছে দম যেন বন্ধ হয়ে যাবে।

শব্দটা যেন কাসির নয় আর কিছুর। দেওয়ালগুলো কাঁপিয়ে উঠোন ছাড়িয়ে বহু দূরে সেই আকাশের শেষ পর্যন্ত চলে গিয়ে আবার ফিরে আসছে।

* * *

উমা ধড়মড় করে বিছানায় উঠে বসল। কখন নিজের অজান্তেই বালিশে মাথা দিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে জানে না।

ঘুমের মধ্যে সেই দৃশ্যটাই প্রায় হুবহু আবার দেখেছে। হরেক রকম জিনিসে ঠাসাঠাসি অপরিসর ভাঁড়ার ঘরটা। ও ঘরের বাতিটা খারাপ হয়ে গেছে বলে, দেশলাই জেবলে কেরোসিনের বোতলটা আনতে গেছল। উমেশ রাত চারটেয় ফিরেই চা চাইবে। অ্যালুমিনিয়ামের বাটিতে একজনের মত চায়ের জল কাঠকুটোয় একটু কেরোসিন ঢেলেই ফুটিয়ে নেওয়া যায়।

কেরোসিনের বোতলের জন্যে কোণের দিকে হাত বাড়াবার আগেই দেশ-লাই-এর আলোয় সেই সমস্ত শরীর হিম করা চোখ দুটো দেখেছে। তারপর সেই ধীরে ধীরে পাক ছড়ানো মৃত্যুর কুণ্ডলী। চোখ দুটোর হিম ক্রূর দৃষ্টি যেন তাকে অসাড় করে দিচ্ছে ক্রমশ। প্রাণপণে সেই সর্বনাশা সম্মোহ কাটিয়ে সে ছুটে বেরিয়ে আসতে চেয়েছে। স্বপ্নের মধ্যে এবারে কিন্তু পিছনের দরজা বন্ধ। সে আকুল হয়ে ছুটে দরজার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে, আঘাত করেছে সমস্ত শক্তি দিয়ে বার বার। দরজা খুলছে না।

ঘুমের ঘোর কাটার সঙ্গে সঙ্গে উমা টের পেলে সে নিজে না দিক সত্যিই তার দরজায় ঘা পড়ছে।

উমা! উমা! দরজা খোল।

এ ত রাঙাবৌদির গলা। সমস্ত মনটা এক মুহূর্তে আতঙ্কের ঘোর কাটিয়ে তিক্ত হয়ে উঠল।

দরজা অবশ্য সে খুলল, খুলে বেশ একটু কঠিন স্বরেই বললে,—কি, হয়েছে কি?

তোদের সেই মধুর শিশিটা আছে না? উমেশ সেবার এনেছিল।

তার আর কতটুকু আছে!

যেটুকু থাক তাতেই হবে! আমার এক ফোঁটা নেই। ওঁর টান আর বুকের কষ্ট ভয়ানক বেড়েছে। সেই বড়িটা মেড়ে না খাওয়ালেই নয়, এই রকম অবস্থা হলেই কবিরাজ খাওয়াতে বলেছিল।—রাঙাবৌদিকে এমন অস্থির হয়ে কথা বলতে কখনো শোনে নি বটে। স্বামীর জন্যে যেন তাঁর সত্যিই কত ভাবনা!

কিন্তু এ অভিনয়ে মন আরো বিরূপ হয়ে উঠল। বললে,—কিন্তু সে শিশিটা ভাঁড়ারে কোথায় রেখেছি মনে নেই!

মনে থাকবার দরকার নেই, আমি খুঁজে নিচ্ছি।

রাঙাবৌদি স্টোর রুমের দিকে এগোলেন। কিন্তু...নিজের প্রায় অগোচ-রেই বলে ফেলতে গিয়ে উমা নিজেকে সামলালে।

ও ঘরে ত আলো নেই।—বলে কথাটা শেষ করলে।

তোর দেশলাইটা দে তাহলে।—রাঙাবৌদি নাছোড়বান্দা।

উমা দেশলাইটা দিলে। মনকে তখন সে বুঝিয়েছে, যাই এখন হোক তার আর কোন দায়িত্ব নেই।

রাঙাবৌদি ঘরের শিকলটা গিয়ে খুললেন।

উমা প্রায় রুদ্ধ নিশ্বাসে দরজার একটা পাল্লায় হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে পর পর সমস্ত শব্দগুলো শুনল।

রাঙাবৌদি দেশলাই জ্বালালেন। সামনের জিনিসগুলো সরিয়ে তিনি

বাঁধানো তাকগুলোর কাছে যাচ্ছেন খুঁজতে। তাঁর প্রথম দেশলাই-এর কাঠটা বোধ হয় নিভে গেছে, তিনি আরেকটা জ্বাললেন। একটা চাপা চমকে ওঠার শ্বাস কি? কিছুক্ষণ তারপর সব একেবারে নিস্তব্ধ। রাঙাবৌদি বেরিয়ে এসে দরজায় আবার শিকল তুলে দিলেন।

বললেন,—না দেশলাই-এর কাঠিতে হবে না। তোদের ত আবার কুপি নেই। আমার কুপিটা জেবলে নিয়ে আসি।

রাঙাবৌদি চলে গেলেন।

উমার মনের ভেতরটায় কি হচ্ছে তা বোঝাবার ক্ষমতা তাঁর নেই। একটা দুর্বোধ অনুভূতির কুণ্ডলী তার বুকের ভেতর থেকেও যেন পাক দিয়ে উঠছে।

রাঙাবৌদি কুপি নিয়ে ফিরে আসার পর সেটা যেন স্পষ্ট রূপ পেল।

রাঙাবৌদি দরজায় শিকলি খুলতে যাচ্ছেন।

দাঁড়ান—বলে উঠল উমা, আপনি পাবেন না। আমি খুঁজে দিচ্ছি।

না—রাঙাবৌদি ফিরে দাঁড়ালেন,—তোকে আসতে হবে না। ঘরে একটা সাপ আছে। আগে মারতে হবে।

কুপির আলোটাই লক্ষ্য করেছিল, এখন রাঙাবৌদির আরেক হাতের লাঠিটাও চোখে পড়ল।

সাপ বলে বিস্ময়ের ভান করবার আর প্রবৃত্তি হল না। এগিয়ে গিয়ে উমা বললে, তাহলে মধুর শিশিটা কি এখন না খুঁজলে নয়?

না নয়,—কুপির আলোতেই রাঙাবৌদির অদ্ভুত হাসিটা একটু দেখা গেল—অন্তত বড়িটা ঠিকমত দিয়েছি এটুকু ত জানব।

তাহলে আমি আলো ধরছি, চলো।—উমা গিয়ে কুপিটা হাতে নিলে।

নে তবে!—এই মুহূর্তেও অদ্ভুত পরিহাসের সুরে রাঙাবৌদি বললেন, আড়াল দেবার একটা নলচে এখনো আছে যখন, সেটা রাখবার চেষ্টা ত করতে হবে। এ ঝক্কিটা তাই একা আমায় নিতে দিলেই পারতিস!

সামান্য এই কুপির আলোতেই এতদিনে কি আসল চেহারাটা উমা দেখতে পায়?

উত্তর না দিয়ে উমা নিজেই ঘরের শিকলটা খুলে ফেললে।

নিরুদ্দেশ

দিনটা ভারী বিশ্রী। শীতের দিনে বাদলার মত এত অস্বস্তিকর আর কিছু বোধ হয় নাই। বৃষ্টি ঠিক যে পড়িতেছে তাহা নয়। কিন্তু মেঘাচ্ছন্ন আকাশ ও ম্লান পৃথিবী কেমন মৃতের মত অসাড় হইয়া আছে। সোমেশ হঠাৎ আজ আসিয়া না পড়িলে কেমন করিয়া দুপুরটা কাটাইতাম বলিতে পারি না। কিন্তু সোমেশও আজ যেন কেমন হইয়া আসিয়াছে।

খবরের কাগজটা দু-একবার উলটাইয়া পালটাইয়া সোমেশের সামনে ফেলিয়া দিয়া বলিলাম—"একটা আশ্চর্য ব্যাপার দেখেছ?"

"কি?"

"আজকের কাগজে একসঙ্গে সাত সাতটা নিরুদ্দেশ-এর বিজ্ঞাপন।"

সোমেশ কোন কৌতূহলই প্রকাশ করিল না। যেমন বসিয়াছিল, তেমনি উদাসীন ভাবেই শুধু সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়িতে লাগিল। নিস্তব্ধ ঘরের ভিতর ধোঁয়ার কুণ্ডলী শুধু ধীরে ধীরে পাক খাইতে খাইতে ঊর্ধ্বে উঠিতেছে। আর সমস্তই নিশ্চল স্তব্ধ। বাইরের অসাড়তা যেন আমাদের মনের উপরও চাপিয়া ধরিয়াছে।

নেহাত একটা কিছু করিয়া এই অস্বস্তিকর স্তব্ধতা ভাঙিবার প্রয়োজনেই আরম্ভ করিলাম,—"নিরুদ্দেশের এই বিজ্ঞাপনগুলো দেখলে কিন্তু আমার হাসি পায়। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ব্যাপারটা কি হয় জান ত? ছেলে হয়ত রাত করে থিয়েটার দেখে বাড়ি ফিরেছেন। এমন তিনি প্রায় ফিরে থাকেন আজকাল। খেতে বসবার সময় বাবা কয়েকদিন খোঁজ করেছেন—'কোথায় গেলেন বাবু! তোমার গুণধর পুত্রটি!'

লুকোন পুঁজি থেকে মা বিকেলে ছেলের পেড়াপেড়ীতে টাকা ক'টা বার করে দিয়েছেন। সুতরাং তিনি জেনে শুনে মিথ্যে আর বলতে পারেন না—চুপ করে থাকেন।

বাবা বলে যান,—'এত রাত্রেও বাবুর আসবার সময় হল না। আরবারে ত ফেল করে মাথা কিনেছেন। এবারও কি করে কৃতার্থ করবেন বুঝতেই পারছি। পয়সাগুলো আমার খোলামকুচি কিনা, তাই নবাব-পুত্তুর যা খুশি তাই করছেন। দূর করে দেব, এবার দূর করে দেব।'

এই মৌখিক আস্ফালনেই হয়ত ব্যাপারটা শেষ হতে পারত। কিন্তু ঠিক সেই সময়ে গুণধর পুত্রের প্রবেশ!

বাবা ঝোঁকটা আর কাটিয়ে উঠতে পারেন না। নিজের কাছে মান রাখবার জন্যেও কিছু বলতে হয়।

শেষ পর্যন্ত বাবা বলেন, 'এমন ছেলেব আমার দরকার নেই—বেরিয়ে যা।'

অভিমানী ছেলে আর কিছু না হোক পিতৃদেবের এ আদেশ তৎক্ষণাৎ পালন করতে উদ্যত হয়।

মা কোন দিক সামলাবেন বুঝতে না পেরে কাতরভাবে শুধু বলেন—'আহা খাওয়া-দাওয়ার সময় কেন এসব বল! পরে বললেই ত হ'ত।'

বাবা এবার মা'র ওপর মারমুখী হয়ে ওঠেন—'তোমার আস্কারাতেই ত উচ্ছন্নে গেছে। মাথাটি ত তুমিই খেয়েছ আদর দিয়ে।

মা আঁচলে চোখ মোছেন। ছেলে বিশাল পৃথিবীতে নিরুদ্দেশ যাত্রায় বেরিয়ে পড়ে।

পরের দিন ভয়ানক কাণ্ড। মা সেই রাত থেকে দাঁতে কুটি কাটেন নি! আজকের দিনও বিছানা থেকে উঠবেন মনে হয় না। বাবারও হয়ত রাত্রে ঘুম হয়নি। কিন্তু সে কথা প্রকাশ করবেন কোন মুখে!

গৃহিণীকে ধমক দিয়ে বলেন, 'মিছি মিছি প্যান্ প্যান্ কোরো না। অমন ছেলে যাওয়াই ভালো।'

মা'র কান্না আবার উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে।

বাবা এবার দাঁত খিঁচিয়ে বললেও নিজের মনের আশার কথাটাই বোধ হয় জানান—'তাও গেলে ত বাঁচতাম। এ বেলাই দেখো সুড় সুড় করে আবার ফিরে আসবে। এমন বিনি পয়সার হোটেলখানা পাবে কোথায়?'

মা এবার অশ্রুসিক্ত স্বরে বলেন—'এই দারুণ শীতে কাল সারারাত কোথায় রইল কে জানে! কি করে বসে আমার তাই ভয়।'

'হ্যাঁ ভয়!'—বাবা কথাটাকে ব্যংগ করেই উড়িয়ে দিতে চান—'তোমার ছেলে কিছু করেনি গো কিছু করেনি। দিব্যি আছে কোন বন্ধুর বাড়ি। অসুবিধে হলেই এসে দেখা দেবে।'

মা'র কান্না তবু থামে না।—'কি রকম অভিমানী জান ত।'

বিরক্ত হয়ে বাবা বেরিয়ে যান। সন্ধ্যাবেলা অফিস থেকে ফিরে এসে দেখেন অবস্থা গুরুতর। ছেলে ফেরেনি! মা শয্যা থেকে আর উঠবেন না বলেই পণ করেছেন।

'না আর থাকতে দিলে না! এ অশান্তির চেয়ে বনবাস ভালো।' বলে বাবা বেরিয়ে পড়েন এবং ওঠেন গিয়ে একেবারে খবরের কাগজের অফিসে।

খবরের কাগজের অফিসের ব্যাপারটা বড় জটিল। কোন দিকে কি করতে হয় কিছু বোঝা যায় না। খানিক এদিক-ওদিক বিমূঢ়ভাবে ঘুরে এক দিকের একটা অফিস-ঘরে ঢুকে পড়ে নিরীহ চেহারার এক ভদ্রলোককে বেছে নিয়ে সাহস করে জিজ্ঞাসা করেন—'আপনাদের কাগজে এই—এই একটা খবর বের করতে চাই!'

নিরীহ চেহারার লোকটি হঠাৎ মুখ তুলে ব্যংগের স্বরে বলেন—'খবর! কেন আমাদের খবরগুলো পছন্দ হচ্ছে না! আমরা কি এতদিন রামযাত্রা বার করছি!'

বাবা একটু হতভম্ব হয়ে একবার অসহায়ভাবে চারিদিকে তাকান। পাশের যে ভদ্রলোকটির মুখ দেখে রূঢ় প্রকৃতির মনে হয়েছিল, তিনিই সহানুভূতির স্বরে বলেন, 'আহা কি করছ! ভদ্রলোক কি বলতে চান, শোনোই না! বসুন আপনি।'

বাবা একটা চেয়ারে একটু অপ্রস্তুত ভাবে বসবার পর তিনি বলেন—'কি খবর বলছিলেন?'

'আজ্ঞে ঠিক খবর নয় এই—এই একটু বিজ্ঞাপন!'

'বিজ্ঞাপন? কিসের বিজ্ঞাপন? কতটা স্পেস দরকার? কপি এনেছেন?'

বাবা আরো বিমূঢ়ভাবে বলেন—'আজ্ঞে ঠিক বিজ্ঞাপন নয়—এই আমার ছেলে বাড়ি থেকে চলে গিয়েছে—'

তাঁকে আর কথা শেষ করতে হয় না। টেবিলের অপর দিক থেকে ভদ্রলোক বলেন—'ও বুঝেছি নিরুদ্দেশ! কি দেবেন—চেহারার বর্ণনা, না ফিরে আসবার অনুরোধ!'

বাবা যেন এতক্ষণে কূল পেয়ে বলেন—'আজ্ঞে হ্যাঁ, ফিরে আসবার অনুরোধ! ওর মা বড় কাঁদাকাটি করছে।'

'বুঝেছি বুঝেছি। রাগারাগি করে গিয়েছে বুঝি?' ভদ্রলোক একটা কাগজের প্যাড বাবার দিকে এগিয়ে দিয়ে বলেন—'দিন লিখে দিন!'

'লিখে!' বাবার মুখের বিপদগ্রস্ত ভাব অত্যন্ত স্পষ্ট।

ভদ্রলোক দয়াপরবশ হয়ে বলেন—'আচ্ছা আমরা লিখে দেব'খন। আপনি শুধু নামটামগুলো দিয়ে যান।'

পরিচয় ইত্যাদি দিয়ে যাবার সময় বাবা অনুরোধ করেন, 'একটু ভালো করে লিখে দেবেন। ওর মা কাল থেকে জলগ্রহণ করেনি।'

'সে বলতে হবে না, এমন লিখে দেব, যে পড়ে আপনার ছেলে কেঁদে ভাসিয়ে দেবে। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।'

আশ্বস্ত হয়ে বাবা ঘরে ফেরেন। কিন্তু অশ্রুসজল বিজ্ঞাপন বার হবার আগেই দেখেন ছেলে ঘরে এসে হাজির।

অনুতপ্ত হয়ে সে এসেছে মনে কোরো না ; সে বাড়িতে থাকতে আসেনি! শুধু একবার চলে যাবার আগে তার গোটাকতক বই নিয়ে যেতে এসেছে।

এবার মা'র রুদ্ধস্বর শোনা যায়, 'তা যাবি বই কি. অমনি কুলাঙ্গার ত তুই হয়েছিস্। কোনো ছেলে যেন আর বকুনি খায় না। তুই একেবারে পীর হয়েছিস্। কাল সারারাত দুচোখের পাতা এক করেন নি তা জানিস। ভেবে ভেবে চেহারাটা আজ কি হয়েছে দেখে আয়। উনি তেজ করে চলে যাবেন।'

বাবা এবার ভেতরে ঢুকে মৃদু স্বরে বলেন—'আঃ আর বকাবকি কেন?'

মা ধমক দিয়ে বলেন—'তুমি থাম। অত আদর ভাল নয়! একটু বকুনি খেয়েছেন বলে ছেলে বাড়ি থেকে চলে যাবে এত বড় ওর আস্পর্ধা!'

"অধিকাংশ নিরুদ্দেশের বিজ্ঞাপনের ইতিহাসই এই।"

সোমেশের সিগারেটটা তখন শেষ হইয়াছে। এতক্ষণ ধরিয়া আমার কথা সে মেটেই শুনিয়াছে বলিয়া মনে হয় না। একবার একটু নড়িয়া বসিতেও তাহাকে দেখা যায় নাই।

একটু বিরক্ত স্বরেই বলিলাম—"কি হয়েছে তোমার বল ত? মিছিমিছিই আমি একলা বকে মরছি।"

সে কথার কোন উত্তর না দিয়া সোমেশ হঠাৎ ছড়ান পা গুটাইয়া লইয়া সোজা হইয়া বসিয়া সিগারেটের অবশিষ্টটুকু ফেলিয়া দিল। তারপর বলিল,—

"তুমি জান না। এই বিজ্ঞাপনের পেছনে অনেক সত্যকার ট্র্যাজিডি থাকে।"

"তা থাকে যে আমি অস্বীকার করছি না। কখন কখন সত্যিই যে যায় সে আর ফেরে না।"

সোমেশ একটু হাসিয়া বলিল, "না তা বলছি না। ফিরে আসারই ভয়ানক একটা ট্র্যাজিডির কথা আমি জানি।"

আমি উৎসুক ভাবে তাহার দিকে চাহিয়া বলিলাম—"তার মানে?"

"শোনো বলছি।"

বাহিরে এতক্ষণে বৃষ্টি আবার আরম্ভ হইয়াছে। কাচের সার্সির ভিতর দিয়া বাহিরের রাস্তা-ঘাট ঝাপসা অবাস্তব দেখাইতেছে। মনে হইতেছে আমরা যেন সমস্ত পৃথিবী হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছি।

"পুরানো খবরের কাগজের ফাইল যদি উল্টে দেখ, তাহলে দেখতে পাবে বহু বছর আগে এখানকার একটি প্রধান সংবাদপত্রের পাতায় দিনের পর দিন একটি বিজ্ঞাপন বেরিয়েছে। সে বিজ্ঞাপন নয়, সম্পূর্ণ একটি ইতিহাস। দিনের পর দিন ধারাবাহিক ভাবে পড়ে গেলে একটা সম্পূর্ণ কাহিনী যেন জানা যায়। মনে হয় ছাপার লেখায় কান পাতলে সত্যি যেন কাতর আর্তনাদ শোনা যাবে। সে বিজ্ঞাপন অবশ্য নিরুদ্দেশের। প্রথম দেখা যায় মায়ের কাতর অনুরোধ ছেলের প্রতি ফিরে আসবার জন্যে। অস্পষ্ট আড়ষ্ট ভাষা, কিন্তু তার ভেতর দিয়ে কি ব্যাকুলতা যে প্রকাশ পেয়েছে তা না পড়লে বোঝা যায় না। ধীরে ধীরে মায়ের কাতর অনুরোধ হতাশ দীর্ঘশ্বাসের মত খবরের কাগজের পাতায় যেন মিলিয়ে যেতেও দেখা গেল। তারপর শোনা গেল পিতার গম্ভীর স্বর, একটু যেন কম্পিত তবু ধীর ও শান্ত—'শোভন ফিরে এস। তোমার মা শয্যাগত। তোমার কি এতটুকু কর্তব্যবোধও নেই!'

বিজ্ঞাপন তারপরেও কিন্তু থামল না। পিতার স্বর ভারী হয়ে আসছে যেন, মনে হয় যেন গলাটা ধরা। 'শোভন, এখন না এলে তোমার মাকে আর দেখতে পাবে না।'

কিন্তু শোভনের হৃদয় এতে বুঝি গলল না। দেখা গেল বিজ্ঞাপন সমান ভাবে চলেছে, শুধু পিতার নিজেকে সামলাবার আর ক্ষমতা নাই। এবার তাঁর স্বরে কাতরতা—শুধু কাতরতা নয়, একান্ত দুর্বলতা—'শোভন, জান না আমাদের কেমন করে দিন যাচ্ছে। এস, আর আমাদের দুঃখ দিও না।'

বিজ্ঞাপন ক্রমশঃ হতাশ হাহাকার হয়ে উঠল। তারপর একেবারে গেল বদলে। আর শোভনকে উদ্দেশ করে কিছু লেখা নেই। সাধারণ একটি বিজ্ঞপ্তি মাত্র। এই ধরনের এই চেহারার এই বয়সের একটি ছেলে। আজ এক বৎসর তার কোন সন্ধান নেই। সন্ধান দিতে পারলে পুরস্কার পাওয়া যাবে।

পুরস্কারের পরিমাণ ক্রমশঃ বাড়তে লাগল খবরের কাগজের পাতায়। "দোহারা ছিপছিপে একটি বছর ষোল-সতেরোর ছেলে। পরিচয়-চিহ্ন ঘাড়ের দিকে ডান কানের কাছে একটি বড় জড়ুল। জীবিত না মৃত এইটুকু যদি কেউ সন্ধান দিতে পারে তাহলেও পুরস্কার পাওয়া যাবে।"

সোমেশ চুপ করিল খানিকক্ষণের জন্য। জলের ছাটে সার্সির কাঁচ একেবারে ঝাপসা হইয়া গেছে। ঘরের ভিতর ঠাণ্ডায় মনে হইতেছে একটা কম্বল-টম্বল জড়াইতে পারিলে ভাল হয়।

বলিলাম—"এত গেল বিজ্ঞাপনের উপাখ্যান! আসল ব্যাপারের কিছু জান নাকি?"

"জানি! শোভনকে আমি জানতাম। সে যে কোনো ভয়ংকর অভিমানের বশে বাড়ি ছেড়ে এসেছিল তা মনে কোরো না। বাড়ি ছাড়াটাই তার কাছে একান্ত সহজ। ছুতোটা যা হোক কিছু হলেই হল। পৃথিবীতে দু-একটা লোক

আসে জন্ম থেকেই একেবারে নির্লিপ্ত মন নিয়ে। তারা ঠিক কঠিন-হৃদয় নয়। বরং বলা যেতে পারে তাদের মন তৈলাক্ত। পিচ্ছল হলে তারা কোথাও ধরা পড়ে না, কিছুই তাদের মনে দাগ দিতে পারে না। শুনলে আশ্চর্য হবে, খবরের কাগজের বিজ্ঞাপনের সংবাদ জানলেও সেগুলো সে অনুসরণই করেনি। কোন দিন চোখে পড়েছিল হয়ত—তারপর অনায়াসে সেগুলো গেছল ভুলে। বাড়ির বাইরে যে সমস্ত দুঃখ অসুবিধায় অন্য কেউ হলে হয়রান হয়ে পড়ত তার ভেতরেই সে পেয়েছে মুক্তির স্বাদ। অন্য কেউ যাই ভাবুক সে নিজেকে একটি ছোট সংসারের আদরের ছেলে হিসেবে শুধু ভাবতে পারেনি। কিন্তু বিজ্ঞাপন যেদিন হঠাৎ বন্ধ হয়ে গেল, সেদিন কেন বলা যায় না তার উদাসীন মনও বিচলিত হয়ে উঠল। বিজ্ঞাপন বন্ধ হয়েছিল একটু অসাধারণ ভাবে! ক্লান্তভাবে চলতে চলতে একদিন হঠাৎ তা থেমে যায়নি, হঠাৎ যেন একটা ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনায় সংবাদ-পত্রের পাতা স্তব্ধ হয়ে গেল। শোভনের চেহারার বদলে হঠাৎ একদিন দেখা গেল,—

'শোভন, তোমার মার সঙ্গে আর তোমার বুঝি দেখা হল না। তিনি শুধু তোমারই নামই করছেন এখনো।' তারপর আর কোন বিজ্ঞাপন দেখা গেল না।

প্রায় দুই বৎসর তখন কেটে গেছে। শোভন একদিন হঠাৎ গিয়ে হাজির তার দেশে। একটা ব্যাপারে শোভনের প্রকৃতির খানিকটা পরিচয় পাবে। সে কথাটা আগে বলিনি। শোভন সাধারণ মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলে নয়। সম্পন্ন বললেও তাদের ঠিক বর্ণনা করা হয় না। তাদের প্রাচীন জমিদারী অনেক দুর্দিনের ভেতর দিয়ে এসেও তখন তেমন ক্ষয় পায়নি। শোভনই তার এক-মাত্র উত্তরাধিকারী।"

সোমেশ একটু থামিতেই আমি বলিলাম—"যাক শেষটুকু আর না বললেও চলবে। বুঝতে পেরেছি!"

সোমেশ একটু হাসিয়া কোন উত্তর না দিয়া বলিয়া চলিল—"দু-বছর স্বাধীন জীবনের দুঃখ-কষ্ট গায়ে না মাখলেও তার ছাপ শোভনের ওপর তখন পড়েছে। দু-বছরের সে অনেক পরিবর্তিত হয়েছে। কিন্তু তাই বলে তাদের কর্মচারীরা তাকে চিনতে পারবে না এতটা সে আশংকা করেনি।

শোভন দেশে পৌঁছে সোজাসুজি তাদের বাড়ি ঢুকছিল, প্রথমে তাকে বাধা দিলেন তাদের পুরানো নায়েব মশাই।

'কাকে চান?'

শোভন হেসে বললে—'কাউকে না, বাড়িতে যেতে চাই।'

নায়েব মশাই তার দিকে খানিক তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে তারপর একটু স্মিতহাস্যে বললে—'ওঃ কিন্তু তাড়াতাড়ি কেন! আসুন বার-বাড়িতে একটু বিশ্রাম করুন।'

শোভন অবাক হয়ে বললে—'সে কি? কি হয়েছে নায়েব মশাই?'

'না, না হয়নি কিছু!'

'মা ভালো আছেন?' শোভনের প্রশ্নে এবার সত্যি ব্যাকুলতা ছিল।

নায়েব মশাই তেমনি অদ্ভুত হাসি হেসে বললেন—'ভালো আছেন বইকি! আসুন! আসুন আমার সঙ্গে!'

শোভন তবু বললে—'কিন্তু ভেতরে গেলেই ত হয়।'

নায়েব মশাই একটু যেন কঠিন স্বরে বললেন—'না হয় না, আপনি আমার সঙ্গে আসুন।'

শোভন রীতিমত বিমূঢ় অবস্থায় এবার নায়েব মশাইকে অনুসরণ করে বার-বাড়িতে গিয়ে উঠল। দু-বছরে সেখানে কিছু কিছু পরিবর্তন হয়েছে। পুরনো সরকার তাদের নেই। নতুন দুটি লোক সেখানে বসে খাতা লিখছে। তার পরিচিত বৃদ্ধ খাজাঞ্চি মশাইকে দেখে সে যেন আশ্বস্ত হল।

নায়েব মশাই তাকে একটা চেয়ারে বসতে বলে খাজাঞ্চি মশাইকে উদ্দেশ করে বললেন—'ইনি ভেতরে যেতে চাইছেন!'

শোভনের কাছে নায়েব মশাইয়ের গলার স্বর কেমন যেন অস্বাভাবিক মনে হল। খাজাঞ্চি মশাই নাকের ওপরকার চশমাটা একটু আঙুল দিয়ে তুলে তার দিকে চেয়ে বললে—'ওঃ, ইনি আজই এসেছেন বুঝি!'

'হ্যাঁ, এইমাত্র।'

শোভন এবার অধীর ভাবে বলে উঠল—'আপনারা কি বলতে চান স্পষ্ট করে বলুন। মার কি কিছু হয়েছে? বাবা কেমন আছেন?'

চারিধারের সব কটা দৃষ্টি তার ওপর অদ্ভুত ভাবে নিবদ্ধ। খানিকক্ষণ সকলেই নীরব। তারপর নায়েব মশাই বললেন,—'তাঁরা সবাই ভালো আছেন। কিন্তু এখন ত আপনার সঙ্গে দেখা হবে না।'

এবার শোভন ক্রুদ্ধ হয়ে উঠল—'কেন দেখা হবে না? আপনাদের কি মাথা খারাপ হয়েছে! আমি চললুম।'

শোভন উঠল। কিন্তু নায়েব মশাই দরজার দিকে সামান্য একটু এগিয়ে গিয়ে শান্তভাবে বললেন—'দেখুন, মিছিমিছি কেলেংকারী করে লাভ নেই! তাতে ফল হবে না কিছু।'

হঠাৎ শোভনের কাছে সমস্ত ব্যাপারটা ভয়ংকর ভাবে স্পষ্ট হয়ে উঠল। সে বিস্মিত ভীত কণ্ঠে বললে—'আপনারা কি আমাকে চিনতে পারছেন না?'

সকলে নীরব।

'আমি শোভন.—বুঝতে পারছেন না আমি শোভন?'

নায়েব মশাই এবার বললেন—'আপনি একটু দাঁড়ান, আমি আসছি।' পাশের ঘরে গিয়ে টেবিলের একটা ড্রয়ার খুলে তিনি একটা জিনিস এনে শোভনের হাতে দিলেন। তারই একটা পুরানো ফটো, সাধারণভাবে তোলা! এখন অস্পষ্ট হয়ে এসেছে একটু।

নায়েব মশাই বললেন, 'চেনেন একে?'

শোভন বিস্মিত কণ্ঠে বললে—'এ ত আমারই ফটো। দেখুন ভালো করে আপনারাই মিলিয়ে! নাঃ এ অসহ্য!'

চুলগুলো মুঠি করে ধরে সে বসে পড়ল।

নায়েব মশাই তার সঙ্গে বসে বললেন—'দেখুন, কিছু মনে করবেন না। আপনার সঙ্গে একটু মিল আছে সত্যি। কিন্তু এর আগে আরো দুজনের সঙ্গে ছিল। মায় জড়ুল পর্যন্ত। আমাদের এ নিয়ে গোলমাল করতে মানা আছে। আমরা কিছু হাঙ্গামা করব না। আপনি এখন চলে যেতে পারেন।'

শোভন উদ্‌ভ্রান্ত ভাবে সকলের দিকে চেয়ে দেখলে। সকলের দৃষ্টিতে

অবিশ্বাস।

কাতরভাবে বললে,—'একবার শুধু আমি মা-বাবার সঙ্গে দেখা করব। আপনারা বিশ্বাস করছেন না। কিন্তু একবার আমায় শুধু দেখা করতে দিন।'

নায়েব মশাই হতাশ ভাবে হাতের ভঙ্গি করে বললেন—'শুনুন তাহলে, সাতদিন আগে শোভন মারা গেছে। তার মৃত্যুর খবর আমরা পেয়েছি।'

শোভন এই অবস্থাতে না হেসে পারলে না, বললে—'কেমন করে মারা গেল?'

তার কণ্ঠস্বরের বিদ্রূপ উপেক্ষা করে নায়েব মশাই বললেন—'মারা গিয়েছে রাস্তায় গাড়ি চাপা পড়ে অপঘাতে। নাম-ধাম-পরিচয় পাওয়া সম্ভব হয়নি। কিন্তু যারা দুর্ঘটনার সময় উপস্থিত ছিল তাদের কয়েকজন খবরের কাগজে আমাদের বিজ্ঞাপন দেখে আমাদের সব কথা জানিয়েছে। হাসপাতালেও আমরা খবর নিয়েছি। সেখানকার ডাক্তারের বর্ণনা আমাদের সঙ্গে মিলে গিয়েছে।'

শোভন এর পর কি করত বলা যায় না, কিন্তু সেই সময় দেখা গেল তার বাবা বাড়ি থেকে বেরুচ্ছেন। মানুষের সঙ্গে ঝড়ে ভাঙ্গা গাছের যে এতদূর সাদৃশ্য হতে পারে, সাহিত্যের উপমা পড়েও কখনও তার মনে হয়নি। তাঁর চলার গতিতে পর্যন্ত যেন ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনার পরিচয় আছে।

সকলে কিছু বুঝে ওঠবার আগেই শোভন দৌড়ে ঘর থেকে বার হয়ে গেল। নায়েব ও কর্মচারীরা ব্যাপারটা বুঝে যখন তার পিছু নিলে, তখন সে বাবার কাছে উপস্থিত হয়েছে।

'বাবা!'

বৃদ্ধ থমকে দাঁড়ালেন। সে মুখের বেদনাময় বিমূঢ়তা শোভনের বুকে ছুরির মত বিঁধল।

'বাবা আমায় চিনতে পারছ?'

বৃদ্ধ স্খলিত-পদে এক পা এগিয়ে আবার থমকে গেলেন। প্রবল ভাবাবেগ তাঁর বার্ধক্যের শিথিল মুখকে বিকৃত করে দিচ্ছে।

তখন নায়েব মশাই ও কর্মচারীরা এসে পড়েছেন।

বৃদ্ধ কম্পিত হাত তুলে, কম্পিত স্বরে বললেন -'কে'!'

নায়েব মশাই শোভনের কাঁধে দৃঢ় ভাবে হাত রেখে বললেন—'না কেউ না। সেই সেবারের মত—এই নিয়ে তিনবার হল।'

একজন কর্মচারী বললে—'আমরা আসতে দিইনি, হঠাৎ আমাদের হাত ছাড়িয়ে—'

বৃদ্ধ তাকে থামিয়ে বললেন—'কিছু বোলো না, চলে যেতে দাও।' বৃদ্ধ শেষ বার শোভনের দিকে কাতর ভাবে চেয়ে আবার ঘরের দিকে ফিরলেন।

শোভন স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। নায়েব মশাই তাকে কি বলছিলেন। অনেকক্ষণ সে কিছু শুনতে পায়নি। কখন সে আবার বার-বাড়িতে এসে বসেছে তাও তার মনে নেই।

আচ্ছন্নতা তার কাটল খানিক বাদে। ভেতর বাড়ি থেকে একজন কর্মচারী নায়েব মশাইকে এসে কি বলছে। নায়েব মশাই তাকে কি বলছেন ঠিক শোনা যাচ্ছে না। না এইবার বোঝা যাচ্ছে। নায়েব মশাইএর হাতে অনেকগুলো টাকার

নোট। কণ্ঠস্বরে তাঁর মিনতি।

শোভনকে একটা কাজ করতে হবে। বাড়ির কর্ত্রী মুমূর্ষু, ছেলের মৃত্যু-সংবাদ তিনি শোনেন নি। তাঁকে কিছু জানানো হয়নি। এখনও তিনি তাকে দেখবার আশা করে আছেন—সেই জন্যেই বুঝি তিনি মৃত্যুতেও শান্তি পেতে পাচ্ছেন না। শোভনকে তাঁর হারানো ছেলে হয়ে একবার দেখা দিতে হবে। মুমূর্ষুর নিষ্প্রভ দৃষ্টিতে কোন কিছু ধরা পড়বে না। হারানো ছেলের সঙ্গে তার সত্যি সাদৃশ্য আছে। মৃত্যুপথ-যাত্রীকে এই শেষ সান্ত্বনাটুকু দেবার জন্যে জমিদার নিজে তাঁকে কাতর অনুরোধ জানিয়েছেন। তার এতে কোন ক্ষতি নেই।

নায়েব মশাই নোটের তাড়াটা শোভনের হাতে গুঁজে দিলেন।”

সোমেশ চুপ করিল। খানিকক্ষণ বাইরের বৃষ্টির শব্দ ছাড়া আর কোন শব্দ নাই। আমি অবশেষে বলিলাম—“সোমেশ, তোমার কানের কাছে একটা জড়ুল আছে।”

সোমেশ হাসিয়া বলিল,—“সেই জন্যেই গল্প বানান সহজ হল।”

কিন্তু কেন বলা যায় না—শীতের বাদলের এই শীতল প্রায়ান্ধকার অস্বাভাবিক অপরাহ্নে তার হাসিটাই বিশ্বাস করিতে আমার প্রবৃত্তি হইল না।

না, তস্য অস্য!

বললেন শ্রীঘনশ্যাম দাস, ঘনাদা নামে যিনি কোনো কোনো মহলে পরিচিত।

এ উক্তির আনুপূর্ব বোঝাতে একটু পিছিয়ে যেতে হবে এ কাহিনীর। স্থান-কাল-পাত্রও একটু বিশদ করা প্রয়োজন।

স্থান এই কলকাতা শহরেরই প্রান্তবর্তী একটি বৃহৎ কৃত্রিম জলাশয়, করুণ আত্মছলনায় যাকে আমরা হ্রদ বলে অভিহিত করে থাকি। জীবনে যাদের কোনো উদ্দেশ্য নেই, অথবা কোনো উদ্দেশ্যরই একমাত্র অনুসরণে যারা পরিশ্রান্ত, উভয় জাতির নানা বয়সের স্ত্রী-পুরুষ নাগরিক প্রতি সন্ধ্যায় এই জলাশয়ের চারিধারে এসে নিজ নিজ প্রবৃত্তি অনুযায়ী স্বাস্থ্য অর্থ কাম মোক্ষ এই চতুর্বর্গের সাধনায় একা একা বা দল বেঁধে ভ্রমণ করে উপবিষ্ট হয়।

এই জলাশয়ের দক্ষিণ তীরে একটি নাতিবৃহৎ বৃক্ষকে কেন্দ্র করে কয়েকটি আসন বৃত্তাকারে পাতা। সেই আসনগুলিতে আবহাওয়া অনুকূল থাকলে প্রায় প্রতিদিনই পাঁচটি প্রবীণ নাগরিককে একত্র দেখা যায়।

এ কাহিনী সূচনার পাত্র এঁরাই। তাঁদের একজনের শিরোশোভা কাশের মত শুভ্র, দ্বিতীয়ের মস্তক মর্মরের মত মসৃণ, তৃতীয়ের উদর কুম্ভের স্ফীত, চতুর্থ মেদভারে হস্তীর মত বিপুল এবং পঞ্চম জন উষ্ট্রের মত শীর্ণ ও সামঞ্জস্যহীন।

প্রতি সন্ধ্যায় এই পঞ্চ সভাসদের অন্ততঃ চারজনকে এই বিশ্রাম-আসনে নিয়মিতভাবে সমবেত হতে দেখা যায় এবং আকাশের আলো বিলীন হয়ে জলাশয়ের চারিপার্শ্বের আলো জ্বলে ওঠার পর ফেরিওয়ালাদের ডাক বিরল না হওয়া অবধি স্বাস্থ্য থেকে সাম্রাজ্যবাদ ও বাজারদর থেকে বেদান্তদর্শন পর্যন্ত যাবতীয় বিষয় ও তত্ত্ব তাঁরা আলোচনা করে থাকেন।

এ সমাবেশের প্রাণ হলেন শ্রীঘনশ্যাম দাস, প্রাণান্তও বলা যায়।

এ আসর কবে থেকে তিনি অলংকৃত করছেন ঠিক বলা যায় না, তবে তাঁর আবির্ভাবের পর থেকে এ সভার প্রকৃতি ও সুর সম্পূর্ণ পরিবর্তিত। কুম্ভের মত যাঁর উদরদেশ স্ফীত সেই ভোজনবিলাসী রামশরণবাবু আগেকার মত তাঁর রুচিকর রন্ধন-শিল্প নিয়ে সবিস্তারে কিছু বলবার সুযোগ পান না। মস্তক যাঁর মর্মরের মত মসৃণ সেই ভূতপূর্ব ইতিহাসের অধ্যাপক শিবপদবাবু ঐতিহাসিক বিষয় নিয়েও নিজের মতামত জ্ঞাপন করতে দ্বিধা করেন।

কারণ, শ্রীঘনশ্যাম দাস সম্বন্ধে সবাই সন্ত্রস্ত। কোথা থেকে কি অশ্রুত-পূর্ব উল্লেখ ও উদ্ভট উদ্ধৃতি দিয়ে বসবেন, নিজেদের অজ্ঞতা প্রকাশের আশংকাতেই যার প্রতিবাদ করতে পারতপক্ষে কেউ প্রস্তুত নন।

মেদভারে হস্তীর মত যিনি বিপুল সেই সদাপ্রসন্ন ভবতারণবাবু সেদিন কি কুক্ষণে ঐতিহাসিক উপন্যাসের কথা তুলেছিলেন!

ভবতারণবাবু নির্বিবাদী নিপাট ভালোমানুষ। সরকারী পূর্ত বিভাগে

মাঝারী স্তরে কি একটা আয়েশী চাকরি করতেন। কয়েক বছর হলো রিটায়ার করেছেন। ধর্মকর্ম এবং নির্বিচারে যাবতীয় মুদ্রিত গল্প উপন্যাস পড়াই এখন তার কাজ।

এ সভায় বেশীরভাগ সময়ে ভবতারণবাবু নীরব শ্রোতা হিসাবেই বিরাজ করেন। এই দিনে আলোচনায় একবার ঢিল পড়ায় কি খেয়ালে নিজের দুর্বলতার কথাটা প্রকাশ করে ফেলেছেন।

দিবানিদ্রার প্রসঙ্গ থেকেই কথাটা বলবার সুযোগ পেয়েছিলেন।

হ্যাঁ, ও রোগ আমার ছিল। যেন লজ্জিত ভাবে বলেছিলেন ভবতারণবাবু, —ডাক্তার বলেছিল দিনে ঘুমোন বন্ধ না করলে চর্বি আরো বাড়বে। কিন্তু দিনে ঘুমোন বন্ধ করি কি করে? দুপুরের খাওয়া সারতে না সারতেই চোখ দুটো ঘুমে জুড়ে আসে। তারপর ওই এক ওষুধে ভোজবাজি হয়ে গেল!

ওষুধটা কি?—সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করলেন উদর যাঁর কুম্ভের মত স্ফীত বর্তুলাকার সেই রামশরণবাবু,—কফি?

না না কফি কেন হবে! ভবতারণবাবু গদগদ স্বরে বললেন,—আজকালকার সব ঐতিহাসিক উপন্যাস। কি অপূর্ব জিনিস ভাবতে পারেন না, একবার পড়তে শুরু করলে ঘুম দেশ ছেড়ে পালাবে।

আপনি ওইসব উপন্যাস পড়েন?—মস্তক যাঁর মর্মরের মত মসৃণ সেই শিবপদবাবু নাসিকা কুঞ্চিত করলেন।

পড়ি মানে? ওই তো এখন আমার ওষুধ।—ভবতারণবাবু উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন,—পড়ে দেখবেন একখানা। আর ছাড়তে পারবেন না। আহা, কি গল্প আর কি সব চরিত্র! চোখের সামনে যেন জ্বলজ্বল করে। শাজাহাঁ, ক্লাইব, নুরজাহান, সিরাজ, বাহাদুর শা, জগৎ শেঠ, উমীচাঁদ সব যেন আপনার চেনা পাড়ার ছেলেমেয়ে মনে হবে, আর কি সুন্দর তাদের আলাপ কথাবার্তা! একটু কোথাও খিঁচ নেই। পাছে বুঝতে না পারেন তাই এক কথা একশ' বার বুঝিয়ে দেবে। ইতিহাসকে ইতিহাস, আরব্যোপন্যাসকে আবব্যোপন্যাস।

শুধু তাই নয়তো!—মর্মরমসৃণ মস্তক ঝাঁকি দিয়ে শিবপদবাবু যেন তাঁর অবজ্ঞা প্রকাশ করলেন,—পড়ে এখনো অবশ্য দেখিনি, কিন্তু ইতিহাসের শ্রাদ্ধ না হলেই বাঁচি। চোখের সামনে যা আছে তা-ই যারা দেখতে পায় না তারা ইতিহাসের ওপর চড়াও হলে একটু ভয় করে কিনা! সেদিন কি একটা এখানকার সামাজিক উপন্যাসে কলকাতার এক বাঙ্গালী ধনীর স্কাইস্ক্রেপারের কথা পড়ে খুঁজতেই গিয়েছিলাম নিউ আলিপুরে। আজকের দিন নিয়েই এই! দু-চারশো বছর আগেকার কথা হলে তো একেবারে বেপরোয়া। পাণিপথের প্রথম যুদ্ধেই হয়তো ট্যাঙ্ক দেখিয়ে ছাড়বে!

হুঃ!

নাসিকাধ্বনি শুনে সকলকেই সচকিত সন্ত্রস্ত হয়ে এবার ঘনশ্যাম দাসের দিকে তাকাতে হলো। এতক্ষণ তাঁর নীরব থাকাই অবশ্য অস্বাভাবিক বলে বোঝা উচিত ছিল।

হ্যাঁ, ঘনশ্যাম দাসই নাসিকাধ্বনি করেছেন। সকলের দৃষ্টি যথোচিত আকৃষ্ট হবার পর তিনি কেমন একটু বাঁকা হাসির সঙ্গে জিজ্ঞাসা করলেন,—পাণিপথের প্রথম যুদ্ধ কবে হয়েছে যেন?

২১শে এপ্রিল, ১৫২৬ খ্রীষ্টাব্দ। শিবপদবাবুকে বিদ্যা প্রকাশের এ সুযোগ পেয়ে যেন বেশ একটু গর্বিত মনে হলো।

আর আপনার ওই যুদ্ধের ট্যাংকের ব্যবহার হয় প্রথম কবে?—ঘনশ্যাম দাসের কথার সুরটা এবারও যেন বাঁকা।

কিন্তু শিবপদবাবু এখন নিজের কোটের মধ্যে। তিনি সগর্বে গড়গড় করে শুনিয়ে দিলেন, প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ১৫ই সেপ্টেম্বর ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে মিত্র পক্ষের চতুর্থ বাহিনী উনপঞ্চাশটি ট্যাংক ফ্রান্সের সোম থেকে আনকর অভিযানে ব্যবহার করে। ইতিহাসে যুদ্ধের সচল ট্যাংকের ব্যবহার সেই প্রথম।

আপনাদের ইতিহাসের দৌড় ওই পর্যন্ত!—ঘনশ্যাম দাসের অনুকম্পা মাখানো বিদ্রূপ।

তাঁর ঐতিহাসিক পাণ্ডিত্যের ওপর এ কটাক্ষে শিবপদবাবু যদি গরম হয়ে ওঠেন তাঁকে দোষ দেওয়া যায় না বোধ হয়।

কি বলে তাহলে আপনার ইতিহাস?—শিবপদবাবুও গলা পেঁচিয়ে বললেন।

ইতিহাস আমারও নয়, আপনারও নয়।—দাসমশাই করুণাভরে হেসে বললেন,—সত্যিকারের ইতিহাসটা শুনতে চান?

চাই বই কি!—শিবপদবাবুর যুদ্ধং দেহি ভাব।

তাহলে শুনুন,—দাসমশাই শুধু অজ্ঞানতিমির দূর করবার কর্তব্যবোধেই যেন বলতে শুরু করলেন—প্রথম পাণিপথের যুদ্ধে 'ট্যাংক' ব্যবহার হয়নি বটে, কিন্তু সচল দুর্গের মত এক যুদ্ধযান আবিষ্কৃত ও ব্যবহৃত হয়েছে তারও ছ'বছর আগে। এর নাম দেওয়া হয়েছিল 'মান্টা'।

ছ' বছর আগে মানে ১৫২০ খ্রীষ্টাব্দে?—শিবপদবাবুর গলায় বিস্ময়ের চেয়ে বিদ্রূপটাই স্পষ্ট।

হ্যাঁ, সেই জোড়া ছুরির বছরেই প্রথম সচল ট্যাংক নিয়ে মানুষ যু[illegible]

—দাসমশাই করুণাভরে জানালেন।

জোড়া ছুরির বছর! সেটা আবার কি?—এবার শিবপদবাবুর গলায় আর বিদ্রূপ নেই।

ওই ১৫২০ খ্রীষ্টাব্দেরই নাম ছিল জোড়া ছুরির বছর টেনচটিট্লান-এ।—পরিতৃপ্তভাবে ঘনশ্যাম দাস সমবেত সকলের ব্যাদিত মুখের ওপর চোখ বুলিয়ে নিলেন একবার। তারপর বিশদ হলেন,—তার আগের বছর ১৫১৯ খ্রীষ্টাব্দের নাম ছিল একটি খাগড়া। এই দুটি বছর সমস্ত পৃথিবীর ইতিহাসকে ওলট-পালট করে দিয়ে গেছে। কিন্তু জোড়া ছুরির বছরে টেনচ-টিট্লান-এ ওই সচল ট্যাংক প্রথম মাথা থেকে বার করে কাজে না লাগালে ইতিহাস আরেক রাস্তায় চলে যেত। একদিন দেনার দায়ে মাথার চুল বিকোনো অথর্ব হার্নাণ্ডো কর্টেজ তাহলে ক্ষোভে দুঃখে স্পেনের সম্রাট পঞ্চম চার্লসকে শোনাবার সুযোগ পেতেন না যে, স্পেনে যত শহর আছে গুনতিতে তার চেয়ে অনেক বেশী রাজ্য তিনি সম্রাটকে ভেট দিয়েছেন। ভলটেয়ারের লেখা এ বিবরণ গালগল্প বলে যদি উড়িয়েও দিই, তবু এ কথা সত্য যে টেনচটিট্লান-এর নাম তাহলে অন্য যা-ই হোক, মেক্সিকো সিটি হয়ে উঠত না, আর ঘনশ্যামের পেছনে দাস পদবী লাগাবার সৌভাগ্য হতো না আমার কপালে।

উপস্থিত সকলের ঘূর্ণ্যমান মাথা স্থির করতে বেশ একটু সময় লাগল। মাথার কেশ যাঁর কাশের মত শুভ্র সেই হারসাধনবাবুই প্রথম একটু সামলে উঠে, দু'বার ঢোক গিলে, তাঁর বিমূঢ় বিহ্বলতাকে ভাষা দিলেন,—ও, আপনি স্পেনের হয়ে কর্টেজ-এর মেক্সিকো বিজয়ের কথা বলছেন? সেই যুদ্ধে প্রথম সচল ট্যাঙ্ক ব্যবহার হয়? কিন্তু তার সঙ্গে আপনার পদবী দাস হওয়ার সম্পর্ক কি?

সম্পর্ক এই যে,—ঘনশ্যাম দাস যেন সকলের মূঢ়তা ক্ষমার চক্ষে দেখে বললেন,—কর্টেজ-এর অমূল্য ডায়ারী চিরকালের মত হারিয়ে না গেলে ও মেক্সিকোর আজটেক রাজত্ব জয়ের সব চেয়ে প্রামাণ্য ইতিহাস 'হিস্টোরিয়া ভের্দাদেরা দে লা কনকুইস্তা দে লা নুয়েভা এসপানা'-র লেখক বার্নাল ডিয়াজ নেহাত হিংসায় ঈর্ষায় চেপে না গেলে, প্রথম ট্যাঙ্কের উদ্ভাবন ও কর্টেজ-এর উদ্ধারকর্তা হিসেবে যাঁর নাম ইতিহাসে পাওয়া যেত তিনি দাস বলেই নিজের পরিচয় দিতেন।

পদবী তাঁর দাস ছিল?—মেদভারে হস্তীর মত বিপুল ভবতারণবাবু বিস্ফারিত নয়নে জিজ্ঞাসা করলেন—তার মানে তিনি বাঙালী ছিলেন?

বাঙালী অবশ্য এখনকার ভাষায় বলা যায়। দাসমশাই বুঝিয়ে দিলেন,—তবে তখনো এ শব্দের প্রচলন হয়নি। তিনি অবশ্য এই গৌড় সমতটের লোকই ছিলেন।

আপনার কোনো পূর্বপুরুষ তাহলে?—স্ফীতোদর রামশরণবাবু সবিস্ময়ে বললেন,—অতি-বৃদ্ধ প্রপিতামহটহ কেউ!

না, তস্য তস্য।—বললেন দাসমশাই। তারপর একটু থেমে কৃপা করে উক্তিটি ব্যাখ্যা করলেন বিশদভাবে,—অর্থাৎ, আমার ঊর্ধ্বতন দ্বাবিংশতম পূর্বপুরুষ ঘনরাম, দাস পদবীর উৎপত্তি যাঁর থেকে।

মর্মরের মত মস্তক যাঁর মসৃণ সেই শিবদাসবাবু নিজের কোটেও কেঁচো হয়ে থাকতে হওয়ায় এতক্ষণ বোধ হয় মনে মনে গজরাচ্ছিলেন। এবার ভুরু কপালে তুলে একটু ঝাঁজাল গলাতেই জিজ্ঞাসা করলেন,—১৫১৯ কি ২০ খ্রীষ্টাব্দে আপনার সেই বাঙ্গালী পূর্বপুরুষ মেক্সিকো গেছলেন?

শিবপদবাবু যে ভাবে প্রশ্নটা করলেন, তাতে,—'গঞ্জিকা পরিবেশনের আর জায়গা পেলেন না।'—কথাটা খুব যেন উহ্য রইল না।

দাসমশাই তবু অবোধের প্রতি করুণার হাসি হেসে বললেন,—শুনতে একটু আজগুবিই লাগে অবশ্য। কিউবা বাহামাদ্বীপ ইত্যাদি আগে আবিষ্কার করলেও ক্রিস্টোফার কলম্বস-ই তিন বারের বার ১৪৯৮ খ্রীষ্টাব্দে আসল দক্ষিণ আমেরিকার মাটি স্পর্শ করেন। তাঁর আমেরিকা আবিষ্কারের মাত্র একুশ বছর বাদে তখনকার এক বঙ্গসন্তানের সেই সুদূর অ্যাজটেক্‌দের রাজধানী টেনচ্‌টিট্‌লান-এ গিয়ে হাজির হওয়া অবিশ্বাস্যই মনে হয়। কিন্তু ইতিহাসের বুনন বড় জটিল। কোন জীবনের সুতো যে কার সঙ্গে জড়িয়ে কোথায় গিয়ে পৌঁছোয় তা কেউ জানে না। যে বছর কলম্বস প্রথম আমেরিকার মাটিতে পা রাখেন সেই ১৪৯৮ খ্রীষ্টাব্দেরই ১লা মে তারিখে পোর্টুগ্যালের এক নাবিক ভাস্কো দা গামা আফ্রিকার দক্ষিণের উত্তমাশা অন্তরীপ পার হয়ে এসে ভারতের পশ্চিম কূলের সমৃদ্ধ রাজ্য কালিকটে তার চারটে

জাহাজ ভেড়ায়। যে উদ্দেশ্য নিয়ে এসেছিল তাতে বিফল হয়ে ভাস্কো দা গামাকে ফিরে যেতে হয়। কিন্তু কালিকটের জামোরিনের ওপর আক্রোশ মেটাতে দশটি সশস্ত্র জাহাজ নিয়ে ভাস্কো দা গামা ফিরে আসে ১৫০২ খ্রীষ্টাব্দে। এবার নরপিশাচের মত সে শুধু কালিকট ধ্বংস করেই ক্ষান্ত হয় না। কালিকট ছারখার করে সেখান থেকে কোচিন যাবার পথে হিংস্র হাঙগরের মত সমুদ্রের ওপর যা ভাসে এমন কোন কিছুকেই রেহাই দেয়নি। যে সব জাহাজ সুলুপ লুট করে জ্বালিয়ে সে ডুবিয়ে দেয় তার মধ্যে ছিল একটি মকরমুখো পালোয়ার সদাগরী জাহাজ। সে সদাগরী জাহাজ সমতট থেকে সূক্ষ্ম কার্পাস বস্ত্র নিয়ে বাণিজ্য করতে গেছল ভৃগুকচ্ছে। সেখান থেকে ফেরার পথেই এই অপ্রত্যাশিত সর্বনাশ। দা গামার পৈশাচিক আক্রমণে সে সদাগরী জাহাজের সব মাঝি মাল্লা যাত্রারই শেষ হয়ে যাবার কথা। কিন্তু তা হয়নি। রক্ষা পেয়েছিল একটি দশ বৎসরের বালক। দয়ামায়ার দরুন নয়, নেহাত কুসংস্কারের দরুনই দা গামার জাহাজের নরপশুরা তাকে রেহাই দেয়। জ্বলন্ত সদাগরী জাহাজ যখন ডুবছে তখন ছেলেটি কেমন করে সাঁতরে এসে দা গামার-ই খাস জাহাজের হালটা ধরে আশ্রয় নেয়। একজন মাল্লা তাকে সেখানে দেখতে পেয়ে পৈশাচিক আনন্দে আরো ক'জনকে ডাকে ছেলেটিকে বন্দুক ছুঁড়ে মেরে মজা করবার জন্যে। কিন্তু সেকালের ম্যাচ্‌লক্ বন্দুক। ছুঁড়তে গিয়ে বন্দুক ফেটে সেই লোকটাই পড়ে মারা। ঠিক সেই সময়ে তিনটে শুশুকের জাতের ডুগংকে জলের মধ্যে ডিগবাজি খেতে দেখা যায় জাহাজের কিছু পেছনে। দুটো ব্যাপার নিজেদের কুসংস্কারে এক সঙ্গে মিলিয়ে দৈবের অশুভ ইঙ্গিত মনে করে ভয় পেয়ে ছেলেটিকে আর মারতে তারা সাহস করে না। তার বদলে তাকে তুলে নেয় জাহাজের ওপরে।

১৫০৩ সালে ভাস্কো দা গামা লিসবন-এ ফেরবার পর ছেলেটি বিক্রী হয়ে যায় ক্রীতদাসের বাজারে। সেখান থেকে হাত ফেরতা হতে হতে একদিন সে কিউবায় গিয়ে পৌঁছায়। দশ বছর বয়সে দা গামার জাহাজে যে লিসবন-এ এসেছিল সে তখন চব্বিশ-পঁচিশ বছরের জোয়ান। জুয়ারেজ নামে কিউবায় এসে বসতি করা একটি পরিবারের সে ক্রীতদাস।

কর্টেজ তখন সেই কিউবাতেই সে দ্বীপের বিজেতা ও শাসনকর্তা ভেলাস-কেথের বিষ নজরে পড়েছে। বিষ নজরে পড়েছে ওই জুয়ারেজ পরিবারেরই একটি মেয়ের সঙ্গে প্রেমের ব্যাপারে। মেয়েটির নাম ক্যাটালিনা জুয়ারেজ। কর্টেজ স্বভাবে-চরিত্রে একেবারে তখনকার মার্কামারা অভিজাত স্প্যানিশ। উদ্দাম দুরন্ত বেপরোয়া যুবক। প্রেম সে অনেকের সঙ্গেই করে বেড়ায় কিন্তু বিয়ের বন্ধনে ধরা দিতে চায় না। বিশেষ করে জুয়ারেজ পরিবার বংশে খাটো বলেই ক্যাটালিনার সঙ্গে বেশ কিছুদিন প্রেম চালিয়ে সে তখন সরে দাঁড়িয়েছে। ভেলাসকেথ-এর কোপদৃষ্টি সেই জন্যেই পড়েছে কর্টেজ-এর ওপর। ভেলাসকেথ-এর সঙ্গে জুয়ারেজ পরিবারের মাখামাখি একটু বেশী। ক্যাটা-লিনার আরেক বোন তাঁর অনুগ্রহধন্যা।

জুয়ারেজ পরিবারের সঙ্গে বেইমানি করার দরুন ভেলাসকেথ-এর এমনি-তেই রাগ ছিল, কর্টেজ তার ওপর তাঁর বিরুদ্ধেই চক্রান্ত করেছে খবর পেয়ে ভেলাসকেথ তাকে কয়েদ করলেন একদিন। কর্টেজের বাঁচি ফাঁসিই হয় রাজ-

দ্রোহের অপরাধে। সেকালে স্পেনের নতুন-জেতা উপনিবেশে এ ধরনের বিচার আর দণ্ড আখছার হতো।

কর্টেজ কিন্তু সোজা ছেলে নয়। পায়ের শিকল খুলে গারদের জানলা ভেঙে একদিন সে হাওয়া। আশ্রয় নিল গিয়ে এক কাছাকাছি গির্জায়। তখনকার দিনে গির্জের অপমান করে সেখান থেকে কাউকে ধরে আনা অতি বড় স্বেচ্ছাচারী জবরদস্ত শাসকেরও সাধ্য ছিল না। কিন্তু গির্জের মধ্যে কর্টেজ-এর মত ছটফটে দুরন্ত মানুষ ক'দিন লুকিয়ে থাকতে পারে! সেখান থেকে লুকিয়ে বেরুতে গিয়ে আবার কর্টেজ ধরা পড়ল।

এবার হাতকড়া বেড়ি পরিয়ে একেবারে জাহাজে নিয়ে তোলা হলো তাকে। পরের দিন সকালেই তাকে চালান করা হবে হিসপানিয়োলায় বিচার আর শাস্তির জন্যে।

বিচার মানে অবশ্য প্রহসন আর শাস্তি মানে প্রাণদণ্ড ছাড়া আর কিছু নয়।

কর্টেজ-এর এবার আর কোনো আশা কোনো দিকে নেই।

ভেলাসকেথ এবার তাঁর ক্ষমতার বহরটা না বুঝিয়ে ছাড়বেন না।

অথচ এই ভেলাসকেথ-এর সঙ্গেই কর্টেজ প্রধান সহায় রূপে কিউবা-বিজয়ের অভিযানে ছিলেন। ভেলাসকেথ-এর প্রিয়পাত্রও তখন হয়েছিলেন কিছুদিন। হবারই কথা। ভেলাসকেথ তাঁর অভিযানে সব দিকে চৌকশ এমন যোগ্য সহকারী আর পাননি। তখন স্পেনের কল্পনাতীত সাম্রাজ্য বিস্তারের দিনেও অসীম সাহসের সঙ্গী স্থির বুদ্ধি ও দুরন্ত প্রাণশক্তির এমন সমন্বয় বিরল ছিল।

কর্টেজ-এর জন্ম স্পেনের পূর্ব-দক্ষিণ দিকের মেডেলীন শহরে। ছেলেবেলায় নাকি ক্ষীণজীবী ছিলেন, কিন্তু বয়স বাড়বার সঙ্গে সঙ্গেই সমর্থ জোয়ান হয়ে উঠেছেন। বাবা মা'র ইচ্ছে ছিল কর্টেজ আইন পড়ে। বছর দুই কলেজ পড়েই কর্টেজ পড়ায় ইস্তফা দিয়ে পালিয়ে আসেন। তখন স্পেনের হাওয়ায় নতুন অজানা দেশ আবিষ্কারের উত্তেজনা ও মাদকতা। দুঃসাহসিক নিরুদ্দেশ যাত্রার উদ্দীপনা সব তরুণের মনে। এসব অভিযানে সোনা, দানা, হীরে মানিকের কুবেরের ভাণ্ডার লুট করে আনার প্রলোভন যেমন আছে, তেমনি আছে অজানা রহস্যের হাতছানি, আর সেই সঙ্গে গৌরব-মুকুটের আশা।

উনিশ বছর বয়সে ১৫০৪ খ্রীষ্টাব্দে কর্টেজ স্পেন ছেড়ে পাড়ি দিলেন নতুন আবিষ্কৃত পশ্চিমের দেশে ভাগ্যান্বেষণে। সফল বিফল নানা অভিযানে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে ১৫১১ সালে কর্টেজ ভেলাসকেথ-এর সঙ্গে গেলেন তাঁর কিউবা-বিজয়ের সহায় হয়ে। মান-সম্মান অর্থ-প্রতিপত্তি কিছুটা তখন তাঁর হয়েছে। ভবিষ্যৎ তাঁর উজ্জ্বল বলেই সকলের ধারণা। ঠিক এই সময়ে স্বভাবের দোষে আর ভাগ্যের বিরূপতায় এই সর্বনাশ তাঁর ঘটল। চোর ডাকাতের মত ফাঁসিকাঠে লটকেই তাঁর জীবনের সব উজ্জ্বল সম্ভাবনা শেষ হবে।

জাহাজের গারদ-কুঠুরির ভেতর হাত-পায়ে শেকলবাঁধা অবস্থায় এই শোচনীয় পরিণাম নিশ্চিত জেনে কর্টেজ তখন ভেঙে পড়েছেন। উপায় থাকলে আত্মহত্যা করেই নিজের মানটা অন্ততঃ তিনি বাঁচাতেন।

হঠাৎ কর্টেজ চমকে উঠে দু' কান খাড়া করেন।

এই রাত্রে নির্জন জাহাজঘাটার পাড়ে কোথায় কোন ধর্মযাজক 'আভে মেরিয়া'র স্তোত্র পাঠ করতে এসেছেন!

পর মুহূর্তেই কর্টেজের বিস্ময়ের আর সীমা থাকে না।

নার স্তোত্রের, কিন্তু কথাগুলো যে আলাদা!

এ তো 'আভে মেরিয়া' নয়। ভাষাটা লাটিন, সুরটাও মাতা মেরীর বন্দ-

কর্টেজ দু'বছর কলেজে একেবারে ফাঁকি দিয়ে কাটাননি। ল্যাটিনটা অন্ততঃ শিখেছিলেন।

স্তোত্রের সুরে উচ্চারিত কথাগুলোর মানে এবার তিনি বুঝতে পারেন। এ তো তাঁর উদ্দেশেই উচ্চারণ করা শ্লোক! ল্যাটিনে বলা হচ্ছে যে, ভাবনা কোরো না বন্দী বীর। আজ গভীর রাত্রে সজাগ থেকো। যে তোমাকে মুক্ত করতে আসছে তাকে বিশ্বাস কোরো।

জাহাজের মাল্লা আর প্রহরীরা গোমুখ্খু। তাদের বুঝতে না দেবার জন্যেই এই লাটিন স্তোত্রের ছল, তা কর্টেজ বুঝলেন।

কিন্তু কে তাঁকে উদ্ধার করতে আসছে! এমন কোন দুঃসাহসিক বন্ধু তাঁর আছে যে তাঁকে এই জাহাজের গারদ থেকে উদ্ধার করবার জন্যে নিজের প্রাণ বিপন্ন করবে?

সত্যিই কেউ আসবে কি?

আশায় উদ্বেগে অধীর হয়ে কর্টেজ জেগে থাকেন।

সত্যিই কিন্তু সে এল। গভীর রাত্রে প্রহরীরা যখন ঢুলতে ঢুলতে কোনো রকমে পাহারা দিচ্ছে, তখন জাহাজের গারদ-কুঠুরির একটি মাত্র শিক দেওয়া জানালায় গাঢ় অন্ধকারে একটা সিঁড়িঙ্গে ভুতুড়ে ছায়াই যেন দেখা গেল।

কিছুক্ষণ বাদেই জানালার শিকগুলো দেখা গেল কাটা হয়ে গেছে নিঃশব্দে।

সেই ভুতুড়ে ছায়া গোছের লোকটা এবার জানালা গলে নেমে এল ভেতরে। কর্টেজ-এর হাত-পায়ের শিকল কেটে খুলে দিতে বেশীক্ষণ তার লাগল না।

চাপা গলায় সে এবার বললে,—জানলা দিয়ে বাইরে চলে যান এবার। ডেকের এদিকটা অন্ধকার। পাহারাতেও কেউ নেই। ডেকের রেলিং থেকে একটা দড়ি ঝুলছে দেখবেন। নির্ভয়ে সেটা ধরে নীচে নেমে যান। সেখানে একটা ডিঙি বাঁধা আছে। সেইটে খুলে নিয়ে প্রথম স্রোতে নিঃশব্দে ভেসে জাহাজঘাটা ছাড়িয়ে চলে যান। তারপর যেখানে হোক তীরে উঠলেই চলবে।

এই নির্দেশ পালন করতে গিয়েও একবার থেমে কর্টেজ না জিজ্ঞেস করে পারলেন না,—আর আপনি?

আমার জন্যে ভাববেন না,—বললে অস্পষ্ট মূর্তিটা,—আগে নিজের প্রাণ বাঁচান। আমি যদি পারি তো আপনার পিছুপিছু ওই ডিঙিতেই গিয়ে নামব। নইলে গোলমাল যদি কিছু হয়, জাহাজেই তার মওড়া নিতে হবে।

কর্টেজ নির্দেশ মত ডিঙিতে গিয়ে পৌঁছোবার পর ছায়ার মত মূর্তিটাও তাতে নেমে এল। জাহাজের ওপর কেউ কিছু জানতে পারেনি।

ডিঙি খুলে স্রোতে ভাসিয়ে অনেকখানি দূরে তীরে গিয়ে ওঠেন দু'জনে।

কর্টেজ তখন কৌতূহলে অধীর হয়ে পড়েছেন। কে এই অদ্ভুত অজানা

মানুষটা? গায়ে আঁট-সাট পোশাক সমেত যে চেহারাটা দেখা যাচ্ছে তার সঙ্গে তাঁর চেনা-জানা কোনো কারুরই মিল নেই। তারা কেউ এমন রোগাটে লম্বা নয়। মুখটা তখনো অবশ্য দেখা যাচ্ছে না। একটা শুধু দু'চোখের জন্যে দুটো ফুটো করা কাপড় তাতে বাধা।

তীরে নামবার পর কর্টেজ কিছু জিজ্ঞাসা করবার অবসর অবশ্য পেলেন না। লোকটা তাকে সে সুযোগ না দিয়ে ব্যস্তভাবে বলল,—আর দেরি করবার সময় নেই ডন কর্টেজ। আরবারে যে গিজের আশ্রয় নিয়েছিলেন, সোজা সেখানেই যেতে হবে সামনের বনের ভেতর দিয়ে। আসুন।

এ দিকের এই বনাঞ্চলটা কর্টেজ-এর অচেনা। কিন্তু লোকটার সব যেন মুখস্ত। অন্ধকার জংগলের ভেতর দিয়ে আকাবাঁকা পথে কিছুক্ষণ বাদেই কর্টেজকে সে গির্জার পেছনের করবখানার কাছে পেঁছে দিয়ে বললে,—এবার আপনি নিরাপদ ডন কর্টেজ। কেউ এখনো আপনার পালাবার খবর জানতে পারেনি। যান, ভেতরে চলে যান এদিক দিয়ে।

কিন্তু কর্টেজ গেলেন না। সেখানেই দাঁড়িয়ে পড়ে স্পেনের আদব-কায়দা মাফিক কুর্নিশ করে দৃঢ়স্বরে বললেন,—না, আমার এত বড় উপকার যিনি করলেন তাঁর পরিচয় না জেনে আমি কোথাও যাব না। বলুন আপনি কে? কি আপনার নাম?

আমার পরিচয় কি দেব ডন কর্টেজ!—লোকটা তার মুখের ঢাকা খুলে ফেলে বললে,—ক্রীতদাসের কি কোনো পরিচয় থাকে! আমরা গরু ঘোড়ার বেশী কিছু নয়। আমায় সবাই গানাদো, মানে গরু-ভেড়া বলেই ডাকে হুকুম করতে।

কর্টেজ তখন হতভম্ব। স্প্যানিশে গানাদো মানে গরু-ভেড়া। তার চেয়ে ভালো সম্বোধন যার নেই তেমনি একটা ক্রীতদাসকে কুর্নিশ করে 'আপনি' বলেছেন বলে বেশ একটু লজ্জাও বোধ করছেন। কিন্তু মানুষ হিসেবে কর্টেজ খুব খারাপ ছিলেন না। এত বড় উপকারের কৃতজ্ঞতাটা তাই তৎক্ষণাৎ উড়িয়ে দিতে না পেরে একটু ইতস্ততঃ করে তুই-এর বদলে তুমি বলেই সম্বোধন করে বিস্মিতভাবে জিজ্ঞাসা করলেন,—তুমি,—মানে কাদের ক্রীতদাস তুমি?

যে জুয়ারেজ পরিবারে আপনি আগে যাতায়াত করতেন, তাদেরই। লোকটির মুখে অন্ধকারেও যেন একটু অদ্ভুত হাসি দেখা গেল,—ক্রীতদাস-দের কেউ তো লক্ষ করে দেখে না! নইলে আপনার ফাই-ফরমাশও আমি অনেক খেটেছি।

কিন্তু, কিন্তু,—কার্টেজ একটু ধোঁকায় পড়েই বললেন এবার,—তোমায় তো চেহারায় এদেশের আদিবাসী বলে মনে হয় না। দু-চারজন যে কাফ্রী ক্রীতদাস এখন এখানে আমদানি হয়েছে তাদের সঙ্গেও তোমার মিল নেই। তাহলে তুমি—

হ্যাঁ, ডন কর্টেজ, আমি অন্য দেশের মানুষ। কর্টেজের অসম্পূর্ণ কথাটা পূরণ করে লোকটি বললে,—আপনারা এক ইণ্ডিজ-এর খোঁজে পশ্চিম দিকে পাড়ি দিয়েছেন, কিন্তু আরেক আসল ইণ্ডিজ আছে পূর্ব দিকে। আমি সেখানকার মানুষ। ছেলেবেলায় বোম্বেটেদের কাছে ধরা পড়ে এদেশে এসে ক্রীতদাস হয়েছি।

কর্টেজ সব কথা মন দিয়ে শুনলেন কিনা বলা যায় না। আর এক প্রশ্ন তখন তার মনে প্রধান হয়ে উঠেছে। একটু সন্দিগ্ধভাবে জিজ্ঞাসা করলেন,—আচ্ছা, দুপ্রহর রাত্রে জাহাজঘাটার পাড়ে আভে মেরিয়া-র সুরে স্তোত্র পাঠ করে কে আমায় এ উদ্ধারের জন্যে তৈরী থাকতে বলেছিল?

একটু চুপ করে থেকে লোকটি বললে,—আর কেউ নয় ডন কর্টেজ, এই অধীন।

তুমি!—কর্টেজ সত্যিই এবার দিশাহারা,—তোমার অমন শুদ্ধ ল্যাটিন উচ্চারণ! এ শ্লোক তৈরী করলে কে? শেখালে কে তোমায়?

কেউ শেখায়নি ডন কর্টেজ।—লোকটি সবিনয়ে বললে ও শ্লোক আমি তৈরি করেছি আপনাকে হুঁসিয়ার করবার জন্যে।

তুমি ও শ্লোক তৈরী করেছ? তুমি ল্যাটিন জানো!—কর্টেজ একেবারে তাজ্জব।

আজ্ঞে হ্যাঁ- লোকটি যেন লজ্জিত,—এখানে চালান হবার আগে অনেককাল ডন লোপেজ দে গোমারার পরিবারে ক্রীতদাস ছিলাম। পণ্ডিতের বাড়ি। শুনে শুনে আর লুকিয়ে-চুরিয়ে পড়াশুনা করে তাই একটু শিখেছি। কিন্তু আর আপনি দেরি করবেন না ডন কর্টেজ। গির্জেয় গিয়ে লুকোন তাড়াতাড়ি। বাইরে কেউ আপনাকে দেখলেই এখন বিপদ।

ফিরে গির্জের বাগানে ঢুকতে গিয়েও কর্টেজ কিন্তু আবার ঘুরে দাঁড়ালেন।

কি হবে ওই গির্জের মধ্যে চোরের মত লুকিয়ে থেকে? কর্টেজ বললেন ক্ষোভ আর বিরক্তির সংগে,—কতদিন বা ওভাবে লুকিয়ে থাকতে পারব? আর যদি বা পারি, ছুঁচোর মত গর্তে লুকিয়ে বাঁচার চেয়ে ফাঁসিকাঠে ঝোলাও ভালো।

ভরসা দেন তো এই অধম একটা কথা নিবেদন করতে পারে।—লোকটি বিনীতভাবে বললে।

কি কথা?—কর্টেজ এবার মনিবের মেজাজেই কড়া গলায় বললেন।

লোকটি তবু না ভড়কে বললে—ছুঁচোর মত গর্তে লুকিয়ে বাঁচবার মানুষ সত্যিই তো আপনি নন। ডন জুয়ান দে গ্রিজাল ভা এই সবে পশ্চিমের কুবেরের রাজ্যের সন্ধান পেয়ে ফিরেছেন, শুনেছেন নিশ্চয়। কিউবার শাসনকর্তা মহামহিম ভেলাসকেথ সেখানে আর একটি নৌ-বহর পাঠাবার আয়োজন করেছেন। এ নৌ-অভিযানের ভার নেবার উপযুক্ত লোক আপনি ছাড়া কে আছে সারা স্পেনে।

খুব তো গাছে চড়াচ্ছ! তিক্ত স্বরে বললেন কর্টেজ,—হাতে পায়ে বেড়ি দিয়ে যে আমায় ফাঁসিতে লটকাতে চায়, সেই ভেলাসকেথ আমায় এ ভার দেবার জন্যে হাত বাড়িয়ে আছে বোধহয়!

হাত তিনি সত্যিই বাড়াবেন ডন কর্টেজ।—বললে লোকটি,—শুধু একটি ভুল যদি আপনি শোধরান।

কি ভুল শোধরাব?—গরম হয়ে উঠলেন কর্টেজ।

লোকটি কিন্তু অবিচলিত। ধীরে ধীরে বললে,—ডোনা ক্যাটালিনাকে আপনি বিয়ে করুন ডন কর্টেজ। তিনি শুধু যে আপনাকে প্রাণ দিয়ে ভালবাসেন তা নয়, তাঁর মত গুণবতী মেয়ে সারা স্পেনে খুব কম আছে। তাঁর

কথা ভেবে তার খাতিরেই আপনাকে আমি উদ্ধার করেছি।

সাহস তো তোর কম নয়!—লোকটার আস্পর্ধায় তুই-তোকারি করে ফেললেও একটু যেন নরম ভাবিত গলাতেই বললেন কর্টেজ,—আমি কাকে বিয়ে করব না করব তাও তুই উপদেশ দিতে আসিস!

দুই

গরু যার ডাক-নাম সেই ক্রীতদাস গানাদোর পরামর্শই কিন্তু শুনেছিলেন ডন হার্নান্ডো কর্টেজ। তার বরাতও ফিরেছিল তাহতে। ডোনা ক্যাটালিনা জুয়ারেজকে বিয়ে করে আবার শুধু ভেলাসকেথের সুনজরেই তিনি পড়েননি, নেতৃত্বও পেয়েছিলেন কুবেরের রাজ্য খুঁজতে যাবার নৌবহরের।

ক্রীতদাস গানাদোকে তিনি ভোলেননি। স্ত্রী ক্যাটালিনার অনুরোধে জুয়ারেজ পরিবারের কাছ থেকে তাকে কিনে নিয়ে সংগী অনুচর করে নিয়ে গিয়েছিলেন তাঁর অ্যাজটেক রাজ্য বিজয়ের অভিযানে।

সে অভিযান এক দীর্ঘ কুৎসিত কাহিনী।

গানাদোর কাছে তা বিষ হয়ে উঠেছিল শেষ পর্যন্ত। স্প্যানিয়ার্ডদের নৃশংস বর্বরতা দেখে যেমন সে স্তম্ভিত হয়েছিল, তেমনি হতাশ হয়েছিল অ্যাজটেক্‌দের ধর্মের পৈশাচিক বীভৎস সব অনুষ্ঠান দেখে। তাদের নিষ্ঠুরতম দেবতা হলেন হুইট্‌জিলপচ্‌লি। জীবন্ত মানুষের বুকে ছুরি বসিয়ে তার হৃৎপিণ্ড ছিঁড়ে বার করে তাঁকে নৈবেদ্য দিতে হয়। এ নারকীয় অভিযান থেকে ফিরে যেতে পারলে গানাদো তখন বাঁচে।

কিন্তু ফেরা আর তার হতো না! হিতকথা বলেই একদিন সে কর্টেজের প্রিয়পাত্র হয়েছিল। সেই হিতকথাই আবার গানাদোর সর্বনাশ ডেকে এনেছিল একদিন।

কর্টেজ-এর স্প্যানিশ বাহিনীর তখন চরম দুর্দিন।

স্পেনের সৈনিকদের অমানুষিক অত্যাচারে সমস্ত টেনচ্‌টিট্‌লান তখন ক্ষেপে গিয়ে তাদের অ্যাক্‌সিয়াক্যাট্‌ল-এর প্রাসাদে অবরুদ্ধ থাকতে বাধ্য করেছে। টেন্‌চ্‌টিট্‌লান নূতন মহাদেশের ভেনিস। শহরের চারিধার হ্রদে ঘেরা। কর্টেজ কোনো মতে তাঁর বাহিনী নিয়ে এ দ্বীপ-নগর থেকে বেরিয়ে পালাবার জন্যে ব্যাকুল। কিন্তু তার উপায় নেই। অ্যাজটেক্‌দের আগ্নেয়াস্ত্র নেই, ইস্পাতের ব্যবহার তারা জানে না, তারা ঘোড়া কখনো আগে দেখেনি, কিন্তু তাদের তীর-ধনুক ব্রঞ্জের বল্লম তলোয়ার আর ইঁট-পাটকেল নিয়ে সমস্ত নগরবাসী তখন মরণ-পণ করেছে বিদেশী শাদা শয়তানদের নিঃশেষ করে দেবার জন্যে। অ্যাক্‌সিয়াক্যাট্‌ল-এর প্রাসাদ থেকে কারুর এক পা বাড়াবার উপায় নেই।

এই বিপদের মধ্যে স্পেনের সৈনিকদের মধ্যেই আবার কর্টেজ-এর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র পাকিয়ে উঠেছে। তার নেতা হলো অ্যান্টোনিও ভিল্লাফানা নামে এক সৈনিক।

প্রাসাদের একটি গোপন কক্ষে গানাদো ভিল্লাফানার দলের এ চক্রান্তের

আলোচনা একদিন শুনে ফেলেছে। কিন্তু কর্টেজকে এসে সে খবর দেবার আগেই তাকে ধরে ফেলেছে ভিল্লাফানা।

ক্রীতদাস গানাদোর কাছে তো আর অস্ত্রশস্ত্র নেই। অ্যান্টোনিও ভিল্লাফানা তাকে সোজা এক তলোয়ারের কোপেই সাবাড় করতে যাচ্ছিল। কিন্তু গানাদো যে কর্টেজ-এর পেয়ারের অনুচর তা মনে পড়ায় হঠাৎ তার মাথায় শয়তানি বুদ্ধি খেলে গেছে।

সঙ্গীদের কাছ থেকে একটা তলোয়ার নিয়ে তার দিকে ছুঁড়ে দিয়ে বলেছে,—নে হতভাগা কালা নেংটি, তলোয়ার হাতে নিয়েই মর।

তলোয়ার নিয়ে আমি কি করব হুজুর!—ভয়ে ভয়েই যেন বলেছে গানাদো, —আমার মত গোলাম তলোয়ারের কি জানে!

তবু হাতে করে তোল হতভাগা!—পৈশাচিক হাসি হেসে বলেছে অ্যান্টো-নিও—গোলাম হয়ে আমার ওপর তলোয়ার তুলেছিস বলে তোকে উচিত শিক্ষা দিয়েছি বলবার একটা ওজর চাই যে।

নেহাত যেন অনিচ্ছায় ভয়ে ভয়ে তলোয়ারটা তুলে নিয়েছে গানাদো। অ্যান্টোনিও তলোয়ার নিয়ে এবার তেড়ে আসতেই ভয়ে ছুটে পালিয়েছে আর একদিকে।

কিন্তু পালাবে আর কোথায়! হিংস্র শয়তানের হাসি হেসে বেড়ালের ইঁদুর ধরে খেলানোর মত তলোয়ার ঘুরিয়ে কিছুক্ষণ তাকে নাচিয়ে বেড়িয়ে মজা করেছে অ্যান্টোনিও ভিল্লাফানা। তারপর হঠাৎ বেকায়দাতেই বোধহয় গানাদোর তলোয়ারের একটা খোঁচায় তার জামার আস্তিন একটু ছিঁড়ে যাওয়ায় ক্ষেপে উঠেছে অ্যান্টোনিও। এবার আর ইঁদুর খেলানো নয়, একেবারে সোজাসুজি ভবলীলা শেষ গানাদোর।

কিন্তু অ্যান্টোনিওর সংগীরা হঠাৎ থ হয়ে গেছে।

এ কি সেই ক্রীতদাস গানাদোর আনাড়ি ভীরু হাতের তলোয়ার! এ যেন স্বয়ং এল্ সিড্ কম্পিয়াডর আবার নেমে এসেছেন পৃথিবীতে তাঁর তলো-য়ার নিয়ে।

ইঁদুর নিয়ে বেড়ালের খেলা নয়, এ যেন অ্যান্টোনিওকে বাঁদর-নাচ নাচানো তলোয়ারের খেলায়।

প্রথম অ্যান্টোনিও-র জামার আর একটা আস্তিন ছিঁড়ল। তারপর তার আঁটসাঁট প্যান্টের খানিকটা, মাথার টুপিটার বাহারে পালকগুলো তারপর গেল কাটা, তারপর একদিকের চোমরানো গোঁফের খানিকটা।

সংগীরা তখন হাসবে না কাঁদবে ভেবে পাচ্ছে না।

অ্যান্টোনিও ভিল্লাফানা ছুটে বেড়াচ্ছে এদিক থেকে ওদিক তলোয়ারের খোঁচা বাঁচাতে।

হঠাৎ একটি মোক্ষম মারে অ্যান্টোনিওর হাতের তলোয়ার সশব্দে পড়ে গেছে মাটিতে। আর সেই সংগে বজ্রহুংকার শোনা গেছে,—থামো।

চমকে সবাই ফিরে তাকিয়ে দেখেছে, কর্টেজ নিজে এসে সেখানে দাঁড়িয়ে-ছেন তাঁর প্রহরীদের নিয়ে।

অগ্নিমূর্তি হয়ে তিনি গানাদোকে বলেছেন,—ফেলো তোমার তলোয়ার। এতবড় তোমার স্পর্ধা, স্পেনের সৈনিকের ওপরে তুমি তলোয়ার তোলো!

ও স্পেনের সৈনিক নয়,—তলোয়ার ফেলে দিয়ে শান্ত স্বরে বলেছে গানাদো,—ও স্পেনের কলংক। আপনার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছিল গোপনে। তা ধরে ফেলেছি বলে আমায় হত্যা করতে এসেছিল। তলোয়ার ধরে তাই ওকে একটু শিক্ষা দিচ্ছিলাম।

না, ডন কর্টেজ।—অ্যান্টোনিও এবার হাঁটু গেড়ে বসে পড়েছে কর্টেজের পায়ের কাছে,—বিশ্বাস করুন আমার কথা। আপনার পেয়ারের ক্রীতদাস বলে ধরাকে ও সরা দেখে। আমাকে এই এদের সকলের সামনে যা-নয়-তাই বলে অপমান করেছে। আমি তাতে প্রতিবাদ করি বলে, আমাদের একজনের তলোয়ার খাপ থেকে তুলে নিয়ে আমার ওপর চড়াও হয়।

চড়াও হওয়াটা কর্টেজ নিজের চোখেই দেখেছেন। তার সাক্ষ্যপ্রমাণের দরকার নেই।

অ্যান্টোনিও খাস বনেদী ঘরের ছেলে না হলেও তারই নীচের ধাপের একজন 'হিড্যালগো'। তার ওপর সামান্য একজন ক্রীতদাসের তলোয়ার তোলা ক্ষমাহীন অপরাধ।

রাগে আগুন হয়ে অ্যান্টোনিওর কথাই বিশ্বাস করে কর্টেজ গানাদোকে বেঁধে নিয়ে যেতে হুকুম দিয়েছেন। ক্রীতদাসের বিচার বলে কিছু নেই। এ অপরাধের জন্যে সেদিনই যে তার মৃত্যুদণ্ড হবে একথাও কর্টেজ জানিয়েছেন তৎক্ষণাৎ।

হিড্যালগো আর প্রহরীরা তাকে বেঁধে নিয়ে যাবার সময় গানাদো এ দণ্ডের কথা শুনে একটু শুধু হেসে বলেছে,—প্রাণদণ্ডটা আজই না দিলে পারতেন ডন কর্টেজ! তাতে আপনাদের একটু লোকসান হতে পারে।

আমাদের লোকসান হবে তোর মত একটা গরু ভেড়া মরে গেলে!—কর্টেজ একেবারে জ্বলে উঠেছেন এতবড় আস্পর্ধার কথায়।

গানাদো কিন্তু নির্বিকার ধীর স্থির গলায় বলেছে,—হ্যাঁ, সে ক্ষতি আর হয়তো সামলাতে পারবেন না। বিশ্বাসঘাতক ভিল্লাফানার শয়তানি আজ না হোক, একদিন নিশ্চয় টের পাবেন, কিন্তু ততদিন পর্যন্ত আপনার এ বাহিনী টিঁকবে কি? আমায় আজ মৃত্যুদণ্ড দিলে উদ্ধারের উপায় যা ভেবেছি, বলে যেতেও পারব না।

কর্টেজ-এর রাগ তখন সপ্তমে উঠেছে। সজোরে গানাদোর গালে একটা চড় মেরে তিনি প্রহরীদের বলেছেন,—নিয়ে যা এই গরুটাকে এখান থেকে। নইলে নিজের হাতটাই নোংরা ক'রে বসব এইখানেই ওকে খুন করে!

তিন

হাত নোংরা না করুন, প্রায় হাত জোড়ই করতে হয়েছে কর্টেজকে সেই-দিনই গানাদোর কাছে তার কয়েদঘরে গিয়ে।

কর্টেজ আর তার অ্যাক্সিয়াক্যাট্ল-এর প্রাসাদে বন্দী সৈন্যদলের অবস্থা তখন সঙ্গীন। প্রাসাদে খাবার ফুরিয়ে এসেছে। খবর এসেছে যে, দ্বীপ-নগর টেনচ্টিট্লান থেকে বাইরের স্থলভূমিতে যাবার একটিমাত্র সেতুবন্ধ পথ

অ্যাজটেক্‌রা ভেঙে নষ্ট করে দিচ্ছে। প্রাসাদ-কারাগার থেকে বেরিয়ে অন্ততঃ লড়াই করে সে সেতুবন্ধের পথে যাবার একটা উপায় না করলেই নয়।

শুধু সেই জন্যেই কর্টেজ অবশ্য গানাদোর কাছে যাননি। একদিন যে তাঁর প্রাণ বাঁচিয়েছে, যার কাছে অনেক সুপরামর্শ পেয়ে বড় বড় বিপদ থেকে তিনি উদ্ধার পেয়েছেন, ক্রীতদাস হলেও তার প্রতি কৃতজ্ঞতাটা মন থেকে একেবারে মুছে ফেলতে পারেননি। কিছুটা অনুশোচনাতেও কর্টেজ তাঁর মেক্সিকো-অভিযানের দোভাষী ও নিত্যসঙ্গিনী মালিঞ্চে ওরফে মারিনাকে নিয়ে গেছেন গানাদোর কাছে।

কর্টেজ নিজে প্রথমে কিছু বলতে পারেননি। মালিঞ্চেই তাঁর হয়ে বলেছে, —আমার কথা বিশ্বাস করো গানাদো। হার্নান্ডো তোমার এ পরিণামে সত্যি মর্মাহত। কিন্তু ক্রীতদাস হয়ে মনিবের জাতের কারুর বিরুদ্ধে হাত তোলার একমাত্র শাস্তি মৃত্যুদণ্ড রদ করবার ক্ষমতা তাঁরও নেই। শুধু স্পেনের জন্যে মস্ত বড় কিছু যদি তুমি করতে পারো, তাহলেই কর্টেজ শুধু প্রাণদণ্ড মকুব নয়, দাসত্ব থেকেও তোমায় মুক্তি দিতে পারে সম্রাটের প্রতিনিধি হিসাবে।

হ্যাঁ, বলো গানাদো,—কর্টেজ এবার ব্যাকুলভাবেই বলেছেন,—আমাদের এ সংকট থেকে বাঁচবার কোন উপায় যদি তোমার মাথায় এসে থাকে এখুনি বলো। তা সফল হলে শুধু নিজেদের নয়, তোমাকে বাঁচাতে পেরেই আমি বেশী খুশী হব। বলো কি ভেবেছ?

ভেবেছি,—বলে গানাদো এবার যা বলেছে কর্টেজ বা মালিঞ্চে কেউই তা বুঝতে পারেনি।

এ আবার কি আওড়াচ্ছ? অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করেছে মালিঞ্চে,—তুক-তাকের মন্ত্র নাকি?

না,—একটু হেসে বলেছে গানাদো,—ডন কর্টেজকে আমি ছেলেবেলায় শেখা একটা কথা বললাম। বললাম—তোমায় রথ দেখাব বলেই ভেবেছি, রথও দেখবে কলাও বেচবে।

সত্যি রথই দেখিয়েছে গানাদো। রথের মত কাঠের মোটা তক্তায় তৈরী দোতলা সাঁজোয়া গাড়ি। সে ঢাকা সাঁজোয়া গাড়ির দুই তলাতেই বন্দুক নিয়ে থাকবে সৈনিকেরা। নিজেরা কাঠের দেওয়ালের আড়ালে তীর বল্লম আর ইঁট-পাটকেলের ঘা বাঁচিয়ে নিরাপদে বন্দুক ছুঁড়তে পারবে শত্রুর ওপর। এই কাঠের সাঁজোয়া গাড়ির নামই হলো মান্টা।

সেই মান্টা না উদ্ভাবিত হলে কর্টেজ আর তার মুষ্টিমেয় বাহিনী সেবার দ্বীপ-নগর টেনচ্‌টিট্‌লান থেকে পালিয়ে প্রাণ বাঁচাতে পারত না। নতুন আবিষ্কৃত আমেরিকা মহাদেশের ইতিহাসই হয়তো পাল্টে যেত।

কর্টেজ নিজের কথা রেখেছিলেন। গানাদোকে দাসত্ব থেকে মুক্তি দিয়ে দামী দামী বহু উপহার সমেত সম্রাটের সওগাত বয়ে নিয়ে যাবার জাহাজেই স্পেনে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন।

পাঠাবার আগে দাসত্ব থেকে মুক্তিপত্র লিখে দেবার সময় জিজ্ঞাসা করে-ছিলেন,—এখন তুমি মুক্ত স্বাধীন মানুষ গানাদো। বলো কি নামে তোমায় মুক্তিপত্র দেব? কি নেবে তুমি পদবী?

নাম আমার নিজের দেশের ছেলেবেলায় দেওয়া ঘনরামই লিখুন,—বলে-

ছিলেন গানাদো,—আর আমার বংশ যদি ভবিষ্যতে থাকে তাহলে এ ইতিহাস চিরকাল স্মরণ করাবার জন্যে পদবী দিন দাস।

ঘনশ্যাম দাস থামতেই ঈষৎ ভ্রূ কুঞ্চিত করে জিজ্ঞাসা করলেন মর্মরের মত মস্তক যাঁর মসৃণ সেই শিবপদবাবু,—কিন্তু এ ইতিহাস আপনি পেলেন কোথায়? আপনার আদিপুরুষ সেই গানাদো, খুড়ি ঘনরাম বাংলায় পুঁথি লিখে গিয়েছিলেন নাকি?

হ্যাঁ, পুঁথিই তিনি লিখে গেছলেন। ঘনশ্যাম দাস একটু বাঁকা হাসির সঙ্গে বললেন,—তবে সে পুঁথি দেখলেও আপনি পড়তে পারবেন না। নাম এক হলেও 'ধর্মমঙ্গল' লিখে যিনি রাঢ়ের লোককে এক জায়গায় একটু বিদ্রূপ করে গেছেন, ইনি সে ঘনরাম নয়। বাংলায় নয়, দেশে ফেরবার আগে প্রাচীন ক্যাষ্টিলিয়ানেই তিনি তাঁর পুঁথি লিখে গেছলেন। ফ্যাল্যানজিস্টরা স্পেনের গৃহযুদ্ধের সময় ধ্বংস করে না দিলে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষদিকে বিখ্যাত পণ্ডিত মুনোজ তাঁর অক্লান্ত চেষ্টায় যেখান থেকে ফ্রানসিসক্যান ফ্রায়ার বার্নাদিনো দে সাহাগুনের অমূল্য রচনা হিস্টোরিয়া ইউনিভার্সাল দে নুয়েভা এসপানা, মানে নূতন স্পেনের বিশ্ব-ইতিহাসের পাণ্ডুলিপি উদ্ধার করেন, স্পেনের উত্তরে টলোসা মঠের সেই প্রাচীন পাঠাগারেই এ পুঁথি পাওয়া যেত।

এত জায়গা থাকতে টলোসা মঠে কেন, আর ফ্র্যাল্যানজিস্টরা যত মন্দই হোক, হঠাৎ একটা নির্দোষ মঠের পাঠাগার ধ্বংস করবার কি দায় পড়েছিল তাদের, জিজ্ঞাসা করতে গিয়েও শিবপদবাবু নিজেকে সংবরণ করলেন বুদ্ধিমানের মত। রাত যথেষ্ট হয়েছে।

সম্পাদক মহাশয়
সমীপেষু,

দেবতোষ চৌধুরীর উপন্যাসটি আমায় সমালোচনা করতে দিয়েছিলেন। অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি, এ-বইয়ের সমালোচনা করা আমার দ্বারা সম্ভব হ'ল না। আপনার অনুরোধ রাখতে পারলাম না বলে মার্জনা করবেন।

বইটি ফেরত পাঠাচ্ছি। কিন্তু সেই সঙ্গে কেন এ-বইটি সম্বন্ধে কিছু লিখতে আমি অনিচ্ছুক তাও না জানিয়ে পারছি না।

দেবতোষবাবু অল্প দিনের মধ্যেই বাংলা-সাহিত্যে যাকে আমাদের ভাষায় বলে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছেন। তাঁর বই বেরুতে না বেরুতে সংস্করণ শেষ হয়ে যায় না বটে, কিন্তু রসিক ও বিদগ্ধ পাঠক মহল তাঁর লেখার জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে থাকেন। গত তিন বছরে তাঁর তিনটি উপন্যাস বাংলা সাহিত্যে যে একটা আলোড়ন সৃষ্টি করেছে একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়। তাঁর চতুর্থ উপন্যাস 'কালো জল' বিজ্ঞাপিত হওয়ার পর থেকে আমিও তাই অন্যান্য বহু অনুরাগী পাঠকের মত উৎসুক হয়ে প্রতীক্ষা করেছি। কিন্তু বইটি আদ্যোপান্ত পড়ে সত্যি কথা বলতে গেলে হতাশ ঠিক নয়, কেমন যেন বিমূঢ় হয়েছি।

এই বিমূঢ়তার কথা সমালোচনায় লেখা যায় না, অন্তত লিখতে ইচ্ছে করে না। তবু আপনি সহৃদয় ও বিবেচক জেনে আমার মনের বিহ্বলতার কারণগুলি আপনার কাছেই নিবেদন করছি। এ আলোচনা নেহাত ব্যক্তিগত-ভাবে আপনার কাছেই লেখা। আশা করি, কোনদিন তা প্রকাশ পাবে না।

'কালো জল' নামটি থেকেই শুরু করা যেতে পারে। সমস্ত বইটি পড়লে নামটির সার্থকতার হয়ত অনেকেই তারিফ করবেন। কিন্তু আমার মতে নামটির ইংগিত উপন্যাসটিকে একটু ভুল বোঝবার পথেই সাহায্য করেছে। 'কালো জল' বলতে দেবতোষবাবু নিয়তিই বোঝাতে চেয়েছেন এই ধারণাই হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু সেই ধারণাই উপন্যাসটির পক্ষে ক্ষতিকর বলে আমি মনে করি।

'কালো জলে' চরিত্রসংখ্যা কম নয়। তাদের সকলের কথা আলোচনা করতে চাই না, সময় বা দরকারও নেই। সুপ্রিয়, দিবা আর বাসব এই তিনটি চরিত্রের কথাই প্রধানত ধরা যায়, কারণ এই তিনজনই মনের উপর দাগ কেটে যায় সবচেয়ে বেশী।

তিনটি চরিত্র। তার মধ্যে দু'জন পুরুষ ও একজন নারী। কিন্তু সাধারণত যাকে ত্রিকোণ কাহিনী বলে 'কালো জল' তা নয়। এই তিনজনের সম্বন্ধের জটিলতা প্রেমের সে মামুলি ছকে পাতা বোধ হয় বলা চলে না।

দিবাকে প্রথমেই একটি পরিচ্ছন্ন সুখের সংসারের মধ্যেই দেখি। বেশ একটু সাচ্ছল্যের গৃহস্থালী। মনে হয়, কোনদিকে কোন দুর্ভাবনা বুঝি এদের জীবনে নেই। দেবতোষবাবুর এইখানেই মুন্সিয়ানা। ছোট ছোট তুচ্ছ ঘটনা ও

ছবি দিয়ে তিনি আমাদের মুগ্ধ করে কখন যে মসৃণতার মাঝে চিড় খাওয়া দাগগুলো দেখিয়ে দিয়ে গেছেন আমরা হঠাৎ একসময়ে বুঝতে পেরে অবাক হয়ে যাই। কিন্তু নেহাতই সূক্ষ্ম তুচ্ছ চিড়। সুপ্রিয় আর দিবার হৃদয়-সম্পর্কের মধ্যে তার কোন লক্ষণ নেই। আছে বুঝি শুধু ভীরু আশা, ছোট সুখের বেষ্টনীতে নিজেদের ঘিরে রাখার দুর্বলতার মধ্যে। জানলার পর্দাগুলো কেমন একটু বেমানান হয়েছে। ঘরে ঢুকলেই দিবার আফসোস হয়। দোকান-দারের খোশামুদিতে ভুলে কেন যে সেদিন হট্ করে কিনে আনল! এখন আর ফেরত দেবারও উপায় নেই।

ঘরে ঢুকে দিবাকে ভুরু কুঁচকে সেদিকে তাকাতে দেখেই সুপ্রিয় হেসে বলে, "আচ্ছা, এখনো তোমার মনের খুঁতখুঁতুনি গেল না!"

'না'--দিবার মুখটা কেমন করুণই দেখায়। "মনে হয় যেন ঘরটা নিজের নয়!"

"তুমি এক কাজ কর বাপু!" সুপ্রিয় হেসে ওঠে আবার, "ও পর্দাগুলো ফেলে নতুন পর্দা কিনে নিয়ে এস!"

কিন্তু সে পরামর্শও দিবার ভালো লাগে না। সে পর্দা নিয়ে খুঁতখুঁত করবে তবু অপব্যয় মনে করে নতুন পর্দা কিনতে রাজী হবে না। মনের মধ্যে এই সামান্য খচখচে কাঁটাটা পুষে রাখাতেই তার চরিত্রের ইঙ্গিত কি দেবতোষ-বাবু দিয়েছেন?

শুধু পর্দা নয় আরো দু-একটা বিষয় আছে, যেমন গানের স্কুলের কমিটির ব্যাপারটা।

দিবা এ বছর সে কমিটিতে থাকতে চায়নি। কিন্তু কমিটির হোমরা-চোমরা চাঁইদের একান্ত অনুরোধও এড়ান সম্ভব হয়নি তার। নেহাত অনিচ্ছায় শেষ পর্যন্ত স্বীকৃতি জানিয়েছে।

সুপ্রিয় অফিস যাবার জন্যে তৈরী হচ্ছে। দিবা বেঁধে দিচ্ছে টাইটা। এ কাজটা বরাবর তাকেই করতে হয়। সুপ্রিয় বোধহয় এই মধুর সেবাটুকু উপ-ভোগ করবার জন্যেই ইচ্ছে করে টাই বাঁধতে কয়েকবার গোলমাল করে তার আনাড়িপনা প্রমাণ করে রেখেছে।

চাকর একটা কার্ড এনে দেয় দিবার হাতে। গানের স্কুলের কমিটি মিটিং-এর নোটিস।

দিবা সেদিকে একবার চোখ দিয়ে কার্ডটা চাকরের হাত থেকে নিয়ে ছেঁড়া কাগজের ঝুড়িতে ফেলে দেয় রাগ করে।

টাই বাঁধা হয়ে গেছে। ঘাড়টা দু-একবার নেড়ে সেটা যেন একটু আলগা করবার চেষ্টা করে সুপ্রিয়। সকৌতুক দৃষ্টিতে দিবার দিকে চেয়ে বলে,—"কি, কমিটি মিটিং বুঝি?"

"হ্যাঁ!" কোটটা পিছন দিক থেকে পরিয়ে দিতে দিতে দিবা বলে, "এক জ্বালা হয়েছে আমার!"

কোটটা পরার পর দিবার দিকে ফিরে এক হাতে তাকে জড়িয়ে আর এক হাতে তার চিবুকটা তুলে ধরে সুপ্রিয় বলে,—"তা এতই যদি জ্বালা মনে হয় ত একটি চিঠি দিয়ে চুকিয়ে দাও না ঝামেলা। ও কমিটিতে থাকবার দরকার কি?"

দিবার মুখের চেহারায় অসহায় একটা করুণ ভাব ফুটে ওঠে, "কিন্তু সুরপতিবাবু শোভনাদি অনিমা ওরা যে কিছুতেই ছাড়তে দেয় না।"

এই দ্বিধা ও দৃঢ়তার অভাবও বুঝি দিবার চরিত্রের একটা দিক।

অ্যাটাচিটা তুলে নিয়ে বেরিয়ে যাবার আগে সুপ্রিয় বলে,—"কিন্তু কমিটির ওপর এত বিদ্বেষই বা কেন তোমার? সময়টাও কাটে, কাজও কিছু করতে পারো।"

"ছাই কাজ! ও গানের স্কুল-টুল আজকাল আমার ভালোই লাগে না!"

সুপ্রিয় একটু সকৌতুক বিস্ময়েই তার দিকে তাকায়,—"সে আবার কি? নৌকোর জলে বিরাগ! গান নিয়েই ত তুমি পাগল!"

"গান নিয়ে পাগল হতে পারি কিন্তু এইসব স্কুল আমার দু চোখের বিষ। অলিতে গলিতে যেখানে যাও দু-পা অন্তর গানের স্কুল। গোটা জাতটা গান শিখেই যেন উদ্ধার হয়ে যাবে! আর কিছু কাজ নেই। আর শেখে ত কত! শুধু বিয়ের বিজ্ঞাপনের বাহার বাড়াবার ফিকির।"

দিবার সঙ্গে এরকম আলোচনা আগেও হয়েছে। সুপ্রিয় তাই আর তাকে ঘাঁটিয়ে তর্ক বাড়ায় না। "কিন্তু গানের স্কুল না থাকলে তোমায় পেতাম কোথায়?" বলে হেসে বেরিয়ে যায়।

দেবতোষবাবু আমাদের প্রায় অগোচরে গল্পের ক'টা সূত্র এইসব বর্ণনার মধ্যে রেখে গেছেন।

সুপ্রিয় ও দিবার এই আপাতমসৃণ দাম্পত্য জীবনের ছবিতে বিচক্ষণ পাঠক অবশ্য সম্পূর্ণ প্রতারিত হননি। তাঁরা বুঝেছেন, পুষ্পে কীট এখনো না থাক দেখা দেবেই।

বাসবই কি সেই কীট!

কিন্তু সে ভাবে সে দেখা দেয়নি। উপন্যাসের প্রায় মাঝামাঝি পর্যন্ত সে অনুপস্থিত। তার নাম পর্যন্ত একবার উল্লিখিত হয়নি।

তারপর গানের স্কুলেরই একজন শিক্ষক হিসাবে সে এসেছে। অত্যন্ত নগণ্য একজন শিক্ষক। এককালে বাংলা দেশের গানের জগতে তার নাম বুঝি একটু আধটু শোনা গিয়েছিল, তারপর অভাবে অত্যাচারে তার সমস্ত সম্ভাবনা গিয়েছে বিনষ্ট হয়ে। কমিটি গায়ক সমাজেরই কয়েকজনের সুপারিশে শিক্ষকতার ভার দেওয়ার নামে তাকে কিছু সাহায্য করতে স্বীকৃত হয়েছে।

সে কমিটির অধিবেশনে দিবাও ছিল। সে উৎসাহও যেমন দেখায়নি এ ব্যাপারে, তেমনি আপত্তিও নয়।

নিত্য তাদের কমিটি বসে না। স্কুলে স্বেচ্ছায় দিবা খুব কমই যায়। সুতরাং বাসবের সঙ্গে তার দেখাই হয় না বললে হয়।

হ'লে বাসবই কেমন একটু দীনভাবে আড়ষ্ট হয়ে থাকে। স্কুলে দিবার প্রতিপত্তি যে কত তা জানে বলেই বোধ হয়। বাসব সামান্য মাইনের শিক্ষক। দিবা হর্তাকর্তাদের একজন। বাসবের চাকরি বজায় রাখতে দিবার অনুগ্রহও প্রয়োজন।

দেখা দৈবাৎ হয়ে গেলে দু-চারটে কথা যে হয় না তা নয়।

দিবাই জিজ্ঞাসা করে আগে, "কেমন লাগছে স্কুল?"

"ভালো! খুব ভালো!" -বাসবের মুখের হাসি ও গলার স্বরে একটু

সম্ভ্রমই মেশানো। কিন্তু শুধু কি সম্ভ্রম? একটু যেন কেমন আশংকাও কি মনে হয় না?

হতে পারে। হয়ত সেইজন্যেই বাসব সাধ্যমত দিবার সামনে পড়তে চায় না। দিবাকে এড়িয়ে চলা এমন কিছু কঠিন নয়। ক'দিনই বা সে স্কুলে আসে।

বড় জোর কোনদিন কোথাও স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের বড় অনুষ্ঠান থাকলে কমিটির অন্য সকলের সংগে সব ব্যবস্থা একটু তদারক করবার জন্যে। তখন হয়ত বাধ্য হয়ে বাসবকে দেখা করতে হয়।

"তুমি—আপনি আমায় ডেকেছেন?"

দিবা বুঝি অনুষ্ঠানে যারা যোগ দেবে তাদের তালিকাটা দেখছিল। মুখ তুলে বলেছে—"ও, হ্যাঁ, আপনার ক্লাসের একটি মেয়ে ত জ্বর নিয়ে এসেছে। ওকে কি গাইতে দেওয়া উচিত হবে?"

"ওর কিন্তু দারুণ আগ্রহ। বলছে, ডাক্তারের মত নিয়ে এসেছে। গাইলে কিছু হবে না। তবে আপনি যা বলেন?"

দিবা হঠাৎ একটু ভ্রূকুটি করে বলেছে,—"বেশ, তাহলে গাইতে দিন।" এক মুহূর্ত চুপ করে বাসব চলে যাবার উপক্রম করতেই আবার একটু কঠিন স্বরেই বলেছে,—"আমায় আপনি বলবেন না!"

বাসব উত্তর দেবার অবকাশ পায়নি। পরিচালক সমিতির আরেকজন ঘরে ঢুকেছেন। বাসব অত্যন্ত অপ্রস্তুত হয়েই বেরিয়ে গেছে ঘর থেকে।

কয়েকটা এমনি ঘটনায় আমরা বুঝেছি, বাসব দিবার অপরিচিত নয়।

দেবতোষ চৌধুরী কয়েক পাতা পরেই পরিচয়ের বিবরণও জানিয়ে দিয়েছেন।

বাসবের কাছেই দিবার প্রথম গান শেখা শুরু।

কিন্তু সেটা এমন কিছু মনে রাখবার মত ব্যাপার নয়। বাসবের পর আরো অনেকের কাছেই দিবা শিক্ষা পেয়েছে। তাদের কেউ কেউ দেশবিখ্যাত গুণী।

বাসবের প্রতি পাঠক হিসাবে তেমন মনোযোগ তাই দিইনি। ঔপন্যাসিকও তাঁকে কাহিনীর নেপথ্যে পাঠিয়ে দিয়েছেন তারপর।

দিবা আর সুপ্রিয়র দাম্পত্য জীবনের কাহিনীতেই আমরা মগ্ন হয়ে গেছি। সাধারণ স্বামী-স্ত্রীর জীবনযাত্রার ও হৃদয়সম্বন্ধের গল্প। কিন্তু দেবতোষ-বাবুর কলমের এইসব জায়গাতেই বাহাদুরী। সে গল্প তিনি মামুলি হ'তে দেন নি। প্রতিদিনের তুচ্ছ বিবরণ অপ্রত্যাশিত সব বিস্ময়-দীপ্তিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে। দুটি মানুষ যে পরস্পরের কাছে দুটি অজানা রহস্যের দ্বীপ, পদে পদে সেখানে যে আবিষ্কারের উত্তেজনা, অভাবিতের বিস্ময়বিমূঢ়তা তা আমরা গভীরভাবেই বোঝবার সুযোগ পেয়েছি।

মনে হয়েছে, সুপ্রিয় আর দিবা বুঝি তাদের আবেগের আন্তরিকতায় নিরাপদ স্বাচ্ছন্দ্যের সুলভ সন্তোষ অতিক্রম করে যাবে।

নিয়তিও তাদের জীবনের মূল ধরে নাড়া দিয়েছে এবার। একটি মৃত সন্তান প্রসব করে দিবা প্রায় জীবন-মৃত্যুর সীমান্ত থেকে ফিরে এসেছে।

বিশ্বাস করুন, এর পরই দেবতোষবাবুর লেখা কেমন যেন বিভ্রান্ত করে দিয়েছে আমাকে। তাঁর সুদৃঢ় সুনিপুণ কলমে যেন কী দুর্বোধ খেয়াল ভর করেছে। পাঠকের সমস্ত মন প্রতি মুহূর্তে বিদ্রোহ করলেও কিন্তু তাঁকে

অনুসরণ না করে পারে না। তিনি দুর্বার বেগে তাকে টেনে নিয়ে যান এই ক'টি মন্থর মামুলি জীবনের প্রচণ্ড আকস্মিক আবর্তের দিকে।

দিবা একটু কি বদলে গেছে জীবনের এই প্রথম শোকের আঘাতে? একটু অস্বাভাবিক গাম্ভীর্য ছাড়া কিছুতে তা বোঝা যায় না।

দিবা সেই দুঃসহ স্মৃতিকে আমল না দেবার জন্যেই বোধ হয় নিজেকে নানা কাজের মধ্যে ডুবিয়ে রাখবার চেষ্টা করে। যে স্কুল তার দু চক্ষের বিষ হয়ে উঠেছিল সেখানে সে আজকাল প্রতিদিন যায় বিভিন্ন কাজের ভার নিয়ে।

বাসবের সংগে তার দেখা হয় প্রায় রোজই।

'কালো জল' থেকে একটি সাক্ষাতের বিবরণ এখানে না তুলে দিয়ে পারছি না।

বাসব বুঝি একলা বসে সেতারের তার বাঁধছিল। দিবা ব্যস্তভাবে এসে ঘরে ঢুকল।

"শোভনাদি এঘরে আসেন নি!"

প্রশ্নের উত্তরটা নিজের চোখের দেখাতেই পেয়ে দিবা চলে যাচ্ছিল। কিন্তু দরজার কাছে গিয়ে আবার কি ভেবে থমকে দাঁড়াল, তারপর ফিরে এল একেবারে বাসবের কাছে।

"আমায় দেখলে আপনি এমন জড়সড় হয়ে থাকেন কেন?"—একটা প্রচ্ছন্ন জ্বালা শুধু তার গলার স্বরে নয় চোখের দৃষ্টিতেও। "সহজ হয়ে কথা বলতে পারেন না?"

বাসব মুখ তুলে তাকাল। তার মুখে একটা অসহায় অস্বস্তি।—"না, সহজভাবেই ত কথা বলি!"

"না, বলেন না!"—দিবার স্বর অত্যন্ত কঠিন। "কিন্তু জড়সড় হবার আপনার ত কিছু নেই।"

বাসব কেমন বিপন্নভাবে চুপ করে রইল।

দিবা-ই আবার তীব্রস্বরে বললে,—"আপনার কোন ক্ষতি করব এই আপনার ভয়? করলে আগেই করতে পারতাম। এখানে আপনি জায়গা পেতেন না।"

এরকম আলাপ আরও আছে।

এক জায়গায় দেখছি দিবা বলছে,—"যারা অমানুষ হয়, তাদের তবু একটা লোকদেখানো সাহসের আস্ফালন থাকে। আপনার তাও নেই! আপনি কিলবিলে একটা পোকার বেশী কিছু ন'ন।"

দিবার এইসব অদ্ভুত আচরণের ও কথার কোনো মানে কেউ পাবে বলে মনে হয় না।

গ্রন্থকার তাকে ক্রমশ আরো দুর্বোধ করে তুলেছেন।

অফিসের পর বাড়ি এসে সুপ্রিয় একদিন বিমূঢ় হয়ে গেছে। অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করেছে,—"এ আবার কি খেয়াল দিবা?"

খেয়াল সত্যিই অদ্ভুত। দিবা নিজের আলাদা শোবার ঘরের ব্যবস্থা করেছে।

সুপ্রিয়র মনে যাই হোক, মুখে একবার সে প্রতিবাদ করেছে মাত্র। তার-

পর আর কিছু বলেনি।

বলেনি অনেক কিছুতেই, অনেকদিন পর্যন্ত।

একদিন বাড়ি ফিরে বাসবকে দেখেছে বাইরের ঘরে। অত্যন্ত সংকুচিত অপরাধীর মত বসে আছে। বাসব সুপ্রিয়র একেবারে অপরিচিত নয়।

সামান্য একটা দুটো সাধারণ আলাপ হয়েছে। বাসব তারপর চলে গেছে।

সুপ্রিয় আজও হয়ত কিছু বলত না। কিন্তু এতক্ষণে দিবার মুখের চেহারা সে লক্ষ্য না করে পারেনি। সে মুখের ভাব বোঝা অবশ্য কঠিন। যন্ত্রণা না আক্রোশ না অন্য কিছুতে তা অমন বিবর্ণ কঠিন জানবার উপায় নেই।

"কি জন্যে এসেছিল বাসব?" যথাসম্ভব সহজ গলায় সুপ্রিয় জিজ্ঞাসা করেছে, "কিছু চাইতে বোধ হয়?"

দিবা কেমন অদ্ভুতভাবে সুপ্রিয়র দিকে তাকিয়েছে। উত্তর দেয়নি।

সুপ্রিয় আবার বলেছে,—"চাইলেই বেশী কিছু দিও না। লোকটা স্বভাব-দোষেই শুনেছি নিজের সর্বনাশ করেছে। গলাটলা ত সব গেছে। অভাবে পড়ে আর তোমাদের ওখানে চাকরির দায়ে খানিকটা সামলে আছে। টাকাকড়ি বেশী পেলেই আবার মদ জুয়ায় ওড়াবে।"

"বাসব টাকা চাইতে আসে নি! আমিই তাকে ডেকে পাঠিয়েছিলাম।" বলে দিবা তৎক্ষণাৎ ঘর থেকে বেরিয়ে গেছে।

স্তব্ধ হয়ে সুপ্রিয় ঘরে একটা চেয়ার ধরে দাঁড়িয়ে থেকেছে অনেকক্ষণ।

নিরাপদ একটি শান্তি ও তৃপ্তির নীড়। কী অপরাধে কার শাপে তা এমন করে ভেঙে যাচ্ছে!

দিবা আর সুপ্রিয় একই বাড়িতে বাস করে, কিন্তু বহু যোজনের ব্যবধান যেন ক্রমশ বেড়েই চলেছে।

গানের মত বেশভূষার সংযত শৌখীনতাও দিবার জীবনের একটি প্রধান নেশা ছিল। দিবা সে সমস্ত পরিত্যাগ করে নিতান্ত সাধারণ পোশাক ছাড়া কিছু পরে না।

অফিস যাবার সময় সুপ্রিয় গলার টাইটা নিয়ে যেন বিব্রত হয়ে সেদিন বলেছে, "কি গোলমাল করে ফেললাম। দাও না একটু বেঁধে।"

"আয়নার সামনে গিয়ে বাঁধো ঠিক হয়ে যাবে।"—দিবার কন্ঠস্বর যেন যান্ত্রিক।

"তবু তুমিই দাও না আজ বেঁধে? কতদিন ধরে নিজে বাঁধছি বলো তো?"

"নিজে যখন পারো তখন আমার বাঁধবার দরকার কি?"—আলোচনাটায় জোর করে দাঁড়ি টানবার জন্যেই দিবা ঘর থেকে চলে গেছে।

তারপর সেই রাত্রি।

নিঃসঙ্গ ঘরে অনেক রাত পর্যন্ত বিনিদ্র হয়ে পায়চারি করে সুপ্রিয় হঠাৎ ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছে। মৃদুভাবে ঘা দিয়েছে দিবার ঘরের বন্ধ দরজায়।

দিবাও তখন জেগে আছে বোঝা গেছে। দুবারের বেশী তিনবার ঘা দিতে হয়নি।

দিবা কিন্তু 'কে' যেমন জানতে চায়নি, তেমনি দরজাও খোলেনি। দরজার ওধার থেকে ক্লান্ত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করেছে, "কি চাও?"

"দরজাটা খোলো দিবা।"—কি সকাতর মিনতি সুপ্রিয়র গলার স্বরে।

কয়েক মুহূর্তের নীরবতার পর দিবা দরজা খুলেছে।

তারপরও খানিকক্ষণ দুজনেই স্তব্ধ হয়ে দুজনের দিকে তাকিয়ে।

সুপ্রিয় হঠাৎ হাতটা বাড়িয়ে প্রায় রুদ্ধ কণ্ঠে বলেছে—"এসো!"

দিবা সরে দাঁড়িয়েছে তৎক্ষণাৎ,—"না, তুমি তোমার ঘরে যাও।"

"কেন? কেন এমন অবুঝ হয়েছ দিবা! কি আমার অপরাধ?"

"অপরাধ। অপরাধ তোমার কেন হবে!" দিবার কণ্ঠ ক্লান্ত কাতর কিন্তু অত্যন্ত দৃঢ়, "কিন্তু আমাকে তুমি চেও না। স্পর্শ করবার চেষ্টাও কোরো না। তাহলে—আমায় আত্মহত্যা করতে হবে।"

দিবার ঘরের যেটুকু আলো বাইরে এসে পড়েছে তাইতেই দেখা গেছে সুপ্রিয়র মুখ ছাই-এর মত শাদা।

"কি বলছ তুমি দিবা! কেন এমন করে যে-স্বর্গ আমরা তৈরী করে তুলতে পারতাম, তা ভেঙে দিচ্ছ নিষ্ঠুর হয়ে? পরস্পরকে আমাদের যে একান্ত দরকার দিবা। আমাকে নিজেকে এমন করে অন্যায় শাস্তি দিও না!"

"এ শাস্তি আমার পাওনা।" দিবার গলা থেকে নয়, যেন অতল অন্ধকার কোন গহ্বর থেকে কথাগুলো উঠে এসেছে।

"তোমার পাওনা!"—বিমূঢ়ভাবে খানিক চুপ করে থেকে সুপ্রিয় ক্লান্ত কণ্ঠে বলেছে, "কি তোমার গ্লানি আমি জানি না দিবা। যদি কিছু থাকেও তবু তোমাকে আজ আমি যেমনভাবে যতটুকু পেয়েছি তাই আমার কাছে সব। আজকের দিনের আলোয় কাল রাতের অন্ধকার কেন তুমি টেনে আনছ? নিজেকে শাস্তি দিতে গিয়ে আমায় কি যন্ত্রণা দিচ্ছ তা কি একবার ভাবছ না!"

"ভাবছি, ভাবছি, সারাক্ষণই ভাবছি!"—দিবার স্বর এবার বুঝি একটু তীক্ষ্ন হয়ে কেঁপে উঠেছে,—"তোমায় যন্ত্রণা আর আমি দেব না। আমি চলে যাবো।"

"চলে যাবে! কোথায়? কেন?"—একটা হঠাৎ আর্তনাদের মত শোনাল সুপ্রিয়র কথাগুলো।

"কোথায় জানি না, কেন জিজ্ঞাসা কোরো না, কিন্তু যেতে আমায় হবেই। আর—যাবো ওই বাসবের সঙ্গে।"

সমস্ত বাড়িটাই নিস্পন্দ পাথর হয়ে গেছে।

সেই পাথরের নিস্পন্দতায় আর একটা শব্দ যেন আছড়ে পড়ল,—"সেই আমার চরম পুরস্কার।"

কি ভাবছেন সম্পাদক মশাই? কি আপনি বুঝেছেন?

আমি কিন্তু বিমূঢ়।

কি বলতে চেয়েছেন লেখক?

দেহের শুচিতা নিয়ে উন্মত্ত অবাস্তব তন্ময়তাও রুগ্ন মনের একরকম বিলাস?

বিবেকও অর্থহীন উপদ্রব হতে পারে কখনো কখনো?

যত বড় স্খলনই হোক তার অনুশোচনায় মাত্রাহীন আত্মনিপীড়নের চেয়ে জীবনের দাবী অনেক বড়?

না, সম্পাদক মশাই, এ উপন্যাস সমালোচনা করবার ভার নিতে আমি অক্ষম। আবার মার্জনা চাইছি।

বি দে শি নী

মেয়েটিকে অনেকক্ষণ ধরেই লক্ষ্য করেছি।

এমনিতে বিশেষভাবে লক্ষ্য করবার কথা নয়। যেখানে পথে-ঘাটে সুন্দরী না হোক সুশ্রী সুঠাম মেয়ের ছড়াছড়ি, সেখানে আলাদা করে চোখে পড়বার মত চেহারা মেয়েটির নয়।

বয়সটা অবশ্য অল্প। গড়নটাও পাতলা একহারা সুঠামই বলা উচিত। যৌবনের সেই আবেদনটুকু থাকলেও দেহসৌষ্ঠবে কি সাজ-পোশাক-প্রসাধনে উগ্র মোহিনী আকর্ষণ কিছু নেই। রংটা অবশ্য ফর্সা, কিন্তু এদেশে যার সব চেয়ে কদর সেই সোনালী চুল আর নীল চোখের কাগুজে সাদা 'ব্লন্ড' নয়, ব্রুনেট। চুলটা একটু লালচে আর চোখের তারা নীলের বদলে ফিকে বাদামী।

বর্ণনা থেকেই বোঝা যাবে যে বেশ একটু খুঁটিয়েই মেয়েটিকে লক্ষ্য করেছি এবং ক্ষণিকের দেখায় নয়, বেশ কিছুক্ষণের দীর্ঘ পর্যবেক্ষণে।

সে সুযোগও অবশ্য মিলেছিল।

একই ট্রেনের কামরায় লম্বা ঘন্টা-কয়েকের পাড়ি একসঙ্গে দিতে হয়েছিল।

যাচ্ছিলাম ব্রাসেলস থেকে উত্তর সমুদ্রের ধারের একটি শহরে। শহরের নাম কনক। সেখানে একটি সম্মেলনে যোগ দেবার নিমন্ত্রণ পেয়েছিলাম।

ইয়োরোপের ইলেকট্রিক ট্রেন চাপার সুযোগ সেই প্রথম। করিডর ট্রেন অবশ্য, তবে আমাদের চেয়ে এমন কিছু আহামরি নয়। শুধু গুড়ের নাগরী ঠাসা ভিড় যেমন নেই, তেমনি বসবার আসনের গদি কাটা কি ইলেকট্রিক বাল্‌ব লোপাট করা নয়।

ছোট একটি কিউবিক্‌লে মুখোমুখি আমাদের আসন। ট্রেন যে দিকে যাচ্ছে মেয়েটি সেই দিকে মুখ করে ডাইনের জানলার ধারে তার সঙ্গীর পাশে বসেছে। আমি আমাদের ব্রাসেল্‌সের এমব্যাসীর নতুন আলাপী এক সহচরের সঙ্গে বসেছি উল্টো মুখ করে।

কামরায় আমরাই শুধু যাত্রী নয়। আর যাত্রী জনচারেক ছিল, তাদের মধ্যে দুটি আবার যাত্রিনী এবং চেহারা-পোশাকের চটকে মনোহারিকা বলা যেতে পারে।

তবু যে জানলার ধারের প্রায়-সাধারণ ঈষৎ অনুজ্জ্বল মেয়েটির দিকেই গোড়া থেকে বেশী করে চোখ পড়েছিল তার কারণ একটু অদ্ভুত।

মেয়েটি নয়, তার সঙ্গীই এ বিশেষ আকর্ষণের প্রধান হেতু।

রূপসী না হোক মেয়েটি ছিমছাম সুশ্রী তরুণী। তার সঙ্গীটি কিন্তু কদাকার অষ্টাবক্র এক বামন।

আমার সহচর ভার্গব তো গাড়িতে উঠে বসার খানিক বাদেই নিজের অভদ্র কৌতুকটা আর চাপতে না পেরে আমার কানে কানে বললে—বিউটি অ্যান্ড দ্য বীস্ট চাক্ষুষ দেখছেন?

চাপা গলায় ভার্গবকে ভর্ৎসনা করে বললাম—চুপ! চুপ! শুনতে পাবে।

পেলেও কিছু বুঝবে না।—ভার্গব হেসে জানাল—ফরাসীরা ইংরাজী

বোঝে নাকি!

বুঝুক না বুঝুক মেয়েটি ভার্গবের হাসির জন্যেই আমাদের দিকে তখন একবার তাকাতে অত্যন্ত অপ্রস্তুত বোধ করলাম।

অস্বস্তির সংগে নিজের মুখটা কিছুক্ষণ জানলার দিকে ফিরিয়ে রাখতে হল, কিন্তু বেশীক্ষণ কৌতূহলটা দমন করে রাখতে পারলাম না।

খানিক বাদে আবার যখন মুখ ফেরালাম তখন মেয়েটি তার বামন সাথীর সংগে কি একটা উত্তেজিত আলোচনায় মত্ত।

উত্তেজনাটা সেই বামনটির। সে বেশ একটু জোর দিয়ে কি একটা কথা যেন মেয়েটিকে বলছে। আর মেয়েটি বেশ একটু ব্যাকুলভাবে তাকে বুঝিয়ে শান্ত করবার চেষ্টা করছে।

মেয়েটি ইংরাজী বোঝে কিনা জানি না, আমি কিন্তু একবর্ণ ফরাসী জানি না। মেয়েটি যে তার সংগীকে বুঝিয়ে শান্ত করবার চেষ্টা করছে তা তাদের আলাপ শুনে বুঝিনি। বুঝেছি মেয়েটির মুখের ভাব আর হাতের সঞ্চালন দেখে।

বামনটি যত উত্তেজিত হয়ে উঠছে মেয়েটি তত কাতরভাবে মুখেই শুধু তাকে বোঝাচ্ছে না, বামনের একটি হাত নিজের দু-হাতের মধ্যে নিয়ে আদর করে প্রায় চটকাচ্ছে বলা যায়।

দৃশ্যটা একটু অস্বাভাবিক সন্দেহ নেই। বিলেত হলে এ দৃশ্য দেখার কথা কল্পনাই করা যায় না বোধহয়। ফরাসীরা ইংরেজদের চেয়ে ঢের খোলা-মেলা হলেও এরকম একটা প্রকাশ্য উচ্ছ্বাস বড় একটা দেখা যায় না।

কৌতূহল ও বিস্ময় দুই-ই সত্যি অত্যন্ত প্রখর হয়ে উঠেছে এবার।

এই বামন আর মেয়েটি স্বামী-স্ত্রী?

এ তো আমাদের দেশের সাবেকী আমল নয় যে মেয়েদের ধরে-বেঁধে সামাজিক মর্যাদা কি টাকার খাতিরে যার-তার হাতে গছিয়ে দেওয়া যায়! ও-রকম একটা কুৎসিত কদাকার মানবকে ওই সুশ্রী তরুণী মেয়েটি কেন বিয়ে করেছে?

স্বামী-স্ত্রী যদি না হয় তাহলে সম্বন্ধটা নিছক প্রেমিক-প্রেমিকার ছাড়া আর কিছু হতে পারে না এবং সেটা আরও অস্বাভাবিক ও অবিশ্বাস্য।

এই সব কথা ভাবতে ভাবতে একটু তন্ময় হয়েই মেয়েটিকে লক্ষ্য কর-ছিলাম, হঠাৎ চমকে উঠলাম।

মেয়েটি আচমকা অমন সোজা আমার দিকে মুখ তুলে তাকাবে তা ভাবতে পারিনি। মুখের দিকে শুধু নয়, তাকানোটা একেবারে চোখে চোখে।

হতভম্ব ও অপ্রস্তুত হয়ে আমি তখন নিজের মুখটা ফেরাতে পর্যন্ত ভুলে গেছি।

কিন্তু আমার অভদ্র চাউনির কঠোর তিরস্কারস্বরূপ যে ভ্রূকুটি-কুটিল জ্বলন্ত কটাক্ষ আশংকা করেছিলাম, তা কই!

আমারই কি মনের ভুল?

মেয়েটির মুখে-চোখে চকিতে যা মুহূর্তের জন্যে ফুটে উঠল তা কি একটু হাসির আভাস?

আমার আগে মেয়েটিই তার মুখ ফিরিয়ে নিয়ে বামন সংগীকে আবার

বোঝাতে ব্যস্ত হয়ে উঠল।

এতক্ষণে যেন হুঁশ ফিরে পেয়ে দেখি ভার্গব আমাদের দিকে চেয়ে মিটমিট হাসছে।

হাসতে হাসতে মুখের একটা মজার ভঙ্গি করে সে চাপা গলায় এবার হিন্দীতে বললে—বেশ রস পেয়েছেন মনে হচ্ছে?

তার কথায় যদি বেয়াড়া ইঙ্গিত কিছু থাকে সেটা লক্ষ্য না করে সত্য কথাটাই স্বীকার করলাম—হ্যাঁ, একটু অবাক লাগছে সত্যিই। মেয়েটির ব্যবহারে একটা সত্যিকারের টানই তো দেখা যাচ্ছে।

সত্যিকারের টান!—ভার্গব হাসল—ওই হাত চটকানো দেখে ভাবছেন? ওটুকু না করলে যে ডাহা ফাঁকি দেওয়া হবে। কড়ি যে ফেলছে তাকে একটু তেল না মাখালে চলে?

তার মানে এটা সম্পূর্ণ ভান—গলাটা একটু তীক্ষ্মই হয়ে গেল আপনা থেকে।—মেয়েটি শুধু পয়সাকড়ির লোভে ওই বামনকে বিয়ে করেছে বা ওর সঙ্গে আছে?

আপনিই ভেবে দেখুন না, এ সম্পর্কের আর কি মানে হতে পারে?—ভার্গব আমার দিকে চোখ মটকে বললে।

তার কথাগুলো যত খারাপই লাগুক, তা খণ্ডন করবার মত যুক্তি সত্যিই খুঁজে পেলাম না।

ট্রেনে তিন-চার ঘণ্টায় বেশ ভাল করে লক্ষ্য করবার সুযোগ পেলেও মেয়েটি সম্বন্ধে স্পষ্ট কোন ধারণা করতে পারিনি। শেষ পর্যন্ত সে স্মৃতিতে একটা চিরন্তন জিজ্ঞাসার চিহ্ন হয়েই থাকবে বলে মেনে নিয়েছিলাম।

কনকে পৌঁছবার আগেই একটা স্টেশনে তারা নেমে যায়।

নামবার সময় কদাকার ওই আড়াই হাত বামনের পাশে দীর্ঘাঙ্গী মেয়েটিকে আরও যেন করুণ ও বিসদৃশ লেগেছিল। সেই সঙ্গে আরেকটা যা প্রতিক্রিয়া হয়েছিল তা একেবারে অপ্রত্যাশিত। বসে-থাকা অবস্থায় যা ভাল বোঝা যায়নি, দাঁড়িয়ে উঠে চলে যাবার ছন্দিত চলার ভঙ্গিতে মেয়েটির সেই তন্বী সুঠাম দেহের আকর্ষণ আরও অনেক স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল।

মেয়েদের কারুর সৌন্দর্য মুখে, কারুর সমস্ত শরীরে। কারুর যথার্থ রূপ আবার গতিছন্দে ছাড়া সম্পূর্ণ ফুটে ওঠে না।

এ মেয়েটির তাই। চেহারা, গড়ন ওপর-ওপর দেখতে এমন কিছু আহা-মরি না হলেও সমস্ত শরীরের সামঞ্জস্য তার এমন যে সাধারণ সহজ পদচারণা-তেই একটা মাধুর্য ও জৈব আকর্ষণ যেন তরঙ্গিত হয়।

ভার্গব এদেশে বহুকাল আছে, সৌন্দর্য-রসিকও আমার চেয়ে অনেক বেশী। মেয়েটিকে বামনের সঙ্গিনী হিসেবেই যা একটু কৌতুক-ভরা মনোযোগ সে এতক্ষণ দিয়েছে। মেয়েটি সম্বন্ধে আলাদাভাবে কোন উৎসাহ তার ছিল না।

মেয়েটি নামবার সময় কিন্তু লক্ষ্য করলাম দু-চোখে যেন সার্চলাইট জেলে ভার্গব মেয়েটিকে দেখছে।

করিডর দিয়ে তারা চোখের আড়ালে চলে যাবার পর মুখে একটা অস্ফুট

শিসের আওয়াজ বার করে ভার্গব বললে—কি দেখলাম বলুন তো! এ যে সদ্য 'ব্যালে'র মঞ্চ থেকে নেমে এসেছে মনে হচ্ছে! আর ওই উর্বশীর পাশে ওই শিম্পাঞ্জি!

আক্ষেপটা শেষ করে দু-এক মুহূর্ত যেন গুম হয়ে রইল ভার্গব। তারপর নিরুপায় হতাশার নিশ্বাস ছাড়বার ভান করে বললে—একটা বিকৃত যৌন নির্বাচন বলে ভাবতে পারলেও মনটা ঠাণ্ডা থাকত। কিন্তু সে-সব কিছু নয়। স্রেফ চাঁদির খেলা। ওই বামনটা কিম্‌বার্লি মাইন্‌সের পৈতৃক শেয়ার-টেয়ার পেয়েছে নিশ্চয়, কিংবা সাহারায় পেট্রোলের খনি।

হেসে বললাম—কিম্‌বার্লির হীরে কি সাহারার পেট্রোলের খনির হিস্‌সা-দার হলে আমাদের সংগে এ ট্রেনে যাবে কেন? রোল্‌স্‌ রয়েস ক্যাডিল্যাক নেই?

শখ! খেয়াল!—বলে ভার্গব ব্যাপারটা ঠাট্টা করে উড়িয়ে দিলে।

কনক শহরের ক্যাসিনো আমাদের সম্মেলনের ঘাঁটি।

কনক পেঁছবার পর প্রথম দিন কোন প্রোগ্রাম না থাকায় ঘুরেটুরে বেড়িয়েছি।

দ্বিতীয় দিন সকালে সাধারণ অধিবেশনে গিয়ে বেশীর ভাগই অনুবাদহীন ফরাসী বক্তৃতা শুনে ধৈর্যের পরীক্ষা দিতে দিতে এদিকে-ওদিকে প্রতিনিধি-দের লক্ষ্য করেছি। দু বছর অন্তর এ বিশ্ব-সম্মেলনের আয়োজন বেলজিয়মই করে। পৃথিবীর প্রায় সমস্ত অঞ্চল থেকেই নির্বাচিত প্রতিনিধিরা নিমন্ত্রিত হয়ে আসেন।

অলসভাবে সমবেত সকলের ওপর চোখ বুলিয়ে যেতে যেতে চমকে উঠেছি হঠাৎ। আমি যে সারিতে বসে আছি তারই দু সারি পেছনে প্রায় দেয়ালের কাছে ট্রেনের সেই মেয়েটিই বসে আছে।

শুধু মেয়েটিকে ওখানে দেখেই চমকে উঠিনি, আরও অবাক হয়েছি তার দিকে চোখ পড়ার পর দূর থেকে হাত তুলে আমায় নীরব সম্ভাষণ জানানোতে।

এ সভায় মেয়েটিকে দেখবার কথা সত্যি কল্পনাও করিনি। মেয়েটি কি তাহলে কবি নাকি! তার শরীরের বাঁধুনি আর চলার ছন্দ দেখে ব্যালে-নর্তকী বলেই তো মনে হয়েছিল। তার সংগী সেই বামনটিই বা কোথায়? এ সম্মেলনে তাকে সংগে আনতে লজ্জা হয়েছে বুঝি?

আধ ঘন্টা বাদে অধিবেশন শেষ হবার পর একসংগে অনেকগুলো ভুল ভাঙল। সভা-ঘর থেকে বেরিয়ে বাইরের হল-ঘরে তখন বেশ কয়েকটা জটলা জমেছে। প্রতিনিধিরা ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে দাঁড়িয়ে নিজেদের মধ্যে আলাপ-পরিচয় করছেন।

ছোট একটা দলে আমিও আটকে পড়েছিলাম। কথা বলতে বলতে দেখি মেয়েটি আমাদের জটলার কাছেই দাঁড়িয়ে আছে। তার দাঁড়াবার ও তাকাবার ধরনে আমাকেই কিছু যেন সে বলতে চায় মনে হল। এ তো আশাতীত ভাগ্য। আমিই যখন মেয়েটির সংগে কোনরকমে একটু যোগাযোগের উপায় ভাবছি, তখন নিজে থেকে সে আমার সংগে আলাপ করতে আসবে ভাবতেই পারিনি।

কিন্তু তার পাশে ওই তো সেই বাঁটকুল বামন। লোকটা তাহলে সভাঘরেই

ছিল। আড়াই হাত মাপের দরুন অন্য কারও আড়ালে চাপা পড়ে গিয়েছিল।

দল ছেড়ে বেরিয়ে এসে মেয়েটি ও তার বামন সঙ্গীর কাছে একটু দ্বিধা-ভরেই দাঁড়ালাম। মেয়েটি মধুর হেসে একটু নীরব আপ্যায়ন জানাল। সেই সঙ্গে বামনটিরও মুখে কেমন একটু সংকুচিত হাসি। কিন্তু শুধু কাছে দাঁড়িয়ে একটু হাসি বিনিময় করলেই তো হবে না। আমাদের পরস্পরের কথা বুঝিয়ে দেবার মত যেমন হোক একজন দোভাষী কোথায় পাই।

দোভাষীর দরকার হল না। কয়েক মিনিটের মধ্যেই অনেকগুলো ভুল একসঙ্গে ভাঙল।

প্রথমতঃ, মেয়েটি ইংরেজী জানে। কাজ চালানো গোছের নয়, বেশ ভাল-রকম। দ্বিতীয়তঃ সে নিজে কবি নয়, কবিতা লেখে তার বামন সঙ্গী, যার নাম পিয়ের রেনে গোছের কি যেন শুনলাম।। পিয়েরটুকু মনে আছে। তৃতীয়তঃ, সে পিয়েরের স্ত্রী নয়, সঙ্গিনী তথা সেবিকা গোছের কিছু, যা সে সেক্রেটারী বলে একটুও গৌরবান্বিত করতে চায় না। মেয়েটির নাম জানলাম ইভেৎ।

আমি ভারতবর্ষ থেকে এসেছি জেনে পিয়ের আমার সঙ্গে আলাপ করতে উৎসুক। ইভেৎ তাই তাকে নিয়ে এসেছে দুটো কথা বলবার জন্যে।

নিযে তো এসেছে কিন্তু কি বলা হবে, আর বলবেই বা কে! পিয়ের শুধু শরীরের বাঁকা দোমড়ানো আর যেন থাবড়ে ছোট-করা বামন নয়, তার বাক্-যন্ত্রও বুঝি জট-পাকানো। সামান্য দুটো কথা বলতে গিয়ে মুখ-চোখ লাল করে তোতলা হয়ে সে যা করলে তা করুণ হলেও প্রায় হাস্যকর কেলেঙ্কারি।

এমনিতেই ফরাসী জানি না, জানলেও পিয়েরের সে তোতলা গোটাকতক শব্দের জট থেকে কিছুই উদ্ধার করতে পারতাম না!

পিয়ের নিজের কথা বলতে গিয়ে হয়রান হয়ে থামবার পর ইভেৎ-ই তার বক্তব্যটা বুঝিয়ে দিলে।

পিয়ের আমার সঙ্গে ভাল করে আলাপ করবার জন্যে দুপুরে আমায় লাঞ্চে নেমন্তন্ন করতে চায়। দুপুরে লাঞ্চ যদি সম্ভব না হয় তাহলে সন্ধ্যার অধিবেশনের আগে তার সঙ্গে একটু চা খেলে সে বাধিত হবে। যে হোটেলে সে আছে জানাল তা আমার হোটেলের খুব কাছে।

কৌতূহল ও আগ্রহ থাকলেও দুঃখের সঙ্গে দু বেলার নিমন্ত্রণই প্রত্যা-খ্যান করতে হল। লাঞ্চ ও বিকেলের চায়ের নিমন্ত্রণ দু জায়গায় আগে থাকতেই নিয়ে বসে আছি।

তাহলে অন্ততঃ কাল দুপুরের লাঞ্চটা যদি আমাদের সঙ্গে খান।—ইভেৎ এবার পিয়েরের হয়ে নিজেই অনুরোধ জানালে।

সত্যিই পরের দিন দুপুরেও একটা ছবি দেখা আর খাওয়ার নিমন্ত্রণ নেওয়া ছিল বলে ইভেৎ-এর এ অনুরোধও রাখা সম্ভব হল না। বেশ একটু বিনয় করে সে কথা জানালাম।

যতক্ষণ সবিনয়ে কৈফিয়ত দিয়ে মার্জনা ভিক্ষা করছিলাম ইভেৎ কেমন একটা অদ্ভুত না-কৌতুক না-ক্ষোভের দৃষ্টিতে আমার দিকে চেয়ে ছিল। সব শুনে একটু হেসে বললে—না, না, আপনার দুঃখিত হবার কি আছে! আমাদেরই দুর্ভাগ্য।

এরপর বামন সঙ্গীকে নিয়ে ইভেৎ ক্যাসিনো থেকে বেরিয়ে চলে গেল।

শুধু বিসদৃশ জুটির জন্যে নয়, ইভেৎ-এর নিজের খাতিরেই অনেকেরই তার ওপর নজর পড়েছে দেখলাম। নারীদেহের লালিত্য কি লাস্য-বিচারে ফরাসীদের চেয়ে সেরা জহুরী আর কোন দেশে আছে বলে তো জানি না। নিছক জৈব যৌন আকর্ষণ তো সকলকেই নাড়া দিতে পারে, কিন্তু নারীদেহের আরও সূক্ষ্ম মোহিনী মায়ার রসিক সমঝদার সবাই নয়।

ইভেৎ-এর অনুরোধ রাখতে না পারার জন্যে বেশ একটু আফসোসের সঙ্গেই তার চলে যাওয়া লক্ষ্য করতে করতে ছুটে গিয়ে তাদের ধরব কি না ভাবছিলাম। ভাবছিলাম কোন একটা ছুতোয় কালকের অন্য নিমন্ত্রণটাই কাটিয়ে দিয়ে ইভেৎ-এর অনুরোধই রাখব না কেন?

ছুটে যাওয়া হল না।

আপনার জন্যে এবার তো ভাবনা হচ্ছে! শুনে চমকে ফিরে তাকিয়ে দেখি ভার্গব পাশে দাঁড়িয়ে চোখে-মুখে ভর্ৎসনার ভান নিয়ে হাসছে। ইভেৎ-এর দিকেই তন্ময় হয়ে চেয়েছিলাম বলে কখন সে ক্যাসিনোয় ঢুকে কাছে এসে দাঁড়িয়েছে, টের পাইনি।

ভার্গবের ঠাট্টার উত্তরে সেই সুরই ধরে বললাম—ভাবনা কেন বলুন তো? এমব্যাসী থেকে আমার পাসপোর্টের মেয়াদ বাড়াতে হাঙ্গামা হবে বলে?

না, অতদূর এখনও ভাবিনি।—ভার্গব হেসে ফেলে বললে, কিন্তু মেয়েটার মতলব ঠিক বুঝতে পারছি না। আপনার সঙ্গে নিজেই গায়েপড়া হয়ে আলাপ করল কি?

হ্যাঁ, তা করল।—সকৌতুকে স্বীকার করলাম—আজ কিংবা কাল লাঞ্চ খাবারও নিমন্ত্রণ করছিল।

না, ব্যাপারটা খুব গোলমেলে!—ভার্গব যেন সত্যি চিন্তিত হয়ে পড়ল —কিন্তু আপনাকে রাজা-মহারাজা মনে করবার তো কোন কারণ নেই।

যেন ক্ষুণ্ণ হয়ে বললাম—নেই নাকি! মতলবটা তাহলে কি হতে পারে?

সেইটেই তো বুঝতে পারছি না!—ভার্গব একেবারে গুরুগম্ভীর গলায় বললে, ও বামনটাকে বোধহয় ছোবড়া করে ছেড়েছে, এখন আপনার ঘাড়ে চেপে ভারতবর্ষটা ঘুরে আসতে চায়। কিন্তু তার আগে তো ডাইভোর্স-টাইভোর্সের নানা ঝামেলা আছে।

না, সে-সব নেই। এবার হাসতে হাসতে বললাম—মেয়েটি ও বামনের স্ত্রী নয়, একরকম নার্স-কম্প্যানিয়ন বলা যায়।

তাই নাকি!—ভার্গব এবার সত্যি অবাক—তবে হাত চটকানো দেখে মনে হচ্ছে নার্স-সঙ্গিনী থেকে অর্ধাঙ্গিনীতে পদোন্নতি হতে দেরি নেই। কিন্তু তাহলে আপনার ওপর এ টাঁক কেন? আমায় আবার আজই এমব্যাসী ফিরতে হচ্ছে। নইলে পাহারা দিতাম। যাই হোক, সাবধানে থাকবেন। ব্যাপারটা খুব সোজা নয়।

সোজা যে নয়, তা সেই দিনই খানিক বাদে বুঝলাম। দুপুরে যেখানে নিমন্ত্রণ ছিল সেখানে লাঞ্চ সেরে কনক-এর দোকান-পাড়ায় একটু ঘুরছিলাম। বাড়ি ও বন্ধু-বান্ধবদের জন্যে টুকিটাকি কিছু কিনে নিয়ে যাব এই উদ্দেশ্য।

একটা মনিহারী গোছের দোকানে ঢুকতে গিয়ে ইভেৎ আর পিয়েরকে ভেতরের কাউন্টারে দেখেই বেরিয়ে আসছিলাম, হঠাৎ ইভেৎ ফিরে তাকাল।

পিয়ের তখন অন্য দিকে মুখ করে কি সব জিনিস বাছতে ব্যস্ত। সে না করলেও ইভেৎ যে আমার ঢোকা সামনের বড় আয়নাতেই হয়তো লক্ষ্য করেছে, তা তার চোখের দৃষ্টিতেই বুঝলাম।

কিন্তু তার চোখে যা দেখলাম তা তো প্রায় অবিশ্বাস্য। চোখের ইশারায় স্পষ্টই সে আমায় বাইরে গিয়ে অপেক্ষা করতে বলছে। কি মানে এ ইঙ্গিতের!

যত বিস্মিত ও সন্দিগ্ধ হই, সুন্দরী মেয়ের এ ইশারার আদেশ উপেক্ষা করতে পারলাম না।

বাইরে কিছু দূরে গিয়ে দাঁড়িয়ে বেশীক্ষণ অপেক্ষা করতে হল না অবশ্য। এক মিনিট না যেতেই অত্যন্ত দ্রুত পায়ে দোকান থেকে বেরিয়ে ইভেৎ আমার কাছে এসে যা বললে তাতে আমি সত্যিই বিমূঢ়।

শীগগির আপনার হোটেলের নাম আর রুম নম্বরটা জানান।--যেন দাবি জানালে ইভেৎ।

আচ্ছন্নের মত তাই জানালাম।

আজ বিকেলের সেসনের পরেই যাব।—বলে ইভেৎ যেমন এসেছিল তেমনি দ্রুত পায়ে ছুটে চলে গেল।

কি উদ্বেগ, আশঙ্কা, সংশয় নিয়ে বিকেলের অধিবেশনের পর হোটেলে এসে যে অপেক্ষা করেছি তা বোঝানো সম্ভব নয়।

নিজের কামরায় অবশ্য নয়, অপেক্ষা করছিলাম নীচের হোটেললবিতেই।

কিন্তু তাতে কোন লাভ হল না।

ইভেৎ এল ঠিক সময়েই। এসেই জোর দিয়ে বললে—লবিতে নয় আপনার ঘরেই যেতে হবে, কিংবা অন্য কোন নির্জন জায়গায়।

রাত্রে বাইরে তখন উত্তর-সমুদ্রের কনকনে হাওয়া বইতে শুরু করেছে, নির্জন আলাপের জায়গা সেখানে এখন কোথায়।

নিজের কামরাতেই তাকে নিয়ে গেলাম।

কামরায় ঢুকে আমার অস্বস্তিটা অনুমান করে ইভেৎ একটু ঠাট্টার সুরে বললে—আপনি নেহাত বেরসিক মনে হচ্ছে। যেমনই হোক একটি মেয়ের ঘরে ঢোকা যেন বাঘ আসা মনে করছেন।

না, প্রতিবাদ একটু জানাতে হল—ঘরটা নেহাত ছোট কিনা। আয়াসে বসে আলাপ করবার উপযুক্ত নয়।

আমার খোঁড়া কৈফিয়তটা ইভেৎ গায়েই মাখল না এবার। হঠাৎ মুখখানা তার ব্যাকুল হয়ে উঠল। গাঢ় গভীর স্বরে বললে—আপনাকে আমার একটা কথা রাখতেই হবে।

ইভেৎ তখন কাতর মুখে আমার হাতটা ধরে ফেলেছে।

অত্যন্ত অবাক হয়ে বললাম—কি কথা বলুন, সম্ভব হলে নিশ্চয় রাখব।

আমার হাত ছেড়ে দিয়ে কামরার একটি মাত্র সোফায় বসে পড়ে ইভেৎ তার অনুরোধ এবার ধীরে ধীরে জানাল।

রাখা অসম্ভব সত্যিই এমন কোন অনুরোধ নয়। অতি সামান্য ব্যাপার। পিয়েরের কাছে ভারতবর্ষে গিয়ে নিজের ভাষায় অনুবাদ করব বলে তার কয়েকটা কবিতা আর তার ইংরেজি অনুবাদ আমায় চাইতে হবে। আমি যেন নিজের গরজেই চাইব। ইভেৎ যে আমার সঙ্গে দেখা করেছে বা আমায় অনু-

রোধ করেছে, তা যেন ঘৃণাক্ষরে না জানাই।

স্তব্ধ হয়ে বেশ খানিকক্ষণ ইভেৎ-এর দিকে চেয়ে থেকে বললাম—অনুরোধ নিশ্চয় রাখব। পিয়েরকে একটু সান্ত্বনা দিতে চান, তার ভেঙেপড়া আত্মাভিমান একটু খাড়া করে তুলতে—এই তো? কিন্তু পিয়ের কি সত্যি এ স্তোকে ভোলে?

বোধহয় না। মাঝে-মাঝে সব ছলনার বিরুদ্ধে বিদ্রোহে উন্মাদ হয়ে ওঠে। গাড়িতে তো দেখেছেন। ক্লান্ত স্বরে বললে ইভেৎ—কিন্তু আমি এইটুকু ছাড়া আর কি করতে পারি?

একটু চুপ করে থেকে বললাম—কিছু মনে করবেন না। আমি বিদেশী। দুদিন বাদে চলে যাব, জীবনে আর আপনার সঙ্গে দেখা হবে না। আমার একটা কৌতূহল যদি মেটান।

বলুন।—ইভেৎ করুণভাবে আমার দিকে চাইল।

আপনি কি পিয়েরকে ভালবাসেন?

অত্যন্ত অদ্ভুত ম্লান একটা হাসি ফুটে উঠল ইভেৎ-এর মুখে। বিষণ্ণ কৌতুকের সঙ্গে বললে—কাউকে ছেড়ে থাকতে না-পারা যদি ভালবাসা হয়, তাহলে বাসি।

তাহলে—একটু দ্বিধা করে বললাম—তাহলে ওকে বিয়ে করলেই তো পারেন!

না, পারি না,—একটু যেন কঠিন হয়ে উঠল ইভেৎয়ের মুখ—বিয়ে করলে দাবির দলিলে আমাদের সম্পর্কটা পরস্পরের কাছে বিভীষিকা হয়ে দাঁড়াবে। নিজেকে একটু দুর্বল করে রেখে তাই বাঁচার স্বাদ ওর মনে যতক্ষণ পারি একটু লাগিয়ে রাখতে চাই।

রোগব্যাধি থেকে শুরু করে সাংসারিক পারত্রিক যাবতীয় সমস্যার একটি অতি সরল সহজ এবং এক হিসেবে অত্যন্ত সুলভ ধন্বন্তরী জাতীয় মুশকিল-আসান দাওয়াই আছে।

অন্ততঃ আমাদের শিবুচন্দ্রের তাই ধারণা।

তা, শিবুকে বর্তমানে দেখলে সে ধারণার সমর্থনই সাক্ষাৎভাবে বোধহয় পাওয়া যায়।

সে শিবু যেন আরেক শিবু হয়ে গেছে।

আগে তো তার দেখা পাওয়াই দায় ছিল। ক্বচিৎ কদাচিৎ দেখা হলে তার কাঁদুনিই শুনতে হত শুধু। কাঁদুনি তার শরীর নিয়ে। আয়ুর্বেদশাস্ত্রে হেন অসুখ নেই যাতে সে ভুগছে না, আর কবিরাজী হকিমি য়ুনানী হোমিও-প্যাথিক অ্যালোপ্যাথিক দৈবিক আধিদৈবিক কোন চিকিৎসা করতে তার বাকি নেই। দেখা হলে সবচেয়ে আগে যা শুনতে হবে, তা অজ্ঞজনের কাছে তো প্রথমটা প্রহেলিকা।

আমার কাল কি ছিল জান?—করুণ স্বরে শিবু হয়তো জানায়, ষাট আর একশো দশ!

ষাট আর একশো দশ?—হতভম্ব হয়ে আমায় জিজ্ঞেস করতে হয়—কি ষাট আর কিসের একশো দশ? তোমার ব্যাঙ্ক-ব্যালান্স? দু ব্যাংকে টাকা রাখ বুঝি?

টাকা নয়, টাকা নয়;—শিবু বিরক্ত হয় আমার নির্বুদ্ধিতায়। ওর একটা হল ডায়স্টোলিক আর একটা সিস্টোলিক।

আমি এবার একটু সভয়েই শিবুর দিকে চাই। শরীর খারাপই তার ছিল, মাথাটাও তাই হল নাকি?

আমার চিন্তার গতিটা কিছু বোধহয় আন্দাজ করে শিবু এবার একটু ভর্ৎসনার সঙ্গে ব্যাখ্যা করে তার উক্তিটা।

তুমি একটি আকাট। সিস্টোলিক ডায়োস্টোলিক জান না? ও দুটো হল প্রেসারের নাম।

প্রেসারের নাম!—আমি তখনও বিমূঢ়। প্রেসারের নাম তো হয়েছে কি? তোমার সঙ্গে ও প্রেসারের কি সম্পর্ক?

সম্পর্ক এই যে,—শিবু এবার একটু ধৈর্য হারিয়ে বলে—ওতে আমি যে-কোন মুহূর্তে কোলাপ্স করতে পারি. আর একটু নামলেই সব খতম। ডাক্তাররা কি বলে জান?

ডাক্তাররা যা বলে সে সম্বন্ধে কিছুমাত্র উৎসাহ তখন আমার নেই। শিবুর হাত থেকে কোনরকমে পরিত্রাণ পাবার জন্যে আমি তাড়াতাড়ি বলি—এই তো শুনলাম কি বলে। কিন্তু ও সব সিসটিল্ড্ না ডিসটিল্ড্ গোছের বিদ্‌কুটে ডাক্তারী ওষুধ না খাওয়াই ভাল নয় কি?

ওষুধ নয়, ওষুধ নয় আহাম্মক!—শিবু এবার চটে ওঠে, ওগুলো হল প্রেসারের নাম। একটা নীচের দিকের আর একটা ওপরের। রক্তের চাপ জানো,

রক্তের চাপ?

তা আর জানি না!—এবার শিবুকে খুশী করবার মত বিদ্যার পরিচয় দিতে পারব বলে আশা করে উৎসাহভরে বলি—চাপ চাপ রক্ত তো বেশী কেটে গেলেই পড়ে।

না।—সে চাপের কথা বলছি না—শিবু ধমক দেয়। তারপর অনেক কিছুই সে ব্যাখ্যা করে বোঝায়।

তার কাছে শরীরতত্ত্ব ও চিকিৎসাশাস্ত্র সম্বন্ধে প্রচুর জ্ঞানলাভ করে যখন ছাড়া পাই তখন নিজেরই কাছের কোন ডাক্তারখানায় যাওয়ার দরকার আছে বলে মনে হয়।

সেই শিবু এখন একেবারে অন্য মানুষ।

এর আগে রাস্তায় কোথাও দেখা হবার পর তার ব্যাধি-বৃত্তান্ত তেমন মারাত্মক না হলেও তাকে এক এক দিন অতি কষ্টে কোন হোটেলে-রেস্তোরাঁয় টেনে নিয়ে যাওয়া যেত।

নেহাত অনিচ্ছাসত্ত্বেও গিয়ে আমার অন্ততঃ ডবল খাবারের সদ্ব্যবহার করলেও প্রতি মুহূর্তে নিজের সর্বনাশা অসংযম সম্বন্ধে আত্মধিক্কার দিয়ে যা সে বলত সে কঠোর আত্মসমালোচনা শুনতে শুনতে নিজের ঔদরিকতার ওপরই ঘৃণা নিয়ে বেরিয়ে হস্তাখানেক ভাল-মন্দ কিছু মুখে দিতেই বাধত।

সেদিন সন্ধ্যায় চৌরঙ্গিপাড়ায় একটু পাচক রসচর্চার অভিপ্রায়ে গিয়ে পার্ক স্ট্রীটের মোড়েই শিবুকে দেখে তাকে পাশ কাটাব কি না ভাবছি হঠাৎ শিবু নিজেই আমায় দেখে উৎসাহভরে চিৎকার করে উঠল—আরে, তুমি এ পাড়ায়?

তার এ সম্ভাষণে, পাড়াটা লজ্জাকর এমন কোন ইঙ্গিত আছে কি না যেমন ভাবতে হল, তেমনি বিস্মিতও হলাম সে সম্ভাষণের সরব উষ্ণ উচ্ছ্বাসে।

শিবুর গলায় প্রথম সম্ভাষণে এরকম আওয়াজ তো আগে শুনেছি বলে মনে পড়ে না।

কিঞ্চিৎ বিস্মিত হলেও আশ্বস্ত খুব হলাম না।

উচ্চগ্রামের আওয়াজটা হয়তো শারীরিক সুস্থতার লক্ষণ। তার ব্যাধি-পুরাণ হয়তো আজ আর শুনতে হবে না। কিন্তু তার সমস্যা তো শুধু শারীরিক নয়।

তার চেয়ে বড় সমস্যা শিবুর আত্মীয়-ঘটিত।

হ্যাঁ, শিবু নিজে ঝাড়া হাত-পা মানুষ। সংসারে আপনি আর কোপনি ছাড়া তার কিছু নেই। কিন্তু রীতিমত একটি ব্যাটেলিয়নের সমস্যায় সারাক্ষণ সে জর্জরিত। বিরাট একটি বাহিনীর ভাবনা তাকে ভাবতে হয়।

সে ভাবনা আবার স্বগত নয়। বন্ধুবান্ধব কাউকে ধরতে পারলেই সে ভাবনার সমুদ্র বুঝি উথলে ওঠে।

বন্ধুকে সবিস্তারে তখন প্রায় নতন গোটা একটা মহাভারতই শুনতে হয়।

আচ্ছা, তোমার ভালো একটা টেলারিং জানা আছে?

শিবুর উপক্রমণিকাটা এমনি নির্দোষ গোছের।

টেলারিং মানে দর্জির দোকান তা বুঝে নিয়ে অত আক্ষেপ ছাড়া পাবার

আশায় উৎফুল্ল হয়ে উঠি। শিবু জামা-টামা কিছু করাবার জন্যে দর্জির দোকান খুঁজছে মনে করে চটপট একটা দোকানের নাম-ঠিকানা তাকে দিয়ে ফেলি।

কিন্তু তারা কি অ্যাপ্রেন্টিস নেবে?—শিবু তখন বলতে শুরু করেছে,—নেনীটাকে দর্জির কাজই শেখাব ভাবছি। এমনিতে বিয়ে-থা কিছু হওয়া শক্ত। চেহারাটা মন্দ নয় তা তো দেখেইছ, কিন্তু রংটা যে তিন পোঁচ চুনকামেও চলনসই হবার নয়। আমাদের ছেলেরা যতই সব চালে বোলে আধুনিক হোক না, মনগুলো সেই মান্ধাতার আমলের ছাঁচে ফেলা। একচুল নড়চড় হয়নি। মেয়েটা এবার আবার ঠিক পরীক্ষার মুখেই জ্বরে পড়ল। আজকাল পাঁচদিনের জায়গায় সাতদিন জ্বর থাকলেই তো বলবে টাইফয়েড। তখন হেন করো, তেন করো, রক্ত পরীক্ষা করো, দিনে দশবার টেম্পারেচার নাও। হাজার ফ্যাচাং। ওব সেই জ্বরের সময় আবার রতনের পা-টা ভাঙল। রতনের পা ভাঙা মানে ওর কেরিয়ারই নষ্ট তা বুঝেছ তো! ওই পায়ের জোরেই ও যা-হোক করে খাচ্ছে। ওই পায়ের জোরেই চাকরি। পা ভেঙে যদি ফুটবল খেলাই ওর খতম হয় তাহলে ওকে চাকরিতে রাখবে কেন? পা-টা আস্ত রাখবার জন্যে কি হ্যাংগামাই না পোয়াতে হল! পা প্লাস্টার করাও, মাপে ছোট না হয়ে যায় তার জন্যে বেঁধে ঝুলিয়ে রাখো, আরো কত কি! দুখুটা যদি আমার কথা শুনে ডাক্তারি পড়ত, তাহলে কি আর আমার এ সব কিছু ভাবতে হয়! সেই তো সব দেখতে শুনতে পারত, তার বদলে গেল ব্যবসা করতে। বুঝেছ, ব্যবসা করা চারটিখানি কথা...

নেহাত এলোমেলো আবোলতাবোল মনে হচ্ছে? তা হতে পারে, কিন্তু কথাগুলোর ভেতরে গভীর অন্য একটা সম্বন্ধ আছে। সম্বন্ধটা শিবুর আত্মীয়তার। নেনী থেকে শুরু করে রতন দুখু, এরা সবাই হল শিবুর ভাগনে-ভাগনী। সগর রাজার নাকি ষাট হাজার সন্তান ছিল : ঠিক অত বা আপন সন্তান না হলেও শিবুকে একটু সময় দিলে ওরকম অন্ততঃ শ'খানেক ভাগনে-ভাগনীর নাম আপনা থেকেই তার আক্ষেপের মধ্যে লতায় পাতায় জড়িয়ে এসে পড়ত। শুনতে হত তাদের সকলেরই একেবারে হালের দুর্ভোগের কাহিনী, আর তাই নিয়ে শিবুর দুর্ভাবনা। দর্জির দোকানে অ্যাপ্রেন্টিস করার প্রস্তাব থেকে আবার নেনীর বিয়ের সমস্যায় ফিরে যেত শিবু এবং শেষ পর্যন্ত আমাকেও মনে ও মুখে স্বীকার করিয়ে ছাড়ত যে নেনীর উপযুক্ত পাত্রে বিয়ে না হওয়াটা আমার ব্যক্তিগত কর্তব্য-চ্যুতি শুধু নয়, একটা জাতীয় লজ্জা বলেও ধরে নেওয়া যায়।

শিবুর সঙ্গে দেখা হওয়া মানেই হয় তার ব্যাধি-বৃত্তান্ত, নয় ভাগিনেয়-ভাগিনেয়ী সংবাদ। এড়িয়ে পালাবার কোন উপায় না থাকায় শিবুর উৎফুল্ল আহ্বানে দাঁড়িয়ে পড়তে বাধ্য হলেও মুখের ওপর খুব একটা প্রসন্নতার আভা তাই বোধহয় ফোটাতে পারিনি।

কিন্ত শিবুর যে আমূল সংস্কার হয়ে গেছে তখন কি জানি!

আমার মুখের শুকনো কাতর ভাবটা স্রেফ চেপে-রাখা ক্ষিদেব বলে ধরে নিয়ে ক্ষুধাবর্ধক একটি প্রচণ্ড চাপড় আমার পিঠে মেবে সে বললে, কি রে! কোন-টাতে ঢুকবি ঠিক করতে পারছিস না বুঝি? এদিকে ক্ষিধের জ্বালায়

মুখ যে শুকিয়ে আমসি হয়ে গেছে! চল চল, এই সামনের শাহী মঞ্জিলটাতেই চল। মোগলাই পরোটা আর পাসিন্দা কাবাব যা দেয় তার আর জবাব নেই।

আমার মতামতের অপেক্ষা না করে হাত ধরে একরকম হিঁচড়াহিচড় করে টেনেই সে শাহী মঞ্জিলে গিয়ে ঢুকল। তারপর সেখানে একটা উপযুক্ত টেবিল সংগ্রহ করে অর্ডার যা দিলে তা শুনে আমি যেমন শঙ্কিত তেমনি একটু হতভম্বও।

শঙ্কাটাই আগে প্রকাশ করলাম,—আমার সঙ্গে কিন্তু বেশী কিছু নেই।

বেশী কিছু নেই!—শিবু যেন এমন আজগুবী কথা কখনো শোনেনি। সশব্দে হেসে উঠে বললে,—আরে চিবোবার দাঁত, চাখবার জিভ, আর পেটের খিদেটা আছে তো? তাহলেই হল। আজ সব খরচা আমার।

মুখব্যাদান করে তার দিকে খানিক চেয়ে থেকে বিহ্বলতার অন্য কারণটাও সসঙ্কোচে জানালাম,—কিন্তু মোগলাই পরোটা, পসিন্দা কাবাব আর ওই সব গুরুপাক বাদশাহী খানার অর্ডার দেওয়া কি ঠিক হল? তোর আবার সেই গ্যাসট্রিক আলসার না কিসের একটু লক্ষণ আছে বলিস?

বলি নয়, বলতাম। বর্তমান নয়, অতীত।—শিবু হাস্যধ্বনিতে সমস্ত শাহী মঞ্জিলকে সচকিত করে তুললে,—ভোরের কুয়াশা, কিংবা বলতে পার ছেলেবেলার কবিতা লেখার বাতিকের মত ওসব বালাই কবে ঘুচে গেছে।

কিন্তু তোমার ওই যে কি বলে ডিস্টিল সিস্টিল না কি?

ডিস্টিল সিস্টিল নয়।—শিবু আমায় সংশোধন করলে, ডায়স্টোলিক সিসটোলিক মানে প্রেসার। প্রেসার একেবারে স্বাভাবিক।

আর তোমার হার্ট? সেই যে থেকে থেকে যায় যায় হয়?

আর হয় না।—শিবু সগর্বে জানালে,—হার্ট এখন পুরোপুরি মজবুত। তা না হলে নেনীর বিয়ের এতবড় ব্যাপারটা একলা কাঁধে নিই!

নেনী মানে তোমার ভাগনী সেই নন্দিনীর বিয়ের কথা হচ্ছে বুঝি?—নন্দিনীর বিয়ে দেওয়া সম্বন্ধে শিবুর মুখেই যে সব হতাশ আক্ষেপ এ পর্যন্ত শুনেছি, তারই দরুন একটু বিস্ময়ের সঙ্গে প্রশ্নটা করলাম।

কথা হচ্ছে মানে? শিবু একটু ক্ষুন্ন হল,—বিয়ের পাকা দেখা পর্যন্ত হয়ে গেছে। অতবড় ঘরে বিয়ের কথা কি কোনদিন ভাবতে পেরেছিলাম! রতনের পা-টা দেখিয়ে পুরোপুরি সারার ব্যবস্থাও অবশ্য ওই সঙ্গে হয়ে গেল।

সামনে খাবারের প্লেটগুলো তখন আসতে শুরু হয়েছে। কিন্তু মাথায় যা জট পাকিয়েছে তা আগে না ছাড়ালে নয়। সেই জন্যেই জিজ্ঞাসা করলাম, রতনের পা-টা দেখে যিনি সারালেন তাঁর সঙ্গেই নেনী মানে নন্দিনীর বিয়ের সম্বন্ধ হল বুঝি?

না না, তাঁর সঙ্গে হবে কেন?—শিবু আমার বুদ্ধির জড়তায় একটু অধৈর্য প্রকাশ করলে,—তিনি তো হলেন...

শিবু সার্জন হিসাবে যাঁর নাম শোনালে, বাংলাদেশে শুধু নয় সত্যিই ভারতজোড়া তাঁর খ্যাতি।

তাহলে বিয়েটা ঠিক হল কার সঙ্গে?—এবার আমার বিমূঢ় জিজ্ঞাসা।

কার সঙ্গের চেয়ে, কোন্ বাড়িতে জিজ্ঞাসা কর—প্রশ্নটা বাতলে শিবু আবার তার জবাবে যে বাড়ির নাম করলে তা কলকাতা শহরে এক-ডাকে

চেনবার মত বললে ভুল হয় না।

তা এমন ভাল সম্বন্ধটা হল কি করে?—আমি সত্যিই বিস্মিত।

ওই যা করে রতনের ভাগ্যে অত বড় সার্জন জুটল আর সব বালাই ঘুচল আমার শরীরের! খাবারের প্লেটগুলোর ওপর মনোনিবেশ করে মুচকি হেসে বললে শিবু,—মুশকিল আসানের একই ফিকিরে!

একই ফিকিরে? আমি হতভম্ব হয়ে বললাম,—এক চালে তুমি তাজা হয়ে উঠলে, তোমার ভাগনীর বিয়ের ঠিক হয়ে গেল, আর তোমার ভাগনের ফুট-বলের পা গেল নিখুঁত মেরামত হয়ে? কি সে ফিকির?

ট্রাঙ্ক-কল!

ট্রাঙ্ক-কল?—হতভম্ব হয়ে শিবুর দিকে তাকালাম,—ফিকির হ'ল ট্রাঙ্ক-কল?

ট্রাংক-কল কখনও করেছ? উল্টো প্রশ্নে জবাব দিল শিবু,-হালে নিশ্চয় করনি। তাহলে শোন। একটি ট্রাঙ্ক-কল করতে যাও, তোমার সব সমস্যা যাবে ঘুচে। শুধু ধৈর্যটি ধরা চাই।

প্রথমে কল বুক করতে হবে,—শিবু বলে চলল,—গাইড দেখে তিনটে সংখ্যায় নম্বর ডায়াল করে করে তোমার আঙুল ব্যথা হয়ে যাবে। তাতে কখনও রিং পাবে, কিন্তু রিনিঝিনি অবিরাম বেজেই যাবে, সাড়া দেবে না কেউ। কখনও বা পাবে এনগেজ্‌ডের টানা টানা বদমেজাজী পোঁ।

ভাগ্য যদি ভাল হয়, কোন এক সময়ে ওদিক থেকে সাড়া মিলবে।

দেখুন আমি প্রায় আধঘন্টা ধরে...তুমি তোমার দুঃখের কাহিনীটি বলতে যাবে কিন্তু ও প্রান্ত থেকে শুষ্ক নীরস কণ্ঠে প্রশ্ন আসবে,—কোথায় কল চান? বলুন।

নাগপুর। পার্সোন্যাল কল।

আর বেশী কিছু তোমার বলার ফুরসত হবে না।

নাগপুর—?...হবে না, লাইন খারাপ।

ও মশাই শুনছেন? বৃথাই তুমি ব্যাকুল হবে। ওদিকে তখন রিসিভার নামানো।

আবার বেশ খানিকক্ষণ অবিরাম চেষ্টা করে যাও। ভাগ্য সুপ্রসন্ন হলে একটা নম্বর শেষ পর্যন্ত ওপ্রান্ত থেকে পেয়ে যাবে। নম্বরটা পাছে ভোলো তাই সাবধানে লিখে রেখে এবার অপেক্ষা কর। খেতে ডাকছে? না, না এখন খাওয়া কি? হঠাৎ যদি কলটা আসে! বাথরুম? তাও এখন থাক্ না।

কিন্তু কল তবু আসবে না। এক ঘন্টা যাবে। তা যাক্। লাইন তো খারাপ ছিল, তুমি নিজেকে বোঝাবে—অনেক কল তাই জমা আছে নিশ্চয়।

দু ঘন্টা পরে! আরও আধ ঘন্টা! এবার একটু খোঁজ নেওয়া বোধহয় দরকার।

আবার আরেকবার সেই তিন সংখ্যার হায়রানি। ডায়াল করে যাও। এনগেজ্‌ড্, এনগেজ্‌ড্, তারপর রিং রিং, কেউ ধরে না। না না, ধরেছে।

দেখুন,—তুমি তোমার দুঃখটা জানাবে,—সেই আড়াই ঘন্টা আগে বুক করেছি। কি বললেন, এ নম্বরে নয় অন্য নম্বরে জানাতে হবে? কি নম্বর?

নম্বরটা তখন জানা যাবে না। গাইড হাঁটকাবে। আবার সেই আগের

নম্বরটাই ডায়াল করে প্রায় বকুনিই শুনবে,—বললাম তো এখানে বলে কোন লাভ নেই।

কোথায় করব তাহলে বলবেন?

ও প্রান্ত একটু সদয় হয়ে তোমায় একটা নম্বর দেবে।

তিন ঘন্টা তখন পার হয়ে গেছে।

নতুন নম্বরটা ডায়াল করা মাত্রই সাড়া পেয়ে মেজাজটা যেমন খুশী হবে, গলাটা তেমনি কড়া।

—কি ব্যাপার মশাই আপনাদের, তিন ঘন্টা আগে বুক করেছি। এই দিয়েছেন। তারপর এতক্ষণ ধরে...অ্যাঁ, কি বললেন—?

ভ্যাবাচাকা খেয়ে তোমার গলাটা তখন খাদে নেমে এসেছে,—আপনাকে কেন মিছিমিছি বকছি! আপনিও আমার মত কল না পেয়ে নালিশ জানাতে চাইছেন? আপনার সংগেই আমার ক্রশ কানেকসন হয়ে গেছে? আচ্ছা রাখুন মশাই। আপনি ফোনটা রাখুন। ঠিক ঠিক, আমিও নামিয়ে রাখছি।

ফোন নামিয়ে রেখে আবার চেষ্টা করতে হবে।

কিন্তু আবার সেই ক্রশ কনেকসন! একবার নয়, বার বার।

এ তো মহামুশকিল মশাই! যাদের চাইছি তাদের পাচ্ছি না, আর আপনার সংগেই বার বার লাইন জড়িয়ে যাচ্ছে!

আমার সংগেও!—আরেকটা ভারী গলায় চমকে উঠে শুনবে,—আমি তখন থেকে আপনাদের আলাপ শুনছি।

ত্রিপাক্ষিক আলাপটা তারপর জমে উঠবে। না জমে উপায় কি?

আমি তিন ঘন্টা আগে বুক করেছি। তুমি জানাবে,—আর কলে দরকার নেই। এবার ক্যানসেল করতে চাই।

আমিও।—তোমার সমর্থন করবেন অন্য দুজন।

কিন্তু বুক করার চেয়ে ক্যানসেল করা সোজা যদি ভেবে থাকো তো তাহলে সে ভ্রান্তি এবার দূর হবে।

আবার সেই রিং আর এনগেজ্‌ড্‌ ধ্বনি। তারপরে সাড়া। কিন্তু গলাগুলো এখন চেনা হয়ে গেছে। বুঝতে দেরি হবে না যে তারে তারে আবার সেই জট পাকিয়েছে।

পরস্পরের পরিচয় নেওয়া তখন আর বাকি থাকে না।

আপনি কি করেন মশাই? গলা শুনে মনে হচ্ছে থিয়েটার-টিয়েটার করেন যেন?—তুমি ভারী গলাকে জিজ্ঞাসা করবে।

তিনি একটু হেসে জবাব দেবেন,—না, সে গুণপণা নেই। আমি একটু কাটা-ছেঁড়া করি।

কাটা-ছেঁড়া মানে যে সার্জারি সে কথাটা বেশীক্ষণ চাপা থাকবে না, সার্জন সাহেবের পরিচয়ও। একই হায়রানির শিকার হবার দরুন একটা নিবিড় প্রীতির সম্পর্ক তখন পরস্পরের মধ্যে গড়ে উঠেছে।—তুমি সাহস করে ভাগনে রতনের খোঁড়া পায়ের কথাটা একসময়ে বলে ফেলবে নিজে থেকে তাঁকে।

আপনি নাগপুরে কাকে ফোন করতে চাইছিলেন। সরু গলা সহানুভূতিতে জানতে চাইবেন।

ফোন করতে চাইছিলাম আমার এক ভাগ্নেকে। তোমায় বলতে হবে—

নেনী, মানে আমার ভাগনীটার জন্যে নাগপুরে একটি পাত্রের সন্ধান পেয়েছি। তার একটু খোঁজখবর নিতে বলতাম।

আপনার ভাগনীটির পাত্র খুঁজছেন বুঝি?—সরু গলা এবার কৌতূহলী হবেন,—তা কিরকম পাত্র চান?

আমাদের কি চাওয়া-চাওয়ির বহর থাকতে পারে?—তুমি সরলভাবেই জানাবে,—গরীবের ঘরের মেয়ে, তার ওপর মুখশ্রীটা থাকলেও রঙ বেশ ময়লা। পড়াশুনাও বেশী কিছু করেনি। এই সবে পার্ট ওয়ান...

দাঁড়ান দাঁড়ান মশাই, মুখশ্রী ভাল বলছেন, কিন্তু রং ময়লা?—সরু গলা এবার চড়া হবে,—তা রং ময়লা তো হয়েছে কি! দুধে-আলতার ডানা-কাটা পরী তো ঢের দেখলাম। দেমাকে মাটিতে পা পড়ে না, আর গায়ে আঁচ লাগাবার ভয়ে কুটোটি নাড়তে চান না।—সাদামাটা ঘর-গেরস্থালীর একটা তেমন মেয়ে দেখলে তো চোখ জুড়োয়।

তুমি হয়তো একটু স্মরণ করিয়ে দিতে চাইবে,—আচ্ছা, ট্রাংক-কলগুলো ক্যানসেল করবার চেষ্টা আর একবার করলে হয় না?

আরে রাখুন মশাই কল ক্যানসেল! ভারী গলাই বলে উঠবেন,—করল না করল তো বয়েই গেল। আমাদের এখন জমে উঠেছে।

জমে উঠবে আরও। সরু গলা তোমাকে আর ভারী গলাকে একদিন তাঁর গরীবখানায় পদধূলি দিতে বলবেন। তোমাকে তোমার ভাগনীটিকে নিয়ে অবশ্য।

তাই যাবে। ফিরে এসে ছুটবে ডাক্তারের বাড়ি।—দেখো তো ডাক্তার হার্ট আর প্রেসারটা। হঠাৎ বেশী খুশীতে টেঁসে যাব না তো?

টেঁসে?—ডাক্তার তোমায় তন্নতন্ন করে পরীক্ষা করে অবাক হয়ে বলবেন, —আপনি যেন পুরনোর বদলে নতুন এঞ্জিন বসিয়ে এসেছেন! এ তো আজ-গুবি ব্যাপার!

আজগুবি মনে হচ্ছে? ট্রাংক-কল কখনও করে দেখেছেন?—বলে ডাক্তার-কেই হতবুদ্ধি করে তুমি চলে আসবে।

যষ্টিরূপে তমোনাশ

তমোনাশবাবু লাঠি হয়ে গেলেন। বেশ মজবুত গাটওয়ালা, মাথাটা খোদাই করা আর মটকাটুকু রুপোয় বাঁধানো লাঠি।

আশ্চর্যের কথা, তমোনাশবাবু সবটাই টের পেলেন, বেশ স্পষ্ট করে।

প্রথমে পায়ের দিকটা বদলে গেল তাঁর চোখের ওপরই। দু'পায়ের জুতো, মোজা-প্যান্ট সব বদলে গিয়ে গাঁট-দেওয়া পালিশ-করা লাঠি হচ্ছে তিনি দেখতে পেলেন, তলার লোহার ফেরুলটা পর্যন্ত।

পড়েই যাচ্ছিলেন কাত হয়ে। কিন্তু মেঝেতে পড়তে হল না। ডিভানটার গায়ে হেলে পড়ে তারই মাথার দিকের গদির খাঁজে আটকে গেলেন।

পড়তে পড়তে চিৎকার করবার কথা একবার মনে হয়েছিল। কিন্তু বড় লজ্জা করল। হঠাৎ তাঁর মত মান্যগণ্য জলজ্যান্ত মানুষটার লাঠি হয়ে যাওয়া দেখলে লোকে ভাববে কি! বিশ্বাসই তো করতে চাইবে না। আর যদি বা বিশ্বাস করে তাহলেও তারা কি-ই বা করতে পারবে।

তমোনাশ তাই চেঁচাননি।

কিন্তু পড়তে পড়তেও একটু চমকে উঠেছিলেন। চমকে উঠেছিলেন স্ত্রী মনোরমাকে ওই সময় ঘরে ঢুকতে দেখে।

চমকটা তেমন বেশী নয়, তার চেয়ে বেশী যেন আফসোস। মনোরমার কি এই সময়টাতেই ঘরে না ঢুকলে হত না? এমন সময় তার তো এ ঘরে আসবার কথা নয়। ঠাকুর চাকর ঝি-র খবরদারী করতে এ সময়টা তো তার রান্নার মহলেই কাটে। কপালে তার এই দেখাটা আছে তা তিনি আর খণ্ডাবেন কি করে?

তমোনাশের মুখে তাই একটু যে হাসির রেখা ফুটে উঠেছে তা না দুঃখের না কৌতুকের। ভাবটা এই—এসে যখন পড়েছ তখন নিজের চোখেই দেখে ফেল।

মনোরমা কিন্তু কতটুকুই বা আর দেখছেন? ঘাড় থেকে মুণ্ডটা পর্যন্ত তো শুধু। ওইটুকু তাঁর চোখের ওপরই লাঠির মাথা হয়ে গেছে তমোনাশের শেষ মুহূর্তের হাসিটুকু সমেত। লাঠির খোদাই করা মাথাটায় সে হাসিটা চেষ্টা করলে আন্দাজ করা যায়। কাঠের গুণে খোদাই করা হাসিটা অবশ্য কেমন একটু রহস্যময় দেখায়।

মনোরমা কি করলেন তমোনাশবাবুর ঘাড় থেকে মাথাটা খোদাই করা লাঠি হয়ে যেতে দেখে?

একটু দাঁড়ালেন। চোখটা রগড়ালেন দু'বার। কস্তাপাড় শাড়ির আঁচল দিয়ে একবার মুছে আর একবার তাকালেন লাঠিটার দিকে। লাঠিটা তখন ডিভানটার গদিতে কাত হয়ে আটকে গেছে। সেটা হাত দিয়ে একবার তুলে দেখে আবার হেলিয়েই রেখে কলঘরের দিকে গেলেন।

কল খুলে মাথায় জল চাপড়ালেন খানিকটা তারপর আবার ঘরেই ফিরে এসে হাঁক পাড়লেন,—হরির মা!

হরির মা ছুটে এসে দেখলে মনোরমা ডিভানের ওপরেই হেলান দিয়ে শুয়ে আছেন চোখ বুজে।

পায়ের শব্দেই হরির মার আসা টের পেয়ে হুকুম দিলেন মনোরমা,—আমার বড়িটা নিয়ে আয়।

ও মা! হরির মা ব্যস্ত হয়ে উঠল,—মাথা ঘুরছে তো? বিকেলে বড়ি আনলাম, তা কিছুতে খেলে না।

বকবক না করে কাজটা আগে কর...,, ধমক দিলেন মনোরমা।

হরির মা ছুটে গেল পাশের ঘরের দেরাজ থেকে মনোরমার ওষুধের বড়ি আনতে।

মনোরমা তখন চোখ বুজে বাঁ হাতটা মাথার দিকে বাড়িয়ে গদির খাঁজে হেলে-থাকা লাঠির মাথাটা একটু ছুঁয়ে দেখছেন।

হ্যাঁ, লাঠিটা ঠিকই আছে ওখানে। মাথাটা তাহলে হঠাৎ ঘুরেই গিয়েছিল। ঘুরে যাওয়া আশ্চর্য কিছু নয়। দুদিন ধরেই একটু বেশী অনিয়ম করছেন। উপোসের ওপর জন্মাষ্টমীর সারারাত থিয়েটার দেখেছেন কাল। ওষুধটাও খাননি প্রেসারের। কিন্তু তাই বলে ওইরকম একটা অদ্ভুত চোখের ভুল—যেন জেগে জেগে স্বপ্ন!

হরির মা ছুটতে ছুটতে ওষুধের শিশি আর জলের গ্লাস নিয়ে এল এরই মধ্যে।

মনোরমা উঠে বসে বড়ি মুখে দিয়ে জলের সঙ্গে গিললেন। একবার লাঠিটার দিকে আড়চোখে চেয়েও নিলেন তারই মধ্যে। না, লাঠিটা আর চোখে ভুলটুল কিছু দেখছেন না।

হাত থেকে জলের গেলাস আর ওষুধের শিশিটা নিয়ে হরির মা ব্যস্ত হয়ে জিজ্ঞাসা করলে,—পাখাটা বাড়িয়ে দেব মা?

না। দরকার নেই।—বললেন মনোরমা। সত্যিই অন্য দিনের মত বেশী হাওয়ার কোন দরকার তো বোধ করছেন না।

হরির মা চলে যাবার আগে তবু একবার জিজ্ঞাসা না করে ছাড়লে না, —বড়বাবুকে ডেকে দেব?

অভ্যাসমত 'না'-ই বলতে যাচ্ছিলেন কিন্তু হঠাৎ যেন টনক নড়ল। কি বলছে কি হরির মা! বড়বাবুকে ডাকবে কি? কোথা থেকে?

মুখে একটু ধমকের সুর রেখে জিজ্ঞাসা করলেন,—উনি কি এসেছেন যে ডাকবি?

হ্যাঁ, দেখলাম যে নীচে ঢুকতে।—হরির মা জানালে,—বাইরের ঘরে আছেন বোধ হয়।

ডাক্ একবার তাহলে!—মনোরমা সহজ গলায় বলবার চেষ্টা করলেন। পারলেন কি না কে জানে!

না পারলেও হরির মার তা অবশ্য লক্ষ্য করবার কথা নয়। সে হুকুম পেয়েই তখন ঘর থেকে বেরিয়ে গেছে।

নীচের বৈঠকখানায় থাকলে মানুষটা অবশ্য বেশ একটু অবাক হবে। এ রকম ডাকাডাকির ব্যাপার তাদের মধ্যে তো নেই।

যে যার নিজের ধান্দা নিয়ে থাকেন। একসঙ্গে সুখ-দুঃখের কথা বলবারও

আর সময় হয় না।

এ রকম ডাক শুনে হয়ত বাড়াবাড়ি কিছু ভেবে বসবেন।

তা ভাবুন, তবু একবার এলে ক্ষতি তো কিছু নেই। হঠাৎ চোখের ভুলটায় মাথাটায় সত্যি যেন গোলমাল হয়ে গেছে।

চোখের অমন ভুল হলই বা কেন? শুধু প্রেসার? প্রেসারে মাথা ঘোরার মত তো ঠিক নয়। সেবারও প্রেসারে মাথা ঘুরে গিয়েছিল হঠাৎ চোখে যেন সব অন্ধকার দেখে। সে রকম অন্ধকার-টন্ধকার তো এবার দেখেননি! যা দেখেছেন তা তো বেশ স্পষ্ট করে।

কিন্তু এই লাঠিটা দেখাই তো আশ্চর্য ব্যাপার?

মনোরমা উঠে বসে লাঠিটা আবার দেখলেন। সত্যি, এ লাঠিটা তো তাঁর অচেনা। কর্তা মাঝে মাঝে একটা লাঠি নিয়ে বেড়াতে বার হন বটে কিন্তু সেটার চেহারাই তো আলাদা।

এ লাঠি তো কর্তার নয়!

উনি কি নতুন কিনে এনেছেন? হঠাৎ বুকটা ছাঁৎ করে উঠল মনোরমার। এ লাঠি কবেই বা কিনলেন, কখনই বা রাখলেন এ ঘরের ডিভানে হেলিয়ে? লাঠিটা মনোরমা যে চোখের ওপর ডিভানের গায়ে হেলে পড়তে দেখেছেন। সেটা যদি দেখার ভুল হয় তাহলে লাঠিটা তো তা নয়। লাঠিটাই তো চোখের সামনে পড়ে আছে এখনও।

যাক, কর্তা এলেই সব মীমাংসা হয়ে যাবে। সিঁড়িতে পায়ের শব্দ। কিন্তু কর্তার তো নয়।

না, বড়বাবু নীচে নেই মা।—হরির মা অপরাধীর মত এসে খবর দিলে, —এসে আবার বেরিয়ে গেছেন বোধ হয়।

আচ্ছা ঠিক আছে। আর ডাকবার দরকার নেই।

মুখে তাচ্ছিল্যভরে বলে হরির মাকে বিদায় করার পর মনোরমা আর শুয়ে থাকতে পারলেন না। উঠে প্রথমে কর্তার চেনা লাঠিটার খোঁজ করলেন। লাঠিটা ঠিকই আছে আলনার আংটায় ছাতার পাশে ঝোলানো।

তাহলে?

তাহলে কিছুই আর করবার নেই কর্তা ফিরে না আসা পর্যন্ত।

কিন্তু তমোনাশবাবু ফেরেন না।

রাত বাড়ে। তার সংগে বাড়ে ভাবনা। ভাবনা উদ্বেগ হয়। উদ্বেগ আতঙ্ক। ফোনে খবর নেওয়া হয় প্রথম বন্ধুবান্ধব আত্মীয়স্বজনের বাড়ি। তারপর হাসপাতাল থানা সর্বত্র।

না, তমোনাশবাবুর কোথাও কোন খবর মেলে না।

সকালবেলা বাড়িতে বন্ধুবান্ধব আত্মীয়স্বজন খবর নিতে, পরামর্শ দিতে, ভরসা দিতে আসে।

কিছু ভাবনা নেই। তেমন কিছু হলে থানায় কি হাসপাতালে খবর পাওয়া যেত। তা যখন হয়নি তখন কোথাও না কোথাও আছেন।

কিন্তু আছেন কোথায়? সারাজীবন যাঁর রুটিন-বাধা জীবন সে মানুষটার হঠাৎ বাড়ি ছেড়ে সারারাত অন্য কোথাও কাটানো যে অবিশ্বাস্য।

মনোরমার চোখটা আপনা থেকে বার বার লাঠিটার দিকে যায়।

লাঠিটা এখন তিনি সামনের আলমারিটার মাথাতেই তুলে রেখেছেন। কাউকে তাঁর অদ্ভুত দৃষ্টি-বিভ্রমের কথাটা বলতে পারলে যেন একটু স্বস্তি পেতেন। কিন্তু কাকে বলবেন?

শেষ পর্যন্ত খুড়তুতো দেওর রতিকান্তর কাছে কথাটা অন্যভাবে পাড়লেন, —আচ্ছা ঠাকুরপো, মানুষ তো বদলে যায়?

রতিকান্ত তখন ফোনে লালবাজারের এক চেনা অফিসারকে ধরবার চেষ্টা করছিল। ফোন গাইডেই চোখ রেখে বললে,—তা আর যায় না। খুব বদলায়। তুমি কি মেজদার হঠাৎ বদলে গিয়ে বিরাগীটিরাগী হয়ে যাবার কথা ভাবছ?

না না, তা ঠিক নয়।

মনোরমা কি বলবেন ঠিক করতে না পেরে চুপ করে যান।

রতিকান্ত লালবাজারের চেনা অফিসারের সঙ্গে যোগাযোগ করে তখন আলাপ চালাচ্ছে।

...না না, ওসব কোন দলের সঙ্গে কোন সংস্রবই নেই। আর বলতে নেই... আমাদের পাড়াটা একেবারে ঠাণ্ডা, ওরকম কোন ব্যাপার এখনও পর্যন্ত হয়নি। ...তবু বিশ্বাস নেই বলেছেন...কিন্তু তমোনাশদার মত মানুষ তার মধ্যে পড়বেন কি করে? সারাজীবন কোনরকম রাজনীতির ধার দিয়েও যাননি। বড়লোক নয়, গরীবও বলা যায় না। অবস্থা সচ্ছল এইমাত্র। প্রায় রুটিন-বাঁধা জীবন। সব কিছুতে মাঝারি...

আরও কি বলতে গিয়ে রতিকান্ত থেমে গেল কিংবা কেমন সন্দেহ হল বোধ হয় যে, কথার টানে কথা যা এসে যাচ্ছে তা ঠিক সত্য নয়। সব কিছুতে মাঝারি বলবার পরই হয়ত বলত, জীবনে সব কিছুতেই মাঝামাঝি পেঁৗছে-ছেন, মাঝামাঝি উন্নতি, মাঝামাঝি সুখ স্বাচ্ছন্দ্য সাফল্য। কিন্তু তাতে তমোনাশদাকে কি সত্যি-সত্যিই বোঝানো যেত!

পলকের মধ্যেই কথাগুলো মাথায় খেলে যাওয়ায় রতিকান্ত সুর পাল্টে দিলে। বললে—চরিত্র বর্ণনার সত্যি কিছু দরকার আছে কি? মানুষটাকে আগে খুঁজে পাওয়া দরকার...হ্যাঁ, চেষ্টা তো আপনারা করবেন জানি!... কি বলছেন!...না না, সেরকম কিছু হয়নি। হওয়া সম্ভবই নয়। মানুষটাই আলাদা!...ওই আবার সেই চরিত্র বর্ণনাই আসছে...তাও দরকার বলছেন খোঁজার জন্যে! আচ্ছা...আচ্ছা...ধন্যবাদ...

ফোন নামিয়ে রতিকান্ত মনোরমার কাছে এসে দাঁড়াল।

একটু হেসে বললে,—একটা কথা জিজ্ঞাসা করব মনো-বউদি? রাগ করো না কিন্তু।

অনুমতির অপেক্ষা না করেই রতিকান্ত জিজ্ঞাসা করলে তারপর,—তোমাদের ঝগড়াটগড়া কিছু হয়নি তো?

ঝগড়া!

মনোরমার গলার স্বর আর মুখের চেহারাতেই অপ্রস্তুত একটু হাসি হেসে রতিকান্ত বললে—আমিও তাই বললাম মিঃ সামন্তকে। নাটক নভেল সিনেমা দেখা ছেলেছোকরা কি, যে ঝগড়াঝাটি করে বাড়ি ছেড়ে যাবে! তমোনাশদা ঝগড়া রাগারাগি করবার মানুষই নয়। এই এতদিন ধরে...

হঠাৎ আরেকটা কথা মনে পড়ে কি যেন একটু খটকা লাগল রতিকান্তর।

আগের কথাটা বলতে বলতে থেমে পড়ে জিজ্ঞাসা করলে,—বদলে যাবার কথা কি যেন বলছিলে মনো-বউদি!

মনোরমা বেশ একটু অস্বস্তি বোধ করলেন এবার। একটু বিপন্নও। এতক্ষণ মনে মনে বলবার মত করে সাজাবার চেষ্টা করে বুঝেছেন যে তাঁর বক্তব্যতে ভাষা দেওয়াই যায় না। দিলে আজগুবী প্রলাপ শোনাবে।

অথচ আগে যেটুকু বলে ফেলেছেন যেমন হোক একটা মানের ইঙ্গিত না রাখলে নয়।

এলোমেলো ভাবে তাই বললেন,—বদলে...বদলে মানে, এই ধর, নিয়মবাঁধা মানুষের হঠাৎ নিয়মে অরুচি হতে পারে তো একদিন?

সে তো ওই বিরাগী হয়ে যাওয়ারই মত। রতিকান্ত মাথা নাড়ল,—তমোনাশদার সেরকম কিছু লক্ষণ দেখেছ ইদানিং? আর দেখাও যদি যায় তাহলেও বিবাগী হওয়ার বদলে অনিয়মটা কি করবেন? সন্ধ্যেয় বেড়াতে বেরিয়ে বাঁধা দস্তুর ভেঙে যাবেন কোথায়? সিনেমা-থিয়েটারে? না, নেশায় গিয়ে জমবেন নতুন ইয়ার-বন্ধুর সঙ্গে?

নিজের উত্তরটার বাতুলতায় নিজেই হেসে উঠল রতিকান্ত। তারপর যাবার সময় আশ্বাস দিয়ে গেল,—তুমি কিছু ভেবো না মনো-বউদি। আজকের মধ্যে একটা খবর পাবেই। ফিরেই আসবেন বলে আমার বিশ্বাস।

সেই কথাই বলে এসে ভাইপো সুবীর। মেজ ভাইয়ের ছেলে। চালাক-চতুর চৌকশ ছেলে। খেলাধুলোয় বাহাদুরির জন্যে আর কিছুটা খুঁটির জোরে বড় বিলিতি কোম্পানির চাকরি পেয়েছে। কলেজে পড়াশুনার সময় ইউনিয়ন-টিউনিয়নের পাণ্ডাগিরি করত। এখন সব ছেড়ে দিয়েছে।

হাসপাতাল কি থানা থেকে যখন কোন খবর পাওয়া যায়নি—জোর দিয়ে বলে সুবীর,—তখন নিশ্চিন্ত থাকতে পার যে ভয়-ভাবনা করবার মত কিছু হয়নি পিসেমশাইয়ের। এমন কিছুতে আটকা পড়েছেন যেটা শুধু আমরা ভাবতে পারছি না।

সেটা কি?—মনোরমা নিজেকেই যেন জিজ্ঞাসা করেন।

সেটা...সেটা কতরকম হতে পারে—সুবীর তার কল্পনা খাটায়,—যেমন ধর কোন পুরনো বন্ধুর সঙ্গে হয়ত হঠাৎ দেখা হয়ে গেছে। সে বন্ধু ধরে নিয়ে গেছে তার বাড়িতে। বাড়িটা ধরো তিলজলা কি সিঁথির দিকে।

সুবীর নিজের কল্পনায় মেতে ওঠে,—সেখান থেকে ফেরার বাস ধরতে পারেননি ঠিক সময়ে। রাত হয়ে গেছে বলে বন্ধুই আর আসতে দেয়নি।

একটু থেমে সুবীর সম্ভাব্য প্রতিবাদগুলো নিজেই তুলে ধরে আবার খণ্ডন করে. কিংবা হয়ত বন্ধুটি হঠাৎ খুব অসুস্থ হয়ে পড়েছে। তাকে ছেড়ে আসতে পারেননি। কাছাকাছি ফোন করবার সুবিধেও নেই। পিসেমশাই তাই একেবারে নিরুপায় ঠুঁটো হয়ে আছেন...

তার চেয়ে বল্ না, তোর পিসে হঠাৎ জমে পাথর হয়ে গেছে!—মনোরমার মুখ দিয়ে কথাটা এইভাবে যে বার হবে তিনি নিজেও ভাবতে পারেননি।

সুবীর তখন হাসছে। কথাগুলোয় কি যেন একটা মজা পেয়ে হাসছে। হাসতে হাসতেই বলে,—ঠিক বলেছ, ঠিক তাই হয়ত হয়ে গেছেন। লোকে বলে রাগে আগুন, শোকে পাথর, ভয়ে কাঠ। সত্যি সত্যি তাই হলে কি কাণ্ড-

টাই হত ভাব তো।

কথাগুলো সুবীর যেন নিজে থেকে বলছে না। কে যেন তাকে দিয়ে বলাচ্ছে।

এই তুমি বসে আছ সামনে—সুবীর বলে যায়,—পিসেমশাইয়ের শোকে হঠাৎ পাথর হয়ে গেলে! দুনিয়ার কত পাথর কত কাঠই তাহলে বাড়ত!

একটু থেমে কিছুটা গম্ভীর হবার ভান করে আবার বলে সুবীর,—কিন্তু শোকে পাথর হবার মত পিসেমশাইয়ের তো কিছু হয়নি। বল না। হয়েছে? হবেই বা কোথা থেকে? একেবারে তো ঘড়ির কাঁটা-ধরা জীবন! শোকে পাথর না হলে, ভয়ে কাঠ? তা ভয়টাই বা ওঁর কিসের? যে দিকে ভয়ের কিছু আছে উনি তো তার ধার মাড়ান না!

কি আজেবাজে বকছিস!—মনোরমা ধমক দেন। ধমকটায় খুব জোর কিন্তু নেই। সেটাও যেন নিজের মনের জিজ্ঞাসা একটু বাইরে আনার একটা ছুতো।

উনি কাঠ কি পাথর হয়েছেন তা নিয়ে বিচক্ষণতা করতে তোকে ডেকেছি? না, সত্যি ওরকম কিছু হয় বলে তুই ভাবিস?

পাগল!—এবার গলা ছেড়ে হেসে ওঠে সুবীর,—এমনি তোমার মনটা একটু হাল্কা করবার জন্যে আজেবাজে কথা বলছিলাম। তোমার কিন্তু সত্যি অত ভাবনার কিছু নেই পিসিমা। আজ বিকেলের মধ্যেই দেখবে পিসেমশাই এসে হাজির আর আমাদের মাথায় যা এখন আসছে না তেমনি কোন তুচ্ছ ব্যাপারেই আটকা পড়েছেন নিশ্চয়...

চলে যেতে যেতে আটকা পড়বার যে কারণটা সুবীরের মাথায় ঝিলিক দেয় সেটাকে কিন্তু তুচ্ছ বলা চলে না। একালের ছেলে। খুব বুদ্ধিমান না হলেও মামুলী গোঁড়ামি নেই ভাবনা-চিন্তায়। কুসুমে কীট দেখবার ঝোঁকই বেশী।

যেতে যেতে মনে মনে বেশ একটা সরস কেচ্ছা সে সাজিয়ে তোলে।

পিসেমশাই বলেই তো আর ধোয়া তুলসী-পাতাটি নয়? কত বয়সই বা হয়েছে তাঁর? এই বাহান্ন-তিপান্নর বেশী নয় কক্ষনো। এখন বেশ মজবুতই তো আছেন, আর এই বয়সটাই বলে বিপদের। জিতের খুঁটিতে গিয়ে পৌঁছবার আগের শেষ বেড়াবাজি। এ হার্ডলেই বারো আনা বাহাদুরেরা এসে হুমড়ি খেয়ে পড়েন। পড়েন নিজেদেরই দোষে। পঞ্চাশ পার হয়ে ষাটের দিকে বয়স এগুচ্ছে। তখনই গেল-গেল ভাব। বসন্ত গেল, যৌবন গেল। যা গেল আর ফিরবে না। মনের সব রাশ এই সময়েই কখন নিজের অজান্তে ঢিলে হতে শুরু করে। পিসেমশাইয়েরও যে হয়নি তার ঠিক কি! কোথায়? কেমন করে? কেন, তাঁর অফিসের ওই স্টেনো অ্যাংলো মেয়েটাই বা নয় কেন? পিসেমশাইয়ের অফিসে দু-চারদিন যেতে হয়েছে। বড় অফিস, কিন্তু পিসেমশাই হোমরা-চোমরাও নয়, হেঁজিপেঁজিও না। তাঁর নিজের কামরা নেই যেমন, তেমনি বড় হলঘরে সকলের সংগে এক সারিতেও বসেন না। কাঠের নিচু রেলিং দিয়ে তাঁর বসার জায়গাটুকু ঘেরা। সেখানেই মিস ম্যাবেলকে দেখেছে। চেহারা ভাল কিছু নয়, কিন্তু চটক আছে। তার ওপর বেশ চনমনে আর একটু গায়ে-পড়া। পিসেমশাইয়ের কাছেই তাকে নানা খুচরো ব্যাপারে আসা-যাওয়া করতে হয়। সুবীর তো প্রত্যেকবারই তাকে পিসেমশাইয়ের কাঠগডার মধ্যে কোন-না-কোন কাজে আসতে দেখেছে। তার গায়ে-পড়া ভাবে পিসেমশাই সুবীরের সামনে

একটু অস্বস্তিও যেন বোধ করেছেন। ওই ম্যাবেলের সঙ্গে একটা লটঘট যে বাধেনি তার ঠিক কি! আর কিছু না হোক কাল হয়ত ওদের বাড়িতে জন্ম-দিনের পার্টিটার্টি ছিল। পিসেমশাই বিকেলে বেড়াতে যাবার নাম করে সেখানে হাজিরা দিয়েছেন আর তার ওপর অনভ্যাসের পেটে ড্রিংক-ট্রিংক করে এমন বেসামাল হয়েছেন যে এখন পর্যন্ত আর বাড়িমুখো হতে পারেননি।

সুবীর গোপনে একবার পিসেমশাইয়ের অফিসে মিস ম্যাবেলের খোঁজ করবে বলে ঠিক করে।

সুবীর কি খোঁজ পেয়েছিল কে জানে! সে কিন্তু আর অনেকদিন এ পথ মাড়ায়নি।

এর মধ্যে একদিন এসেছিল কর্তার অফিসের চাপরাসী ছোটেলাল।

হঠাৎ এসে হাজির হয়েছিল। নীচে ঝি-চাকরের সঙ্গে কথা বলেই চলে যেতে যেতে কি ভেবে দাঁড়িয়ে পড়ে ভৌজীর সঙ্গে একবার দেখা হবে কি না জিজ্ঞাসা করেছিল।

হরির মা এসে খবরটা দিয়েছিল মনোরমাকে।

বাবুর অফিসের কে এক ছোটেলাল বেয়ারা এসে ভৌজীর সঙ্গে দেখা করতে চাইছে।

অফিসের বেয়ারা শুনেই উৎসুক একটু হয়েছিলেন মনোরমা। ভৌজী শুনে তেমনি একটু অবাক।

চাপরাসী বেয়ারারা সাধারণতঃ বাবুর স্ত্রীকে ভৌজী নয়, মাজীই বলে। এর আবার ভৌজী সম্বোধন!

ছোটেলালকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন তারপর। নেহাত ছেলেমানুষ। বেশ সভ্যভব্য শিক্ষিত চেহারা। নাম না জানলে আর কথা না শুনলে কোন্ প্রদেশের তা বোঝাই যায় না।

ছোটেলাল একটু আড়ষ্ট হলেও আন্তরিকতার সঙ্গে জিজ্ঞাসা করলে,—বাবুর কোন পাত্তা কি পাওয়া গেল ভৌজী?

এখনও পাওয়া যায়নি শুনে একটু চুপ করে থেকে বেশ একটু দ্বিধার সঙ্গে জানালে, বাবুর একটা জিনিস তাঁর হাতে দিতে পারেনি বলে সে বড় আপসোসে আছে। জিনিসটা অবশ্য এখন আর কাজে লাগবে না। তার দরকার ফুরিয়ে গেছে। দিতে যে সে পারেনি তাও তার কসুর নয়। যেদিন তাঁকে দেবার কথা সেদিন থেকে বাবু আর অফিসেই যাননি।

জিনিসটা ছোটেলাল এবার বার করে দিয়েছে পকেট থেকে।

সিনেমার একটা টিকিট। চৌরঙ্গী অঞ্চলের হিন্দী সিনেমার। তমোনাশ আগের দিন ছোটেলালকে কিনে রাখবার জন্যে টাকা দিয়ে রেখেছিলেন।

এরকম তিনি নাকি অনেকবারই দিয়েছেন।

ভাল হিন্দী সিনেমা এলে ছোটেলালের কাছেই তিনি তার খবর নিতেন। আর তাকে দিয়ে অগ্রিম টিকিট কাটিয়ে একা একা যেতেন। বেশীর ভাগ শনিবারই গেলেও এক-আধবার অফিসের ঘন্টার মধ্যে ম্যাটিনি শোতেও নাকি গেছেন।

ছোটেলালকে স্নেহের সম্ভাষণে বিদায় করে মনোরমা ব্যাপারটা ভাবতে গিয়ে অবাক হয়েছেন।

ওঁর মত মানুষের লুকিয়ে লুকিয়ে একা সিনেমা দেখা!

তাও আবার হিন্দী সিনেমা!

এটা তো কল্পনাই করতে পারতেন না মনোরমা। ছোটেলালের মত ছোকরা একটা মিথ্যে কথা বলবার জন্যে এত তোড়জোড় করে টিকিট যোগাড় করে নিশ্চয় দেখাতে আসেনি!

স্বামীর জীবনের আরও অন্ধকার দিক কি তাঁর অজানা আছে?

সেজমামা জ্যোতিপ্রসাদের কথায় তাই যেন মনে হয়।

আত্মীয়স্বজন মহলে বিজ্ঞ-বিচক্ষণ বুদ্ধিমান বলে সেজমামার যথেষ্ট খাতির। নিজে ঘর-সংসার করেননি, তীর্থধর্ম নিয়েই দিন কাটান, কিন্তু সাংসারিক বৈষয়িক ব্যাপারে তাঁর পরামর্শ নাকি অমূল্য।

সব শুনেটুনে প্রসন্ন মুখেই বলেন,—শোন মা মনো। তমোনাশ ভালয় ভালয় ফিরে আসুক তাই চাই। তবু সংসার বড় বিচিত্র জায়গা, এখানে সব কিছুর জন্যে তৈরি থাকতে হয়।

তৈরী কিসের জন্যে থাকা উচিত তাও মনোরমাকে বুঝিয়ে দেন জ্যোতি-প্রসাদ। দুর্ঘটনা গোছের কিছু তো হতেই পারে যার খবর থানা কি হাস-পাতালে এখন পেঁছোয়নি। তার চেয়ে বেশী সম্ভাবনা তমোনাশের নিজেরই কোন কারণে গা ঢাকা দেওয়ার...

কিন্তু!—মনোরমা বিমূঢ় একটু প্রতিবাদ জানাবার চেষ্টা করেন।

জ্যোতি মামা একটু হাসেন। বলেন,—ভাবছ তমোনাশের মত মানুষের পক্ষে সেরকম কিছু করা সম্ভব নয়! কিন্তু সংসারে কি যে সম্ভব আর কি যে নয় তা কেউ জানে না মা। তমোনাশের চেয়ে হিসেবী সাবধানী মানুষকে এক মুহূর্তের খেয়ালে কি ভুলে সারাজীবনের পরিচয় মিথ্যে করে দিয়ে নিরুদ্দেশ হয়ে যেতে দেখেছি। কারণটা ধরা পড়তেও অমন কত বছর কেটে গেছে। তারপর জানা গেছে অফিসের খাতায় অনেক টাকার হিসেবের গোল-মাল। লুকিয়ে লুকিয়ে ফাটকা বাজারে খেলতে গিয়ে এক গুণ লোকসান মেটাতে হাজার গুণ মার খেয়ে শেষপর্যন্ত দেশান্তরী হওয়া ছাড়া আর উপায় খুঁজে পায়নি কিছু।

তমোনাশেরও সেই রকম কিছু হয়েছে তা বলেননি সেজমামা। তবে ব্যাংকট্যাংকের কাগজপত্র একটু দেখে নিতে বলেছেন। মোটা কিছু টাকা সম্প্রতি তোলাটোলা হয়েছে কি না তাও জানা দরকার! তমোনাশ অবশ্য সাবধানী হিসেবী লোক তিনি জানেন। ফিক্সড ডিপোজিট আর ন্যাশনাল সেভিং সার্টিফিকেট ছাড়া কোন কিছুর ওপর বিশ্বাসই ছিল না তার। কিন্তু লোকসান দিয়েও সে-সব অসময়ে ভাঙিয়ে নেওয়া তো যায়। পুঁজিপাটা সব কিছু অমনি করে তুলে নিয়ে সম্পূর্ণ নতুন জায়গায় নতুন নামে আবার জীবন শুরু করার নজিরও আছে।

কিন্তু কেন তা করবে? মনোরমা বিহ্বলভাবে যেন নিজের মনেই বলেন, —কুড়ি বছর ধরে যে মানুষটাকে জানি সে কি হঠাৎ এমন বদলে যেতে পারে!

সব পারে মা। সব পারে।—সেজমামা জ্যোতিপ্রসাদ জোর দিয়ে বলেন,— আমাদের কুড়ি বছরের জানাটাই যে মিথ্যে নয়, তার ঠিক কি?

না, ঠিক কিছুরই যে নেই মনোরমা ক্রমশই তা বোঝেন।

বিশেষ করে তমোনাশের বন্ধু নীলরতনের সংগে কিছুক্ষণ কথা বলার পর।

বেশ কিছুদিন তখন কেটে গেছে। হাসপাতাল থানা ইত্যাদিতে খোঁজ-খবর নেওয়া থেকে খবরের কাগজে ছবি সমেত বিজ্ঞাপন দেওয়া পর্যন্ত কোন চেষ্টাই তখন বাদ নেই। কোন হদিসই তবু মেলেনি তমোনাশের অন্তর্ধানের। জ্যোতি মামার পরামর্শে ব্যাঙ্কের বই কাগজ হিসেবপত্র ঘেঁটেও গোলমেলে কিছু পাওয়া যায়নি।

তাহলে একটামাত্র সম্ভাবনাই তো বাকি থাকে।—আকস্মিক স্মৃতিভ্রংশ। তমোনাশের মনস্তাত্ত্বিক বন্ধু নীলরতন সে সম্ভাবনায় কিন্তু জোর পান না।

তাহলে একটা কথাই তো শুধু মনে হয় বউদি।—বলেছেন তমোনাশের মনস্তাত্ত্বিক বন্ধু নীলরতন, তমোনাশের হঠাৎ স্মৃতিভ্রংশ হয়েছে। সে কে, কি, কোথাকার কিছুই তার আর মনে নেই। এই রকম স্মৃতিভ্রংশ সত্যিই কারুর কারুর হয়। কিন্তু এ-কথা ভেবে নিতে একটু বাধছে এইজন্যে যে সে নিজে সব ভুলে গেলেও তার চেনা-জানা একজন কারুরই কি সে এতদিনে চোখে পড়ত না! বিশেষ করে কাগজে কাগজে এত ছবি দেওয়া বিজ্ঞাপনের পর! তাছাড়া স্মৃতিভ্রংশ যার হয় সে তো সাধ করে সকলের চোখের আড়ালে থাকবার চেষ্টা করে না!

তাহলে আপনার কি মনে হয়?—ক্লান্ত গলায় প্রশ্ন করেছেন মনোরমা।

যা মনে হয় নীলরতন সব বলেননি। যেটুকু বলেছেন তাও মনোরমা কত-টুকু বুঝেছেন কে জানে!

নিজেদের যত সোজা মনে করি তা আমরা নই বউদি। আমাদের ভেতরে আর বাইরে যে একটা মানুষই থাকে তা নয়, সম্পূর্ণ ভিন্ন দুটো কি তার চেয়েও বেশী মানুষ একসংগে এক নাম আর চেহারার মধ্যে থাকতে পারে। তারা সব সময়ে একাকার হয়েও থাকে না। ভেতরকার আর বাইরের তাগিদে একই সংগে আলাদা আলাদা দুরকম জীবন কাটায়।

তার মানে ওঁর আর একটা পরিচয় আছে বলছেন?—অনেক ধোঁয়ার ভেতর থেকেও সার কথাটা হঠাৎ ধরে ফেলেছেন মনোরমা,—এ ঘরসংসার ছাড়া ওঁর আর একটা আস্তানা আছে, আর একটা জীবন?

না, অতটা বলছি না।—নীলরতন যেন অপ্রস্তুত হয়ে এলোমেলো কথায় চলে গেছেন।

এলোমেলো কথার ভেতর দিয়েও ইংগিতগুলো খুব অস্পষ্ট থাকেনি মনোরমার কাছে।

তমোনাশের আলাদা একটি জীবন আর পরিচয় থাকা কিছুমাত্র নাকি আশ্চর্য নয়। তা না থাকলে হঠাৎ একটা মানুষ অমন বেমালুম নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতে পারে কি? দ্বিতীয় পরিচয় আর জীবনটা তার এক-আধ দিনেরও বোধ হয় নয়। বহুকাল ধরে ফন্দি করে সাজিয়ে-গুছিয়ে না রাখলে অমন একটা আলাদা পরিচয় আর আস্তানা গড়ে তোলা যায় না। তার মানে হঠাৎ এই নিরুদ্দেশ হবার অনেক আগে থেকে তমোনাশ যাকে বলে দ্বৈত জীবন কাটাচ্ছে।

হিসেবে সাবধানী নেহাত সাধারণ মাপের মানুষ তমোনাশ। কিন্তু এদের

বোঝাই বুঝি সব চেয়ে শক্ত। এদের সামনেটা যত সোজা, পেছনের গোলক-ধাঁধা তত জটিল।

নীলরতন চলে যাবার পর মনোরমা নিজের ঘরে এসে আলমারির ওপর থেকে লাঠিটা একবার নামালেন।

বিছানায় সেটা শুইয়ে দিয়ে দেখতে দেখতে নিজের মাথার সুস্থতা সম্বন্ধে সন্দেহ অনেকখানি যেন কেটে গেল।

মনে হল লাঠির মাথা থেকে তমোনাশবাবুর শেষ হাসিটুকু যেন ফুটে বেরিয়েছে। সেই সঙ্গে তাঁর গলাও যেন শোনা যাচ্ছে—যা দেখেছ খুব অবিশ্বাস্য আর মনে হচ্ছে কি? আমার সম্বন্ধে সকলের কল্পনার দৌড়টাও তো দেখলে। নেহাত মাঝারি সাধারণ মামুলী লাঠিটার সঙ্গে খুব বেশী তফাত কি আমার ছিল?

ইকেবানা
(চিত্রাখ্যান)

কয়েকটি ফুল আর বাহারী পাতার মধ্যে ঠিক চম্পক-অঙ্গুলি না হোক নধর সুঠাম কটি আঙুলের কাজ প্রথমে দেখা গেল। সযত্নে বাড়ানো নখগুলোর রঙও বোঝা যাচ্ছে।

বেশ কয়েক মুহূর্ত ক্যামেরা শুধু ওই ফ্রেমেই স্থির হয়ে রইল। ফুল আর লতা-পাতা নানাভাবে সাজিয়ে আবার বদলানো হচ্ছে।

ক্যামেরা এবার পিছিয়ে এল একটু। যে পাত্রে ফুলগুলো রাখা প্রথমে সেটি, তারপর ফুল যে সাজাচ্ছে সে মেয়েটিকেও দেখতে পেলাম। আঙুলগুলো দেখে যা মনে হয়েছিল মেয়েটি পোশাকে-প্রসাধনে সেই রকম আধুনিকা। পাতলা দোহারা চেহারা। মুখশ্রী বিশেষ না থাকলেও শরীরের বাঁধুনি যা আছে বেশভূষায় তাই প্রধান আকর্ষণ করে তোলবার চেষ্টা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়নি।

মেয়েটির চেহারা-পোশাকে যে সচ্ছল আভিজাত্যের ইঙ্গিত আছে ঘরটার যেটুকু দেখতে পাওয়া যাচ্ছে তার মধ্যে তা কিন্তু অনুপস্থিত। (অর্থাৎ মেয়েটিকে পার্ক স্ট্রীটে কোন বিলেতী ময়রার দোকানে দেখলে তার অবস্থা সম্বন্ধে যে ধারণা হত ঘরদোরের চেহারায় তা ভুল বলে প্রমাণ হচ্ছে।) সাধারণ মধ্যবিত্ত চেহারাকে আধুনিক করে তোলবার একটা আন্তরিক চেষ্টা আছে অবশ্য। ঘরের যে জানালাটা ক্যামেরা পেছুবার সঙ্গে দেখা গেছে তার কাটা পর্দার ভেতর দিয়ে অন্যদিকের বাড়ির আভাস দেখে এটা সারি সারি ফ্ল্যাট বাড়ির অংশ বলেই বোঝা যাচ্ছে।

ঘরের মধ্যে ফুল সাজাবার পাত্রটি আর ফুলগুলো মেয়েটির চরিত্রই প্রতিফলিত করছে কিনা না জানলেও প্রথম থেকে মনে ছাপ রাখবার মত করে দেখানো।

মেয়েটি ফুল সাজাতে তন্ময়। মুখে সেই একাগ্রতার সঙ্গে কখনো একটু ভ্রূকুটি কখন একটু প্রসন্নতা ফুটে উঠছে।

ক্যামেরা ধীরে ধীরে এগিয়ে শুধু মুখটিকেই বড় করে তুলল একটু পেছন থেকে। গলা আর কাঁধের সামান্য অংশ শুধু দেখা যাচ্ছে।

হঠাৎ একটু অস্ফুট আতঙ্কের শব্দের সঙ্গে মেয়েটির মুখ মুহূর্তের জন্যে চমকে বিবর্ণ হয়ে গেল।

তার গলার পাশ আর কাঁধের ওপর দিয়ে দুটো হাত ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে।

আঙুলগুলো একটু নাড়াচাড়ার সঙ্গে এগিয়ে যাওয়ার ধরনে ঠিক যেন সরীসৃপের অস্বস্তিকর স্পর্শের আভাস দিচ্ছে।

মেয়েটির মুখের সেই চমকে-ওঠা ভয়ের বিবর্ণতা একটু একটু করে কেটে যাচ্ছে।

মুখটা স্থির। শুধু দু'চোখের তারা নীচের দুটো হাতের আঙুলগুলোকে

লক্ষ্য করল দুবার একোণে-ওকোণে সরে।

মুখের ভাবটা ক্রমশঃ বেশ কঠিন হয়ে এসেছে। কঠিন মুখ আর সেই সঙ্গে ঠোঁটের কোণে ঈষৎ বিদ্রূপ-তীক্ষ্ন হাসি।

দু'হাতের আঙুলগুলো তখন মেয়েটির সুঠাম গলার কোমল মসৃণতা যেন বুলিয়ে বুলিয়ে উপভোগ করছে।

অত কাছে থেকে হাত আর হাতের আঙুলগুলো লক্ষ্য না করে উপায় নেই। পুরুষের বলিষ্ঠ হাতের আঙুল, গড়নেও খারাপ নয়, কিন্তু কেমন খসখসে চামড়া, আঙুলের গাঁটগুলোও বড় স্পষ্ট। আর নখগুলোও দিন কয়েক আগে অন্ততঃ কাটা উচিত ছিল। নখের ডগাগুলো পরিষ্কার নয় বলেই সন্দেহ হয়। ডান হাতের বুড়ো আঙুল আর তর্জনীটাই ভাল করে চোখে পড়ছে। সেখানে স্পষ্ট ধূমপানের তামাকের ছোপ।

মেয়েটির কঠিন মুখ থেকে বিদ্রূপের হাসিটা মুছে গেল এবার। নিজের ডান হাতটা তুলে সে তার গলার ওপর বুলোনো আঙুলগুলো সরাতে চেষ্টা করলে। পারলে না। আঙুলগুলো আরও নিবিড়ভাবে তার গলাটা যেন জড়াতে চাইছে।

মেয়েটির চোখে একটা ক্রুদ্ধ ঝিলিক দেখা দিল এক মুহূর্তের জন্যে।

উপদ্রবের আঙুলগুলো সরাবার চেষ্ট আর না করে বললে,—হাত সরাও।

চোখের দৃষ্টিতে জ্বালা কিন্তু গলার স্বর শান্ত, দৃঢ়, অনুচ্চ।

হাত সরল না তবু।

তার বদলে শুধু একটু হাসি শোনা গেল—কৌতুকের চাপা হাসি।

সেই হাসির সুরে মেলানো একটু চিমটি-দেওয়া কথা, তারপর,—সরাতে ইচ্ছে করছে না যে! খুব খারাপ লাগছে কি?

মেয়েটি দাঁতে দাঁত চেপে বললে,—এতখানি সাহস তোমার হবে ভাবিনি।

ভাবনি!—সেই ঈষৎ কর্কশ কৌতুক-মেশানো গলা শোনা গেল,—স্ত্রীর কাছে স্বামীর কি সাহসের দরকার হয়!

মেয়েটি এক ঝটকায় ফিরে দাঁড়াল। ক্যামেরাও সেই সঙ্গে পিছিয়ে গেল খানিকটা। মেয়েটি আর পুরুষটিকে এক ফ্রেমে ধরবার জন্যে ঠিক যতটা দরকার।

স্বামী! তুমি স্বামিত্বের দাবি কর!—মেয়েটির চোখের দৃষ্টি আর কণ্ঠ দিয়ে আগুনের হল্কা বার হচ্ছে।—জান, এই মুহূর্তে আমি চিৎকার করতে পারি!

নিশ্চয় পার।—পুরুষটির গলায় ও মুখের ভাবে এবার কৌতুকের সঙ্গে একটা উদ্ধত তাচ্ছিল্য।—তাতে হবে কি নীল! তোমার সব পাড়া-পড়শীরা ছুটে এসে তোমাকে রক্ষা করবে আমায় উত্তম-মধ্যম দিয়ে? তোমার এই ফ্ল্যাট বাড়ির উইঢিবিতে সেরকম পরের দায় ঘাড়ে নেবার মানুষ আছে বলে তো মনে হয় না। চেঁচিয়ে তুমি গলা চিরে ফেললেও পুলিসের হাঙ্গামায় জড়িয়ে যাবার ভয়ে কেউ দরজা খুলে সাড়াও দেবে না। আর ধর তোমার এই ফ্ল্যাট বাড়ির কবুতর মহলে কেউ কেউ সত্যিই ছুটে এল বিপন্ন নারীকে উদ্ধার করতে! কি বলবে তুমি তাদের? একটা পাষণ্ড তোমার ঘরে ঢুকেছে পাশবিক অত্যাচার করতে? পারবে সে কথা বলতে?

পুরুষটি কথা বলতে শুরু করার পর থেকেই ধীরে ধীরে প্রায় যেন আমাদের অজান্তে ক্যামেরা এগিয়ে গিয়ে মেয়েটিকে ফ্রেম থেকে বাদ দিয়ে দাঁড়িয়েছে। পুরুষটিকে ভাল করে এবার লক্ষ্য করতে হবেই। বছর পঁয়ত্রিশ বয়স হবে। চেহারা খারাপ নয়। এককালে পুরুষালী একটা শ্রী-সৌষ্ঠব নিশ্চয় ছিল। বলিষ্ঠ ও কিছুটা ধারালো মুখ-চোখের ছাঁদে। কিন্তু চেহারা পোশাক সব কিছুর ওপর উদ্দাম উচ্ছৃঙ্খল জীবনের একটা ছাপ পড়ে সে শ্রী-সৌষ্ঠব প্রায় মুছে গেছে এখন। গায়ের যে শার্টটিই শুধু এখন পর্যন্ত দেখা গেছে তা ধোপদস্ত তো নয়ই--ঘাড়ের কলারের কাছটায় বেশ রোঁয়া-ওঠা। মুখে একদিনের না-কামানো গোঁফদাড়ির ছায়া। দৃষ্টি উজ্জ্বল হলেও চোখ বেশ কোটরে ঢোকা আর তার তলায় কালি। মুখের হাসিতে চোখে আর চেহারায় একটা বুদ্ধিদীপ্ত কৌতুকের আভা যা লাগে তা অপ্রীতিকর নয়, কিন্তু সেই সংগে দাঁতের পাটিতে যে সুস্থ উজ্জ্বলতার অভাব তাও লক্ষ্য না করে পারা যায় না।

পুরুষটির কথার শেষে ক্যামেরা তাকে ছেড়ে এতক্ষণের একটানা ছবির ধারা কেটে দিয়ে 'নীল' বলে যাকে সম্বোধন করা হয়েছে শুধু সেই মেয়েটির ওপর নিবদ্ধ হল।

'কি বলবে তুমি তাদের? একটা পাষণ্ড তোমার ঘরে ঢুকেছে পাশবিক অত্যাচার করতে? পারবে সে কথা বলতে?'—কথাগুলি 'নীল'-এর ছবির ওপর শোনা যাবার সঙ্গে তার মুখের ভাবান্তরও লক্ষ্য করা গেল। প্রথম একটু যেন বিব্রত অস্থির ভাব, তারপর স্থির কঠিন।

ওসব কথা বলবার দরকার হবে না।—গম্ভীর গলায় বললে 'নীল',—বিনা অনুমতিতে সম্পর্কহীন কোন পুরুষের পক্ষে কোন মেয়ের ঘরে ঢোকাই অপরাধ। বিশেষ করে মেয়েটি যেখানে অভিযোগ করছে।

হ্যাঁ,—পুরুষটি মুখে একটা ধূর্ত হাসি ফুটিয়ে স্বীকার করল,—সত্যিই যদি কেউ তোমার আর্তনাদে ছুটে আসে তাহলে তোমার নালিশের পর আমার জবানবন্দির জন্যে আর অপেক্ষা করবে না। সরাসরি আমার শ্রাদ্ধ করতে চাইবে। কিন্তু চাওয়াটাই তো সব নয়। আমার এ চেহারাটা খুব ভদ্রলোক ভালমানুষের নয়। চোখ রাঙিয়ে রুখে দাঁড়াবার ভঙ্গি করলে একটু থমকে যেতে হবে। সেই সুযোগে আমি যদি বলি যে আমি শ্রীঅনুপম চক্রবর্তী হলাম তোমার পরিত্যক্ত স্বামী—যার ঘর থেকে তুমি পালিয়ে এসে এখানে লুকিয়ে ঘর বেঁধেছ আর যে এতদিন বাদে তোমার খোঁজ পেয়ে তোমায় ফিরিয়ে নিয়ে যেতে এসেছে, তাহলে ব্যাপারটা একটু গোলমেলে হয়ে উঠতে পারে না কি?

নীল-এর কথা শেষ হবার পরই তাকে ছেড়ে আমরা শ্রীঅনুপম চক্রবর্তীকে দেখছিলাম। প্রথমে তার কোমর পর্যন্ত ছবিই দেখা গেছে, তারপর সেই ফ্রেমেই সে কথা বলতে বলতে সরে গিয়ে ঘরের এ-পর্যন্ত না-দেখা অংশের একটি 'সেটী'-তে গিয়ে আলস্যভরে গা এলিয়ে দেওয়ায় তার সমস্ত শরীরটাই দেখতে পাচ্ছি। ক্যামেরা তার চলাফেরার সঙ্গেই ঘোরানো হয়েছে। মাঝে শুধু কয়েক মুহূর্তের জন্যে আমরা নীলকে দেখেছি। মুখে অধৈর্যের ভ্রূকুটির সঙ্গে কৌতুকের হাসি নিয়ে সে যেখানে ফুল সাজাচ্ছিল সেখানেই

একটি দেয়ালে ঈষৎ হেলান দিয়ে অনুপমকে লক্ষ্য করছে।

'তোমার পরিত্যক্ত স্বামী, যার ঘর থেকে তুমি পালিয়ে এসে এখানে লুকিয়ে ঘর বেঁধেছ...'এই কথাগুলো 'নীল'-এর ছবির ওপর শোনা গেছে। তার মুখের ঈষৎ কৌতুকের হাসিটাও ফুটে উঠেছে 'যার ঘর থেকে তুমি পালিয়ে এসে এখানে লুকিয়ে ঘর বেঁধেছ...' কথাগুলোর সঙ্গে।

'সেটী'-তে গা এলিয়ে দিয়ে অনুপম এক মুহূর্ত থেমে গলা ও ভঙ্গি বদলে ফেলে সোজা হয়ে উঠে বসে একটু মধুরভাবে হাসল। তারপর ডান হাতের তর্জনী নেড়েই 'নীল'কে অন্তরঙ্গভাবে ইশারায় ডেকে প্রায় গাঢ় স্বরে বললে,—কিন্তু তুমিও কিছু চিৎকার করছ না, আর আমারও নিজের ওরকম সাফাই গাইবার দরকার হচ্ছে না। সুতরাং এসব বাজে কথা রেখে একটু কাছা-কাছি বসি এস। এস লক্ষ্মীটি! নীল আমার নীলিমা!

শেষ কথাগুলো নীল অর্থাৎ নীলিমার মুখের ওপর। অনুপমের গলার স্বরে আর 'নীল আমার নীলিমা' ডাকবার ধরনে যেন অশুভ যাদু আছে। নীলিমা যেন নিজের অনিচ্ছাতেই একটু শিউরে উঠল।

তারপর নিজেকে যেন জোর করে সামলে তুষার-শীতল কঠিন গলায় বললে,—না, তুমি যাও। এখনও ভাল কথায় বলছি এখুনি চলে যাও। তোমার এ অন্যায় জুলুম আমি বেশীক্ষণ সহ্য করব না।

নীলিমার শেষ কথাটা আমরা অনুপমের মুখের ছবির ওপর শুনলাম। তার মুখে রাগ নয়, মিটমিটি কৌতুকের হাসি।

চমৎকার!—যেন মুগ্ধ প্রশংসার দৃষ্টিতে নীলিমার দিকে চেয়ে সে বললে, —রাগলে এখনও তোমাকে কি মিষ্টিই দেখায়...

থাম!

নীলিমার তীব্র স্বরের আদেশটা অনুপমকে প্রায় চমকে থামিয়ে দিল। অদ্ভুত একটু মুখভঙ্গি করে সে কপট বাধ্যতার ভান করে বললে,—জো হুকুম! কিন্তু মাইরি, থুড়ি—সত্যি, প্রাণের কথাটাই বলছিলাম।

তোমার প্রাণের কথা শোনবার সময় বা সাধ আমার নেই।

নীলিমার ওপর ক্যামেরা নিবদ্ধ হল। তারপর তাকেই ফ্রেমে ধরে রেখে তার এগিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে পিছিয়ে এল সোফায় বসে-থাকা অনুপমকেও ছবিতে একত্র করবার জন্যে।

নীলিমা তখন উত্তেজিতভাবে এগিয়ে আসতে আসতে বলে চলেছে,—সত্যি করে বল কি তোমার আসল মতলব? আমার এ ঠিকানা খুঁজে বের করে কেন তুমি হানা দিতে এসেছ মূর্তিমান অভিশাপের মত? কি তুমি চাও? টাকা? মৌতাতের রসদে খাঁকতি পড়েছে, না জুয়ার দেনা শোধ করতে হবে?

নীলিমা শেষ কথাগুলো যখন বলছে তখন ক্যামেরায় অনুপমকেও তার সঙ্গে দেখছি। অনুপম 'সেটী'-তেই বসে কৌতুকের মুখভঙ্গি করে নীলিমার দিকে তাকিয়ে আছে আর নীলিমা তার সামনে দাঁড়িয়ে রাগে ফুলছে।

মৌতাতের রসদে খাঁকতি আর নেই কখন?—নীলিমার কথা শেষ হবার সঙ্গে কাঁধ নেড়ে দু-হাতের অসহায় ভঙ্গি করে বললে অনুপম,—দেবে তা মেটাবার টাকা? দাও। আপত্তি করব না। সত্যি কথা স্বীকার করছি কিছু

টাকা বাগাবার মতলব নিয়েই এসেছিলাম।

কথা বলতে বলতে অনুপম উঠে পড়ে নীলিমার মুখের দিকেই ঈষৎ কৌতুক ঈষৎ মুগ্ধতা মেশানো দৃষ্টি রেখে তার সামনে দিয়ে পায়চারি করতে শুরু করেছে। ক্যামেরা তাকেই কাছে থেকে অনুসরণ করছে বলে খানিক অনুপমকে একা দেখছি আর নীলিমার কাছ দিয়ে যাবার সময় দুজনকে পাচ্ছি একসঙ্গে।

পায়চারি করতে করতে অনুপম বলে চলেছে,—এমনি ইমারজেন্সীর জন্যে ঠিকানাটা আগে থাকতেই যোগাড় করা ছিল সুতরাং খুঁজে বার করার কোন ঝামেলা হয়নি। শুধু ভাবনা হচ্ছিল বাসায় যদি সুবিধেমত নিরিবিলিতে না পাই। যা চেয়েছিলাম তাই পেলাম। কিন্তু সব কেমন উল্টো হয়ে গেল।

'খুঁজে বার করার কোন ঝামেলা হয়নি।' জানাবার পরই অনুপম নীলিমার সামনে এসে থেমে দাঁড়িয়েছে। শেষ কথাগুলো বলেছে নীলিমার সামনেই। অনুপম দাঁড়িয়ে পড়বার পর আমরা তার একটু পেছন থেকে তার শেষ কথাগুলোর প্রতিক্রিয়া নীলিমার মুখে দেখেছি। যে প্রতিক্রিয়া বোঝা শক্ত। নীলিমার মুখ পাথরের মত কঠিন। চোয়াল দুটো দেখে মনে হচ্ছে সে যেন দাঁতে দাঁত চেপে বসে আছে। কিন্তু চোখের দৃষ্টিতে আর কোন যন্ত্রণার আভাস।

অনুপমের কথা শেষ হতেই নীলিমা শুকনো যান্ত্রিক গলায় বললে,—আর কথা বাড়াবার দরকার নেই। যে জন্যে এসেছ তাই নিয়ে আমায় রেহাই দাও।

কথাটা বলে নীলিমা ঘুরে দাঁড়িয়ে ঘরের আরেক দিকে এগিয়ে গেল। ক্যামেরাও সঙ্গে সঙ্গে গেল পেছন থেকে হাঁটুর খাঁজটা পর্যন্ত ফ্রেমে ধরে রেখে। নীলিমার হাঁটাটা যে সুন্দর, দেহের সুঠাম দোলায় তা স্পষ্ট হয়ে উঠল।

কয়েক সেকেণ্ডের জন্যে নীলিমাকে ছেড়ে অনুপমের মুখটা বড় করে এবার দেখলাম। নীলিমার গতিছন্দ দেখার অকপট প্রতিক্রিয়া তার মুখে বাঁকা ঈষৎ হাসির সঙ্গে কৌতুককুঞ্চিত চোখে কামনার একটু স্থূল উগ্রতায় ফুটে উঠেছে।

ক্যামেরা আবার নীলিমাকে ধরল। ওদিকের দেয়ালে রাখা সুদৃশ্য দেরাজের একটা ড্রয়ার এক ঝটকায় খুলে সে একটা ব্যাগ থেকে বেশ কয়েকটা নোট বার করলে, তারপর ড্রয়ারটা ঠেলে বন্ধ করে ঘুরে দাঁড়িয়ে বললে,—নাও, যা আমার কাছে ছিল সবই দিয়ে দিচ্ছি। এই নিয়ে দয়া করে বিদেয় হও। আর এ-কথাও মনে রেখ যে, এর পর দ্বিতীয়বার কখনও এলে এ ব্যবহার পাবে না।

নীলিমার কথার মাঝখানেই তাকে ছেড়ে ক্যামেরা অনুপমের মুখের ওপর গেছে। অনুপম নীলিমার কথা শুনতে শুনতে এগিয়ে আসছে আর ক্যামেরাও তাকে ধরে নিয়ে পিছিয়ে আসছে। অনুপম নীলিমার কাছে এসে দাঁড়াবার পর দুজনকে মিলিয়ে দিয়ে ক্যামেরাও থামল।

এ ব্যবহার পাব না?—কেমন একটা অদ্ভুত মুখভঙ্গি করে অনুপম বললে,—না পাওয়াই উচিত। সত্যি সত্যি এতগুলো টাকা তুমি দিয়ে ফেলবে তা কি আশা করতে পেরেছিলাম!

[বলতে বলতে অনুপম হাত বাড়িয়ে নীলিমার হাত থেকে টাকাগুলো

যেন ছোঁ মেরে নিয়ে আগ্রহভরে গুনতে শুরু করল। তার লুব্ধ উল্লসিত চোখ আর মুখে সাফল্যের হাসিটা দেখাবার জন্যে ক্যামেরা তখন নীলিমাকে ছেড়ে শুধু তাকেই আলাদা করে ধরেছে।]

এ যে প্রায় শ'দুই টাকা! গোনা শেষ করে মুখ তুলে একটু বিস্ময়ের দৃষ্টিতেই নীলিমার দিকে তাকিয়ে অনুপম বললে,—এতগুলো টাকা একসঙ্গে আমায় দিয়ে দিচ্ছ! আমায় বিদেয় করবার তাড়াতেই দিচ্ছ জানি, কিন্তু টাকা-গুলো এক কথায় বার করে দেবার ক্ষমতা তো তোমার হয়েছে। তার মানে অবস্থা তোমার এখন বেশ সচ্ছল। অবশ্য এ ঠিকানায় এসে তোমার বাসায় ঢুকেই তা বোঝা যায়।

[কথা বলতে বলতে অনুপম ঘরটা ঘুরে দেখবার জন্যেই পা চালাতে শুরু করেছে। ক্যামেরা একটু পিছিয়ে গিয়ে তার এই ঘোরাফেরাটাই অনুসরণ করছে।]

এমন কিছু আহামরি হয়ত নয়,—অনুপম ঘুরে ঘুরে দেখতে দেখতে কতকটা নিজের মনে বলেছে,—কিন্তু পরিচ্ছন্ন পরিপাটি, তোমার নিজের রুচির ছাপটাই এ ঘরে দেবার চেষ্টা করেছ। এমনি ঘরসংসার, এই জীবন তুমি চেয়েছিলে। রুচি প্রবৃত্তি তোমার একটু দো-আঁশলা। আমার সঙ্গে মেলে না। তা হোক, তার মধ্যে অন্ততঃ ভান নেই। আগেও ছিল না...

থাক্! যথেষ্ট হয়েছে!

নেপথ্যে নীলিমার তিক্ত স্বরে বলা কথাটায় একটু চমকে অনুপম ফিরে দাঁড়াল।

ক্যামেরা এবার নীলিমার ওপর। সে তিক্তস্বরে বলছে,—টাকা পাওয়ার কৃতজ্ঞতা আমায় ওভাবে জানাতে হবে না। তার বদলে আমায় একটু অনুগ্রহ করো। আর এক মুহূর্ত দেরি না করে চলে যাও এখুনি। আমার স্বামীর ফেরবার সময় হয়েছে। তিনি এসে তোমাকে এখানে দেখবেন এটা বাঞ্ছনীয় নয়।

[শেষ কথাগুলো শোনা গেল অনুপমের ওপর। তার মুখের ভাবে কি একটা সূক্ষ্ম পরিবর্তন এর মধ্যে হয়ে গেছে। সেই কৌতুকের হাসি আছে ঠোঁটের কোণে, কিন্তু চোখের দৃষ্টিতে কেমন একটু অস্বাভাবিক তীক্ষ্ণতা]

বাঞ্ছনীয় নিশ্চয় নয়?—একটু হেসে উঠে বললে অনুপম,—না তোমার পক্ষে বাঞ্ছনীয় নিশ্চয় নয়। স্বামীর কাছে এরকম একটা ব্যাপারের জবাবদিহিটা বেশ অস্বস্তিকর হতে পারে। বিশেষ করে নতুন স্বামীর কাছে। বেশী নয়, মাত্র বছর খানেকের স্বামী, হ্যাঁ কি নাম যেন তোমার নতুন স্বামীর? দত্ত, কি যেন দত্ত?—হ্যাঁ, এস দত্ত।—মানে শুভঙ্কর দত্ত। এই যে!

[কথা বলতে বলতে অনুপম আবার দেয়ালের পাশে পাশে ধীরে ধীরে চলতে শুরু করেছিল। যে জায়গায় এসে সে থামল সেখানে ছোট একটা রাইটিং টেবিলের ওপরে একটা ফটো-ফ্রেম রাখা। 'এই যে' বলে অনুপম ফটোটা তুলে নিয়ে যেন ভালো করে দেখবার জন্যে চোখের কাছে ধরল। ক্যামেরাও এগিয়ে গিয়ে এক ফ্রেমে বড় করে ফটোটা আর অনুপমের মুখটা ধরল। ফটোতে একটি বেশ প্রসন্ন শান্ত গোলগাল মুখ দেখা গেল। অনুপমের সঙ্গে সব দিক দিয়েই তার তফাত]

এই ইনি শ্রীশুভঙ্কর দত্ত—ফটোটা হাতে ধরে একটু যেন অকপট প্রশং-

সার সুরেই অনুপম বলে চলেছে,—উচ্ছৃংখল চরিত্রহীন অকর্মণ্য অপদার্থ ন'ন, দস্তুর মত সচ্চরিত্র সজ্জন, জীবনে সাফল্যের চূড়ায় ধাপে ধাপে উঠে চলেছেন। কোন এক বিলেতী কোম্পানীর যেন ডেভেলপমেন্ট অফিসার। একাগ্র চেষ্টায় অটুট নিষ্ঠায় আরো অনেক ওপরের ধাপে উঠবেন...

ফটোটা ধরে অনুপম কথা বলা শুরু করবার একটু পরেই ক্যামেরা তাকে ছেড়ে নীলিমার ওপর চলে গেছে। কথাগুলো যেন চাবুকের মত তার গায়ে লাগছে। মুখে-চোখে তার তীব্র রাগের জ্বালা। কোন রকমে যেন নিজেকে সামলে রেখে শেষে সে দ্রুতপায়ে এগিয়ে এসে এক ঝটকায় ফটোটা ছিনিয়ে নিলে অনুপমের হাত থেকে। ক্যামেরা তাকেই ধরে এনে অনুপমের সংগে তখন মিলিয়ে দিয়েছে।

তুমি নীচ ইতর অমানুষ!—ফটোটা ছিনিয়ে নিয়ে নীলিমা জলন্ত স্বরে তখন বলছে,—তোমার মত মানুষের তুলনায় উনি দেবতা। ও'র বড় চাকরিই তুমি হিংসা করো, ও'র মহত্ত্ব তোমার কল্পনারও বাইরে। টাকা পেয়েছ, যাও, এখুনি তুমি যাও। এ ঘরে দাঁড়িয়ে ও'কে বিদ্রূপ করতে তোমায় আমি দেব না।

নীলিমাকে ছেড়ে ক্যামেরা শেষের দিকে অনুপমকে ধরেছে। 'ও'র মহত্ত্ব তোমার কল্পনারও বাইরে' থেকে আরম্ভ করে শেষ অবধি নীলিমার কথা শুনে অনুপমের মুখে এই প্রথম বুঝি একটু বিষণ্ণ হাসি ফুটে উঠল।

আশ্চর্য! নীল, আশ্চর্য!—নীলিমার দিকে একটু যেন হতাশার ভংগিতে চেয়ে বললে অনুপম,—আমার গলার স্বরটাও তুমি ভুলে গেছ! তুমি কি জানো না, বিধাতা এমন বাঁকা করে আমায় গড়েছেন যে সোজা জিনিস আমার বাঁকা কাচে উল্টো দেখায়! চেহারা দেখলেই লোকে আমাকে শঠ কপট বলে সন্দেহ করে, আন্তরিকভাবে যা বলতে চাই, তা আমার এই বাঁকা হাসির ছাঁচে ঢালাই করা বেয়াড়া মুখের জন্যে বিদ্রূপের মত শোনায়। আমি তোমার শুভংকর দত্তকে বিদ্রূপ করে কিছু বলিনি। যা বলেছি, তার মধ্যে ঈর্ষার জ্বালা হয়ত একটু ছিল কিন্তু ব্যংগ কি অবজ্ঞা নয়। আজ আরো কিছু সরল সত্য আন্তরিকভাবে বলবার চেষ্টা করেছিলাম। এসেছিলাম শুধু কিছু টাকা বাগাবার মতলব নিয়েই কিন্তু চুপি চুপি ঘরে ঢুকে পেছন থেকে তোমায় দেখে সত্যিই কি যেন হয়ে গেল। কি হারাইয়াছেন আপনি জানেন না অবস্থাটা হয়েছে সেই থেকে। আমার বর্বরতা মাপ করো। কিন্ত...

[কথা বলতে বলতে অনুপম ক্রমশঃ নীলিমার দিকে এগিয়ে এসেছে। নীলিমা প্রথমে একটু পিছিয়ে গিয়েছিল, তারপর নিজের অজ্ঞাতসারেই স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছে। অনুপম কথার মাঝে একসময় একটা হাত ধরে ফেলেছে নীলিমার। তারপর সেটা নিজের দু হাতের মধ্যে ধরে রেখে আদর করে টিপতে টিপতে গাঢ় কথা বলে যাচ্ছে। ক্যামেরা দুজনকে অন্তরংগভাবে ধরে রেখেছে এখন।]

হাতছাড়া হয়ে গেছ বলেই তোমার দাম যেন—অনুপম তার সেই ছাঁচে জমানো ধূর্ত কৌতুকের হাসিটি মুখে নিয়েই বলে চলল,—এতদিনে ঠিকমত বুঝতে পারছি। তুমি আজ আমার নও, কিন্ত আকর্ষণটা তারই হলেও পরস্ত্রী বলে তোমায় ভাবতে পারছি কই? মনে হচ্ছে, শুধু ত ক'টা কাগজের হিজি-বিজি লেখা, তাই দিয়ে কি রক্তের বন্যাবেগ বেঁধে রাখা যায়...

[অনুপম আরো কাছে সরে গিয়ে একটা হাত নীলিমার কোমরের পেছনে দিয়ে তাকে কাছে টেনে এনেছে। হঠাৎ বেল বেজে উঠল। টেলিফোন নয়, নীচের দরজার কলিং বেল। নীলিমা চমকে পিছিয়ে সরে দাঁড়াল।]

দত্তই এলেন!—অনুপম যেখানে ছিল সেইখানেই দাঁড়িয়ে থেকে বললে, না, দত্ত ত নয়। তিনি কলিং বেল বাজিয়ে আসবেন কেন? দেখো কোন উপদ্রব আবার উপস্থিত।

[অনুপমের কথার মধ্যে আর একবার কলিং বেল বাজল। নীলিমা নীরবে অদ্ভুত এক দৃষ্টিতে অনুপমের দিকে এতক্ষণ চেয়েছিল। এবার যেন হঠাৎ চমক ভেঙে ঘুরে দাঁড়িয়ে ফটোটা কাছের টেবিলে রেখে চলে গেল নীচে কে এসেছে দেখবার জন্যে]

অনুপম চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল কয়েক মুহূর্ত। তারপর এদিক-ওদিক ঘুরে দেখতে দেখতে নীলিমা যেখানে ফুল সাজাচ্ছিল, সেখানে 'ভাস'টার সামনে গিয়ে দাঁড়াল। বেশ একটু মনোযোগ দিয়ে দেখল সাজানো ফুলগুলো। তারপর এদিক-ওদিক চেয়ে ঘরের এক কোণে আর একটা পেতলের বড় 'ফ্লাওয়ার ভাস' এর কাছে গিয়ে দাঁড়াল। সেখানে একটা আধা-শুকনো ফুলের তোড়া। তার ভেতর থেকে শুকনো লম্বা কাঁটা-ওঠা কটা কাঠি টানতে দেখিয়েই ক্যামেরা তাকে ছেড়ে দিলে।

ক্যামেরা এবার নীচে সিঁড়ির তলার ল্যাণ্ডিং-এ। নীলিমা টেলিগ্রাফ পিওনের খাতায় সই করে টেলিগ্রাম নিলে। তারপর সিঁড়ি দিয়ে উঠতে গিয়েও থেমে পড়ে খুলে ফেললে টেলিগ্রামটা। টেলিগ্রামটা আমরাও দেখতে পেলাম। ইংরেজীতে যা লেখা তার মর্মার্থ হল—আটকে পড়েছি। কাল পৌঁছোব। দত্ত।

টেলিগ্রামটা পড়ার পর হাতে নিয়ে বেশ কয়েক মুহূর্ত স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল নীলিমা। ক্যামেরা তার শুধু মুখটাকেই দেখছে। সে-মুখে যেন একটা গাঢ় আচ্ছন্নতা।

নীলিমা তারপর সিঁড়ি দিয়ে উঠে গেল।

ওপরে ঘরে ঢোকবার সময় তাকে সামনে থেকে দেখলাম। সে ঘরে ঢুকে প্রথমে একটু অবাক হয়ে এদিক-ওদিক চাইল, তারপর দূরে যেন অনুপমকে দেখতে পেয়ে সবিস্ময়ে বললে—ওকি! ওখানে কি করছ?

ক্যামেরা চলে গেল অনুপমের ওপর। সেও যেন একটু চমকে তাড়াতাড়ি দাঁড়িয়ে উঠে একটু হেসে বললে,—না, কিছু না।

[ক্যামেরায় শুধু অনুপমেরই পুরো চেহারাটা দেখা যাচ্ছিল। নীলিমা এসে সেখানে দাঁড়াবার সঙ্গে সঙ্গে ক্যামেরা একটু পিছিয়ে তাকে জায়গা দিলে।]

কি করছিলে কি!—বলে নীলিমা নিচের দিকে চেয়ে ভ্রূকুটি করলে। নিচের সাজানো ফুলের পাত্রটা অবশ্য ফ্রেমে নেই।

বললাম ত কিছু না! অনুপম তার মনোযোগটা অন্য দিকে ফিরিয়ে জিজ্ঞাসা করলে,—কে এসেছিল কে?

জিজ্ঞাসায় সঙ্গে সঙ্গে নীলিমার হাতের টেলিগ্রামটা দেখতে পেয়ে ছিনিয়ে নিলে অনুপম। আচমকা টান পড়ায় নীলিমা বাধা দিতে পারেনি।

অনুপমকে টেলিগ্রামের ভাঁজ খুলে পড়তে দেখে সে এবার তীব্র প্রতিবাদই জানালে, টেলিগ্রাম পড়ছ কেন? দাও।

অনুপমের টেলিগ্রাম পড়া তখন হয়ে গেছে। সেটা নীলিমার হাতে ফিরিয়ে দিয়ে হেসে বললে,—চিঠি ত নয়, টেলিগ্রাম পড়তে দোষ কি? একটু থেমে আবার বললে,—চিঠি হলেও অবশ্য পড়তে আপত্তি করতাম না। নীচ, ইতর কি বলবে বলো এবার।

সে-সব কিছুই বলব না—নীলিমা শান্ত স্বরে বললে,—এবার তুমি যাও।

যেতে বলছ!—নীলিমার দিকে চেয়ে অদ্ভুতভাবে হাসল অনুপম—আর যাবার কি দরকার আছে? রাস্তা ত আমাদের পরিষ্কার। আজকের রাত্রের মত কোনো ভাবনা নেই। কি মহাপ্রলয় হয় পৃথিবীতে যদি থেকে যাই?

কোনো উত্তর দিলে না নীলিমা। তীব্র দুর্বোধ দৃষ্টিতে শুধু চেয়ে রইল অনুপমের দিকে।

অনেকক্ষণ নীরবে সে-দৃষ্টির সঙ্গে পাল্লা দেবার চেষ্টা ক'রে যেন হেরে গিয়ে বেশ একটু সশব্দে হেসে অনুপম বললে,—না, পকেটের এ-টাকাগুলো ওড়বার জন্যে ছটফট করছে। যেতেই হয় সুতরাং।

শুধু ওইটুকু বলেই চলে যেতে যেতে খানিক গিয়েই ফিরে দাঁড়াল অনুপম। ক্যামেরা তাকেই অনুসরণ করে গেছে সেখানে।

দরজা-টরজা কিন্তু ভালো করে বন্ধ করে রেখো নীল।—এখনই যেন নেশায় গলাটা জড়িয়েছে বলে ভান করে অনুপম বললে, নেশা তেমন চাপলে হয়ত এখানে হানা দিতে আসতেও পারি।

কথাটা বলেই আর এক মুহূর্ত দাঁড়াল না অনুপম। যেন মিলিটারি কায়দায় ফিরে দাঁড়িয়ে গট গট করে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

ওই পর্যন্ত দেখেই ক্যামেরা ফিরল নীলিমার মুখের ওপর। স্তব্ধ হয়ে সে দাঁড়িয়ে আছে।

বেশ কিছুক্ষণ অমনি নিস্পন্দ হয়ে সে দাঁড়িয়ে রইল, তারপর ফিরল তার সেই সাজানো ফুলের পাত্রের দিকে।

সে দিকে তাকাবার সঙ্গে সঙ্গে তার চোখের বিস্ময় স্পষ্ট হয়ে উঠল।

সে নিচু হয়ে বসবার পর তার পেছন থেকে ক্যামেরায় বিস্ময়ের কারণটা বুঝলাম।

ফুলগুলো তখন নতুনভাবে সাজানো। নীলিমা যখন নীচে টেলিগ্রামটা নিতে গিয়েছিল, তখন অনুপমই সাজিয়েছে।

সাজানো বলতে কিছু নয়, বাহারী ফুল পাতার মধ্যে তিনটে শুকনো, কাঁটা-ওঠা মরা কাঠি আঁকাবাঁকা ভাবে পোঁতা।

সব মিলে অদ্ভুত একটা চেহারা তাতে হয়েছে।

রবিনশন ক্রুশো মেয়ে ছিলেন?

"রবিনসন ক্রুশো! আসলে তিনি কে ছিলেন জানেন, এক জন মেয়ে।" সকলের দিকে চেয়ে একটু অনুকম্পার হাসি হেসে ঘনশ্যামবাবু বললেন, "তবে আপনারা আর সে কথা জানবেন কি করে?"

আহত অভিমানে শিবপদবাবু কি একটা বলতে যাচ্ছিলেন কিন্তু আর সকলের চোখের ইশারায় নিজেকে তিনি সামলে নিলেন।

ঘনশ্যামবাবুর এই উক্তি নিঃশব্দে হজম করে উৎসুক ভাবে সকলে তাঁর দিকে তাকালেন।

ঘনশ্যামবাবুর কথার প্রতিবাদ পারতপক্ষে কেউ আজকাল করেন না।

কেন যে করেন না তা বুঝতে গেলে ঘনশ্যামবাবুর এই বিশেষ আসরটি ও তাঁর নিজের একটু পরিচয় বোধ হয় দেওয়া দরকার।

কলকাতা শহরের দক্ষিণে একটি কৃত্রিম জলাশয় আছে করুণ রসিকতার সংগে আমরা যাকে হ্রদ বলে অভিহিত করে থাকি। জীবনে যাদের কোন উদ্দেশ্য নেই অথবা উদ্দশ্যের একাগ্র অনুসরণে যারা পরিশ্রান্ত, উভয় জাতের সকল বয়সের স্ত্রী-পুরুষ নাগরিক প্রতি সন্ধ্যায় সেই জলাশয়ের চারিধারে এসে নিজের নিজের রুচি-মাফিক স্বাস্থ্য অর্থ কাম মোক্ষ এই নব চতুর্বর্গের সাধনায় একা একা বা দল বেঁধে ঘুরে বেড়ায় বা বসে থাকে।

এই জলাশয়ের দক্ষিণ পাড়ে জলের কাছাকাছি এক একটি নাতিবৃহৎ বৃক্ষকে কেন্দ্র করে কয়েকটি বৃত্তাকার আসন পরিশ্রান্ত বা দুর্বল পথিক ও নিসর্গদৃশ্যবিলাসীদের জন্য পাতা আছে।

ভালো করে লক্ষ্য করলে এরকম একটি বৃত্তাকার আসনে প্রায় প্রতিদিনই সন্ধ্যায় পাঁচটি প্রাণীকে একত্র দেখা যাবে। তাঁদের এক জনের শিরোশোভা কাশের মত শুভ্র, এক জনের মস্তক মর্মরের মত মসৃণ, এক জনের উদর কুম্ভের মত স্ফীত, এক জন মেদভারে হস্তীর মত বিপুল আর এক জন উষ্ট্রের মত শীর্ণ ও সামঞ্জস্যহীন।

প্রতি সন্ধ্যায় এই পাঁচ জনের মধ্যে অন্তত চার জন বিশ্রাম-আসনে এসে সমবেত হন এবং আকাশের আলো নির্বাপিত হয়ে জলাশয়ের চারি পার্শ্বের আলো জ্বলে ওঠার পর ফেরিওয়ালাদের ডাক বিরল না হওয়া অবধি স্বাস্থ্য থেকে সাম্রাজ্যবাদ ও বাজার-দর থেকে বেদান্ত-দর্শন পর্যন্ত যাবতীয় তত্ত্ব আলোচনা করে থাকেন।

ঘনশ্যামবাবুকে এ সভার প্রাণ বলা যেতে পারে, প্রাণান্তও অবশ্য তিনিই। এ আসর কবে থেকে যে তিনি অলংকৃত করেছেন ঠিক জানা নেই, তবে তাঁর আবির্ভাবের পর থেকে এ আসরের প্রকৃতি ও সুর একেবারে বদলে গেছে। কুম্ভের মত উদরদেশ যাঁর স্ফীত সেই রামশরণবাবু আগেকার মত তাঁর ভোজন-বিলাসের কাহিনী নির্বিঘ্নে সবিস্তারে বলার আর সুযোগ পান না, ঘনশ্যাম-বাবু তার মধ্যে ফোড়ন কেটে সমস্ত রস পাল্টে দেন।

রামশরণবাবু হয়ত সবে গাজরের হালুয়ার কথা তুলেছেন, ঘনশ্যামবাবু

তারই মধ্যে রানী এলিজাবেথের আমলে প্রথম কি ভাবে হল্যান্ড থেকে ইংলন্ডে গাজরের প্রচলন হয় তার কাহিনী এনে ফেলে সমস্ত প্রসঙ্গটার মোড় ঘুরিয়ে দেন।

কোনদিন বিলিতী বেগুনের 'জেলি' সম্বন্ধে রামশরণবাবুর উপাদেয় আলোচনা শুরু না হতেই ঘনশ্যামবাবু তাঁর শীর্ণ হাড়বেরুন মুখে একটু অবজ্ঞার হাসি টেনে বলেন, "হ্যাঁ, বেগুন বলতে পারেন, তবে বিলিতী নয়।"

তার পর কবে ২০০ খ্রীষ্টাব্দে গ্যালেন নামে কোন্ গ্রীক বৈদ্য মিশর থেকে আমদানি এই তরকারিটির বিশদ বিবরণ লিখে গিয়েছিলেন, তারও প্রায় বার শ বছর বাদে দক্ষিণ আমেরিকার পেরু থেকে কিভাবে জিটোমেট্ নামে অ্যাজ্‌টেক্ জাতের এই তরকারিটি টোম্যাটো নামে ইংলন্ডে ইউরোপে প্রচলিত হয়, বিষাক্ত ভেবে কত দিন পর্যন্ত খাদ্যহিসাবে টোম্যাটো ব্যবহৃত হয়নি সেই কাহিনী সবিস্তারে বলে ঘনশ্যামবাবু ভোজন-বিলাসের প্রসঙ্গকে ইতিহাস করে তোলেন।

মস্তক যাঁর মর্মরের মত মসৃণ—বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব ইতিহাসের অধ্যাপক শিবপদবাবুর ঐতিহাসিক কাহিনীকেও আবার তেমনি ভোজন-বিলাসের গল্পে তিনি অনায়াসে ঘুরিয়ে দেন।

আসল কথা এই যে সব বিষয়ে শেষ কথা ঘনশ্যামবাবু বলে থাকেন। তাঁর কথা যখন শেষ হয় তখন আর কিছু বলবার সময় কারুর থাকে না।

তাঁর ওপর টেক্কা দিয়ে কারুর কিছু বলাও কঠিন। কথায় কথায় এমন সব অশ্রুতপূর্ব উল্লেখ ও উদ্ধৃতি তিনি করে বসেন, নিজেদের অজ্ঞতা প্রকাশ পাবার ভয়েই যার প্রতিবাদ করতে কারুর সাহসে কুলোয় না।

ঘনশ্যামবাবু এই সান্ধ্য আসরের প্রাণস্বরূপ হলেও তাঁর সম্বন্ধে বিশেষ কিছু কারুর জানা নেই। কলকাতার কোন এক মেসে তিনি থাকেন ও ছেলে-ছোকরাদের মহলে ঘনাদা-রূপে তাঁর অল্প-বিস্তর একটা খ্যাতি আছে এইটুকু মাত্র সবাই জানে। শীর্ণ পাকানো চেহারা দেখে তাঁর বয়স অনুমান করা কঠিন, আর তাঁর মুখের কথা শুনলে মনে হয় পৃথিবীতে এমন কোন স্থান নেই যেখানে তিনি যাননি, এমন কোন বিদ্যা নেই যার চর্চা তিনি করেন না। প্রাচীন নালন্দা, তক্ষশিলা থেকে অক্সফোর্ড কেম্ব্রিজ হার্ভার্ড, চীনের প্রাচীন পিপিন থেকে ইউরোপের সালের্নো, প্রাগ, হিডেলবার্গ, লাইপ্‌জিগ্ পর্যন্ত সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গেই তাঁর প্রত্যক্ষ যোগাযোগ আছে বলে মনে হয়।

তাঁর পাণ্ডিত্যে যত ভেজালই থাক তার প্রকাশে যে মুনশীয়ানা আছে একথা স্বীকার করতেই হয়।

তাঁর কথার প্রতিবাদ না করে আমরা আজকাল তাই নীরবে তাতে সায় দিয়ে থাকি।

রবিনসন ক্রুশোর প্রসঙ্গটার বেলায়ও সেই জন্যেই জিভের উদ্যত বিদ্রোহ আমরা কোনরকমে সামলে নিলাম।

মাথার কেশ যাঁর কাশের মত শুভ্র সেই হরিসাধনবাবুর ছোট্ট দৌহিত্রীটির দরুন সেদিন প্রসঙ্গটা উঠেছিল।

দৌহিত্রীটিকে সেদিন হরিসাধনবাবু বুঝি আদর করে সঙ্গে নিয়ে এসে-ছিলেন। যে বয়সে ছেলেদের সঙ্গে তাদের পার্থক্যটা মেয়েরা বুঝতে শেখে না

বা বুঝেও মানতে চায় না, মেয়েটির বয়স ঠিক তাই। আমাদের গল্প-গুজবের মধ্যে কিছুকাল মনোনিবেশ করবার বৃথা চেষ্টা করে, হ্রদের মাঝখানের দ্বীপের মত জায়গাটিকে দেখিয়ে সে বুঝি বলেছিল, "দেখেছ দাদু, ঠিক যেন রবিনসন ক্রুশোর দ্বীপ!"

দাদু কিংবা আর কারুর মনোযোগ তবু আকর্ষণ না করতে পেরে সে আবার বলেছিল, "বড় হলে আমি রবিনসন ক্রুশো হব জানো।"

এত বড় একটা দুঃসাহসিক উক্তির প্রতি উদাসীন থাকা আর বুঝি আমাদের সম্ভব হয়নি। মেদভারে যাঁর দেহ হস্তীর মত বিপুল সেই চিন্তাহরণবাবু হেসে বলেছিলেন, "তা কি হয় রে পাগলী! মেয়েছেলে কি রবিনসন ক্রুশো হ'তে পারে?"

মেয়েটির হয়ে হঠাৎ ঘনশ্যামবাবুই প্রতিবাদ করে বললেন, "কেন হয় না?"

একটু চুপ করে কিঞ্চিৎ অনুকম্পার সঙ্গে আমাদের দিকে চেয়ে তিনি আবার যা বললেন, তার উল্লেখ আগেই করেছি।

আমাদের কোন প্রতিবাদ করতে না দেখে ঘনশ্যামবাবু এবার শুরু করলেন, "রবিনসন ক্রুশো ড্যানিয়েল ডিফোর লেখা বলেই আপনারা জানেন। এ গল্পের মূল কোথায় তিনি পেয়েছিলেন তা জানেন কি?"

মস্তক যাঁর মর্মরের মত মসৃণ সেই শিবপদবাবু সসংকোচে বললেন, "যতদূর জানি, আলেকজাণ্ডার সেলকার্ক বলে একজন নাবিকের জীবনের অভিজ্ঞতা শুনেই এ গল্প তিনি বানিয়েছিলেন।"

"যা জানেন তা ভুল!" ঘনশ্যামবাবুর মুখে করুণামিশ্রিত অবজ্ঞা ফুটে উঠল, "আত্মম্ভরি ইংরেজ সাহিত্যিকরা আসল কথা চেপে গিয়ে যা লিখে গেছে তাই অম্লান বদনে বিশ্বাস করেছেন। মনমাউথের বিদ্রোহে যোগ দেবার জন্যে ড্যানিয়েলের একবার ফাঁসি হবার উপক্রম হয় জানেন তো? লণ্ডনের বাসিন্দা বলে কোন রকমে সে যাত্রা তিনি রক্ষা পান। তার পর নতুন রাজা-রানী উইলিয়ম আর মেরী দেশে আসাব পর ড্যানিয়েল কুগ্রহ কাটিয়ে বেশ কিছু প্রতিষ্ঠা অর্জন করেন। সেই সময়ে ব্যবসা সংক্রান্ত কাজে তাঁকে যেতে হয় স্পেনে! সেই স্পেনেই মাদ্রিদ শহরের এক ইহুদী বুড়োর দোকানে খুঁটি-নাটি জিনিসপত্র ঘাঁটতে ঘাঁটতে একটি ত্রয়োদশ শতাব্দীর পুঁথি পেয়ে তিনি অবাক হয়ে যান। সে পুঁথির অনুলেখক রাস্টিসিয়ানো আর তার কথক স্বয়ং মার্কো পোলো।"

উদর যাঁর কুম্ভের মত স্ফীত সেই রামশরণবাবু সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করলেন, "মার্কো পোলো মানে, যিনি ইউরোপ থেকে প্রথম চীনে গেছলেন পর্যটক হয়ে, রবিনসন ক্রুশোর মূল গল্পের লেখক তা হলে তিনি!"

একটু রহস্যময় ভাবে হেসে ঘনশ্যামবাবু বললেন, "না, তিনি হবেন কেন! তিনি শুধু সে গল্প সংগ্রহ করে এনেছিলেন মাত্র। সংগ্রহ করেছিলেন চীন থেকে।

ষোল বছর বয়সে মার্কো পোলো তাঁর বাপ আর কাকার সঙ্গে পৃথিবীর অদ্বিতীয় সম্রাট কুবলাই খাঁর রাজধানী ক্যাম্বালুকের উদ্দেশে সাগর-সম্রাজ্ঞী ভেনিসের তীর থেকে রওনা হন। ফিরে যখন আসেন তখন তাঁর বয়স এক-চল্লিশ। দীর্ঘ পঁচিশ বছর ধরে অর্ধ-পৃথিবীর অধীশ্বর কুবলাই খাঁর বিশ্বস্ত

কর্মচারীরূপে প্রায় সমস্ত চীন তিনি পর্যটন করে ফিরেছেন। ১২৮২ খ্রীষ্টাব্দে ইয়াং চাওয়ের এক লবণের খনির পরিদর্শক হিসেবে কাজ করবার সময় বিখ্যাত চীনা লেখক ও সম্পাদক সান কাও চি-র সঙ্গে তাঁর সম্ভবত সাক্ষাৎ হয়। সান কাও চি তখন অতীতের সমস্ত চীনা-কাহিনী ও কিংবদন্তী সংগ্রহ করে তাতে নতুন রূপ দিচ্ছেন। সেই সান কাও চি-র কাছে শোনা একটি চীনা গল্পই রবিনসন ক্রুশোর প্রধান প্রেরণা।

মার্কো পোলোরা চীন থেকে তাঁদের বিশ্রী নোংরা বেঢপ তাতার পোশাকের ভেতরে সেলাই করে শুধু হীরা মতি নীলা চুনিই নয় আরো অনেক কিছুই এনেছিলেন। ভেনিসের ডোজে-কে তাঁরা যা যা উপহার দেন, ১৩৫১ সালে লেখা মারিনো ফালেইরোর প্রাসাদের মূল্যবান দ্রব্যের তালিকায় তার কিছু বিবরণ পাওয়া যায়। সে সব উপহারের মধ্যে ছিল স্বয়ং কুবলাই খাঁর দেওয়া আংটি, তাতারদের কলার, তেফলা একটি তরবারি, টাংগুটের চমরী গাই-এর রেশমী লোম, কস্তুরী-মৃগের শুকিয়ে রাখা পা আর মাথা, সুমাত্রার নীল-গাছের বীজ।

কিন্তু বাইরে যা এনেছিলেন তার চেয়ে অনেক বেশী সম্পদ এনেছিলেন পোলো তাঁর স্মৃতিতে বহন করে। জেনোয়ার কারাগারে বসে সেই স্মৃতি-সমুদ্র মন্থিত কাহিনীই তিনি মুগ্ধ শ্রোতাদের কাছে বলে যেতেন।

মুগ্ধ শ্রোতা কারা? না, শুধু তাঁর কারাসঙ্গীরা নয়, জেনোয়ার অভিজাত সম্প্রদায়ের আমীর-ওমরাহ পুরুষ-মহিলা সবাই। এই কারাকক্ষ তখন জেনো-য়ার তীর্থস্থান হয়ে দাঁড়িয়েছে—রূপকথার চেয়ে বিচিত্র, সুদূর ক্যাথের অপরূপ কাহিনীর মধুতীর্থ।

কিন্তু সাগর-সম্রাজ্ঞী ভেনিসের পরম শ্রদ্ধা-ভালবাসার পাত্র মার্কো পোলো জেনোয়ার কারাগারে কেন? সে অনেক কথা। দেশে ফেরবার মাত্র তিন বছর বাদে ভেনিসের চির প্রতিদ্বন্দ্বী জেনোয়ার নৌবাহিনী লাম্বা দোরিয়ার নেতৃত্বে একেবারে আদ্রিয়াতিক সাগরে চড়াও হয়ে এল। আর সকলের সঙ্গে মার্কো পোলো গেলেন একটি রণতরীর অধিনায়ক হয়ে যুদ্ধে। সেই যুদ্ধে পরাজিত হয়েই জেনোয়ার আরো সাত হাজার ভেনিসবাসীর সঙ্গে তিনি বন্দী হলেন।

জেনোয়ার কারাগারে তার মুগ্ধ শ্রোতাদের মধ্যে হেলে-পড়া মিনারের শহর পিসার এক নাগরিক ছিলেন। নাম তাঁর রাস্টিসিয়ানো। কাব্যের ভাষা প্রেমের কাহিনীর অপরূপ ভাষা হিসেবে ফরাসী তখনই ইউরোপে সর্বেসর্বা হয়ে উঠেছে। পিসার লোক হলেও সেই ফরাসী ভাষায় রাস্টিসিয়ানোর অসাধারণ দখল ছিল। মার্কো পোলোর অপূর্ব সব কাহিনী সেই ভাষায় তিনি টুকে রাখতেন।

তাঁর সেই টুকে রাখা কাহিনীই সারা ইউরোপে ছড়িয়ে পড়েছে তার পর। দেড় শ বছর বাদে জেনোয়ার আর এক নাবিক সেই কাহিনীর ল্যাটিন অনুবাদ পড়তে পড়তে, সিপাঙ্গুর সোনায় মোড়া প্রাসাদচূড়া যেখানে প্রভাত-সূর্যের আলোয় ঝলমল করে সেই সুদূর ক্যাথের স্বপ্নে বিভোর হয়ে গেছেন। সে নাবিকের নিজের হাতে সই করা ও পাতার ধারে ধারে মন্তব্য লেখা বই এখনো সেভিলের কলম্বিনায় গেলে দেখতে পাওয়া যায়। সে নাবিকের নাম কলম্বাস।

আরো প্রায় দু'শ বছর বাদে ড্যানিয়েল ডিফো মাদ্রিদের এক টুকি-টাকি শখের জিনিসের দোকানে রাস্টিসিয়ানোর অনুলিখিত এমনি আর একটি পুঁথির সন্ধান পান। সেই পুঁথি থেকেই তেত্রিশ বছর বাদে রবিনসন ক্রুশোর গল্প তিনি গড়ে তোলেন।"

মর্মরের মত মস্তক যাঁর মসৃণ সেই শিবপদবাবু এবার বুঝি না বলে পারলেন না, "কিন্তু রবিনসন ক্রুশো মেয়ে হলেন কি করে?"

"সান কাও চি-র যে গল্প মার্কো পোলোর মুখে শুনে রাস্টিসিয়ানো টুকে রেখেছিলেন, তাতে মেয়ে বলেই তাঁকে বর্ণনা করা আছে বলে। ড্যানি-য়েল অবশ্য সে গল্পের নায়িকার নাম ও জাত দুই-ই পাল্টেছেন।"

মাথায় কেশ যাঁর কাশের মত শুভ্র সেই হরিসাধনবাবু বললেন, "কিন্তু সেই পুঁথির গল্পটা কি শুনতে পারি?"

"সে গল্প শুনতে চান? কিন্তু আসল কাহিনী অনেক দীর্ঘ, সংক্ষেপে তার সারটুকু আপনাদের বলছি শুনুন...

সুং রাজবংশের রাজধানী তখনও উত্তরের কাইফেং থেকে টাঙগুত দৌরাত্ম্যে কিন্‌সাই নগরে সরিয়ে আনা হয়নি। পৃথিবীর আশ্চর্যতম শহর হিসেবে কিন্‌সাই-এর নাম কিন্তু তখনি মালয়, ভারতবর্ষ, পারস্য ছাড়িয়ে সুদূর ইউরোপে পর্যন্ত পৌঁছেছে। দ্বাদশ তোরণ ও দ্বাদশ সহস্র সেতুর এই নগরে চুয়ান-উ নামে এক সদাগর তখন বাস করেন। সদাগরের মণি-মাণিক্য ধন-রত্নের অবধি ছিল না, কিন্তু সবচেয়ে মূল্যবান যে সম্পদ তাঁর ছিল, সে হল তাঁর এক মাত্র কন্যা নান সু।

কিন্‌সাই-এর খ্যাতি যেমন সারা পৃথিবীতে, নান সু-র রূপের খ্যাতি তেমনি সারা চীনে তখন ছড়িয়ে গেছে। অসামান্য রূপ, হয় নিজের, নয় সং-সারের সর্বনাশ ডেকে আনে। নান সু-র রূপের বেলায়ও সে নিয়মের ব্যতি-ক্রম হল না। উত্তরের কিতানরা তখন কাইফেং-এর ওপর সমুদ্রের তরঙ্গের মত বার বার হানা দিচ্ছে। সেই কিতানদের দলপতি চুয়ো সান্-এর কানে একদিন কি করে নান সু-র অসামান্য রূপ-লাবণ্যের খবর পৌঁছোল। কাইফেং-এর নগরপ্রাকারের ধারে তার দুরন্ত সৈন্য-বাহিনীকে থামিয়ে চুয়ো সান্ তার সন্ধির শর্ত সুং রাজসভায় জানিয়ে পাঠাল। দ্বাদশ তোরন ও দ্বাদশ সহস্র সেতুর যে নগরের মরকত নীল হ্রদের জলে স্বপ্নের মত সব হরিৎ দ্বীপ ভাসে, সেই নগরের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ, চীনের নয়নের মণি নান সু-কে তার চাই। নান সু-কে পেলেই কাইফেং-এর প্রান্ত থেকে ভাঁটার সমুদ্রের মত তার দুর্ধর্ষ বাহিনী সরে যাবে।

সমস্ত চীন চঞ্চল হয়ে উঠল এ সংবাদে, রাজসভা হ'ল চিন্তিত, নান সু-র পিতা চুয়ান-উ সদাগর প্রমাদ গণলেন।

একটি মাত্র মেয়ের জীবন বলি দিয়ে সমগ্র চীনের শান্তি ক্রয় করতে সুং রাজসভা শেষ পর্যন্ত দ্বিধা করলেন না। চুয়ান-উর কাছে আদেশ এল নান সু-কে কাইফেং-এ পাঠাবার।

জাফ্‌রি কাটা জানলার বাইরে গজদন্তের পাখার ওপর দিয়ে ব্রীড়াবনতা নব-যৌবনা নান সু তখন বাইরের পৃথিবীর যেটুকু পরিচয় পেয়েছে তার সমস্তই জুড়ে আছে একটি মাত্র মানুষের মুখ। সে মুখ ভিন্‌সাই নগরের

তরুণ নৌ-সেনাপতি সি হুয়ান-এর।

নান সু কেঁদে পড়ল বাপের পায়ে, নতজানু হল সি হুয়ান। কিন্তু চুয়ান-উ নিরুপায়। রাজাদেশ লংঘন করার শক্তি তাঁর নেই।

যেতেই হবে নান সু-কে সেই বর্বর কিতান দলপতিকে বরণ করবার জন্যে উত্তরের সেই হিমের দেশে। নিয়তির নিষ্ঠুর পরিহাসে সি হুয়ানের ওপরই নান সু-কে নিয়ে যাবার ভার পড়ল।

দ্বাদশ তোরণ আর দ্বাদশ সহস্র সেতুর নগর থেকে সি হুয়ানের রণপোত যেদিন মেঘের মত সাদা পাল মেলে রওনা হল, সমস্ত কিন্‌সাই নগর সেদিন চোখের জল ফেললে। কিন্তু সি হুয়ান আর নান সু-র মনে কোন দুঃখ সেদিন নেই। ভাগ্য তাদের যদি পরিহার করে থাকে ভাগ্যকেও তারা বঞ্চনা করবে—এই তাদের সংকল্প।

সাত দিন সাত রাত রণপোত ভেসে চলল সীমাহীন সাগরে। রণপোতের হাল ধরে আছে স্বয়ং সি হুয়ান। উত্তরে হিমের দেশের কোন বন্দর নয়, দক্ষিণের রৌদ্রোজ্জ্বল সাগরের মায়াময় কোন দ্বীপই তার লক্ষ্য। একবার সেখানে পেঁৗছোলে নিঃশব্দে রাত্রের অন্ধকারে নান সু-কে নিয়ে সে নেমে যাবে। সুং সাম্রাজের অবিচার আর বর্বর কিতান বাহিনীর অত্যাচার যেখানে পেঁৗছোয় না তেমনি এক নির্জন দ্বীপে নান সু-কে নিয়ে সে ঘর বাঁধবে। হাল্কা হাঁসের পালকের ভেলা সে জন্যে সে আগে থাকতেই সঙ্গে নিয়ে এসেছে।

মানুষের এ স্পর্ধায় ভাগ্য বুঝি তখন মনে মনে হাসছে। সাত দিন সাত রাত্রি বাদে হঠাৎ দুর্যোগ ঘনিয়ে এল আকাশে। দুর্যোগ ঘনাল মানুষের মনে।

সি হুয়ান নিজের হাতে হাল ধরায় তার অনুচরেরা গোড়া থেকেই একটু বিস্মিত হয়েছিল। সাত দিন রাত্রিতেও গন্তব্য স্থানে না পেঁৗছে তারা সন্দিগ্ধ হয়ে উঠল। উত্তর নয় দক্ষিণ দিকেই তাদের রণপোত চলেছে আকাশের তারাদের অবস্থানে সে কথা বোঝবার পর তাদের সে সন্দেহ জ্বলে উঠল বিদ্রোহ হয়ে।

রাত্রের আকাশে তখন প্রচণ্ড ঝড় উঠেছে। সমুদ্র উঠেছে উত্তাল হয়ে। ভাগ্যের সঙ্গে যারা জুয়া খেলে বিপদকেই সুযোগরূপে ব্যবহার করবার সাহস তারা রাখে। এই ঝটিকা ক্ষুব্ধ সমুদ্রেই পালকের ভেলা সমেত নান সু-কে নিচে নামিযে সি হুয়ান তখন নিজে নেমে যাবার উপক্রম করেছে। বিদ্রোহী অনুচরেরা হঠাৎ এসে তাকে ধরে বেঁধে ফেলল।

উন্মত্ত এক তরঙ্গের আঘাতে রণপোত থেকে ভেলা সমেত দূরে উৎক্ষিপ্ত হতে হতে নান সু শুধু ঝড়ের গর্জন ছাপিয়ে একটা চীৎকার শুনতে পেল,—"ভয় নেই নান সু, ভয় নেই। আমি যাচ্ছি। আমি যাব-ই।"

জ্ঞান যখন হল নান সু-র ভেলা তখন ছোট্ট এক পার্বত্য দ্বীপের সৈকতের ওপর পড়ে আছে।

সভয়ে নান সু উঠে বসল, উৎকণ্ঠিত ভাবে তাকাল চারিদিকে। কয়েকটা সাগর-পাখী ছাড়া কোথাও কোন জনপ্রাণী নেই। দূরে অশান্ত নীল সমুদ্রের ঢেউ পার্বত্য তটের ওপর ক্ষণে ক্ষণে আছড়ে এসে পড়ছে।

শশকের মত ক্ষুদ্র নবনী-কোমল নান সু-র পা—সে-পা ত কঠিন পার্বত্য ভূমির ওপর দিয়ে হাঁটবার জন্যে নয়, তবু নান সু-কে ক্ষতবিক্ষত পায়ে

সমস্ত দ্বীপ পরিভ্রমণ করতে হল। কোথায় কোন জনপ্রাণীর দেখা সে পেলে না।

তুষার-ধবল নান সু-র অতি সুকোমল হাত ;—গজদন্তের চিত্রিত পাখা ছাড়া আর কিছু যে হাত কখন নাড়েনি, তবু সেই হাতে কণ্টকগুল্ম থেকে ফল ছিঁড়ে নান সু-কে ক্ষুধা নিবৃত্তি করতে হল।

ভীরু সলজ্জ নান সু-র চোখ,—আঁখিপল্লব তার কাঁপতে কাঁপতে একটু উঠেই চিরকাল নেমে এসেছে ; তবু সেই চোখ উৎকণ্ঠিত ভাবে মেলে পাহাড়ের চূড়া থেকে দূরে সাগরের দিকে চেয়ে থাকতে হল দিনের পর দিন সি হুয়ানের আশায়। আসবে সে বলেছে, আসবে-ই।

কত দিন কত রাত গেল কেটে। উত্তরের আকাশে কতবার সপ্তর্ষিমণ্ডলের বদলে শিশুমার আর শিশুমারের বদলে সপ্তর্ষি ধ্রুবতারার প্রধান প্রহরী হয়ে তাকে প্রদক্ষিণ করে গেল। তার কোন হিসেবই নান সু-র আর রইল না।

কখন ধীরে ধীরে তার হৃদয় থেকে সমস্ত লজ্জা আর দেহ থেকে জীর্ণ বাস খসে পড়ে গেল সে জানতে পারলে না।

অনেক কিছু তার গেল, গেল না শুধু চোখের সেই উৎসুক দিগন্ত-সন্ধানী দৃষ্টি আর মনের সেই অবিচলিত প্রতীক্ষা।

একদিন সেই প্রতীক্ষা সফল হল। দূর দিক্‌চক্রবালে দেখা দিয়েছে সাদা পালের আভাস। দেখতে দেখতে দূরের সেই পোত স্পষ্ট হয়ে উঠল, লাগল এসে শিলাকঠিন কূলে।

কে নামছে সেই পোত থেকে? ওই ত সি হুয়ান!

অধীর আগ্রহে পাহাড়ের চূড়া থেকে উচ্ছল ঝরনার মত নামতে লাগল নান সু।

মাঝপথেই সি হুয়ানের সঙ্গে দেখা হল।

উচ্ছ্বসিত ভাবে নান সু যেন গান গেয়ে উঠল, "এসেছ সি হুয়ান, এসেছ এতদিনে?"

লুব্ধ ভাবে যে তার দিকে এগিয়ে আসছিল, সে যেন অনিচ্ছা সত্ত্বেও একটু বিমূঢ় ভাবে চমকে দাঁড়াল,—কর্কশ কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলে, "এসেছি এতদিনে, মানে? কে তুমি!"

সি হুয়ানের বিস্মিত অথচ লুব্ধ দৃষ্টি নিজের সর্বাঙ্গে অনুভব করে সু কাতর ভাবে বললে, "আমায় চিনতে পারছ না সি হুয়ান। আমি নান সু।"

"নান সু! নান সু ত এই দ্বীপের নাম। যে দ্বীপ খুঁজতে আমরা বেরিয়েছি, সে দ্বীপ এতদিনে খুঁজে পেয়েছি।"

"আমার খোঁজে তাহলে তুমি আসনি? এসেছ দ্বীপের খোঁজে।"

"হ্যাঁ এই নান সু দ্বীপের খোঁজে—সাত সাম্রাজ্যের ঐশ্বর্য যার মাটিতে পোঁতা আছে। বল কোথায় ঐশ্বর্য?"

অশ্রুসজল চোখে নান সু এবার যেন আর্তনাদ করে উঠল,—"তোমার কি কিছু মনে নেই সি হুয়ান! মনে নেই তোমার রণপোত থেকে কেমন করে ঝড়ের রাতে আমাদের ছাড়াছাড়ি হয়েছিল?"

"রণপোত থেকে ছাড়াছাড়ি! সাত পুরুষে আমাদের কেউ রণপোতে চড়েনি। আট পুরুষ আগে এক সি-হুয়ান কি রকম নৌ-সেনাপতি ছিলেন

বলে শুনেছি। এই নান সু দ্বীপের গুপ্ত তথ্য নাকি তাঁর কাছ থেকেই পাওয়া। কিন্তু সে তো কাইফেং যখন চীনের রাজধানী ছিল সেই দু শতাব্দী আগের কথা!"

"দু শতাব্দী আগেকার কথা!" অস্পষ্ট আবেগরুদ্ধ স্বরে উচ্চারণ করলে নান সু, তার পর নবাগত নাবিকের লুব্ধ দৃষ্টিতে হঠাৎ নিজের পরিপূর্ণ নগ্নতা আবিষ্কার করে চমকে উঠল।

নাবিক তখন লোলুপ ভাবে তার দিকে অগ্রসর হচ্ছে। নান সু শরাহত হরিণীর মত প্রাণপণে ছুটে পালাল, ছুটে পালাল সেই পর্বত-চূড়ার দিকে, জীবনের পরম স্বপ্ন আজো যাকে ঘিরে আছে।

কিন্তু পদে পদে তার দেহ কি গুরুভারে যেন ভেঙে পড়ছে. লুব্ধ হিংস্র নাবিকের হাত থেকে আর বুঝি রক্ষা পাওয়া যায় না।

পর্বত-চূড়ার প্রান্তে এসে যখন সে আছড়ে পড়ল তখন শরীরে এতটুকু শক্তি আর তার অবশিষ্ট নেই।

কিন্তু লুব্ধ নাবিক তাকে সবলে আকর্ষণ করতে গিয়ে হঠাৎ সভয়ে শিউরে পিছিয়ে এল।

সবিস্ময়ে নান সু একবার তার দিকে তার পর নিজের দিকে তাকিয়ে স্তম্ভিত হয়ে গেল। তার একাগ্র প্রতীক্ষা দীর্ঘ দুই শতাব্দী ধরে যে যৌবনকে অক্ষয় করে ধরে রেখেছিল সে যৌবন দেখতে দেখতে সরে যাচ্ছে। চোখের ওপর তার শরীর শুকিয়ে যাচ্ছে, কুঁকড়ে যাচ্ছে, কুৎসিত হয়ে যাচ্ছে।

বহু যুগের অভ্যাসে আচ্ছন্ন দৃষ্টিতে দূর দিগন্তের দিকে সে বুঝি একবার তাকাল। চারিদিকে নীল সমুদ্র মথিত করে ও কারা আসছে! "কারা?" সে চীৎকার করে উঠল।

"ওরাও সি হুয়ান!" অট্টহাস্য করে উঠল নাবিক, "হুয়ানের পাঁচ হাজার বংশধর। ওবাও আসছে এই নান সু দ্বীপের গুপ্তধনের সন্ধানে. আসছে পুড়িয়ে মারতে সেই ডাকিনীকে দু শতাব্দী ধরে এ দ্বীপের গুপ্তধন যে আগলে রেখেছে!"

যে পাহাড়ের চূড়া থেকে নান সু-র উৎসুক চোখ দু শতাব্দী ধরে দিকচক্রবাল সন্ধান করে ফিরেছে, সেদিন রাত্রে জীবন্ত মশালরূপে তারই শীর্ষ সে উজ্জ্বল করে তুললে।"

ঘনশ্যামবাবু চুপ করলেন।

কিছুক্ষণ স্তব্ধ থাকার পর মর্মরের মত মস্তক যাঁর মসৃণ সেই শিবপদবাবু বললেন, "কিন্তু রবিনসন ক্রুশোর সঙ্গে এ গল্পের কোন মিল ত নেই?"

"থাকবে কি করে?" ঘনশ্যামবাবু একটু হাসলেন, "সপ্তদশ শতাব্দীর ইংরেজ কসাই-এর ছেলে, গেঞ্জি আর টালির ব্যবসাদার ড্যানিয়েল ডিফো এ গল্পের সূক্ষ্ম মর্ম কতটুকু বুঝবেন! মোটা বুদ্ধিতে তাই একে তিনি ছেলেভুলোন গল্প করে তুলেছেন!"

"এ গল্পের আসল মর্মটা তাহলে কি?" মাথার কেশ যাঁর কাশের মত শুভ্র সেই হরিসাধনবাবু জিজ্ঞাসা করলেন। কিন্তু উত্তরে ঘনশ্যামবাবু এমন ভাবে তাকালেন যে, এ প্রশ্ন দ্বিতীয়বার করবার উৎসাহ কারুর রইল না।